পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

সংবাদপত্রে প্রতিফলন

দ্বিতীয় খণ্ড

পপি দেবী থাপা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
দ্বিতীয় খণ্ড
পপি দেবী থাপা

978-984-35-3241-1

978-984-35-3241-1

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
সংবাদপত্রে প্রতিফলন
দ্বিতীয় খণ্ড

পপি দেবী থাপা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

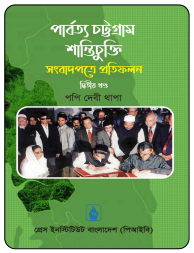

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশক	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রচ্ছদ	সোহেল আশরাফ খান
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০২২
কম্পিউটার বিন্যাস	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
বানান সমন্বয়	রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান মো. লুৎফর রহমান
মুদ্রণ	তিথি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
গ্রন্থস্বত্ব	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	৮৫০.০০ টাকা মাত্র

PARBOTTA CHATTOGRAM SHANTICHUKTI: SONGBADPOTRE PROTIFALAN DITIO KHONDO
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 850 Taka. ■ $08 Only
ISBN : 978-984-35-3241-1
Phone : 9361424, 9330081-84, Fax : 880-02-48317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

মহাপরিচালকের কথা

অশান্তি, হিংসা, হানাহানি, সংঘাত, সন্ত্রাস, শাসন-শোষণ, বঞ্চনার বিপরীতে শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ আর মানবিকতার উন্মেষ অবারিত হোক–এমন চাওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি তা না হয়, তবে সংকটের মাত্রা ও পরিধি তীব্রতর হতে বাধ্য। হয়েছেও তাই। সংঘাতে-সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়েছে জনপদ। ঝরেছে অঝোর ধারায় রক্ত। বিপর্যস্ত জীবন, বিপন্নতায় আক্রান্ত যুগের পর যুগ। সবুজ পাহাড়, বন-বনান্ত, নদী-নালা, ঝরনার ধারায় রক্তের বহতা স্রোত মানবজীবনকে করেছে অশান্ত। সংকট তীব্রতর হয়ে উঠে যখন সমাধানের দরজাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলটিতে জনজীবন স্বাভাবিক পথ ও পন্থা হারিয়ে সংঘাতের তীব্রতায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বিদেশি শক্তির ইন্ধনও ছিল এই সশস্ত্র অবস্থানের নেপথ্যে। আর তা থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ এই অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি অব্যাহত থাকলে যারা ফায়দা নেবে, তারা মত্ত হয়ে উঠেছিল।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহে ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতার সীমারেখার দোলাচলে ছিল বহমান। সময়গুলো ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে বৈষম্যমূলক। পশ্চাৎপদতার যে সার্বিক অবস্থা তা বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ দূরে থাক, নিজ অঞ্চলেও ছিল একধরনের বিচ্ছিন্নতা। পার্বত্য ভূমিতে নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার পথ ও পন্থা নিয়ে নিজেরাও সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছেন, এমনটাও নয়।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল হিসাবে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। তিনটি জেলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চল। সমতলবাসী আর পাহাড়ি জনপদের বাসিন্দাদের জীবনপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভিন্নতর ধারায় প্রবহমান। মোগল যুগে তেমন প্রবাহ তৈরি না হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলকে তাদের করায়ত্ত করে। একই সঙ্গে তাদের সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আলাদা শাসন পদ্ধতি চালু করেছিল। সেসময়ই স্পষ্ট হয় যে, পার্বত্য জনপদের সংকট সমতলের সংকটের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা চালু হয়। পার্বত্যবাসীর মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এর ফলে একটি গোষ্ঠী দেশ ছেড়ে চলে যায় প্রতিবেশী দেশে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য চালু করা শাসনব্যবস্থায় পাকিস্তানি শাসকরা বেশকিছু পরিবর্তন আনে। যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় অধিবাসীদের মধ্যে। কাপ্তাই লেকে বাঁধ নির্মাণ করে

বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ফলাফল–লাখ খানেক অধিবাসী বাস্তুহারা হয়। যথাযথ পুনর্বাসন হয়নি তাদের। অর্ধলাখ অধিবাসী দেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হিসাবে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি শাসকরা পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের মিজো, নাগা, মনিপুরি বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণশিবির গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতায় এরা মাঝেমধ্যেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে হামলা চালাত।

আর বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে উপজাতিদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তাদের নেতারা পাকিস্তানিদের গণহত্যার পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে উপজাতিদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। যদিও অনেক নেতা ও কর্মী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর দেশ হানাদারমুক্ত হলেও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আলবদর, রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনীসহ পাকিস্তানপন্থিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। তাদের উৎখাতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অব্যাহত অভিযান চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সংকট নতুন করে দানা বাঁধে। গড়ে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি, হানাহানি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তা শাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যার সমাধান দূরে থাক বরং পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থান পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা অংশ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। হয়ে যায় শরণার্থী। সেই সঙ্গে চলে শান্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা। শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়।

টানা পনেরো বছরের সামরিক শাসনকালে পার্বত্য অঞ্চলে গোলযোগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। ব্যাপক হারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া বিভেদ দূর করেনি। বরং রেষারেষি এবং বিভেদের মাত্রা হয়েছে তীব্রতর। ব্যাপক হারে বিভিন্ন জেলার ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক হারে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত করা হয়। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রায়ই সংঘাতের ঘটনা ঘটে আসছিল। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিরাশি সালের পর শান্তির নামে আলোচনা চালানো হলেও ফলপ্রসূ হয়নি। সামরিক জান্তা শাসক এরশাদের ৬টি এবং জিয়ার উত্তরসূরি খালেদা সরকার ১৩টি বৈঠক করেও কোনো সুফল আনতে পারেনি। বরং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। শাসক পক্ষের সদিচ্ছার অভাবে এবং

অশান্তি জিইয়ে রাখার অভিপ্রায়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের কোনো পন্থাই সামনে আনা যায়নি। বরং অবিশ্বাস, অসন্তোষ, সহিংসতার মাত্রা বেড়েছে। কোনোদিন এর সমাধান হবে না বরং সশস্ত্র পন্থাই অব্যাহত থাকবে–এমনটাই উভয় পক্ষের বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়। খোলা দূরে থাক, বরং জট আরও বেড়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী তো আর এক জায়গায় স্থির থাকে না। পরিবর্তন তো ঘটেই। পার্বত্যবাসীর জীবনে অমানিশার অন্ধকার যে একদিন দূর হবে, সে আভাসটুকু মিলছিল যখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং পার্বত্য অঞ্চলে সফর করেন। পার্বত্যবাসীর সঙ্গে মতবিনিময়কালেই তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অর্থাৎ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট-পরবর্তী ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক সেখানে অশান্তি আর হানাহানির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সম্প্রীতি, সৌহার্দের কোনো অবস্থানই অক্ষুণ্ন রাখেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি দূরীভূত করার কথা তিনি ছিয়ান্নব্বই সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন। একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরই শুরু হয় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ। বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরাও ছিলেন। বিএনপির দুই সদস্যের নাম কমিটিতে থাকলেও তারা কোনো ভূমিকা নেননি। বরং এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিরোধিতার আশ্রয় নেয়। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সাতটি বৈঠকের পর শান্তির আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সই হয়েছিল ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি। দীর্ঘদিনের অশান্তির বিপরীতে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাটি অকল্পনীয়, অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। শেখ হাসিনা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। যদিও তৎকালীন বিরোধী দল ও তাদের নেত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, শন্তিচুক্তি হলে চট্টগ্রামসহ ফেনী ভারতের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু তার সেই ভাষ্য প্রলাপের তালিকায় রয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের চলে আসা পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই চুক্তি এক অনন্য নজির, সেই সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। চুক্তি সইয়ের পরবর্তী এই আড়াই দশকে পার্বত্যাঞ্চলের যে সমৃদ্ধি তাও শান্তিচুক্তিরই সুফল।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর এই সংকলন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সন্নিবেশিত করেছে। নিয়মিত প্রতিবেদনের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলামগুলো যুক্ত হয়ে গ্রন্থটিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। যেখানে পাঠক কেবল সংবাদ নয়–সংবাদ বিশ্লেষণ, ইতিহাস, দ্বন্দ্বের কারণগুলোর গভীর অনুসন্ধান, শান্তিচুক্তিকে ঘিরে বিভিন্ন পক্ষের মতামতের একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে পারেন। গ্রন্থটি পাঠকের সামনে শান্তিচুক্তিকে ঘিরে তৎকালীন রাজনীতিরও একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসে একটি অন্যতম বড়ো ঘটনা–অর্জন। এই পুরো প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকার কথাও আলাদা করে বলতে হয়, যার স্বীকৃতি ওঠে এসেছে স্বয়ং জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমার কণ্ঠেও।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন' গ্রন্থটির আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ ও (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। সময়সীমা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। কলেবর বেড়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঠাঁই পায় সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ভোরের কাগজ। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়। গ্রন্থটি প্রণয়নে নিরলস পরিশ্রমের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর গবেষক পপি দেবী থাপাকে ধন্যবাদ। বিশ্বাস এই যে, যাদের জন্য এই প্রকাশনা, সেই আগ্রহী পাঠক, গবেষকদের প্রয়োজন পূরণে গ্রন্থটি সক্ষম হবে।

জয় বাংলা।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ভূমিকা

পার্বত্য জীবনপ্রবাহে ইতিহাসের পরতে পরতে অস্তিত্বের টানাপোড়েন। নিজ জাতিসত্তা, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সবুজ পাহাড়ে রক্তের লেপন। বঞ্চিত, রক্তস্রোতে ভাসা প্রাণ যুগে যুগে প্রজন্মের চেতনায় জাগিয়েছে বিপ্লব। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের জনজীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। অশান্ত, অনিশ্চিত জীবনধারা তাদের রেখেছিল পশ্চাৎপদতা, বিদ্বেষ আর বিচ্ছিন্নতার আবর্তে। সময়ে তীব্র হওয়া সংকটের শিকড় ক্রমেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছিল মাটির গভীরে, যার গণ্ডি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ছুঁয়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গন।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে উত্তপ্ত-অস্থির পার্বত্য চট্টগ্রামে থমকে গিয়েছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, উন্নয়ন-অগ্রগতি। এ অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের জীবনাচার, অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সংস্কৃতি সমতলের অধিবাসীদের তুলনায় ভিন্নতর। যে কারণে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ রাজশক্তি পর্যন্ত এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানা মাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে শাসন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এরপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ে দেখা দেয় বিভক্তি। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি গ্রুপ চলে যায় ভারতে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা শাসকরা কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করে স্থানীয় জনমত উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, উন্নয়ন প্রকল্পের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় অধিবাসীদের বিষয়টিও তেমন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। এসব ঘটনায় উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর উপজাতি নেতাদের কিছু দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে সংকট নতুন রূপ লাভ করে। এ সময়ে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবি আদায়ে গঠন করে তাদের সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। সদ্য স্বাধীন দেশে সবাইকে নিয়ে একযোগে এগিয়ে চলার যে অঙ্গীকার, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাহাড়ি

জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কমে আসে দূরত্ব। তাদের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বাকশালে যোগদান সেই সাক্ষ্যই দেয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সে প্রচেষ্টা যায় থমকে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসনের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। তাতে কোনো সুফল তো মেলেইনি, বেড়ে যায় জাতিগত বিদ্বেষ, সংকট হয় আরও ঘনীভূত। তীব্র হয় অশান্তি, হানাহানি, সহিংসতা। অপর সামরিক শাসক এরশাদ শাসনামলে ৬টি, পরবর্তী সময়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি শাসনামলে ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সমাধানের দুয়ার খোলেনি, আসেনি প্রত্যাশিত শান্তি। অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা জমে হয়েছে পাহাড়সম। যে বৈঠকগুলো সম্পর্কে উপজাতীয় নেতাদের মূল্যায়ন ছিল– 'লোক দেখানো, তাতে ছিল আন্তরিকতার অভাব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছাও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।'

সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির দ্বীপশিখা জ্বালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ১৯৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি। কমিটিতে সরকারদলীয় সদস্যদের পাশাপাশি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও বিএনপিদলীয় দুই সংসদ সদস্য শেষ পর্যন্ত কমিটির কাজে অংশগ্রহণ করেননি। সংঘাত, হানাহানি, বিভেদের দিনগুলো পেছনে ফেলে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপে অংশ নেয়। জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর, খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। এরই ধারাবাহিকতায় আরও ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হওয়া সর্বশেষ অর্থাৎ সপ্তম বৈঠকে চূড়ান্ত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলে ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি।

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় চলে আসা অস্থিরতা, রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধে এ শান্তিচুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জমাট বরফ গলিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ চুক্তি বিশ্বেও এক অনন্য নজির। সংগত কারণেই শান্তি প্রক্রিয়ার পুরোটা সময় এ সংক্রান্ত যে কোনো ঘটনা

সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে গুরুত্বসহকারে। গবেষক, আগ্রহী পাঠক যাতে পার্বত্য শান্তিচুক্তিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে পেতে পারেন, সেজন্য আমাদের এই সংকলনগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে শুধু শান্তিচুক্তির পুরো প্রক্রিয়ার সংবাদ নয়, তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা বোঝাতে পক্ষ-বিপক্ষের সংবাদের পাশাপাশি পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও কলামগুলোও গুরুত্বানুসারে সংযোজিত হয়েছে। আধেয় সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পাঁচটি পত্রিকা: (১) সংবাদ, (২) দৈনিক ইত্তেফাক, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) দৈনিক জনকণ্ঠ, (৫) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার। সময়সীমা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর। কলেবর বেড়ে যাওয়ায় গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ঠাঁই পায় সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ভোরের কাগজ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে দৈনিক জনকণ্ঠ ও দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়। দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষা ও বানানে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পুরোনো সংবাদপত্র বিধায়, একেবারেই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি–এমন কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ত্রিবিন্দুচিহ্ন (...) ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পাঠক কেবল শান্তিচুক্তি প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সংবাদ নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম-সংকটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও দ্বন্দ্বের নানা মাত্রিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি শান্তিচুক্তিকে ঘিরে তৎকালীন রাজনীতির একটি সম্যক চিত্রও পাবেন। বিশ্বাস করি–গ্রন্থটি পাঠক, গবেষকসহ এ বিষয়ে আগ্রহীজনের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা যেমন অপরিহার্য, তেমনই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নটিও ছিল জড়িত। এসবকিছু বিবেচনায় নিয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে ধারণ করে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হয়েছেন রাজনৈতিক সমাধান ও শান্তি স্থাপনের পথে। তাঁরই সুযোগ্য নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে মাত্র ১৭ মাসের মাথায় দীর্ঘ দুই দশকের সশস্ত্র সংঘাতের যবনিকাপাত ঘটে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ১৯৯৭' স্বাক্ষরের মাধ্যমে। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৫ বছর পরও আজ পার্বত্যাঞ্চলে যে শান্তির সুবাতাস ও উন্নয়নের ছোঁয়া, তা এই শান্তিচুক্তিরই ফল। সময়ের সঙ্গে এ চুক্তির তাৎপর্য জাতীয় জীবনে উদ্ভাসিত হবে বহুমাত্রিকতায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নিঃসন্দেহে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা–অর্জন।

পপি দেবী থাপা
গবেষক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সূচিপত্র

পটভূমি	১৩-২২
দৈনিক জনকণ্ঠ	২৩-৪০৪
দ্য বাংলাদেশ অবজারভার	৪০৫-৫৫২

পটভূমি

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, মঙ্গলবার সকাল ১০টা ২৪ মিনিট। ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্মলগ্ন। মুহূর্তটি ঐতিহাসিক পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের। শিল্পী শাহাবুদ্দিনের স্বাধীনতার পতাকা আর অ, আ, ক, খ বর্ণমালা আঁকা তৈলচিত্রের নিচে রাখা টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন দুই নেতা–আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসেছিলেন অপর চেয়ারটিতে। মুখোমুখি দুই সারির একটিতে মন্ত্রিসভার সদস্য, অপর সারিতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনসংহতির নেতা ও স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে। মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা প্রধানমন্ত্রীসহ সবার। মুখে স্মিত হাসি বিজয়ের। বিশেষ দুটি কলম হাতে তুলে নিলেন দুই নেতা–আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও সন্তু লারমা। পনেরো পৃষ্ঠার চূড়ান্ত চুক্তির দুটি ফাইলে বাংলায় পরপর স্বাক্ষর করলেন দুইজন। একজন ফাইল তুলে দিলেন আরেকজনের হাতে। চারদিকে উচ্ছ্বাস আর অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। উপস্থিত সবার হৃদয়জুড়ে মঙ্গল আর শান্তির প্রার্থনা। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বিভেদ, হানাহানি, জাতিগত সংঘাতের দিনগুলো পেছনে ফেলে নতুন পথ চলার শুরু। যে পথ শান্তির, যে পথ কল্যাণের। মুহূর্তটি সৃষ্টির কারিকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালের জুনে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র ১৭ মাসের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিরোধীয় পক্ষগুলো মিলল মিলনমোহনায়। মাত্র ১৭ মাস সময়ের মধ্যে এ ধরনের একটি সম্মানজনক সাংবিধানিক সমাধান, তা অনেক অতি আশাবাদীরও ছিল কল্পনার বাইরে। অথচ এই হিরণ্ময় মুহূর্তে সেটিই বাস্তবতা। এখানে সবাই মিলেছে হৃদয়ে হৃদয়ে। শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়ের।

দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলে আসা বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত আর সবুজে ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের শিকড়ের সন্ধানে আমাদের আলো ফেলতে হবে সুদূর অতীতের গর্ভে। সৃষ্ট সংকট, সংঘাতে গড়াতে নিয়েছে দীর্ঘ সময়। প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের হিংস্রতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে রচিত হয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সংকট রূপ নিয়েছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়ে ওঠার ইতিহাসে দৃষ্টি ফেলে আমরা দেখি, চাকমা রাজা মংছুই ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) থেকে বিতাড়িত হয়ে রামু, টেকনাফ

প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরে মারমারা এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মোগলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে এবং বাংলায় মোগল শাসকদের কাছে এ অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করে। ওই সময় থেকেই সমতল ভূমির বাঙালিরা চাকমা রাজা দেওয়ান বক্স খান ও পরবর্তী শাসক রানি কালিন্দির আমন্ত্রণে এই অঞ্চলে আসেন। ১৭৬০-এর ১৫ অক্টোবর বাংলার নওয়াব মীর কাশেম খান পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। তবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইংরেজদেরও বাধার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে ১৭৭৭-১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা যোদ্ধারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ ১৭৮৭ সালে ইংরেজ বড়োলাটের কাছে গিয়ে শান্তি কামনা করে আনুগত্যের ঘোষণা দেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ব্রিটিশরা এলাকাটির প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করে। ১৮৬০ সালের ৩৩০২নং প্রজ্ঞাপন বলে চট্টগ্রাম জেলার মূল পার্বত্য অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একজন সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ইংরেজ রাজশক্তি এই অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিদ্রোহ-অসন্তোষকে গভীর ও নানামাত্রিক বিবেচনায় নিয়ে তাদের শাসনের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০–এই একশ বছরে ইংরেজ তার নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯০০ সালের ১ মে তারা জারি করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট' (CHT Regulation Act 1900)। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নন-রেগুলেটেড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯০০-এর অ্যাক্টের ৩৪, ৫১ ও ৫২ ধারায় এই এলাকার উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ৩৪ ধারা অনুযায়ী বহিরাগত অ-উপজাতিদের জন্য জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ; ৫১ ধারায় অ-উপজাতি কোনো ব্যক্তি উপজাতিদের অধিকার ও স্বার্থবিরোধী কোনো তৎপরতায় লিপ্ত হলে তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করা যাবে। অন্যদিকে ৫২ ধারায় বলা আছে, কোনো অ-উপজাতি শুধু জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়েই ওই এলাকায় প্রবেশ বা বসবাস করতে পারবে।

১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area হিসাবে ঘোষণা করে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করায় উপজাতিদের একটা অংশ এর বিরোধিতা করে। তারা ভারতের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল। পার্বত্য

চট্টগ্রাম জনসমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হলে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। সমিতি রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বোমাং রাজপরিবারের কিছু নেতা এর প্রতিবাদে বান্দরবানে বর্মী পতাকা উত্তোলন করে।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১ আগস্ট বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে। তারা ভারতীয় পতাকা নামানোর জন্য বিক্ষুব্ধদের ওপর বল প্রয়োগ করে এবং সেখানে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। পাকিস্তানে উপজাতিদের অধিকার সংরক্ষিত হবে কি না, তা নিয়ে উপজাতি নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা কলহে লিপ্ত হন। অধিকারের ব্যাপারে শঙ্কিত একটি বড়ো গ্রুপ তাদের ভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। এ সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা খর্ব হতে থাকে। পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনা শুরু হয়। এ সময় পার্বত্যাঞ্চল স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীরবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৮৮১' বাতিল করে। সরকারের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন জেলা প্রশাসক। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার এক সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে Excluded Area-এর পরিবর্তে উপজাতীয় এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৬৪তে উপজাতীয় এলাকার বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্ত করে রেগুলেশন ১৯০০ চালু রাখা হয়। তবে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ওই রেগুলেশনের ৫১ ধারাকে Ultra-Vires বা রীতিবিরুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৪নং ধারারও সংশোধন করা হয়। এর ফলে জেলা প্রশাসক কোনো অ-উপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা হারান এবং যেসব অ-উপজাতি ১৫ বছর বা এর বেশি সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন, তাদের জমি ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দেও অবশ্য ৫২ ধারার কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এলাকার জনগণের মতামত এবং তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সম্মতি বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা হয়নি। এমনকি উন্নয়ন পরিকল্পনায়ও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। বরং কোনো কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ ও কাঠের ওপর নির্ভর করে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল (কর্ণফুলী) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রকল্পসহ

অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে পাহাড়িরা চাকরিবাকরির সুযোগ-সুবিধা প্রায় পায়নি বললেই চলে। ষাটের দশকে কাপ্তাইয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাঁধ নির্মাণের ফলে ব্যাপক ফসলহানিসহ ওই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজনের ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। পাহাড়িদের জীবনধারণের অবলম্বন কৃষি অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। কাপ্তাই বাঁধের কারণে ৯৯ হাজার ৯৭৭ জন লোক বাস্তুহারা হয়ে যায়। এতে তলিয়ে যায় চাষযোগ্য জমির ৫৪ শতাংশ। পথে নেমে পড়ে ওই এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িরা। এমনকি জমি অধিগ্রহণ করে পাহাড়িদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি পুনর্বাসনের। জানা যায়, ওই সময়ে উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে প্রায় ৫০ হাজার উপজাতি নর-নারী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়, তৎকালীন বার্মা তথা আজকের মিয়ানমারেও আশ্রয় নেয় অনেকেই। কর্ণফুলী পেপার মিলস প্রতিষ্ঠাকালে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ঘোষণা থাকলেও পাহাড়িরা চরম বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রভাবে বিপুলসংখ্যক নিরীহ সরল উপজাতি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সমর্থন দিতে পারেনি। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ আসনগুলো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যায়। অবশ্য অনেক উপজাতি নেতা এর বিরোধিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর বাঙালি জাতীয়তার পরিচয়ে পরিচিত হতে পাহাড়িরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে উপজাতিদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। বঙ্গবন্ধু তাদের আশ্বাস দেন যে, তারা সরকারি চাকরিতে তাদের যথাযোগ্য অংশ পাবে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠিত হয় (মতান্তরে ২৪ জুন ১৯৭২)। ওই সময়ে গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পাহাড়িদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ৪ দফা দাবিনামা পেশ করে। সেগুলো হচ্ছে: (১) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ রাখা, (২) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে (৩) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের

জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে। বঙ্গবন্ধু এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলধারায় মিশে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুর এ প্রস্তাবের মর্মার্থ তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির। তৎকালীন বিরোধীদলগুলোর অনেকেই এ সুযোগ গ্রহণ করে মেতে ওঠে অপপ্রচারে। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের শেষদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অভিবাসী প্রেরণ বন্ধ এবং অবৈধভাবে পাহাড়িদের দখল করা জমিজমা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবন এবং বৈশিষ্ট্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন। বাকশাল কমিটিতে উপজাতি নেতাদের সম্মানজনক পদ দেন। যাতে তারা নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতে পারেন। বোমাং চিফ মং শু প্রু চৌধুরীকে বান্দরবান এবং মং চিফ মং প্রু সাইনকে খাগড়াছড়ি জেলার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। তিন জেলার বাকশাল সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া হয় তিনজন উপজাতি নেতাকে। এমনকি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কথায় আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হয়ে বাকশালে যোগদান করেন।

১৯৭৩ সালে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখারূপে যে শান্তিবাহিনীর জন্ম হয়, বঙ্গবন্ধুর গঠনমূলক কাজের দরুন ওই বাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু যখনই পাহাড়িদের বুঝতে এবং কাছে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং উপজাতিরা বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক তখনই ঘাতকের বুলেটে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন। আবার পুরো পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সরকার এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজিত সমস্যাকে কেবল অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করে উপজাতীয় জীবনবিন্যাস, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৬ সালে গঠন করেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড'। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি বসতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা, এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক হারে বাঙালি পুনর্বাসন শুরু করে। পাশাপাশি তাদের জানমাল রক্ষার অজুহাতে বেশি পরিমাণ সৈন্য ও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। সেসময় উপজাতিদের

আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তাতে কিছুই লাভ হয়নি। সহিংসতা ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে। জোরদার হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। ১৯৮০ সালের ২৯ জুলাই একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে। একই বছরের ২৫ মার্চ বাঙালি-পাহাড়ি দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়। ১৯৮১ সালে পুনর্বাসিত বাঙালিদের পাহাড়ে জমি ও টাকা দেওয়া শুরু হয়। ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি ট্রাইবাল কনভেনশন বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে জনসংহতি সমিতির আটদিনব্যাপী দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্টি মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী–এ দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন থেকে শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। একই বছরের ১ অক্টোবর ক্ষমতা দখলকারী অপর সামরিক শাসক এরশাদ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করতে পারেনি। ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হামলায় মানবেন্দ্র লারমা তার ৮ সহযোগীসহ নিহত হন। ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি রাঙামাটির মারিশ্যা এলাকায় বহুল আলোচিত শেল ওয়েল কোম্পানির ৫ জন বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহরণের ঘটনা ঘটে। পরে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্বত্য এলাকার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ৩১ মে বরকলে ১০০ জন অ-উপজাতিকে শান্তিবাহিনী হত্যা করে। ২৮ নভেম্বর ২ জন উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী। ১৯৮৫ সালের ২৯ জুন প্রীতি গ্রুপের ২৩৩ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্য জীবনে ফিরে আসে। ওই বছরের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার পুজগাং এলাকায় সর্বপ্রথম সরকার ও জনসংহতি বৈঠকে বসে। সরকার প্রথম এক মাসের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ১৯৮৬ সালের ২৪ মে। ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে আসেন। ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জেলা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বছরের ডিসেম্বরে পানছড়ি থানার পুজগাংয়ে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৈঠক। ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি তৃতীয় এবং ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বৈঠক, ১৯ জুন পঞ্চম এবং ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর এরশাদ শাসনামলে মোট ছয়টি বৈঠকের শেষ বৈঠকটিও সমাধান ছাড়াই শেষ হয়। বৈঠকগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল না আসায় পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি, সংঘাত থাকে অব্যাহত।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯২ সালের ১০ জুলাই পার্বত্য সংকট নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে। ১ আগস্ট জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে। এ সময় থেকে দফায় দফায় অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। কখনো জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে, কখনো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথভাবে এই অস্ত্রবিরতি পালিত হয়। বিএনপি সরকারের আমলে অলি আহমদের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৫ নভেম্বর। জনসংহতির পক্ষে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের ৫ মে পর্যন্ত খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে বিএনপি সরকারের কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের কমিটির একটি সাব-কমিটি গঠিত হলে ওই কমিটির সঙ্গে খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার দুদুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক হয় ১৯৯৪ সালের ৪ জুন। সাব-কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে মোট ছয়টি বৈঠক করে। ১৯৯৫ সালের ২৫ অক্টোবর বিএনপি সরকারের আমলে কোনো সমাধান ছাড়াই মেননের সাব-কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির ষষ্ঠ ও সরকারের সঙ্গে ত্রয়োদশ বৈঠক শেষ হয়। বৈঠকগুলোর সময় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টি যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তেমনই প্রতিপক্ষের আস্থাহীনতার বিষয়টিও সামনে এসেছে। পাশাপাশি সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল চলমান। শেষ পর্যন্ত আসেনি কাঙ্ক্ষিত ফল।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২৩ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সংকট সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধানকল্পে ৩০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে সরকার, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও বিএনপির দুই সংসদ সদস্য এই কমিটির কাজে শেষ পর্যন্ত অংশ নেননি। এই কমিটিই পরে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত জাতীয় কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠকটি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ২১ ডিসেম্বর শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয়

কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির পক্ষে রূপায়ণ দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়া যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, মথুরালাল চাকমা, কে শৈ অং মারমা ও বিশ্বজিৎ চাকমা, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, মহাপরিচালক সিএম মোহসীন, বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সন্তু লারমা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত থাকায় দুইদিন মুলতুবি থাকার পর ২৪ ডিসেম্বর বৈঠক আবার শুরু হয়। প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা তাদের সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিনামা পেশ করেন এবং অতীতের সরকারগুলো কীভাবে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে একের পর এক ঘটনার জন্ম দিতে থাকে, তার চিত্র তুলে ধরেন। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে টানা সোয়া তিন ঘণ্টা বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাংবাদিকদের বলেন, সমাধান আসন্ন। তার ভাষায়, 'ডেফিনিটলি আই অ্যাম হোপফুল'। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ উল্লসিত মুখে জানালেন, 'আমরা আনন্দিত, বৈঠক ফলপ্রসূ। ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রয়োজনে চলবে ম্যারাথন বৈঠক।' প্রথম বৈঠকের এই ফলাফলকে ব্যতিক্রমধর্মী বলাই যায়। বিগত বছরগুলোয় সরকার নিয়োজিত কমিটির সঙ্গে জনসংহতি সমিতির যতগুলো বৈঠক হয়েছে, তার কোনোটাতেই এই বৈঠকটির মতো সৌহার্দ, আন্তরিকতা ও আশাবাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়নি। বৈঠক চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে টেলিফোনে খোঁজখবর নেন এবং জনসংহতি সমিতির নেতাদের ঢাকায় এসে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আন্তরিকতা আস্থার সংকট কাটাতে ভূমিকা রেখেছে ব্যাপক। যার প্রতিফলন আমরা দেখব দ্বিতীয় বৈঠকে।

দ্বিতীয় বৈঠকের চমক ছিল এর স্থান। বিরোধের দুই যুগের মধ্যে সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির নেতাদের প্রথমবারের মতো ঢাকায় আগমন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে উভয়পক্ষের তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ জানুয়ারি। ঢাকা পর্যন্ত তাদের আসতে সম্মত হওয়ার বিষয়টিকে তখনই আস্থার সংকট কেটে যাওয়ার লক্ষণ মনে করা হচ্ছিল। এরশাদ আমলের

বৈঠকগুলোতে তারা এমনকি ছবি তুলতে দিতেও রাজি ছিলেন না। আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে প্রথম দফা বৈঠক খাগড়াছড়িতে হলেও এর পরের সব বৈঠক হয়েছে ঢাকায়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১২-১৩ মার্চ। ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৪ মে। বৈঠক শেষে উভয়পক্ষ ঘোষণা করে আলোচনায় সব বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন এবং শীঘ্রই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবেন। পাঁচদিনব্যাপী চলা পঞ্চম বৈঠকটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৮ জুলাই। ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমার কণ্ঠে শান্তিচুক্তি নিয়ে পরিষ্কার বার্তা আসে। ১৪-১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সরকারি কমিটি ও জনসংহতি সমিতির চারদিনের ষষ্ঠ বৈঠক শেষে সন্তু লারমা সাংবাদিকদের জানান, তারা খসড়া শান্তিচুক্তি প্রণয়ন করেছেন। সর্বশেষ ও সপ্তম বৈঠকের আলোচনা ঢাকায় শুরু হয় ২৬ নভেম্বর। শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল জনসংহতি সমিতির নেতারা একটি চূড়ান্ত সমাধানের প্রস্তুতি নিয়েই ঢাকায় এসেছেন। সপ্তম দফা বৈঠকের প্রথম দিনে বৈঠক হয়েছে ৪ ঘণ্টা। দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। ধারাবাহিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অমীংমাসিত সব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপিত হয়। বৈঠক সমাপ্ত হয় ৩০ নভেম্বর রাত ১টা ২০ মিনিটে। এরপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ–১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আনন্দঘন পরিবেশে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি।

এই অর্জনের পথ মসৃণ ছিল না কখনোই। সেখানে বসবাসরত বাঙালি ও উপজাতিসহ বিবদমান পক্ষগুলোর দীর্ঘদিনের জমাট ক্ষোভ প্রশমনে নিতে হয়েছে কার্যকর উদ্যোগ। আলোচনা চলাকালেও পাহাড়ের পরিস্থিতিকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। স্বার্থান্বেষী মহল শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পাহাড়ে রক্ত ঝরিয়েছে, চালিয়েছে নানা অপচেষ্টা। তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর বড়ো একটি অংশ শান্তি প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, হরতালের মতো কর্মসূচি দেওয়াসহ 'অশান্তিবাহিনী' গঠনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ আনা হয়েছে দেশ বিক্রির। দেশের অভ্যন্তরে এই প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলায় শান্তিচুক্তির পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলের মতামতকেও বিবেচনায় নিতে হয়েছে গুরুত্বের সঙ্গে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সংকট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরোমে আলোচিত ছিল দীর্ঘ সময় ধরে। সংগত কারণেই পুরো প্রক্রিয়াটিকে তারা রেখেছিলেন আতশকাচের নিচে। ভারতে আশ্রয়

নেওয়া শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বসবাসের পরিস্থিতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিতে নিতে হয়েছে কূটনৈতিক উদ্যোগ। সবকিছু মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র ১৭ মাসের মাথায় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। শান্তি আলোচনা শুরুর পর থেকেই সব বিরোধিতার বিপরীতে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে আসছিলেন, কোনো অপচেষ্টাই শান্তির এই পথচলাকে রুদ্ধ করতে পারবে না। যেমনটা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।' সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই শান্তিচুক্তিবিষয়ক আলোচনার পুরোটা পথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রসর হয়েছেন দৃঢ়তার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে–পার্বত্য শান্তিচুক্তি। বিশ্বে এমন চুক্তির নজির তেমন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইছে। জনজীবন সংঘাতবিমুখ। এমন ধারা থাক অব্যাহত, চিরায়ত–এই প্রত্যাশায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত আধেয় নিয়ে এই প্রকাশনা। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে (১) দৈনিক জনকণ্ঠ, (২) দ্য বাংলাদেশ অবজারভার থেকে সংগৃহীত আধেয়, সময় ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর; শুরুটা 'দৈনিক জনকণ্ঠ' দিয়ে।

তথ্যসূত্র: *সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দ্য বাংলাদেশ অবজারভার।*

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক
জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

সেমিনার ও সংলাপের দ্বিতীয় দিন

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা

সমাধানে সময়ক্ষেপন

বিপজ্জনক হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সময়ক্ষেপণ দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। তারা গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে অবিলম্বে এ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলিক অধিকার রক্ষায় জাতীয় কমিটি আয়োজিত দু'দিনব্যাপী সেমিনার ও সংলাপের দ্বিতীয় দিনে গতকাল শুক্রবার তাঁরা এ কথা বলেন। ঢাকায় জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গতকাল সেমিনার শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে অবিলম্বে আলোচনা শুরু, পাহাড়ী জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, ভূমি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু, উদ্বাস্তুদের ফেরত আনার পরিবেশ সৃষ্টি, বাঘাইছড়ির সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠান এবং অপহৃত কল্পনা চাকমাকে উদ্ধারসহ অপহরণকারীদের বিচারের দাবি জানিয়ে ছ'দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লুৎফর রহমান শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিকালের অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ ইমতিয়াজ আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন ডেইলী স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূত ফখরুদ্দিন আহমেদ, আহমদ ছফা, ভারতীয় সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক, সব্যসাচী বাসু রায় চৌধুরী ও সেলিম সামাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মাহফুজ আনাম বলেছেন, বাংলাদেশে রাজনীতির সামরিকীকরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা দেশের 'জাতীয় একটি ইস্যু' হিসাবে বিবেচনা না করা আমাদের সকলের ব্যর্থতা। এ সমস্যা সমাধানে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর রাখার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ফখরুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পাহাড়ী জনগণের সত্যিকার মতামত প্রতিফলিত

হওয়ার প্রয়োজন। আহমদ ছফা বলেছেন, পাহাড়ী জনগণ বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে থাকতে চায় কি চায় না, নাকি তারা স্বায়ত্তশাসন চায়– এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য দরকার। এ প্রশ্নগুলোর জবাবের ওপর আলোচনার গতি প্রকৃতি নির্ভরশীল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে কর্মরত বিবিসি'র সংবাদদাতা সুবীর ভৌমিক বলেছেন, ভূ-রাজনৈতিক কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটির শীঘ্রই মীমাংসা হওয়া দরকার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এ অঞ্চলে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে পারে। আগামী দিনগুলোয় পাহাড়ী জনগণের নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের বদলে সশস্ত্র ব্যক্তিদের হাতে চলে গেলে এ সমস্যার সমাধান দুরূহ হয়ে পড়তে পারে বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

মেঘনা গুহঠাকুরতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সকালের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ডঃ আমেনা মহসিন, ফরিদা আখতার, আদিলুর রহমান খান, খালেদা খাতুন, শিশির মোড়ল ও কবিতা চাকমা।

আদিলুর রহমান খান বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্তহীন রয়েছে। সেখানকার শান্তিপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে সংশ্লিষ্ট সকলপক্ষে স্বার্থান্বেষী মহল সক্রিয় রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ফরিদা আখতার তাঁর বক্তৃতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাণবৈচিত্র্য (বায়ো-ডাইভারসিটি) ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

কবিতা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত নির্যাতন ও সকল গণহত্যা সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান। তিনি বলেন, সেখানে 'সামরিক সম্প্রসারণ' দিন দিন বাড়ছে। হিল উইম্যান ফেডারেশনের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও হুমকি দেয়া হচ্ছে।

সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা ও বীর বাহাদুর যথাক্রমে গতকালের সকাল ও বিকালের অধিবেশনে বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও তাঁদের কেউ কোন অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১লা অক্টোবর ১৯৯৭

মন্ত্রিসভার বৈঠক

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে জাতীয়

কমিটি ॥ বেসরকারী খাতে উড়োজাহাজ

কন্টার সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত

মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কমিটি

গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মন্ত্রিসভা দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারী খাতে স্টলসহ উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এ সিদ্ধান্তের ফলে পর্যায়ক্রমে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারী উদ্যোগে বিমান ও হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রবর্তনের সুযোগ উন্মুক্ত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

মন্ত্রিসভায় জানানো হয় যে, দেশে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি এবং এর প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। মন্ত্রিসভা দি স্টান্ডার্ডস অব ওয়েটস এন্ড মেজারস অর্ডিন্যান্স ১৯৮২-এর সংশোধনী প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব আইয়ুবুর রহমানের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অবদান এবং ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়।

মন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রিগণ, বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সংশ্লিষ্ট সচিবরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। -তথ্য বিবরণী।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান আসন্ন

মোস্তফা ফিরোজ ॥ পানি বণ্টন চুক্তির মতোই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার নাটকীয় রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগামী ২১ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে সরকারের সঙ্গে জনসংহতি সমিতির আনুষ্ঠানিক বৈঠক হবে। দু'একদিনের বিরতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দু'পক্ষের মধ্যে একটানা বৈঠক চলবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে বলে সরকারী নীতি-নির্ধারক মহল মনে করছেন। ইতোমধ্যে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত

হয়েছে। এখন প্রয়োজন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্মানজনক সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। ভারত সরকারও চায় এ সমস্যার সমাধান হোক। এ বিষয়ে তারা বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিবর্তিত এ প্রেক্ষাপটে শান্তিবাহিনীর নেতারাও উপলব্ধি করছে যে, দীর্ঘদিনের এ রাজনৈতিক বিরোধ আর জিইয়ে রাখা উচিত হবে না। তারাও চায় এ বিরোধের অবসান। এ কারণে শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দও এখন তৎপর। তারা এখন সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী।

সূত্র জানায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের প্রথম বৈঠক হয় গত ২৩ নবেম্বর। ওই বৈঠকেই ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। আগামী ২১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হবার আগে সরকারী কমিটি কিছুটা পুনর্গঠন করা হয়েছে। দশ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে একে খন্দকারের স্থলে বীর বাহাদুর এমপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক হচ্ছেন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। সদস্যরা হচ্ছেন চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি, এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী এমপি, সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি আতাউর রহমান খান কায়সার। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এ সরকারী কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা দেবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

পার্বত্য সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে আজ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠক হতে যাচ্ছে

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম থেকে ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের একরাশ আশা নিয়ে আজ শনিবার আন্তরিক পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী কমিটি বৈঠকে বসছে। বাংলাদেশে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। খবর সরকারী সূত্রের।

সূত্র জানায়, ইতোপূর্বে এরশাদ সরকার আমলে ৬ দফা এবং বিএনপি সরকার আমলে ১৩ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সাথে। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। গত ১২ জুন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানে আশার আলো দেখা দেয়।

সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে নতুন সরকারী কমিটিতে রদবদল হয়ে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে ব্যাপক গ্রাউন্ডওয়ার্ক সম্পন্ন হয় এবং নির্ধারিত হয় আজকের এ বৈঠক। জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, আজ সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এ বৈঠক অনুষ্ঠানে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। বৈঠকে সরকারী পক্ষে সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে শন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন। হাসনাত আবদুল্লাহর সাথে ১২ সদস্য ও শন্তু লারমার সাথে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল বৈঠকে সরাসরি অংশ নেবে। বৈঠকের প্রস্তুতি হিসাবে যোগাযোগ কমিটি আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সভাপতিত্বে স্বেচ্ছাসেবক কমিটিও তাদের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দকে আজ সকালে কড়া প্রহরাধীনে বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারযোগে পানছড়ি থানার দুধুকছড়ি থেকে বৈঠকস্থলে নিয়ে আসা হবে। বৈঠকের পূর্ব শর্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যেই গত ১৭ ডিসেম্বর থেকে দুধুকছড়ি এলাকার ৮টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং ৫টি ক্যাম্প নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সরকার ১০০ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী এলাকায় সকল প্রশাসনিক তৎপরতা বন্ধ রেখেছে এবং আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অবস্থা বলবত থাকবে। অপরদিকে বর্তমান সরকার স্থবির হয়ে পড়া শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরুর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির ৯ গ্রেফতারকৃত সদস্য ও জামিনে মুক্ত অপর ৬ উপজাতীয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্তও প্রদান করেছে।

সূত্র জানায়, জনসংহতি সমিতিও এবার সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুসারে, এবার জনসংহতি সমিতি তাদের অনেক দাবিদাওয়া ছাড় দিয়ে যুক্তিযুক্ত দাবির প্রতি মনোযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের মনোনয়ন পেয়ে গঠিত কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, মোশাররফ হোসেন, আমির

খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও ফজলে রাব্বী এবং আলী হায়দার খান, বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান একে খোন্দকার, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার ও প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাবেক সেনা অধিনায়ক মেজর জেনারেল (অব) আবদুস সালাম এমপি 'রিসোর্স পার্সন' হিসাবে উক্ত কমিটিকে সহায়তা দেবেন। এছাড়া ১০ সদস্যের একটি টেকনিক্যাল কমিটিও শান্তি আলোচনায় সরকারী কমিটিকে সহায়তাদানে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। অপরদিকে উপজাতীয় ৪ শীর্ষনেতা বৈঠক চলাকালে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান শন্তু লারমাকে সহায়তা করবেন।

আজকের বৈঠকে অংশ নিতে শুক্রবার সরকারী কমিটির ৯ সদস্য খাগড়াছড়ি গিয়ে পৌঁছেছেন বলে সরকারী সূত্র জানায়। খাগড়াছড়ি যাত্রার প্রাক্কালে কমিটির অন্যতম সদস্য মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা আশাবাদী। সমস্যাটির অন্তর্নিহিত বিষয় যেহেতু রাজনৈতিক সেহেতু রাজনৈতিকভাবেই আমরা এগিয়ে যাব। অতীত সরকারগুলোর ন্যায় আমরা অযথা কালক্ষেপণ করব না। বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। যুক্তিযুক্ত সকল দাবির প্রতি আমরা মনোযোগ দেব।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদকীয়

পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি চাই

গত মঙ্গলবার সেনাবাহিনীর একটি টহল দল তথাকথিত শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত থানচি থানার টিএনও এবং অন্য সাতজনকে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে এরূপ অনেক অঘটন তথাকথিত শান্তিবাহিনী ঘটিয়েছে। অল্প কিছুদিন আগেও এই বাহিনী গভীর বনে কয়েকজন কাঠুরিয়াকে আটক করে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। শান্তিবাহিনী নামের এই তথাকথিত সংগঠনটি পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে অশান্তি সৃষ্টি করে আসছে। বর্তমানে এই বাহিনী নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ায় দীর্ঘদিন থেকে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার নামে প্রহসন করে আসছে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারী উদ্যোগ ও আলোচনা বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনার স্বার্থে সরকার ও তথাকথিত শান্তিবাহিনীর মধ্যে অস্ত্রবিরতির নির্দিষ্ট তারিখ বহুবার স্থিরীকৃত হয়েছে। কিন্তু অস্ত্রবিরতির পরিবর্তে তারা ইতোপূর্বে বাঙালী নাগরিকদের অপহরণ করে হত্যা করেছে, অস্ত্র ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি

বিঘ্নিত করেছে। বর্তমানে তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের অস্ত্রবিরতি চলছে। কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই বাহিনী অস্ত্রবিরতি চুক্তিকে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের থানচি থানার টিএনওসহ আরও আট ব্যক্তিকে অপহরণ করে বনের গভীরে অবস্থিত ক্যাম্পে আটক রাখে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ টহল দল সাফল্যজনকভাবে অপারেশন চালিয়ে সকল অপহৃতকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। নিঃসন্দেহে আমাদের সেনাবাহিনীর এই উদ্ধার কার্য প্রশংসার দাবি রাখে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তিবাহিনী যে অসন্তোষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা চালিয়ে আসছে তা নিরসনে বিগত সরকারগুলো উদ্যোগ আয়োজন কম করেনি। কিন্তু সে অঞ্চলের একশ্রেণীর বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট সশস্ত্র ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের কারণে কোন উদ্যোগই কার্যকর করা যায়নি। সরকার পথভ্রষ্ট তথাকথিত উগ্রপন্থী শান্তিবাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে তাদের সসম্মানে পুনর্বাসনের অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তারা অপচেষ্টায় লিপ্তই রয়েছে। তবে ইতোমধ্যে বিপথগামী শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্য ভুল স্বীকার করে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং সাধারণ ক্ষমার আওতায় সমাজ জীবনে পুনর্বাসিত হয়েছে। তবু পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তি দূর হয়নি, তথাকথিত শান্তিবাহিনী অশান্তির কাজ করেই চলেছে।

তবে আশার কথা, বর্তমানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শান্তিবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণীমহল পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। জনসংহতি সমিতি এবং বর্তমান সরকারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে বাস্তবভিত্তিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রক্রিয়া যত শীঘ্র শুরু করা যায় ততই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের ওপর পাকিস্তানী আমলে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তাদের জাতিগত অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে; ফলে এই অঞ্চলের উপজাতিরা অধিকারের প্রশ্নে উগ্রবাদী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এ ছাড়াও বর্হিজগত থেকেও তাদের উস্কানি ও মদদ যোগানো হতো। আজ এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সকল পারস্পরিক সমস্যা সমাধান করছে এবং করার উদ্যোগও নিয়েছে।

এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোও সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিক। আত্মমর্যাদার সঙ্গে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী যে তারাও, এ কথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

পার্বত্য অঞ্চলের বুকে শান্তিবাহিনী যে অশান্তি সৃষ্টি করছে দেশের স্বার্থেই তা নিরসন করা আবশ্যক। এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উপজাতি সম্প্রদায়সমূহ এবং বর্তমান সরকার উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমরা আশা পোষণ করছি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

পার্বত্য সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিতে ঐকমত্য

মোয়াজ্জেমুল হক/জিতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: শুরুতেই শুভ সূচনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে রচিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী এক পরিবেশ। শনিবার খাগড়াছড়িতে এক আনন্দঘন অকৃত্রিম পরিবেশে বর্তমান সরকারের নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রামের জটিল সমস্যা সমাধানে কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনের। সিদ্ধান্ত হয়েছে এ লক্ষ্যে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পুনরায় বৈঠকের ঘোষণা করা হয়েছে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির।

খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে টানা সোয়া ৩ ঘণ্টা বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতি চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সাংবাদিকদের বলেছেন, সমাধান আসন্ন। তাঁর ভাষায়, 'ডেফিনিটলি আই এ্যাম হোপফুল'। জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ উল্লসিত মুখে জানালেন, 'আমরা আনন্দিত, বৈঠক ফলপ্রসূ। ২৪ ডিসেম্বর থেকে প্রয়োজনে চলবে ম্যারাথন বৈঠক। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংকট স্থায়ী সমাধানে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে বৈঠকের ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত। সকাল থেকে সর্কিট হাউস সংশ্লিষ্টদের কর্মচঞ্চলতায় মুখর হয়ে ওঠে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জাতীয় কমিটি নেতৃবৃন্দ ঘড়ির কাঁটায় ঠিক সোয়া দশটা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার পানছড়ির দুদুকছড়ি এলাকা থেকে জনসংহতি সমিতির সুপ্রিম কমান্ডের পাঁচ নেতাকে নিয়ে অবতরণ করল সার্কিট হাউস সংলগ্ন হেলিপ্যাডে। নেমে এলেন একে একে জনসংহতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্রি বোধিপ্রিয় লারমা, শীর্ষপর্যায়ের নেতা সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। এগিয়ে গেলেন হাসনাত আবদুল্লাহসহ জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার সাথে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করলেন তাদের। এরপর সোজা সার্কিট হাউসের হল রুমে গমন।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রথমে পরিচয় পর্বের আনুষ্ঠানিকতা এবং সাথে কোলাকুলি। সকাল ঠিক ১১টায় শুরু হলো বৈঠক। সরকারী কমিটির পক্ষে সকল ভেদাভেদ ভুলে সমস্যা সমাধানে তাদের আন্তরিক মনোভাবের বক্তব্য তুলে ধরা হলো। বক্তব্য রাখলেন হাসনাত আবদুল্লাহ, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, মোশাররফ হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার। জনসংহতি সমিতি প্রধান সন্তু লারমা বললেন, তিনি অসুস্থ, তবুও বর্তমান সরকারের আন্তরিক আহ্বানে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন। বক্তব্য দিলেন অন্যান্য নেতা–সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান ও রক্তোৎপল ত্রিপুরা। উপস্থাপন করলেন জুম্ম জনগণের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রদত্ত জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবীনামার ছাপানো কপি।

এরপর তাঁরা তুলে ধরলেন অতীত সরকারগুলোর বৈঠকের কালক্ষেপণ এবং পাশাপাশি সমস্যার জন্ম থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংগঠিত অসংখ্য ঘটনার চিত্র। পিনপতন নীরবতায় উভয়পক্ষ পরস্পরের বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনল। এবার সরকার পক্ষে তাদের ৫ দফার দফাওয়ারী আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ উত্তরে জানালেন, সরকারের আগ্রহে আমরা খুবই খুশী। তবে এর আগে আপনারা আমাদের ৫ দফার গভীরে প্রবেশ করুন। সরকারকে অবহিত করুন এবং আলোচনার জন্য পরবর্তী দিন ধার্য করুন। সন্তু লারমার অসুস্থতা ও দুর্বল শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় এনে সরকার পক্ষ এক তাৎক্ষণিক সম্মতি দেন। বিশদ আলোচনা শেষে ধার্য হয় ২৪ ডিসেম্বর পরবর্তী বৈঠকের। উভয় পক্ষের সম্মতিতে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বেলা সোয়া ২টায় সমাপ্তি ঘটে প্রথম বৈঠকের। এরপর তাদের আপ্যায়িত করা হয় মধ্যাহ্ন ভোজে। বেলা ৩টায় হাসনাত আবদুল্লাহ কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শন্তু লারমাকে নিয়ে উপস্থিত হন অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কক্ষে। ফটোসাংবাদিকদের ক্যামেরার অসংখ্য ফ্লাশ একের পর এক জ্বলে উঠল। জাতীয় কমিটির সকল নেতা তাদের সাথে ছিলেন। মাত্র ২ মিনিট বক্তব্য রাখলেন হাসনাত আবদুল্লাহ ও শন্তু লারমা। হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের বৈঠক আন্তরিক ও ফলপ্রসূ হয়েছে। সন্তু লারমাও একই সুরে কথা বললেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শন্তু লারমা সহাস্যে বললেন, এ সরকারের নতুন উদ্যোগ ও নবরূপে অনুভূতি দেখে আমরা খুবই খুশি। 'আপনি কি আশাবাদী?'–এমন এক প্রশ্নের উত্তরে লারমার দ্রুত জবাব, ভেরি মাচ হোপফুল, আই এ্যাম ডেফিনিটলি হোপফুল। পরপর আরও কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লারমা অস্বীকার করলেন বাঘাইছড়ির বর্বর হত্যাকাণ্ড, পানছড়ির ৯

কাঠুরিয়া অপহরণ ও থানচি থানার টিএনও অপহরণের সাথে শান্তিবাহিনী সদস্যদের সংশ্লিষ্টতার কথা।

বৈঠক সূত্র জানায়, শন্তু লারমাকে প্রস্তাব দেয়া হয় পরবর্তী বৈঠক ও তাঁর শারীরিক চিকিৎসা ঢাকায় গিয়ে করতে। লারমা জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি ২৪ ডিসেম্বর বৈঠকে আলোচনা করবেন এবং সিদ্ধান্ত জানাবেন। বৈঠক শেষে হাসনাত আবদুল্লাহ বৈঠকের অগ্রগতি ও সফলতা নিয়ে টেলিফোনে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলেন। শেখ হাসিনা পুনরায় তাঁর সরকারের আন্তরিকতা জানানোর নির্দেশ দেন এবং বলতে বলেন, লারমাকে সাথে সাথে অবহিত করা হয়েছে। বিকাল সাড়ে ৩টায় হেলিকপ্টারযোগে জনসংহতি নেতৃবৃন্দকে পুনরায় দুদুকছড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। বিদায় জানান সরকারী কমিটির নেতৃবৃন্দও, বিদায়ক্ষণ পর্যন্ত ৩০ সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক দল পুরো সার্কিট হাউস ভবনের আশপাশ কর্ডন করে রাখে। সবকিছু চলে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ন্ত্রণে। বৈঠকে সরকার পক্ষের সাথে প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াৎ হোসেন ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে জাতীয় কমিটি নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারযোগে চট্টগ্রাম ফিরে যান এবং নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। ২৪ ডিসেম্বর নির্ধারিত পুনঃবৈঠকের আলোকে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করেন বলে দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়।

বিএনপি'র ২ সাংসদ অনুপস্থিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির ২ সদস্য বিএনপির সাংসদ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম শনিবার খাগড়াছড়ির ঐ বৈঠকে উপস্থিত হননি। তাদের এই অনুপস্থিতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমিটি সূত্র জানায় ঐ ২ সদস্য এ ব্যাপারে কিছুই জানাননি। তবে সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার সাংবাদিকদের জানান, বিএনপি সাংসদ আমীর খসরু ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে টেলিফোনে জানিয়েছেন তাঁরা যেহেতু সংসদ বয়কট করছেন। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে বিএনপি সরকারের গঠিত জাতীয় কমিটির বৈঠকে আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদগণ উপস্থিত থাকতেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৬
সম্পাদকীয়

পার্বত্য সমস্যার গ্রন্থি খুলে যাক

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির

প্রথম বৈঠকে আলোচনার এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। দৈনিক জনকণ্ঠের রিপোর্টে পরিবেশটিকে 'ব্যতিক্রমধর্মী' বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, প্রথম বৈঠকে এ জটিল সমস্যাটি সমাধানে কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে এবং অস্ত্র বিরতির মেয়াদও আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জাতীয় কমিটির নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি নেতা শন্তু লারমা সমস্যাটি সমাধানে বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোগ ও নতুন অনুভূতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে সমাধান সম্পর্কে জোর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। প্রথম বৈঠকের পরে হাসনাত আবদুল্লাহ ও শন্তু লারমার উপরোক্ত মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিগত বছরগুলোতে উভয় পক্ষের মাঝখানে যে বরফের পাহাড় রচনা করেছিল তা অবশেষে বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোগ ও আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শে গলতে শুরু করেছে এবং বরফ গলাবার এ প্রক্রিয়ায় শান্তি বাহিনীও শরিক হতে প্রস্তুত।

প্রথম বৈঠকের উপরোক্ত ফলাফলকে 'ব্যতিক্রমধর্মী' বলা হয়েছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই, যেহেতু বিগত বছরগুলোতে সরকার নিয়োজিত কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির যতগুলো বৈঠক হয়েছে তার কোনটাতেই এবারকার বৈঠকটির মতো সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ও আশাবাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়নি। তাই এ বৈঠকের সফল সমাপ্তি সঙ্গত কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জনমনে নতুন আশার সঞ্চার করবে। প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিরা তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবিনামা পেশ করেন এবং অতীতের সরকারগুলো কিভাবে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে একের পর এক ঘটনার জন্ম দিতে থাকে তার চিত্র তুলে ধরেন। জাতীয় কমিটির সদস্যরা তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং ৫ দফার ওপর দফাওয়ারী আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জনসংহতি নেতারা জাতীয় কমিটিকে দফাগুলো নিয়ে তৎক্ষণাৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আগে সেগুলোকে ভালভাবে উপলব্ধির ও সরকারের গোচরীভূত করার পরামর্শ দেন। এ পরামর্শই গৃহীত হয় এবং ২৪ ডিসেম্বর পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য হয়। তদনুযায়ী আজ দ্বিতীয় বৈঠক শুরু হতে যাচ্ছে।

৫ দফা দাবিনামার ওপর আজকের বৈঠকের আলোচনা অত্যন্ত কঠিন হতে বাধ্য। কারণ এতে রয়েছে (১) সংবিধান সংশোধনপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, (২) আঞ্চলিক পরিষদসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, (৩) আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বনসম্পদ রক্ষা, আইন ও বিচার ইত্যাদি বিষয় পরিচালনা ও

নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান, (৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের 'জুম্মল্যান্ড' নামকরণ, (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ১৯৪৭ সাল থেকে বাইরে থেকে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে তাদেরকে অপসারণ, সীমান্তরক্ষী বিডিআরসহ সামরিক ও আধা সামরিক সকল বাহিনীর সেনানিবাস তুলে নেয়া ইত্যাদি। বলা বাহুল্য উপরোক্ত দাবিগুলোর বৃহদংশকে প্রথম দৃষ্টিতেই 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মনে হওয়া সম্ভব এবং এরকম দাবিনামা মেনে নেয়া একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈধ ও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে অসম্ভব বলে গণ্য হতে পারে। জনসংহতি নেতৃবৃন্দও মনে হয় তা বোঝেন। এ কারণেই তাঁরা বলেছেন যে, দেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখে সংবিধানের আলোকে সমস্যার সমাধান চান–বিচ্ছিন্নতা নয়। এ ব্যাপারে তাঁরা যে কোন ধরনের ছাড় দিতেও প্রস্তুত। এর অর্থ হচ্ছে জনসংহতি সমিতি পেশকৃত দাবিনামার ব্যাপারে অনড় অবস্থান নিচ্ছে না।

আসলে জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভূমি ইত্যাদির অস্তিত্ব রক্ষা করা। বহিরাগতদের ক্রমবর্ধমান চাপে এগুলো বিপন্ন ও বিলুপ্ত হবে কিনা এটাই তাদের কাছে আজ বড় প্রশ্ন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের ধারণা, ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তানী আমলের ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল, বর্তমানের বাস্তবতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে তারই পুনর্প্রবর্তন সমস্যার জট খুলে দিতে সক্ষম হবে। আমরা মনে করি, জনসংহতির দাবিনামা নিয়ে আলোচনাকালে জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিরা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপরোক্ত উদ্বেগ ও ধারণাকে বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠার একটি যুক্তিগ্রাহ্য উপায় উদ্ভাবনে উভয় পক্ষ সফল হোক–এটাই জাতির কাম্য।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯৬

২৫ জানুয়ারি সমস্যা সমাধানের রূপরেখা

মোয়াজ্জেমুল হক/জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আগামী ২৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত রূপরেখা ঘোষিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যে মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে নাটকীয় অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পর উভয় পক্ষ এক যৌথ প্রেসব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেয়। এ জন্য ঐদিন পুনঃবৈঠকের দিন ধার্য হয়েছে।

চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি ও শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বে ৫ সদস্যের সুপ্রীম কমান্ডের টানা ৩ ঘণ্টা বৈঠক ছিল আশাতীত সাফল্য ও তাৎপর্যবহ। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে উল্লাসমুখর পরিবেশে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্নভাবে ঐকমত্যে পৌঁছে গেছি। আগামী ২৫ জানুয়ারি আমরা এর চূড়ান্ত রূপরেখা উপহার দিতে যাচ্ছি। যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে ঐদিন বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ হবে।

জনসংহতি সমিতি প্রধান সন্তু লারমা বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানে খুবই আন্তরিক বলে অনুভব করছি। তাই অত্যন্ত সন্তুষ্টি নিয়ে বৈঠকে এসেছি। আমরা আশাবাদী। সরকার যেভাবে আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাতেই বৈঠক অর্থবহ হচ্ছে। সময় বলে দেবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শারীরিক অসুস্থতার খোঁজখবর নিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন বলে উল্লেখ করে সন্তু লারমা জানান, এ জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লারমা বলেন, ৫ দফার দফাওয়ারী আলোচনা হয়েছে। পার্বত্য সমস্যা বহুদিনের সমস্যা। এ জন্য ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ম্যারাথন বৈঠক হবার কথা ছিল কিন্তু আবার এক মাস পর কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে লারমা বলেন, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ তাই টানা বৈঠকের সময় দিতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ঢাকায় যাচ্ছেন কি-না প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আমার স্বাস্থ্যের দিকটির ওপর নির্ভর করবে ঢাকায় যাওয়া। এরপর আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আবার বলেন, আমরা ফরমাল ও ইনফরমাল দু'ভাবেই বৈঠকে মিলিত হয়েছি। দীর্ঘদিনের এ সমস্যা সমাধানে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেছি।

সকাল ১১টায় সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে উভয় পক্ষ আবার দ্বিতীয় দফা বৈঠক শুরু করে। বৈঠক সূত্র জানান, শুরুতে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ লিখিতভাবে পড়ে জানান, পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের মনোভাব। গত ২১ ডিসেম্বর প্রথম দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ সংশোধিত ৫ দফা নিয়ে সরকারী মনোভাব জানতে চেয়েছিলেন। বৈঠক সূত্র আরও জানান, জনসংহতি সমিতির ৫ দফার মধ্যে ৪৫টি ধারা রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় সকল দাবী নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা হয়েছে। দু'টি সমস্যার মধ্যে বসতিস্থাপনকারী ও ভূমি সংরক্ষণ বিষয় নিয়ে সমাধান এখনও অমীমাংসিত। আশা করা যাচ্ছে, এ দু'টি বিষয়ে সমাধানের ফর্মুলা বের হয়ে আসবে।

উভয় পক্ষের সকলকে নিয়ে ১ ঘণ্টা বৈঠক শেষে জাতীয় কমিটির ৩ জন ও জনসংহতি কমিটির ৩ জন নিয়ে ২ ঘণ্টা আলাদা এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে। এটিই ছিল মঙ্গলবারের নাটকীয় বৈঠক। এ বৈঠকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোচিত হয়। জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা ও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে চেয়ারম্যান সন্তু লারমা, সুপ্রীম কমান্ডের ২ সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা এ রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠক শেষে উভয়পক্ষের সকলে পুনরায় বৈঠক করেন এবং বৈঠকের ফলাফল নিজেদের মধ্যে অবহিত করা হয়। বেলা ২টায় সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের।

আগে সকাল ঠিক সোয়া দশটায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এমআই-১৭ হেলিকপ্টার পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে শান্তিবাহিনীর ৫ শীর্ষ নেতাকে নিয়ে সার্কিট হাউস সংলগ্ন হেলিপ্যাডে অবতরণ করে। সাথে সাথে এগিয়ে যান জাতীয় কমিটির উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। হেলিকপ্টার থেকে একে একে নেমে এলেন, শান্তিবাহিনী প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা ও রক্ত্যোৎপল ত্রিপুরা। কমিটি প্রদত্ত উপহার স্যুয়েটার, পাঞ্জাবি ও শাল পরিহিত সন্তু লারমা হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন উপস্থিত সকলকে। হাসনাত আবদুল্লাহ জড়িয়ে ধরে সন্তু লারমার সাথে কোলাকুলি করেন। অন্যরা একে অপরের সাথে করমর্দন করলেন এবং সোজা চলে গেলেন বৈঠক স্থলে আপ্যায়ন পর্ব শেষে শুরু হয় মূল বৈঠক। বরাবরের মতো সকাল থেকে বৈঠক সমাপ্তি পর্যন্ত ৩০ স্বেচ্ছাসেবক দল সার্কিট হাউসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে। সার্কিট হাউসের ভিতরের অঙ্গনে ছিল অস্ত্রবিহীন কিছু পুলিশ। আর বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে অস্ত্রধারী আরও কিছু পুলিশ।

বেলা ৩ টায় শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে জাতীয় কমিটি নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারে দুধুকছড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আন্তরিকভাবে বিদায় জানান। দুধুকছড়ি পর্যন্ত জাতীয় কমিটি নেতৃবৃন্দের গমন এই প্রথম। দুধুকছড়ি হেলিপ্যাডের অনতিদূরে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করছিল ১২ সদস্যের শান্তিবাহিনী ক্যাডার। এর কিছু দূরে ৫ শতাধিক উপজাতীয় জনগণ জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করছিল শান্তিবাহিনীর সুপ্রীম নেতাদের জন্য। ব্যাপক করতালির মাধ্যমে তারা নেতাদের প্রত্যাগমনে অভিনন্দন জানায়। শান্তিবাহিনী নেতৃবৃন্দ হাত তুলে বিদায় জানান হেলিকপ্টার টেক অফকালে জাতীয় কমিটি নেতৃবৃন্দকে। সমাধানের দীর্ঘ প্রত্যাশার মাহেন্দ্রক্ষণে এ দৃশ্য ছিল উভয়পক্ষের আন্তরিকতার বহির্প্রকাশ। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় কমিটির

পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাংসদ দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর ও মোশাররফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬
রাঙ্গামাটিতে শান্তি পরিষদ সচিব
সুবিনয় চাকমা খুন

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটিতে অস্ত্রধারীদের গুলিতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ সচিব সুবিনয় চাকমা (৪০)। রাঙ্গামাটি সদর থানার চম্পকনগরে সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, সুবিনয় চাকমা বাজার করে ঠিক তাঁর বাড়ির সামনে এসে পৌছার সাথে সাথে পর পর কয়েকটি গুলির আওয়াজ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হতভাগ্য শান্তি পরিষদ সচিব। অদৃশ্য হয়ে যায় ঘাতকরা। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লে শুভাকাঙ্ক্ষীরা লাশের পাশে ভিড় জমায়।

উল্লেখ্য, বিনয় কুমার শান্তি পরিষদের ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ সিম্পোজিয়াম করে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির চেষ্টারত ছিলেন। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর আগে এ হত্যাকাণ্ড ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছে। কি কারণে এবং কারা তাঁকে হত্যা করল তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। গুজব রয়েছে, বরাবরের ন্যায় এটাও শান্তিবাহিনী সদস্যদের কাজ। কারণ শান্তি বাহিনীর কয়েকটি উপদল নানা অপকর্মে জড়িত।

প্রধানমন্ত্রীর শোক

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্দুকধারীদের হাতে সুবিনয় চাকমা নিহত হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সুবিনয় চাকমার অকাল মৃত্যুতে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

দোষীদের ধরার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবিনয় চাকমার হত্যাকারীদের অবিলম্বে খুঁজে বের করার জন্য জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯৬
পার্বত্য সমস্যাকে আমরা আর জিইয়ে
রাখতে চাই না ॥ একান্ত
সাক্ষাতে সন্তু লারমা

মোয়াজ্জেমুল হক, খাগড়াছড়ি থেকে ফিরে: পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা আমরা আর জিইয়ে রাখতে চাই না। গত দুই যুগেরও বেশি সময়ের সরকারগুলো আন্তরিক ছিল না বলে অশান্তির ঝড় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা চাই সম্মানজনক সমাধান। বর্তমান সরকার এগিয়ে এসেছে খোলামনে। তাই আমরাও সাড়া দিয়েছি আনন্দের সাথে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং পুনর্গঠিত জাতীয় কমিটির অভাবনীয় আন্তরিকতা আমাদের করেছে আপ্লুত। এরই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে নাটকীয় মাত্রা যোগ হয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার পথকে করেছে প্রশস্ত।

গত মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) একটি বিশেষ মুহূর্তে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় কথাগুলো বলেছেন শান্তিবাহিনী প্রধান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। মাত্র মিনিট দশেক ঘনিষ্ঠভাবে এ আলাপচারিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল আকাশপথে। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে দ্বিতীয়বারের মতো বৈঠক শেষে নজিরবিহীন অগ্রগতি নিয়ে শান্তিবাহিনী প্রধান ও তাঁর সহযোগী সুপ্রীম কমান্ডের অপর ৪ সদস্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এমআই ১৭ হেলিকপ্টার যোগে ফিরে যাচ্ছিলেন সীমান্ত সংলগ্ন পানছড়ির দুধুকছড়িতে। সাথে ছিলেন জাতীয় কমিটির ৫ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও ৩ উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা। অসংখ্য অভিযোগ, অনুযোগ, মতভেদ নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে উভয় পক্ষ যেন এক হয়ে যায়। সে এক দুর্লভ দৃশ্য।

এমনি এক বিশেষ পরিবেশে দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত হলাম সন্তু লারমার সাথে। হাত ধরে বসালেন তাঁর পাশেই। কুশল বিনিময় শেষে বললেন, অতীতে অনেকে আমাদের নিয়ে ভুল তথ্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু বর্তমানে পত্রপত্রিকার ভূমিকা চমৎকার। তাই আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। বিলম্বে হলেও একাধিক জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক আমাদের কাছে পৌছে যায়।

আলোচনার পরিবেশ কেমন লাগছে প্রশ্ন করাতে সহাস্যে উত্তর দিলেন, বুঝতেইতো পারছেন– চমৎকার, অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আশাবাদী বলেইতো অসুস্থ শরীরে বৈঠকে যোগ দিয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি রাজনৈতিক।

বর্তমান সরকার রাজনৈতিকভাবেই এ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতার বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছে। অতীতে অস্ত্র দিয়ে আমাদের ঠেকানোর চেষ্টায় পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, সরকার ঘোষণা দিয়েছে তারা পার্বত্য সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। এক্ষেত্রে দাবি-দাওয়া ছাড় দেয়ার বিষয়টি মুখ্য বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। যদি তাই হয়। কতটুকু ছাড় দেবেন?

উত্তর দিলেন, আমাদের দাবি পরিষ্কার। জনসংহতি সমিতির পক্ষে আগে যে ৫ দফা দাবি প্রদান করা হয় সরকার তা মানেনি বলে আবার সংশোধিত আকারে দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকে সরকারী কমিটি এর বিপরীতে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। আমরা এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব এবং তা কতটুকু বিবেচনায় আনা যায় তা আগামী ২৫ জানুয়ারি নির্ধারিত বৈঠকের পূর্বে যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারী কমিটির সাথে তাদের দফাওয়ারী আলোচনা হয়েছে। সীমিত পর্যায়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকও হয়েছে। উক্ত বৈঠকের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করতে বলা হলে প্রেস ব্রিফিংকালের সুরেই বললেন, চমৎকার, সৌহার্দপূর্ণ। সময়ে সবই জানবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৯শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে এবার ঢাকায় বৈঠক

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে আরেক ধাপ। জনসংহতি সমিতি ঢাকায় পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠানের সরকারী প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। শনিবার এ ব্যাপারে তাদের সম্মতিপত্র যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে ঢাকায় স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে। এই চিঠিতে তারা বলেছে প্রস্তাবিত বৈঠক উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি সকাল ১১টায় তাদের প্রতিনিধিদলকে ঢাকায় নিয়ে আসতে হবে হেলিকপ্টারে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়া থেকে। বৈঠকের পর একইভাবে তাদের দুদুকছড়া পৌঁছবার ব্যবস্থা করতে হবে। ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত দু'পক্ষের সর্বশেষ বৈঠকে ২৫ জানুয়ারি পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক হয়। ৭ জানুয়ারি স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ ২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ঢাকায় বৈঠকটি অনুষ্ঠানের প্রস্তাবসহ একটি চিঠি পাঠায় জনসংহতি সমিতির কাছে (স্মারক নং- স্পে-এ্যা বি-৩-প্র-১(৮)/৯৩ (হংস-৪)/৯, তারিখঃ ৭-১-৯৭)। এর জবাবে জনসংহতি সমিতির জবাবী চিঠিতে তাদের পক্ষে রূপায়ন দেওয়ান স্বাক্ষর করেছেন ১৪-১-৯৭ তারিখে (স্মারক নং-১৮/পা চ জ স স/৯৭)। এই চিঠিতেই তারা জানিয়েছে

তাদের সম্মতির কথা। চিঠিটি শনিবার যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পৌঁছবার পরই তিনি তা স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেন। শনিবার রাতে খাগড়াছড়ির একাধিক সূত্রের সাথে যোগাযোগ করলে তারা এই সম্মতির বিষয়টিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি আলোচনায় আরেক ধাপ অগ্রগতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। খাগড়াছড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জিতেন বড়ুয়া জানান, এই সম্মতির বিষয়টি সেখানে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর গত ২১ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে দু'পক্ষের প্রথম আলোচনায় উৎসাহব্যঞ্জক পর্বের শুরু হয়। সেদিনেই সিদ্ধান্ত হয় ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর। সেই বৈঠকে তাদের ৫ দফা দাবিনামা এবং আঞ্চলিক পরিষদ সংবলিত স্বায়ত্তশাসনের সংশোধিত রূপরেখা দেয় সরকার পক্ষের কাছে। ২২ পৃষ্ঠার ৪৪টি উপদাবি সম্বলিত সংশোধিত ৫ দফায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেয়ার দাবি জানানো হয়। তিন পার্বত্য জেলাকে বলবত রেখে একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট সংগঠন, জুম্মল্যান্ড আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, স্বাধীনভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন অনুমোদনের ক্ষমতা, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, পুলিশসহ ৩৬টি বিষয়ে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, ক্ষমতা, দেশের অন্যান্য স্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে সম্পত্তি, জমি ক্রয়, বন্দোবস্ত নিতে না পারার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠন, উপজাতীয় জনগণের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, সাজাপ্রাপ্ত, আটক, বিচারাধীন সকল পাহাড়ী বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথ পুনর্বাসনের দাবি ছিল সংশোধিত ৫ দফায়। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠন করা হয়। প্রথমে স্বাধিকার; পরে পাহাড়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে শান্তিবাহিনী ৩ দশক ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় ও সাবকমিটি পর্যায়ে মোট ২১ দফা বৈঠক হয়েছে সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির। নব্বই দশকের প্রথম দিকে তারা জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদের প্রত্যাহার, শরণার্থী প্রত্যাবাসন-পুনর্বাসন, জমির ওপর পাহাড়ীদের অধিকারসহ প্রথম সংশোধিত ৫ দফা পেশ করে। ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট থেকে সেখানে দফায় দফায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হচ্ছিল। সর্বশেষ এর মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

সর্বশেষ ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের ৩ ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে রাজনৈতিক সমাধান প্রশ্নে একটি চূড়ান্ত রূপরেখা ২৫ জানুয়ারির বৈঠকে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফা দাবি নিয়ে দফাওয়ারী আলোচনা হয় সেখানে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ'র নেতৃত্বে সেই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কল্পরঞ্জন চাকমা, আতাউর রহমান কায়সার, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, দীপঙ্কর তালুকদার, জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, অশোক চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা প্রমুখ অংশ নেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাসহ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগসহ সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ। সেই বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে তাদের দাবিদাওয়া প্রশ্নে অটল ভূমিকা দেখানো হয়। জাতীয় কমিটির পক্ষে বলা হয়, সরকার সংবিধানের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সবকিছু করতে রাজি। শনিবার রাতে এ ব্যাপারে বরিশালে অবস্থানরত জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ'র সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ২৫ জানুয়ারির বৈঠকে আরও ফলপ্রসূ অগ্রগতির আশা ব্যক্ত করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে বৈঠক কাল

ফজলুল বারী ॥ জনসংহতি সমিতির সাথে আগামীকাল শনিবারের শান্তি আলোচনায় ৪ এজেন্ডা নিয়ে কথাবার্তা হবার সম্ভাবনা আছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, সমিতির নেতাদের ঢাকায় প্রয়োজনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায়। বৈঠকটিও সেখানে হবার সম্ভাবনা বেশি। তবে সব কিছুই চূড়ান্ত হবে আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের বৈঠকে। ঢাকা বৈঠককে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি বলেছে তারা বৈঠককে কেন্দ্র করে সতর্ক পর্যবেক্ষণের নীতি নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, আগামীকালের বৈঠক মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় শাসন, সেনা প্রত্যাহার, পার্বত্য ভূমি ব্যবস্থা, শরণার্থী ও জনসংহতি সমিতির শান্তিবাহিনীর নেতা-কর্মী, ক্যাডারদের পুনর্বাসন এই ৪

এজেন্ডায় নিবিষ্ট থাকবে। জাতীয় কমিটির প্রধান চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন স্ব স্ব পক্ষের। জাতীয় কমিটির একটি সূত্র বৃহস্পতিবার বলেছে, জনসংহতি সমিতি এখনও তাদের ৫ দফা প্রশ্নে অনঢ়। তারা কতটা ছাড় দেবে তার ওপরই প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধানের রূপরেখা নির্ভরশীল। এই সূত্র বলেছে সমঝোতার পথ প্রশস্ত হলে আপাতত দুই পক্ষের মধ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী চুক্তি হবার সম্ভাবনা বেশি। খাগড়াছড়ির একটি সূত্র বলেছে, জনসংহতি সমিতি এই মুহূর্তে সমঝোতায় আগ্রহী বলেই ঢাকা পর্যন্ত বৈঠকে যেতে রাজি হয়েছে। তবে ঢাকার একটি সূত্র মতে, এই বৈঠকেই সম্পূর্ণ সমঝোতার সম্ভাবনা কম। সরকার সমঝোতা এবং সমাধানে আগ্রহী। এটিই এসময়কার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫শে জানুয়ারি ১৯৯৭

শান্তি বাহিনীর নেতারা আসবেন হেলিকপ্টারে

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে বৈঠক আজ ঢাকাতেই

ফজলুল বারী ॥ আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে প্রথমবারের মতো শান্তি বৈঠক হবে ঢাকায়। দু'দশকের বেশি সময়ের সশস্ত্র সংঘাতে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার জট খুলতে, ক্ষত সারাতে বিশেষ এই বৈঠকটি দুপুর ১টা নাগাদ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় শুরুর কথা আছে। বৈঠক উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির নেতারা প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসবেন আজ। কুয়াশার সমস্যা প্রকট না হলে পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে তাদের নিয়ে হেলিকপ্টারের সকাল ১১টায় ঢাকা অভিমুখে উড়াল শুরুর কথা আছে। চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল তাঁদের ১০ সদস্যের দলকে দুদুকছড়ি থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনবেন। জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের এটি হবে ২২তম বৈঠক। সমিতিপ্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন তার পক্ষে। সরকার পক্ষে নেতৃত্বে থাকবেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্। জানা গেছে বৈঠক উপলক্ষে জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফার আলোকেই আলোচনা শুরু করতে চাইবে। সরকার পক্ষ একটি খসড়া প্রস্তাবনাও তৈরি করে রেখেছে। তবে সমঝোতার দিকেই থাকবে মূল দৃষ্টি। বৈঠকের প্রস্তুতি হিসাবে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মিলনায়তনে জাতীয় কমিটির সদস্যরা খুঁটিনাটি

আলোচনায় বসেছিলেন শুক্রবার বিকালে। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংশ্লিষ্ট একজন বললেন, বৈঠক দু'দিন বা তিনদিনও স্থায়ী হতে পারে। পদ্মা অতিথি ভবন কর্তৃপক্ষকে জনসংহতি নেতাদের কমপক্ষে দু'রাত সেখানে থাকার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। অপর একটি সূত্র বলেছে, এই বৈঠকে কোন চুক্তি স্বাক্ষর নাও হতে পারে। সমঝোতা আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সমিতি নেতাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারার সময় দেয়া হতে পারে আরও একদফা। জনসংহতি নেতাদের হেলিকপ্টার এসে নামার কথা তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সড়কযানে তাঁদের আনা হবে পদ্মায়। এ উপলক্ষে পদ্মা অতিথি ভবনকে ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় বৈঠক সম্পর্কে একটি প্রেস ব্রিফিং করার কথাও আছে।

অশান্ত পাহাড়ে শান্তি চেষ্টায় জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তি বৈঠক শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। ব্রিটিশ আমলের জনসমিতি, পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমলে জনসংহতি সমিতিতে রূপান্তরের পর সামরিক শাখা শান্তি বাহিনী গঠন করেছিল ১৯৭৪ সালে। তারপর থেকে এই বাহিনী প্রথম স্বাধিকার, পরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে শুরু করলে পাহাড়ী-বাঙালী মিলিয়ে ২০ সহস্রাধিক নিহত হবার তথ্য আছে। ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট থেকে সেখানে দফায় দফায় অস্ত্র বিরতি ঘোষণা হলেও রক্তক্ষয় থামেনি। সর্বশেষ ঘোষণার অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আছে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতাসীন হবার পর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ প্রশস্ত হয়। নতুন সরকারের সাথে ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর দু'দফা বৈঠকে সমিতি সংশোধিত ৫ দফা উত্থাপন করলে সৃষ্টি হয় নতুন আশাবাদের। গত ৭ জানুয়ারি সরকারের পক্ষে পরবর্তী বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করা হলে সমিতি তাতে সায় দিয়ে চিঠি পাঠায় ১৪ জানুয়ারি।

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জিতেন বড়ুয়া কাল রাতে জানিয়েছেন, এই বৈঠককে কেন্দ্র করে সীমান্তের জনপদ দুদুকছড়িতে সৃষ্টি হয়েছে উৎসবমুখর পরিস্থিতি। নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার করায় ২১ জানুয়ারি থেকে সেখানে জনসংহতি সমিতি, শান্তি বাহিনীর নেতাকর্মী-ক্যাডাররা অবস্থান গ্রহণ শুরু করে। শত শত পাহাড়ী নারী-পুরুষ সমবেত হওয়াতে কিছু নতুন দোকানও বসেছে সেখানে। সন্তু লারমার নেতৃত্বে ঢাকা বৈঠকে যোগ দেবেন জনসংহতি সমিতির রূপায়ণ দেওয়ান, অশোক চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা। তাদের সাথে থাকবেন যোগাযোগ কমিটির বিশ্বজিৎ চাকমা, ক্যশ অং মারমা, স্বেচ্ছাসেবক কমিটির শক্তিপদ

ত্রিপুরা, আশিষ চাকমা। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা শুক্রবার দুদুকছড়িতে সমবেতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন। তার মাধ্যমে শুক্রবার বিশেষ একটি বার্তা ঢাকায় পৌঁছেছে জানা গেছে। জাতীয় কমিটির এক সদস্য বলেছেন, হংসধ্বজ আজ ঢাকায় আসবেন। তবে অপর একটি সূত্র বলেছে, দুদুকছড়ির অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় তাঁর খাগড়াছড়ি থাকার সম্ভাবনা বেশি। এই সূত্র বলেছে, পাহাড়ে ভূমি সমস্যা, বাঙালী, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবির বিষয় নিয়েই মূল মনোযোগ থাকবে। এসব বিষয়ে সমিতি কতটা ছাড় দেবে তার ওপরই সমাধানের দ্রুততা নির্ভর করবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা নিয়ে ঢাকা আলোচনা শুরু ॥ আমি আশাবাদী–সন্তু লারমা

চার প্রশ্নে দু'পক্ষ কাছাকাছি, পার্থক্য একটিতে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : ঢাকায় রুদ্ধদ্বার শান্তি বৈঠকের প্রথম দিনের আলোচনায় উত্থাপিত ৫ বিষয়ের ৪টিতে উভয় পক্ষের কাছাকাছি অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। ভূমি সমস্যা, আর পাহাড়ে পুনর্বাসিত অপাহাড়ীদের বিষয়েই প্রচন্ড মতপার্থক্য এখনও দু'পক্ষের মাঝে। সেনা প্রত্যাহার, আঞ্চলিক পরিষদ, শান্তি বাহিনীর বিলুপ্তি, শরণার্থী পুনর্বাসন এসব বিষয়ে মত ছিল প্রায় কাছাকাছি। সরকার বলে দিয়েছে অপাহাড়ী বাঙালীদের সেখান থেকে প্রত্যাহার সম্ভব নয়। জনসংহতি নেতারা এই ইস্যুতে আপত্তি জানান। তাঁরা সায় দেন একটি প্যাকেজ চুক্তির পক্ষে। আবার বলেছেন ভূমি আর অপাহাড়ীদের ইস্যুতে সমঝোতা ছাড়া প্যাকেজ চুক্তি সহজ নয়। প্রথম দিনের বৈঠক থেকে সমিতি নেতারা খাগড়াছড়িতে স্বপক্ষজনের কাছে টেলিফোনে এই বার্তাটিই পাঠিয়েছেন। প্রথম দিনের প্রায় ৪ ঘণ্টার বৈঠককে জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন–ফলপ্রসূ। আমরা একটি সমঝোতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি'। জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বলেছেন, 'আমি আশাবাদী'। বললেন, 'বুঝেন না কতটা আশায় উড়ে এসেছি এতদূর।' উভয়পক্ষ বলেছেন আন্তরিক পরিবেশে বৈঠক শুরুর কথা। আজ সকাল ১০টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় তাঁরা আবার বসবেন বৈঠকে। সমিতি নেতারা অবশ্য থাকছেন পদ্মা অতিথিশালায়। জানা গেছে, প্রথম দিনের বৈঠক সম্পর্কে কাল রাতেই প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। জাতীয় কমিটির এক সদস্য বলেছেন, সমঝোতা প্রক্রিয়া প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত

গড়াতে পারে। সন্তু লারমা বলেছেন–তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আগ্রহী। কিন্তু এখনও কোন আমন্ত্রণ পাননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লারমা এ ব্যাপারে বললেন– প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। আমি সুস্থ হয়ে গেছি। এই মুহূর্তে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ঢাকায় একটি বিদ্রোহী দলের সাথে এ ধরনের প্রথম একটি বৈঠককে কেন্দ্র করে রমনা থানা সংলগ্ন ওই এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬শে জানুয়ারি ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
এ বৈঠক সফল হোক

গতকাল থেকে ঢাকায় সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (বেআইনী শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন) নেতাদের বৈঠক শুরু হয়েছে। এতে সরকার পক্ষের অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন সমিতির প্রধান সন্তু লারমা। ঢাকার এ বৈঠকটি নিয়ে সারা দেশে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘকাল স্থায়ী সন্ত্রাস ও অশান্তির দুষ্টক্ষতটি সারিয়ে তোলার, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান নিশ্চিত করার পন্থা উদ্ভাবনে এ বৈঠক সফল হবে এরূপ একটি ধারণা জনমনে গড়ে উঠেছে। এরূপ ধারণা গড়ে ওঠার দৃষ্টিগোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণও বর্তমান। ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক চুক্তি, গঙ্গার পানি সমস্যার মতো জটিল সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকারের অসাধারণ কূটনৈতিক সাফল্য এবং অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকমত্য ও সমঝোতা, বিশেষ করে উভয় দেশের সীমান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গ্রুপসমূহের তৎপরতা বন্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের বাস্তব ক্ষেত্র এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে।

জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের এ বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় কি তা মোটামুটি সবার জানা। জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবিনামা, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় শাসন, সেনা প্রত্যাহার, পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা, শরণার্থী ও শান্তিবাহিনীর নেতা-কর্মী-ক্যাডারদের পুনর্বাসন

ইত্যাদিকে ঘিরেই আলোচনা আবর্তিত হওয়ার কথা। কিন্তু জনসংহতির ৫ দফা দাবি বা প্রস্তাব যেভাবে ছিল সেভাবে মেনে নেয়া বাংলাদেশের কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। কারণ প্রস্তাবগুলো মেনে নেয়ার অর্থ হতো পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যত আরেকটি রাষ্ট্র, সরকার এবং সংসদ গঠিত হতে দেয়া। বাংলাদেশের সংবিধান এতে লঙ্ঘিত হতো এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাও বিনষ্ট হতো। এখানেই আসে ছাড় দেয়ার প্রশ্ন।

যে কোন জটিল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা একান্তভাবে কাম্য হলে বিবদমান পক্ষসমূহকে ছাড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জটিল সমস্যার জট খোলার জন্যও এটা প্রয়োজন। অনড় অবস্থান গ্রহণ করে সমাধানে উপনীত হওয়ার মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি এখন বিদ্যমান নেই। বর্তমান সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হবার জন্য খোলা ও উদার মন নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস। জনসংহতি সমিতিকেও বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে নমনীয় মনোভাব অবলম্বন ও ছাড় দেয়ার মানসিক প্রস্তুতি প্রদর্শন করতে হবে। ৫-দফা সংশোধিত আকারে পেশ করে জনসংহতি সমিতি তা প্রদর্শন করেছে। তবে এ সংশোধিত ৫ দফার ক্ষেত্রেও ছাড় দেয়ার জন্য তাঁদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে আমরা মনে করি।

আশা করা যায় যে, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই যে প্রবল আশাবাদ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে তা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকেও প্রভাবিত করবে এবং সমাধানের উপযোগী অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অধিবাসীর জন্য সাফল্য ও সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তার পরেও নিন্দুকের, কুৎসাকারীর বিষ উদগিরণকারীর অভাব হবে না। দুনিয়ার প্রধান দেশগুলো এমনকি চীন, পাকিস্তান এবং সর্ব শেষ ইরান পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেও এখানে কিছু লোক এবং তাদের মুখপত্রগুলো সমানে চিৎকার করে বলে চলেছে যে পানি চুক্তি 'আরেকটি গোলামি চুক্তি', হাসিনা-দেব গৌড়া সমঝোতা, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব, এমনকি বাংলাদেশের মাটি থেকে প্রতিবেশী ভারতের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে না দেয়া এবং ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে না দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়া।

বিরামহীন চিৎকারে তারা বলছে, বাংলাদেশকে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপসমূহ সশস্ত্র হামলার টার্গেট বানিয়ে ফেলবে, সীমান্তে সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে সহযোগিতার নামে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশে প্রবেশ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের বিষোদগার ও নিন্দাবাদের কোরাসের একটা উদ্দেশ্য, একটাই লক্ষ্য ঃ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার অমীমাংসিত সমস্যাগুলো অমীমাংসিতই থেকে যাক। গঙ্গার পানি চুক্তি তো হয়েই গেছে–ঠেকাবার আর উপায় নেই। অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বন্টন প্রশ্নে মীমাংসা না হোক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মীমাংসা না হোক। নাগা-বোডো ও অন্যান্য ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ব্যবহার করে ভারতীয় ভূখণ্ডে নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে যাক। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র তৎপরতা অব্যাহত থাকুক। পাকিস্তানী পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হাসিলে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হোক। সর্বোপরি, পাকিস্তানের সাথে আবার যুক্ত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হোক।

এদের উস্কানি সম্পর্কে জনসংহতি নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে যে ভারতকে নিরাপদ পশ্চাৎভূমি ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব নাও হতে পারে। ঐ স্ট্র্যাটেজির কোন ভবিষ্যত নেই আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। জনসংহতি নেতৃবৃন্দের ঢাকায় এসে বৈঠকে বসা এবং যোগদানকারী আলোচকদের সংখ্যাবৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, এ উপলব্ধি তাঁদের মধ্যে রয়েছে। এ জন্যই বলা যায়, রাজনৈতিক মীমাংসার সম্ভাবনা এ মুহূর্তে পূর্বের যে কোন সময় অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা ॥ ঢাকা বৈঠক আজই শেষ

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ঢাকা শান্তি বৈঠক রবিবার দ্বিতীয় দিনের মতো অব্যাহত থাকে। আজ সকাল ১০টায় আবার বৈঠক বসবে। রবিবার সকাল সোয়া ১০টা থেকে তিন দফা বিরতি দিয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত স্থায়ী বৈঠক শেষে কোন সরকারী ভাষ্য পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, মূলত ভূমি সমস্যা নিয়েই বৈঠক কেন্দ্রীভূত ছিল প্রায় সব সময়। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। আজ দুপুরেই জনসংহতি নেতারা ফিরে যেতে পারেন দুদুকছড়িতে। এ ব্যাপারে দুপুর দুটা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে হেলিকপ্টার তৈরি রাখার সিডিউল করা আছে। তবে গভীর রাতে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, অপাহাড়ী সেটেলার ছাড়া বাকি সব ইস্যুতে মোটামুটি সমঝোতা এগিয়েছে। পরবর্তী বৈঠক হবে ঢাকায়।

আজই সমিতি নেতারা ফিরে যাবেন কিনা তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে সকালের বৈঠকে। কোন চুক্তি স্বাক্ষর হবে কিনা তারও সিদ্ধান্ত হবে আজ সকালে। সূত্র বলেছে, সমিতি নেতারা এখনই চুক্তি স্বাক্ষরের কথা বলছেন না। তাঁরা নিজেরাও আজ ফিরে যেতে আগ্রহী। বৈঠক সম্পর্কে রবিবার সন্ধ্যায় নির্ধারিত প্রেস ব্রিফিং হয়নি। চট্টগ্রাম সিটি মেয়র মহীউদ্দিন চৌধুরী বৈঠকস্থল মেঘনা অতিথিশালার গেটে এসে সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনায় মোটামুটি ভাল অবস্থা। একটি সমঝোতা হবে বলে তাঁরা আশা করছেন। ব্রিফিং না হওয়া অপর পক্ষে সন্তু লারমার কোন রক্তব্য পাওয়া যায়নি। গভীর রাতে জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা সমাধান প্রশ্নে আশাবাদী। তারাও (জনসংহতি সমিতি) আশাবাদী। মোশাররফ এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি। রাতে অপর একটি সূত্র বলেছে, সরকার সমাধান প্রশ্নে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শনিবার রাতে এর জন্য জাতীয় কমিটির কয়েকজন নেতা সমিতি নেতাদের সাথে পদ্মা অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করেন।

রবিবার সন্ধ্যায় ইফতারের বিরতির সময় সমিতির এক সদস্য খাগড়াছড়িতে সপক্ষের একজনকে টেলিফোনে বলেন, সারা দিন বৈঠক করেছি। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সন্ধ্যার পর আবার বৈঠক হবে। খাগড়াছড়ির এই সূত্র জনকণ্ঠকে রাতে বলেছে, সম্ভবত ভূমি আলোচনার অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। জনসংহতি সমিতি ভূমি সমস্যা, অপাহাড়ীদের উচ্ছেদের দাবিতে অটল। সরকার পক্ষ বলেছে, পাহাড়ী প্রকৃত জমির মালিককে জমি ফিরিয়ে দেয়া হবে। শরণার্থীদের জমির ডকুমেন্টস না থাকলে জমির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সমিতি পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে অপাহাড়ীদের রেখে ভূমি বণ্টনের মতো ভূমি সেখানে নেই। কারণ ধানী জমি এমনিতে পাহাড়ে সীমিত। তাছাড়া সিংহভাগ পাহাড়ীর ভূমির কোন ডকুমেন্টস নেই। ডকুমেন্টস যা ছিল তা কয়েক বছর আগে খাগড়াছড়ির ভূমিরাজস্ব অফিসে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে তার সবকিছুই পুড়ে গেছে। এরপর বসতিস্থাপনকারীদের নামে নতুন দলিল তৈরি করে দেয়া হয়। সমিতি পক্ষ বলেছে এই অবস্থায় পাহাড়ীদের ভূমি ফিরিয়ে দেবার দাবি অবাস্তব। কারণ তারা ভূমির দলিল নিয়ে আদালতে গেলে পাহাড়ীরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। সমিতির আরেকটি দাবি হচ্ছে সমঝোতা হলে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। কিন্তু সরকার পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এমন একটি গেরিলা সশস্ত্র দলের সাথে রাষ্ট্রের প্রধান দুই ব্যক্তির সাক্ষাতের পক্ষপাতী নন। খাগড়াছড়ির সূত্র বলেছে, তাদের ধারণা চূড়ান্ত চুক্তির আগে সমিতি নেতারা তাদের ফোরামে আরও আলোচনার পক্ষপাতী।

এর আগে পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ব্রিফিং-এর জন্য সন্ধ্যায় সাংবাদিকরা অতিথিশালা মেঘনার ফটকে গেলে চীফ হুইপ-এর একজন সহকারী জানান ব্রিফিং হবে না। সাংবাদিকদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে কমিটির উপনেতা চট্টগ্রামের সিটি মেয়র মহীউদ্দিন চৌধুরী, সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ফটকে আসেন। মহীউদ্দিন বলেন, তারা লাগাতার বৈঠক করে যাচ্ছেন। এই বৈঠকেই একটি সমঝোতা হবে বলে আশা করছেন। কোন ইস্যুতে অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, দফাওয়ারী আলোচনা হচ্ছে। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবি সরকারের প্রস্তাব টেবিলে আছে। চূড়ান্ত অগ্রগতি হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে সবকিছু চূড়ান্ত হবে। চুক্তির ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সে জন্যইতো ওখান থেকে এখানে এসেছি। নীতিগত কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন, লেখাপড়া চলছে। লেখাপড়ার পরেইতো সমাধান আসবে। অগ্রগতি কতটা জানতে চাইলে বলেন, অগ্রগতি ভাল। কতটা ভাল, কিভাবে ভাল তার ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৮শে জানুয়ারি ১৯৯৭
ঘোষণা ছাড়াই ঢাকা বৈঠক সমাপ্ত

ফজলুল বারী ॥ পাহাড়ে শান্তির সন্ধানী প্রথম ঢাকা বৈঠক শেষ হয়েছে সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা মেঘনায়। পরবর্তী বৈঠক হবে আগামী ১২ মার্চ। সেই বৈঠক কোথায় হবে তা পরে ঠিক হবে দু'পক্ষের যোগাযোগে। তবে একটি সূত্র বলেছে, সেই বৈঠকটিও ঢাকায় হবার সম্ভাবনা বেশি। জাতীয় কমিটির এক সদস্য বলেছেন, সমঝোতা চুক্তির জন্য ঢাকা বৈঠকের ৬০ ভাগের বেশি অগ্রগতি হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকেই চুক্তি পর্যন্ত পৌছা যাবে বলে তিনি আশা করেন। তিন দিনে আনুষ্ঠানিক ১০ ঘণ্টা এবং শেষ মুহূর্তে চীফ হুইপের সাথে একটি এক্সক্লুসিভ বৈঠক শেষে ঢাকা ছাড়ার আগে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বলে গেছেন 'বিভিন্ন বিষয়ে আমরা একমতে পৌঁছেছি'। কি সেই বিভিন্ন বিষয়–প্রশ্নের জবাবে সন্তু বলেছেন, আলোচনার সফলতার স্বার্থে বিষয়গুলো এখন বলা যাবে না। এগুলো জিজ্ঞাসা করা বোধহয় ঠিক হবে না। পরবর্তী বৈঠক কোথায় হবে এ প্রশ্নেরও জবাব দেন সন্তু। জানা গেছে, পরবর্তী বৈঠকের আগে জাতীয় কমিটির উপনেতা চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সাংসদ জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক চালিয়ে যাবেন। সন্তু ঢাকার নেতাদের বলে গেছেন,

তিনি এখন তাঁর সমিতি এবং বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ঢাকা আলোচনার পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরবেন। তারপর ঠিক করবেন পরবর্তী বৃত্তান্ত।

জানা গেছে, মূলত ভূমি বণ্টন ও অপাহাড়ী বাঙালী সেটেলারদের প্রত্যাহার ইস্যুতেই দুইপক্ষের আলোচনা থমকে আছে। ঢাকায় বিভিন্ন বিষয়ে একমত হবার কথা বললেও গেরিলা নেতার মতোই পাহাড়ে ফিরে গিয়ে তিনি ভিন্ন কথাও বলেছেন। সোমবার বিকালে দুদুকছড়া পৌঁছে পাহাড়ীদের জনসভায় সন্তু লারমা বলেছেন, সরকারের সাথে আলোচনায় সেনা প্রত্যাহার, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ প্রশ্নেও তিনি একমত হতে পারেননি। তিনি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ৫ দফা দাবিনামা আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ীদের ঐক্যবদ্ধভাবে ধৈর্যধারণ করতে বলেন। তিনি সমিতির দাবি দাওয়া পুনরায় বিবেচনা করতে জাতীয় কমিটির নেতাদের অনুরোধ করেছেন।

জাতীয় কমিটির ১১ সদস্যের ৩ সদস্য নিয়ে শেষমুহূর্তে একটা মিনি কমিটি আলোচনা করেছে সন্তুদের সাথে। সন্তুর সাথে এছাড়া সেই আলোচনায় ছিলেন রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা। ঢাকা আসার দিনেই দলের উগ্রপন্থী বলে পরিচিত সদস্য সুধাসিন্ধু খীসাকে সাথে না আনায় মনে করা হচ্ছিল তারা সত্যিই একটি সমঝোতার পক্ষে। সন্তু অবশ্য বলেছেন, তাদের প্রতিনিধি দলে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। সুধাসিন্ধু আসেননি ভিন্ন কাজে ব্যস্ততার কারণে। শনিবার প্রথম দিনের বৈঠকেই জনসংহতি সমিতির ৫ দফার মূল পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী, অপাহাড়ী বাঙালী সেটেলার প্রত্যাহার, শরণার্থী প্রত্যাবাসন, জমির ওপর পাহাড়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পাহাড়ে গণতান্ত্রিক শাসন চালুর বিষয়াদি আলোচনার টেবিলে ওঠে। সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলা হয় দেশের আর সমস্ত স্থানের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও সেনানিবাস থাকবে। সেনা সদস্যদের নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন সেখানে আগের মতো নেই। সেনাবাহিনী থাকবে ব্যারাকে। ভূমিবণ্টন সম্পর্কে বলা হয় ভূমি তার প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শরণার্থী ফেরার পর তাদের পুনর্বাসন করা হবে। তাদের ভূমির ডকুমেন্টস না থাকলেও বন্দোবস্ত করা হবে ভূমির। পাহাড়ে গণতান্ত্রিক শাসন সম্পর্কে সর্বশেষ প্রস্তাব ছিল তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে নির্বাচিত একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলে পাহাড়ী, অপাহাড়ীদের আনুপাতিক পদ প্রাধান্য থাকবে। এই কাউন্সিলের তিনটি শাখা কার্যকর থাকবে তিন পার্বত্য জেলায়। এই কাউন্সিল, পরিষদ অথবা সংস্থার আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হবে রাষ্ট্রপতির একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে। অধ্যাদেশটি পরে পাস করানো হবে সংসদে। এর বাইরে সংবিধান

সংশোধনীর মাধ্যমে কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সরকারের জন্য সহজ নয়। পাহাড়ীদের জাতিগত অধিকার, সংস্কৃতি রক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। সমিতি নেতারা এ ব্যাপারে সাংবিধানিক মর্যাদার দাবি করেছিলেন। কিন্তু তাদের বলা হয় একা সংবিধান সংশোধনী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিএনপি'র সমর্থন সম্ভবত এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। বিএনপি'র প্রতিনিধিরা শান্তি বৈঠকেও যোগ দিচ্ছেন না। জানা গেছে, সমিতি নেতারা সরকারের এই সীমাবদ্ধতার দিকটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সমিতির ইচ্ছা তাদের সদস্য এবং শান্তিবাহিনীর ক্যাডারদের নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পুলিশ বাহিনীর আদলে আলাদা বাহিনী প্রতিষ্ঠার। সরকার পক্ষ শান্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেবার কথা বলেছিল। তারা বলেছে, সমঝোতা প্রতিষ্ঠা, প্যাকেজ চুক্তি হলে এতে সমস্যা হবে না। সরকার পক্ষ বারবার বলেছে, অপাহাড়ী সেটেলারদের ঢালাও উচ্ছেদ সম্ভব নয়। পাহাড়ীদেরও লক্ষাধিক সদস্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাকরি-বাকরি, পড়াশোনার উদ্দেশে আছে। জানা গেছে, সমিতি নেতারা বেশিরভাগ সময় কথা শুনেছেন বেশি। বিভিন্ন পয়েন্ট লিখে নিয়েছেন। আর বলেছেন, এসব বিষয়ে তাঁদের ফোরামে আলোচনার দরকার আছে। যাবার আগে চীফ হুইপের সাথে তাঁদের একান্ত বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে, ত্রিপুরায় অবস্থানরত শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সাথেও কথাবার্তা বলা হবে। ঈদের পর জাতীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য শরণার্থীদের অবস্থা দেখার, তাঁদের সাথে আলোচনার জন্য ত্রিপুরায় যাবার কথা আছে।

সোমবার রাতে দুদুকছড়ি থেকে ফিরে আমাদের খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা জিতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, সন্তুদের নিয়ে সবুজ সামরিক হেলিকপ্টার বিকাল সোয়া ৪টায় সেখানে পৌঁছে। জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান কায়সার তাঁর সাথে সেখানে যান। যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমাও ওই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অপেক্ষমাণ শত শত পাহাড়ী জনতার সভায় সন্তু লারমা বলেন, জনসংহতি সমিতির ৫ দফার বিপরীতে সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেননি। সমঝোতা এখনও হয়নি। তবে তিনি বলেন, সরকারের আন্তরিকতা আমরা উপলব্ধি করেছি। শান্তি বৈঠকে সরকারের আন্তরিকতার বহির্প্রকাশ ঘটেছে। গৌতম চাকমাও সেখানে বিভিন্ন সময়ে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এরপর শান্তিবাহিনীর একটি সশস্ত্র দল সন্তুসহ নেতাদের নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলের নিজস্ব আস্তানায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাঙ্কক সম্মেলন
শান্তি উদ্যোগকে প্রভাবিত করবে না

সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে

ফজলুল বারী ॥ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাঙ্কক সম্মেলনের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের নীতি নিয়েছে। সরকারী একাধিক সূত্র শুক্রবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেছে, তারা আশা করছে ঐ সম্মেলন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে বর্তমানের শান্তি উদ্যোগে তেমন প্রভাব ফেলবে না। যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে ১২ মার্চ পরবর্তী শান্তি বৈঠকের স্থান নির্ধারণে ঈদের পরই চিঠি পাঠানো হবে জনসংহতি সমিতির কাছে। এ ছাড়া শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যেও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারকে প্রদেয় এককালীন মঞ্জুরীর পরিমাণ ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক প্রচার কমিটি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছে ২৩ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আহ্বায়ক সুবোধ চাকমা বলেছেন, সেই সম্মেলনে এশিয়া ছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলোর বেশ ক'জন নৃতত্ত্ববিদ, সমাজ বিজ্ঞানী, উপজাতি নেতা, মানবাধিকার সংস্থা প্রধান, রাজনৈতিক নেতা অংশ নেবেন। ব্রিটিশ মানবাধিকার সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রধান লর্ড হ্যাবার বিউরি, ইউরোপীয় সংসদের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ডগলাস স্যান্ডাস, ভারত-বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলও সেখানে যোগ দেবার কথা আছে। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, ব্যাংককের বাংলাদেশ মিশনকে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার কথা বলা হবে। তবে ঐ সম্মেলন চলতি শান্তি আলোচনাকে প্রভাবিত করবে এটা তারা মনে করে না। কারণ চলতি শান্তি আলোচনায় বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার বিষয়টি ইতোমধ্যে সকল মহলে সমাদৃত হয়েছে।

সরকারী সূত্র বলেছে, ঈদের পর বাংলাদেশের একটি সংসদীয় দল ত্রিপুরায় শরণার্থীদের সাথে কথা বলতে যাবে। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকেও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। দিল্লীর পক্ষে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে সব ধরনের সহযোগিতা তারা দেবে। সর্বশেষ ঢাকা শান্তি বৈঠকে শনাক্ত হয় এর আগে প্রত্যাবর্তনকারী মাত্র ৮ পরিবারের যথাযথ পুনর্বাসন হয়নি। এই ৮ পরিবারেরও পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শরণার্থী পুনর্বাসনে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা ঈদের পরপর ঘোষণার কথা আছে। ব্যাংকক

সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা নিয়ে মুখ্য আলোচনা হবার কথা। ভূমি সমস্যা নিয়ে ঢাকা বৈঠকেও মূল আলোচনা হয়। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি আইনে উল্লেখ করা আছে ভূমি হস্তান্তরের আগে স্থানীয় পরিষদের অনুমোদন লাগবে। ঢাকা বৈঠকে জনসংহতি সমিতির নেতারা বলেছেন, এই অনুমোদন প্রেক্ষিতে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে বিকল্প প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। সূত্র বলেছে, ঢাকা বৈঠকে জনসংহতি নেতারা কথা শুনেছেন বেশি, বলেছেন কম। অনেক প্রস্তাবের খুঁটিনাটি লিখে নিয়ে গেছেন। তাদের ফোরামে এসব কিছু আলোচনার পর সরকারকে জানানোর কথা। ১২ মার্চের বৈঠকে তাদের অনেক জবাব পাবার আশা করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
চাকমা প্রত্যাবাসন ॥
প্রতিনিধি দল
ত্রিপুরা যাচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করতে একটি সংসদীয় দল ত্রিপুরা সফরে যাচ্ছে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। দলটি সেখানে প্রত্যাবাসন বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার সাথে বৈঠক করার কথা আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ঢাকা শান্তি বৈঠকের আগে প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। শান্তি বৈঠকেও এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে বিষয়টি তুললে ভারত সরকার এমন একটি দলকে ত্রিপুরায় স্বাগত জানানোর কথা বলে দেয়। উল্লেখ্য, দেশে নতুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান আলোচনায় বিশেষ অগ্রগতির সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে খাগড়াছড়িতে পরে ঢাকায় শান্তি বৈঠকে এই সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়। সরকারী সূত্র আশা করে বলেছে, সংসদীয় দলের ত্রিপুরা সফর শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সমস্যার জট খুলে দিতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী
খুব শীঘ্র চাকমা সমস্যার সমাধান হবে,
চুক্তি হবে, স্বাভাবিক অবস্থা
ফিরে আসবে পার্বত্য এলাকায়

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, খুব শীঘ্রই চাকমা সমস্যার সমাধান হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে এবং চাকমা সমস্যা সমাধানে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। রবিবার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নয়াদিল্লী থেকে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, আমাদের শান্তি প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে কোন কোন মহল প্রকাশ্যে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতে শান্তি ফিরে না আসে, চাকমা সমস্যার যাতে সমাধান না হয়, সেজন্য বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছে। এর সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী এবং অস্ত্র চোরাকারবারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তারা চাইবে না এই সমস্যার সমাধান হোক। কিন্তু কোন অপচেষ্টাই আমাদের থামাতে পারবে না। ইনশাল্লাহ্ খুব শীঘ্রই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে পারব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনে যোগদান শেষে সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশ বিমানযোগে ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন পুলিশকে হত্যা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এর সঙ্গে ড্রাগ ট্রাফিক, অস্ত্র চোরাচালানসহ অনেক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। তারা চাইবে না পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসুক। কারণ শান্তি এলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থাকবে না। তাছাড়া দেশের ভিতরে যারা চায় না এই সমস্যার সমাধান হোক, তাদের অপচেষ্টাতো থাকবেই। তিনি এ ঘটনা কেন ঘটল, কারা ঘটনা ঘটিয়েছে, তা খুঁজে বের করার জন্য সাংবাদিকদের কাছে আবেদন জানান।

তিনি বলেন, সমস্যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকাগুলো অনুন্নত থেকে যাচ্ছে। আদিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকাগুলোতে শান্তি একান্ত দরকার। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত করে দেখা হবে। আমরা জানি কি উদ্দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু কোন ঘটনাই আমাদের দমাতে পারবে না। আমাদের

প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সমস্যা সমাধানে কমিটি হয়েছে। শীঘ্রই কমিটি ত্রিপুরা শরণার্থী শিবির দেখতে যাবে। দ্রুত যাতে সমস্যার সমাধান হয়, সেজন্য আলোচনা করেছি। অন্যান্য সমস্যা সমাধানের বিষয়েও ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। ভারত-বাংলা সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার কথা বলা এখনই ঠিক নয়। সমস্যা সমাধানে লক্ষ্য থাকতে হবে।

চট্টগ্রাম জেলখানায় সীমা চৌধুরীর মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন, অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করে নারী ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইয়াসমিন এবং সীমা চৌধুরীর মৃত্যু নারী সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

শেখ হাসিনা তাঁর সফরের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমাদের সংসদে এবং মন্ত্রিসভায় নারী প্রতিনিধিত্ব আছে ১১ শতাংশ। এই অনুপাত ৫০ শতাংশ হওয়া উচিত। আমাদের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো হবে। এ ব্যাপারে আমার সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। আমরা কাজ করে যাব। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। রাজনীতিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ এমনভাবে সমন্বিত করতে হবে, যাতে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে বিকশিত হয়। অর্ধেক নারীকে অনুন্নত রেখে এ সমাজকে টেনে তোলা যাবে না।

চার দফা চুক্তি ভঙ্গের বিরোধী দলের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা কোন চুক্তি ভঙ্গ করিনি। তারা যা যা চেয়েছে সব দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। টেলিভিশনে তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

পাকিস্তান সফর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওনা আদায় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পাওনা আদায় কঠিন ব্যাপার। কেউ এত বছরে পারেনি। তবে বিহারীদের প্রত্যাবাসন এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওনা আদায় আমাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই রয়েছে। এবং সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ কোন উদ্যোগ নিবে কিনা এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ তাদের নিজস্ব ব্যাপার। দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিজেদেরই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমরা চাইব দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই তাদের সমস্যার সমাধান হোক। যেহেতু এই অঞ্চলের দেশগুলোর সমন্বয়ে সার্ক গঠিত হয়েছে, যে কোন সমস্যা এই অঞ্চলের দেশগুলোকে ডিসটার্ব করবে। এ জন্য যত দ্রুত তাদের সমস্যা সমাধান হয়, তত ভাল। আমরা তাদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ পেলে অবদান রাখব। তবে নিজেদের সমস্যা তাদের নিজেদেরই সমাধান করতে হবে।

শেয়ার বাজার সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, শেয়ার বাজারে উঠা-নামা, ধস, ইত্যাদি থাকবেই। এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর জন্য কোন কোন মহলের প্রচেষ্টাও ছিল। তবে এখন শেয়ার বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা চলছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া বলেন, ম্যাক্রো অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে, রিজার্ভ স্থিতিশীল, আমদানি সন্তোষজনক এবং রফতানি বাড়ছে। অথচ এগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছোটখাটো বিষয়গুলোকে নিয়ে সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, শেয়ার বাজারে ধসের জন্য বিশ্বব্যাংক এ ধরনের কথা বলবে কেন এটা আমারও প্রশ্ন। উন্নয়নশীল দেশের শেয়ার বাজারে দ্রুত উঠা-নামা হয়ে থাকে। এখানে সরকারের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেছে। কেউ লাভবান হয়েছে, আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব ছিল সতর্ক করে দেয়া, সরকার সতর্ক করে দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের বিষয় ছিল দেখেশুনে বিনিয়োগ করা। তবে কোন অন্যায় বা বেআইনী কাজ হয়ে থাকলে তদন্ত হওয়া উচিত। এবং সরকার বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। অর্থমন্ত্রী জনাব কিবরিয়া আরও বলেন, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ আমাদের উন্নয়নসহযোগী। তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে চলব। তবে তাদের লেবেল বুকে লাগিয়ে আমরা চলছি না। আমরা স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করছি। ঈদের সময় অতিরিক্ত বাসভাড়া আদায় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাসের মালিক সরকার নয়। যারা বেশি ভাড়া দিচ্ছে, তারাইবা দিচ্ছে কেন? আর বাস মালিকরা বেশি ভাড়া নিবে কেন? তবে এবার ঘাট পারাপারে কোন দুর্ভোগ হয়নি। আওয়ামী লীগ, যুব লীগ এবং ছাত্রলীগের কর্মীরা সহযোগিতা করায় একটি গাড়িও ফেরি ঘাটে বসে থাকেনি। বাড়ি যাওয়ার প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও এত শান্তিপূর্ণভাবে নদী পারাপার আর কখনও হয়নি। নির্দেশ দিয়েছিলাম ঘাটে যাতে কোন গাড়ি আটকা না থাকে। কারণ ইতোপূর্বে ঘাটে যাত্রীদেরকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত পড়তে হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার অশান্ত করার চেষ্টা?

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামকে কি আবার অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে? সাম্প্রতিক রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সেখানকার পরিস্থিতির

প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি সামনে আসতে শুরু করেছে। জনসংহতি সমিতির সাথে সর্বশেষ শান্তি বৈঠকের পর পাহাড়ে শান্তির আভাস যখন স্পষ্ট হচ্ছিল রোয়াংছড়ির ঘটনা তাতে চপেটাঘাতের সামিল বলেছে সংশ্লিষ্ট একটি পক্ষ। সরকারী একটি সূত্র অবশ্য বলেছে, তারা সতর্ক নজর রাখছে। শান্তি আলোচনা ভন্ডুলের কোন অপচেষ্টাকে সফল হতে দেয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এ ক্ষেত্রে অটল। সম্প্রতি তিনি এ কথাই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নুরুদ্দীন খান বলেছেন শান্তি উদ্যোগ কেউ ভন্ডুল করতে পারবে না। আমরা সতর্ক আছি।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর রবিবারের বক্তব্যে তোলপাড় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিশেষ মহলে। এই মহলটিতে কাল এটিই ছিল মুখ্য আলোচনার বিষয়। উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা সোমবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, এদ্দিন জানা এসব অনেক বিষয় নিয়ে আমরা শুধুই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস আলোচনা করতাম, প্রকাশ্যে কিছুই স্বীকার করতে চাইতাম না। পার্বত্য চট্টগ্রামকে এদ্দিন ত্রিদেশীয় সশস্ত্র ব্যক্তিদের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হলেও কিছু ঘটলে শুধুই চিহ্নিত একটি পক্ষকে দোষারোপ করে যাওয়া আমাদের মুখস্থ অভ্যাস। কিন্তু এখন আদ্যোপান্ত অনেক কিছুই জানেন বলেই প্রধানমন্ত্রী সরাসরি আসল কথাটি বলে দিয়েছেন। এর আগে কখনও সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি নিয়ে অমন সরাসরি বক্তব্য আসেনি। এটি প্রধানমন্ত্রীর একটি সাহসী উচ্চারণ। এক ধরনের ওয়ার্নিং। এক সাথে এক কথায় তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন সম্ভাব্য সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পক্ষকে। উল্লেখ্য, বান্দরবানের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে রবিবার জিয়া বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মাদক-অস্ত্র চোরাচালানসহ অনেকের অনেক স্বার্থ জড়িত। সেজন্য তারা সরকারের শান্তি উদ্যোগ ভন্ডুলের চেষ্টা চালাচ্ছে। শান্তি উদ্যোগ ভন্ডুলের জন্য অনেকে প্রকাশ্যে চালাচ্ছে প্রচার প্রপাগান্ডা। বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, হয়ত সেখানে আরও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটবে। এ সবের মাধ্যমে তারা শান্তি উদ্যোগ ভন্ডুলের চেষ্টা চালাবে। কারণ সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থাকবে না। সে জন্য তারা চাইবে না এই সমস্যার সমাধান হোক। প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, কোন অপচেষ্টাই আমাদের উদ্যোগকে থামাতে পারবে না। ইনশাল্লাহ আমরা শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে পারব। উর্ধতন একটি সূত্র বলেছে, এদ্দিন পাহাড়ে অশান্তির কারণসমূহ কোথায় ছিল, কোথায় কিভাবে সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হতো, সাম্প্রতিক শান্তি উদ্যোগের প্রেক্ষিতে কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, কারা কিভাবে এটিকে

ভন্ডুলের চেষ্টা করছে এর সব কিছুই প্রধানমন্ত্রী অবহিত বলেই তিনি এমন সরাসরি মন্তব্যটি করতে পেরেছেন। সরকারের বিশেষ একটি দফতর সোমবার সাম্প্রতিক শান্তি উদ্যোগের পর থেকে পাহাড়ে কাঠুরিয়া হত্যাকাণ্ড, সুবিনয় চাকমা হত্যাকাণ্ড, গুইমারায় একজন পাহাড়ী ছাত্র নেতাকে নির্যাতন এবং সর্বশেষ বান্দরবানে ৪ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলীর একটি সার সংক্ষেপ রিপোর্ট তৈরি করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে সরকারকে বিব্রত, হোস্টাইল করতেই এসব ঘটনা ঘটানো হচ্ছে একের পর এক। এসবের মূল উদ্দেশ্য পরিস্থিতিকে উত্তেজনাকর, অস্থিতিশীল করে সরকারকে অ্যাকশনে যেতে বাধ্য করা। সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এমন চিন্তার উৎসাহীদের নিরুৎসাহিত করবে। চলতি শান্তি উদ্যোগের অংশ হিসাবে সরকারী একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা যাচ্ছে ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেই সফরের প্রস্তুতি হিসাবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির বিশেষ একটি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পরবর্তী বৈঠক হবে আগামী ১২ মার্চ। সূত্র বলেছে, পরবর্তী বৈঠকের স্থান নির্বাচন নিয়ে এখনও জনসংহতি সমিতির সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নূরুদ্দীন খান জনকণ্ঠকে বলেছেন, পরবর্তী বৈঠক খাগড়াছড়িতে হবার সম্ভাবনা বেশি।

মাদক, অস্ত্র চোরাকারবারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর এ বিষয়টি নিয়ে নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে বিভিন্ন মহলে। ওয়াকিবহাল একটি সূত্র বলেছে, ত্রিপুরা, মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল হয়ে থাইল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত মাদক চোরাচালানী নেটওয়ার্কের সাথে বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনের যোগসাজশের অভিযোগ বেশ পুরনো। গত কয়েক বছর ধরে এ পথে অস্ত্র চোরাচালানের প্রায় নিয়মিত অভিযোগ পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের বিদ্রোহী দলগুলো ছাড়াও মিয়ানমার, থাইল্যান্ডের বেশ কিছু বিদ্রোহী দল, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনী এই চোরাচালানীদের মূল টার্গেট। ভারতীয়রা সব সময় অভিযোগ করে আসছে পাকিস্তানের আইএসআই'র মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছিল। এমন একটি অভিযোগ ছিল মিয়ানমার সরকারেরও। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী বিদ্রোহী নেতাদের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় সংগ্রহ করা তহবিলের অস্ত্র বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যায় এমন একটি অভিযোগ ভারতীয়দের ছিল। পুরুলিয়ায় এবং কক্সবাজারে বড় দুটো অস্ত্রের চোরাচালান ধরা পড়ার পর এই অভিযোগটি শক্ত ভিত্তি পায়। বাংলাদেশে ফ্রিডম পার্টিসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা, কিছু ব্যবসায়ীসহ

অন্য পেশার লোকজন এসব অস্ত্র ব্যবসার লোকাল এজেন্টের কাজ করতেন বা করেন এমন অভিযোগ আছে। ফ্রিডম পার্টির নেতা, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম ঘাতক কর্নেল (অব) ফারুক ধরা পড়ার আগে তার চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক সফরের খবর বেরিয়েছিল। জানা গেছে, ঐ সফরসমূহও ছিল অস্ত্র ব্যবসা সম্পর্কিত। ভারতের ত্রিপুরা এবং মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকাজুড়ে হেরোইন, আফিম, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ নানা মাদকদ্রব্যের জমজমাট পাচার ব্যবসা বিষয়টি ব্যাপক জনশ্রুত। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ ধ্বংস করে কাঠের ব্যবসাসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িত হয়ে গেছে স্বার্থান্বেষী বেশ কিছু মহল। বিভিন্ন বিদ্রোহী, গোপন সশস্ত্র গ্রুপের যোগসাজশে সীমান্তের এপারে ওপারের বিশেষ গোষ্ঠী এসব কিছুর মুনাফা ভোগকারী বলে অভিযোগ আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে সেখানে মূল্যবান খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ সম্ভব হচ্ছে না। খনিজ আহরণের জন্য সম্প্রতি শেলওয়েল কোম্পানির সাথে স্বাক্ষর করা চুক্তির অধীনে কাজকর্ম শুরুও সম্ভব হচ্ছে না পরিস্থিতির কারণে। পরিস্থিতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের যথাযথ উন্নয়নও সম্ভব হচ্ছে না। এসব সমস্যার নিরসনের নাড়ি ধরে টান দিয়েছে বলেই সেখানকার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার নানা চেষ্টা-তৎপরতা চালানো হচ্ছে–এমন আভাস প্রমাণ সরকারের হাতে এসেছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি আলোচনা পণ্ডের লক্ষ্যে শান্তিবাহিনীর সন্তু লারমা বিরোধী একটি গ্রুপ, মিয়ানমারের কিছু সশস্ত্র গ্রুপকে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ডিসেম্বরে থানচি থানার টিএনওসহ ছয় জনকে অপহরণের জন্য প্রথমে শান্তিবাহিনীকে দোষারোপ করা হলেও পরে জানা গেছে, অপহরণের সাথে জড়িত ছিল মিয়ানমারের ন্যাশনাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট অব আরাকান এবং ক্যায়াং আর্মি নামের দু'টো সশস্ত্র গ্রুপ। বান্দরবান এলাকায় এ ছাড়া আরাকান লিবারেশন পার্টি, আরাকান আর্মি, মংখাই আর্মিসহ বেশ কিছু সশস্ত্র গ্রুপকে এর আগে মদদ দেয়া হচ্ছিল এমন অভিযোগ আছে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশভিত্তিক ইসলামী বিপ্লবের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কক্সবাজার জেলার কয়েকটি এলাকায় চালু থাকার খবর বেরিয়েছে। সম্প্রতি ধরা পড়া বরগুনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালেবানী প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত এই মহলটি। সূত্র মতে, বান্দরবানে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড পার্বত্য পরিস্থিতিতে নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছে। এর আগে ২০ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও কখনও পুলিশের ওপর হামলা হয়নি। কিন্তু গত ৯ মাসে শুধু রোয়াংছড়ি থানাতেই তিন দফা হামলায় প্রাণ হারিয়েছে পুলিশের ৫ কনস্টেবল, ১ দারোগা। এর পর একই স্থানে আরেকজন সেনা

সদস্যের প্রাণ হারানোর ঘটনা সেখানে বিশেষ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। রবিবার রাতে পার্বত্য এলাকার একাধিক শহরে যোগাযোগ করে জানা গেছে, সে সব জায়গার থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বান্দরবানের এসপি মাজেদুল হক দাবি করে বলেছেন, তাঁরা নিশ্চিত সেখানকার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে শান্তিবাহিনী। কিন্তু সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে শান্তি বাহিনীর তরফে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পাহাড়ি এক নেতা জনকণ্ঠকে বলেছেন, ঐ ঘটনায় শান্তিবাহিনীর যোগসাজশের সম্ভাবনা কম। কারণ যে সব অস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে তা শান্তিবাহিনীর নেই। উল্লেখ্য, এর আগে কাঠুরিয়া হত্যাকাণ্ড, সুবিনয় চাকমা হত্যাকাণ্ডের পর শান্তিবাহিনী বিবৃতি দিয়ে দাবি করেছিল তারা সে সবের সাথে জড়িত ছিল না। বান্দরবান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা মনিরুল ইসলাম মনু সোমবার জানিয়েছেন, সেখানকার পরিস্থিতিতে লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে শীঘ্রই কোন দমন অভিযান শুরু হতে পারে এ রকম সাজ সাজ প্রস্তুতিও দেখা যাচ্ছে। রোয়াংছড়ি থানার টিএনও থানা প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা গত তিন দিন জেলা সদরে আটকা আছেন। রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সোমবার বিকালে জামায়াতে ইসলামী সন্ধ্যায় এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগের যৌথ মিছিল বেরোয়। আওয়ামী লীগের জেলা সংগ্রাম প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রহিম চৌধুরী বিবৃতিতে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের হাতে তিন পুলিশ ও এক সেনা জওয়ান খুন হবার ঘটনার প্রতিবাদ, অচিরেই বিচারের দাবি করেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাঙ্কক সম্মেলন স্থগিত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক ব্যাঙ্কক সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ২৩ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যাঙ্ককে তিন দিনের এই সম্মেলন হবার কথা ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল পিস কনফারেন্স অন চিটাগাং হিলট্র্যাক্টস' শিরোনামে। উদ্যোক্তা সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির একটি সূত্র বলেছে, রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডসহ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে সম্মেলন স্থগিত রাখার কথা। অপর একটি সূত্র বলেছে, সেখানে যাবার ভিসা সংগ্রহ সম্পর্কিত সমস্যার কারণেই সিদ্ধান্তটি। এদিকে রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য এলাকার ৭ বিশিষ্ট ব্যক্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির স্থানীয় একটি সূত্র বলেছে, ঢাকা

থেকে নির্দেশ যাবার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হয়েছে এই ব্যবস্থা। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে ৩০ জনসহ মোট ১১০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণের কথা ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আদিবাসীর সমস্যার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিসমস্যা, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, সরকারের সাথে শান্তি আলোচনাসহ একটি আন্তর্জাতিক ফলোআপ কমিটি (আইএফসি) গঠনের কথা ছিল সেই সম্মেলনে। কথা ছিল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মৌলিক অধিকার কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আনু মোহাম্মদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। সরকারী একটি সূত্র এর আগে বলেছিল, তারা সম্মেলনের কার্যক্রমের চলতি শান্তি বৈঠকের সময়ে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল না। ব্যাঙ্ককের বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষে নাকি এ ব্যাপারে থাই সরকারের সাথে যোগাযোগও করা হয়েছিল। অংশগ্রহণেচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁরা ঢাকার প্রয়োজনীয় ভিসা যোগাড় করতে পারেননি। সে জন্যই সম্মেলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য এলাকার ৭ বিশিষ্ট ব্যক্তির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এই ৭ জন হলেন তিন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর এবং দীপঙ্কর তালুকদার, তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা। তিন সাংসদ পার্বত্য এলাকায় যাবার পরই তাঁদের এই নিরাপত্তা দেয়া হবে। অন্যদের বাড়িতে ইতোমধ্যে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, সুবিনয় চাকমা হত্যার পর সরকার সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। সে জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শান্তিবাহিনীর পক্ষে আজ-কাল একটি বিবৃতি প্রকাশের সম্ভাবনার কথা বলেছে খাগড়াছড়ির ওয়াকিবহাল একটি সূত্র।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

বান্দরবান হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা
অস্বীকার করেছে শান্তি বাহিনী

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডের সাথে যোগসাজশের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে শান্তি বাহিনী। শনিবার প্রকাশিত এক প্রতিবাদ পত্রের মাধ্যমে তারা বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যা

সমাধানে জনসংহতি সমিতি খুবই আগ্রহী। সে জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য সবকিছু তারা করছে। জনসংহতি সমিতি ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট থেকে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা এবং তা পালনের শর্তাবলী মেনে চলছে যথারীতি। তথাপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনীর ওপর অস্ত্রবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ চাপানো হচ্ছে। এদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাংকক সম্মেলন আজ শুরু হচ্ছে। যদিও সম্মেলনে অংশগ্রহণেচ্ছুক বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এখনও সেখানে যোগদানের অনুমতি পাননি। সংশ্লিষ্ট দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নাকি গত বৃহস্পতিবার সম্মেলন স্থগিত হয়েছে বলে ভিসার আবেদন অগ্রাহ্য করেছিল। বাংলাদেশের কয়েকজন অংশগ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি সেমতেই সম্মেলন স্থগিতের খবরটি একাধিক পত্রিকাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার ব্যাংকক থেকে সম্মেলন স্টিয়ারিং কমিটির এক ঘোষণায় বলা হয়েছে খবরটি ঠিক নয়। সম্মেলন যথারীতিই হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণেচ্ছুকদের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে তারা আজ আবার ভিসার জন্য আবেদন করবেন। ভিসা মঞ্জুর হলেই উড়াল দেবেন ব্যাংককের উদ্দেশে। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সম্মেলন চলার কথা।

১৫ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডের ৭ দিনের মাথায় এ ব্যাপারে শান্তি বাহিনীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতির প্যাডে ইংরেজীতে টাইপ করা বক্তব্যটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ইস্যু করা হয়েছে। সমিতির তথ্য ও প্রকাশনা শাখার পক্ষে জগদীশ চাকমা স্বাক্ষরকৃত প্রতিবাদপত্রটি শনিবার দুপুরে খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পাঠানো হয়। এই পত্রে ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠকের অগ্রগতি, ১২ মার্চ পরবর্তী বৈঠকের উল্লেখ করে বলা হয়, তারা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছে পুনরায় সমঝোতার এই মুহূর্তে জনসংহতি সমিতির, শান্তি বাহিনীর পক্ষে কোন ধরনের গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মতো কাজে জড়িত হবার প্রশ্নই ওঠে না। তারা বলেছে, জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য তারা কাজ করছে। শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রোয়াংছড়িতে ৩ পুলিশ ও ১ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হত্যার অভিযোগ তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

এদিকে বান্দরবান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা শনিবার রাতে জানিয়েছেন, রোয়াংছড়ি হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর এখনও সেখানকার জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। রুমা, রোয়াংছড়ি, থানচি থানার সর্বত্র লোক চলাচলের ওপর কার্যকর রয়েছে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা। ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপি সেখানে ১ দিনের হরতাল, ৩ দিনের অবরোধ কর্মসূচী পালন করেছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

ত্রিপুরার চাকমা শরণার্থী শিবিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চলছে

খাগড়াছড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত বাংলাদেশী চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য একটি মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে ৬টি আশ্রয় শিবিরে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে স্বেচ্ছায় ফেরত আসা এক উপজাতীয় শরণার্থী এ কথা জানায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এ শরণার্থী জনকণ্ঠকে জানায়, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীরা এখন চরম অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। দীর্ঘ এক যুগ ধরে ত্রিপুরার ৬টি শিবিরে অবস্থানরত চাকমা শরণার্থীদের জীবন অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও চরম হতাশায় নিপতিত।

প্রত্যাগত ঐ চাকমা শরণার্থী আরও জানায়, শরণার্থী শিবিরের দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় সাধারণ শরণার্থীরা নিজ দেশে ফিরে আসতে উদগ্রীব। কিন্তু শরণার্থী নেতাদের চাপের কারণে তারা স্বদেশে ফিরতে পারছে না। স্বেচ্ছায় যাতে কেউ শিবির হতে স্বদেশে ফিরতে না পারে তার জন্য শিবিরের চারদিকে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। শরণার্থীরা এখন নিয়মিত রেশন সামগ্রীও পাচ্ছে না। চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। শরণার্থী নেতাদের দুর্নীতির কারণে সাধারণ শরণার্থীদের জীবন আজ বিপন্ন। শরণার্থী শেডগুলোও সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। আসন্ন বর্ষা মৌসুম নিয়ে শরণার্থীরা চিন্তিত। এছাড়া শরণার্থীদের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হতে বরাদ্দ রেশন সামগ্রী বিতরণের মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে আগামী ৩১ মার্চ।

এদিকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ৬টি শিবিরে আশ্রিত বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি চীফ হুইপের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির সদস্যদের ত্রিপুরা রাজ্য সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ত্রিপুরায় অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে পরিস্থিতি বর্তমানে অস্বাভাবিক। তাই জাতীয় কমিটির ত্রিপুরা সফর কিছুদিন পিছানোও হতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণেচ্ছুরা ভিসা পাননি ॥ জনসংহতিকে সরকারের চিঠি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক ব্যাঙ্কক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণেচ্ছুরা ভিসা পাননি। রবিবার থাইল্যান্ডের রাজধানী শহরে চার দিনের এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। ১২ মার্চ পরবর্তী শান্তি বৈঠকের স্থান নির্ধারণ নিয়ে সরকার জনসংহতি সমিতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। ত্রিপুরায় জাতীয় কমিটির প্রতিনিধিদলের সফর উপলক্ষে আজ সোমবার একটি বৈঠক হবে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, কমিটির তিনজন বাদে সকল সদস্যের সফরকারী দলে অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্ভাবনা আছে। এদের সবাইকে আজকের বৈঠকে পাসপোর্ট, ভিসা ফরম নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি দলটির আগরতলা পৌঁছবার কথা। প্রতিনিধি দলের সাথে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কের মহাপরিচালক শামীম আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি রবিবার রাতে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলেছে, তাদের ব্যাঙ্কক যাবার ভিসা দেয়া হয়নি। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি, পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ঢাকার থাই দূতাবাসে ভিসা আনতে গেলে তাদের ভিসা প্রদানে অধীকৃতি জানানো হয়। কমিটি এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, তারা মনে করেন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরোধী দেশী-বিদেশী মহলই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে। রবিবার রাতে কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান বিবিসিকে বলেন, তাদের ভিসা না দেয়াতে তারা দুঃখিত, আশ্চর্য হয়েছেন। বিবিসির খবরে বলা হয়, থাই দূতাবাস বলেছে সম্মেলনটি পিছিয়ে দেয়ায় তারা ভিসা দেয়নি। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০ জনের যাবার কথা ছিল। সম্মেলনে পড়ার জন্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আনু মোহাম্মদের লিখিত বক্তব্য আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে পরবর্তী বৈঠকের স্থান সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির মতামত জানতে চেয়ে জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ চিঠি লিখেছেন সন্তু লারমার কাছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, চিঠিতে পরবর্তী

বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। চিঠিটি রবিবার দুপুর ১২টার দিকে খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে পৌঁছে। দুপুর দু'টার দিকে শান্তিময় চাকমা নামের একজন পত্রবাহক সেটি নিয়ে দুদুকছড়ির উদ্দেশে চিঠির খাম নিয়ে রওনা হয়ে যান। উল্লেখ্য, শান্তিময় সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়পক্ষের অনুমোদিত পত্রবাহক।

খাগড়াছড়িতে বৈঠক

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার সংলাপের অগ্রগতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সর্বশেষ পরিস্থিতি খুটিনাটি বিষয় মূল্যায়নের ওপর সর্বস্তরের জুম্ম জনগণের এক বৈঠক রবিবার খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজাতীয় নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, প্রবীণ রাজনীতিবিদগণ এতে অংশগ্রহণ করে।

জেলা সদরের পাইওনিয়ার ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ উপজাতীয় নেতা বরেন কুমার ত্রিপুরা। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির সবুজ সংকেত পাওয়ার পর পরই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির চলমান সংলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। আলোচকবৃন্দ সরকারের কাছে দেয়া জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট উপজাতীয় নেতা সৌখিন চাকমার আহ্বানে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ ছাড়া এ বৈঠকে অন্য কাউকে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। বৈঠকটি অনেকটা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মতোই মনে হয়েছে।

সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্মোক্ত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত উপজাতীয় নেতা নবীন কুমার ত্রিপুরা, অনন্ত বিহারী খীসা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, শুধাংশু শেখর চাকমা, উহলাপ্রু চৌধুরী প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সচেতন জুম্ম বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের বৈঠকে খাগড়াছড়ি জেলা ছাড়াও রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান থেকে আগত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। বৈঠক শেষে বিশিষ্ট উপজাতীয় শিক্ষাবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরাকে আহ্বায়ক ও সৌখিন চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ী ঐক্য কমিটি নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা মার্চ ১৯৯৭

খুব শীঘ্র চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু করা যাবে ॥ আগরতলা থেকে ফিরে হাসনাত জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পরবর্তী বৈঠক ঢাকায়

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে পরবর্তী বৈঠকও ঢাকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছে। ১২ মার্চ এই বৈঠক হবার কথা। সরকারের এ সম্পর্কিত চিঠির জবাবে জনসংহতি সমিতি রবিবার পাঠানো চিঠিতে বলেছে প্রস্তাবটির কথা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন, জবাবী এই চিঠি গতকাল রবিবার দুপুরে তাঁর হাতে পৌঁছেছে। জানা গেছে, মোট সাত সদস্য পরবর্তী বৈঠকে জনসংহতি এবং যোগাযোগ কমিটির পক্ষে আসতে পারেন। এদিকে ত্রিপুরায় ৪ দিনের সফর শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গতকাল রবিবার দুপুরে রামগড় সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তারা সীমান্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। বাংলাদেশ দলের নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন খুব শীঘ্রই শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু করা যাবে বলে তিনি আশাবাদী। জনসংহতি সমিতির চিঠি রবিবারই রামগড়ে চীফ হুইপের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এদিকে সরকারী ধ্যানধারণার উদ্ধৃতি দিয়ে আগরতলার একটি সূত্র বলেছে, চাকমা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন পর্বে ভারত কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সমর্থন করবে না। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতি হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান। গঙ্গার পানি চুক্তির ক্ষেত্রে ভারত তাই করেছে। শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহী সমস্যার সমাধান প্রশ্নেও ভারত দ্বিপাক্ষিক নীতি অনুসরণ করছে। তাছাড়া ভারত সরকার মনে করে চাকমা শরণার্থী সমস্যার সমাধান দু'দেশের কর্তৃপক্ষের আওতার বাইরে কিছু নয়। শরণার্থীরা বিপন্ন হয়ে ভারতে এসেছিল। তাদের আশ্রয় দেয়া হয়েছিল মানবিক কারণে। এখন বাংলাদেশ যদি তার পরিবেশের উন্নতি করে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে চায় তাতে ভারত সরকারের আপত্তির কিছু নেই। প্রত্যাবাসন যথাযথ হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও ভারতের নয়। এটা বাংলাদেশ সরকারের একক নজরদারীর বিষয়। শরণার্থীরা যদি চায় এক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মকর্তারা যৌথ মনিটরিং ব্যবস্থায় থাকতে পারেন। এটিও বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। এখানে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। এটা ভারত সরকার সমর্থন করবে না। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে

তৃতীয় পক্ষকে জড়িত করাব নজিরও সৃষ্টি করবে না। দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে তৃতীয় পক্ষকে জড়িত করার নজিরও সৃষ্টি করতে চায় না ভারত সরকার–কথাগুলো বলেছেন ত্রিপুরার প্রবীণ সাংবাদিক, সেখানকার দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক। শনিবার আগরতলা সার্কিট হাউসে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে শরণার্থী নেতারা প্রত্যাবাসন পর্বে কোন তৃতীয় আন্তর্জাতিক পক্ষের উপস্থিতি দাবি করেছেন পূর্বশর্ত হিসাবে। এ বিষয়ে মন্তব্য চাওয়া হলে রবিবার ভূপেন দত্ত টেলিফোনে জনকণ্ঠকে বলেছেন–এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কি করবে না করবে এটা আপনাদের ব্যাপার, তবে আমাদের সরকারী চিন্তা-ভাবনা যা আমরা জানি ভারত সরকার কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সমর্থন করবে না। উল্লেখ্য আগরতলা বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে এক সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী বৈঠকের কথা বলে এসেছেন। সরকার ঘোষিত ২০ দফা প্রস্তাবের একটিতে শরণার্থী নেতারা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছেন। এককালীন পরিবার পিছু মঞ্জুরি ১৫ হাজার টাকার জায়গায় তারা ২০ হাজার টাকা দিতে বলেছেন। জানা গেছে, এই বিষয়টিতে কোন সমস্যা হবে না।

সরকার ঘোষিত নতুন ২০ দফা প্রস্তাবে আছে সংবিধান ও আইন অনুসারে উপজাতীয় শরণার্থীসহ সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি উপজাতীয় পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান হিসাবে এককালীন দেয়া হবে ১৫ হাজার টাকা, প্রত্যেক শরণার্থী পরিবারের সদস্যদের সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্কদের মাথা পিছু ৫ কেজি, অপ্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু আড়াই কেজি চাল, পরিবার পিছু মাসিক ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল, ২ কেজি লবণ রেশন হিসাবে দেয়া হবে ৬ মাস (শরণার্থী নেতারা এই রেশন সুবিধা এক বছর বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন)। প্রতি শরণার্থী পরিবারকে ২ বাণ্ডিল সিআই শীট ঢেউটিন, ভূমির মালিক প্রতি পরিবারকে চাষযোগ্য এক জোড়া বলদ কেনার জন্য দেয়া হবে ৮ হাজার টাকা। ভূমিহীনদের একটি গাভী কেনার জন্য ৩ হাজার টাকা, কোন শরণার্থী পরিবারের ঋণ থাকলে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের সুযোগ প্রদান, ভারতে অবস্থানকারী উপজাতীয় শরণার্থীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহহীন ঋণ মওকুফ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা বলবৎ, জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত সকল মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানার বিষয় বিবেচনা করা, প্রত্যাবাসনকারী শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের কাছে হস্তান্তর, উপজাতীয়দের সাবেকী আমলের মতো গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন করা

হবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সকল উপজাতীয় হেডম্যানদের স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল, দেশত্যাগের আগে যেসব উপজাতীয় শরণার্থী সরকারী-আধাসরকারী চাকরিতে ছিলেন যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের চাকরিতে পুনর্বাসন, ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরসমূহে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী এসএসসি এবং এইচএসসি'র সমমানের সার্টিফিকেট আনবে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট কুমিল্লা বা চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় তরুণ-তরুণীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদের অধীনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদসমূহে নিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান, পূর্বতন সরকারের আমলে যেসব শরণার্থীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ফৌজদারী মামলায় শাস্তি হয়েছে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা এবং চাকরি ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয়দের বয়সসীমা শিথিল করা হবে।

আগরতলার ওয়াকিফহাল সূত্র বলেছে, সেখানকার কর্মকর্তারা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট। ভারত সরকার আর শরণার্থীদের ব্যয়ভারও বহন করতে চাইছে না। তারা শীঘ্র ফিরবেন এটাই সরকারের ইচ্ছা। ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তারা এই উদ্দেশে সফরকারী দলের সাথে শিবির পরিদর্শনে গিয়ে শরণার্থীদের দেশে ফিরতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শিবিরের জীবন কোন সুখকর জীবন নয়। এখানে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হচ্ছে না। শীঘ্র দেশে না ফিরলে এই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যাবে। কর্মকর্তারা বলেছেন–বর্তমান বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। এই সুযোগে তাদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। জানা পেছে, শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রত্যাবাসন পর্বে ভারত সরকারকে একটি পক্ষ হিসাবে সংশ্লিষ্ট রাখতে চান। শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য এর আগে ভারত সরকারের সাথে ৩ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় উপেন্দ্র আরেকটি চুক্তি চাইছেন দুই সরকারের। সূত্র বলেছে, চুক্তি হোক বা না হোক শরণার্থীরা যেহেতু সেখানে আছেন সেহেতু ভারত সরকার অবশ্যই একটি পক্ষ। আর বাংলাদেশ যদি শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে না চাইত তখনই এ ব্যাপারে চুক্তির তাগিদ থাকত ভারত সরকারের। সূত্র বলেছে, শরণার্থী নেতারা ভারত সরকারের মনোভাব নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছেন। সাম্প্রতিক দিল্লীতে দু'দেশের কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকে কোন পক্ষের কোন বৈরী দলকে অপর পক্ষের সীমান্ত এলাকা ব্যবহার করতে না

দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে শান্তিবাহিনীকে আর ভারতে থাকতে দেবার নৈতিক অবস্থান নেই। সেজন্য শরণার্থীদেরও সেখানে রাখতে বলার প্রভাবক শক্তির বৈধতা নেই। সূত্র বলেছে, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ইস্যুতে ত্রিপুরার রাজনৈতিক শক্তিগুলোর প্রকাশ্য কোন আগ্রহ দৃশ্যমান নয়। কারণ ভোটের সময় এদেরকে ব্যবহারে স্থানীয় রাজনৈতিক পক্ষগুলো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়া শরণার্থীদের অনেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের সনদ সংগ্রহ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। এদের কারণে স্থানীয় মজুর শ্রেণীর লোকজন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। শিবিরে থাকায়, রেশন পাওয়ায় এরা ২৫ টাকার মজুরির কাজ ১০ টাকায় করে দিতে পারেন। এতে স্থানীয় মজুররা অসন্তুষ্ট। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবাসন চান।

রামগড় থেকে ফিরে আমাদের খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা জিতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে পা দিয়ে চীফ হুইপ বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যসরকার শরণার্থী প্রত্যাবাসনে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। নৌকায় ফেনী নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ দল সাব্রুম থেকে রামগড় পৌঁছেন। সাব্রুমের এসডিও, এমএলএসহ শরণার্থী নেতারা সীমান্তে তাঁদের বিদায় জানান। চীফ হুইপ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের মধ্যে বড় ধরনের কোন বিরোধ নেই। শরণার্থীরাও দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৯ই মার্চ ১৯৯৭
আজ চাকমা শরণার্থীদের
স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ
ঘোষণা করা হতে পারে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : আজ চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ ঘোষণার কথা আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ আগরতলায় এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেবেন। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, আগামী বিজু উৎসবের আগেই শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়ে নীতিগত সমঝোতা হয়েছে। বাংলা নববর্ষের আগের দিনটিকে উপজাতীয়রা বিজু উৎসব হিসাবে পালন করে। ১২ মার্চ জনসংহতি সমিতির পরবর্তী শান্তি বৈঠককে সামনে রেখে দুদুকছড়ি এলাকার নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৈঠক উপলক্ষে ১২ মার্চ সকালে জনসংহতি নেতাদের হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হবে। সন্তু লারমার নেতৃত্বে ঢাকায় আসবেন মোট ৯ জন সদস্য। এদিকে শুক্রবার রাতে বান্দরবানে শান্তি বাহিনীর ৪ সদস্যকে

গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, নিয়মিত চাঁদা আদায় উপলক্ষে তারা সেখানে গিয়েছিল।

আগরতলার সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র শনিবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেছে, আজ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সেখানে ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ করা হবে আনুষ্ঠানিকভাবে। সে উপলক্ষে বিকালে আগরতলা সার্কিট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরা সফররত জাতীয় কমিটির সদস্যরা শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার একাধিক শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যান। ২০ দফা প্যাকেজ প্রস্তাবের মধ্যে আছে প্রত্যাবাসনকারী প্রতি শরণার্থী পরিবারকে এককালীন ২০ হাজার টাকা মঞ্জুরি, একজোড়া হালের বলদ কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা, ভূমিহীন পরিবারকে দুধের গাভী কেনার জন্য ৩ হাজার টাকা দেয়া হবে। এছাড়া প্রত্যাবাসনকারী প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে রেশনসামগ্রী দেয়া হবে ৯ মাস। প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে ৫ কেজি, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আড়াই কেজি চাল, পরিবার পিছু মাসিক ৪ কেজি ডাল, ২ কেজি সয়াবিন তেল, প্রতি পরিবারকে ২ বান্ডিল সিআই শীট ঢেউটিন দেয়া হবে। প্যাকেজ প্রস্তাবে এছাড়া আছে সংবিধান ও আইন অনুসারে উপজাতীয় শরণার্থীসহ সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, কোন শরণার্থী পরিবারের কৃষি ঋণ থাকলে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের সুযোগ প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ, জরুরী অবস্থাকালীন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আশ্বাস, সাবেক আমলের মতো গুচ্ছগ্রাম পদ্ধতি অনুসরণ না করা, বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে পর্যায়ক্রমে বেসামরিক এলাকা থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সকল উপজাতীয় হেডম্যানকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল, যোগ্যতার ভিত্তিতে পূর্বতন পদে চাকরিতে পুনর্বাসন, এসএসসি, এইচএসসি সমমানের সার্টিফিকেটসহ প্রত্যাগতদের চট্টগ্রাম বা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, প্রত্যাগত উপজাতীয় তরুণ-তরুণীদের পার্বত্য এলাকায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগে অগ্রাধিকার, চাকরির ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনকারীদের বয়সসীমা শিথিল এবং সাবেক আমলে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার অভিযোগের দণ্ডপ্রাপ্তদের দণ্ড পুনর্বিবেচনার আশ্বাস।

বান্দরবান থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর টহল দল শুক্রবার গভীর রাতে সেখানকার মাঝের পাড়া এলাকা থেকে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে খাগড়াছড়ি থানার ক্যও মং মারমা, লংগদু থানার দিব্য চাকমা, বাঘাইহাটের অমল কৃষ্ণ চাকমা এবং বান্দরবানের আপ্রু মং মারমা। শেষোক্ত ব্যক্তি

শান্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় একটি সূত্র বলেছে, আটককৃতরা ওই এলাকায় শান্তি বাহিনীর চাঁদা সংগ্রহ করছিল। পাইংখং পাড়ার দিকে চলে যাবার সময় তাদের আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে শান্তি বাহিনীর চাঁদা আদায়ের রশিদ, একটি সাবমেশিন গান, ৪ ম্যাগাজিন গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, চলতি শান্তি উদ্যোগের বিরোধিতা করে বিএনপি আগামী ১২ মার্চ তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা করেছে। শনিবার মাটিরাঙ্গায় এক জনসভায় এই ঘোষণা দেয়া হয়। নাসিরউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় আব্দুল ইউসুফ চৌধুরী, গোলাম সারোয়ার, আবুল কালাম আজাদ, নূরুল আলম, বদিউল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালীদের স্বার্থবিরোধী কোন চুক্তি হলে সরকারকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তাঁরা গুচ্ছগ্রামবাসীদের ৪ মাসের বন্ধ রেশন অবিলম্বে বরাদ্দের দাবি জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ই মার্চ ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তির সন্ধানে আজ ঢাকায় বৈঠক

ফজলুল বারী ॥ পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তির সন্ধানে আজ আবার বৈঠক হচ্ছে ঢাকায়। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় এ শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে জনসংহতি সমিতি নেতাদের হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হবে। দ্বিতীয় দফা এই ঢাকা বৈঠকে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন জনসংহতির পক্ষে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। উল্লেখ্য, বিএনপি এ বৈঠকও বয়কট করছে। জাতীয় কমিটিতে তাদের দুই সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওহিদুল আলম আজকের বৈঠকেও উপস্থিত থাকছেন না। উল্লেখ্য, এ শান্তি বৈঠকের বিরোধিতা করে বিএনপি, জামায়াত এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের ২৫ থানায় সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। এ হরতাল এবং উত্তেজক প্রচারণাকে কেন্দ্র করে পুরো পার্বত্য এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার রাতে বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুসারে বেশি উত্তেজনাকর ছিল বান্দরবান শহরের অবস্থা। সেখানে একের পর এক গুজব ছড়ানো

হচ্ছিল। রাঙ্গামাটি শহরের ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা হরতালের সময় দোকানপাট খোলা রাখবেন। হরতাল সমর্থকপক্ষের সাথে এ নিয়ে দ্বন্দ্বের আশঙ্কা করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠকে গতকাল শান্তি উদ্যোগ পণ্ড করতে হরতাল আহ্বান এবং সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, আজ সকাল ১১ টায় পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে দুটো সামরিক হেলিকপ্টারে জনসংহতি নেতাদের ঢাকায় আনা হবে। জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোঃ ইসমাইল অতিথি গেরিলা নেতাদের আনতে সেখানে যাবেন। তেজগাঁও পুরনো বিমানবন্দরে সন্তু লারমাসহ অন্যদের স্বাগত জানাতে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ উপস্থিত থাকার কথা আছে। জনসংহতি নেতারা আগের দফার মতো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় থাকবেন। এ উপলক্ষে পুরো এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চাকমা শরণার্থীদের সাথে সাম্প্রতিক সফল আলোচনা, ২৮ মার্চ প্রথম দফায় ৫ হাজার শরণার্থী প্রত্যাবাসনের তারিখ ঘোষণা, এক মাসের মধ্যে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলো ভেঙ্গে দেবার ভারত সরকারের ঘোষণার পর এ দফা বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি জনসংহতি সমিতির সাথে তৃতীয় বৈঠক। এর আগে ২৫-২৭ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের দলটির একজন সদস্য এবার শুধু বদল হচ্ছেন। ইনি সুধাসিন্ধু খীসা। জনসংহতির কট্টরপন্থী নেতা হিসাবে খীসা পরিচিত। আগের ঢাকা বৈঠকে তাঁকে না আনার কথা উঠেছিল। আলোচক এবারে দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তিকে ইতিবাচক মনে করা হচ্ছে।

আজকের বৈঠক উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় কমিটির প্রস্তুতি বৈঠক দুপুরে এবং রাতে দু'দফায় অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের আগের বৈঠকে জনসংহতি নেতারা বিভিন্ন বিষয় নোট করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বলা হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের ফোরামে আলোচনা করে মতামত দেবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বণ্টন-মালিকানা, বাঙালী সেটেলার, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার– এসব বিষয়ে আগের বৈঠকে দু'পক্ষের স্পষ্ট মতবিরোধ ছিল। সরকারের পক্ষে তখন বলা হয়েছিল, জমির প্রকৃত মালিকদের জমি ফিরিয়ে দেয়া হবে। ভূমিহীনদের জমির ব্যবস্থা হবে। বাঙালী সেটেলার প্রত্যাহার প্রশ্নে বলা হয়েছিল, এটা সম্ভব নয়। এটা করতে গেলে সারা দেশে বসবাসকারী লক্ষাধিক পাহাড়ী আক্রমণের শিকার হতে

পারেন। সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, দেশের আর সব স্থানের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও সেনানিবাস থাকবে। বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অব্যাহত থাকলে নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করা হবে। সেনাবাহিনীকে আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে না। জাতিগত স্বীকৃতির বিষয়ে আগের বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটা করতে সংবিধান সংশোধন লাগবে–যা বর্তমান সরকারী দলের একার পক্ষে সম্ভব নয়। আগের বৈঠকের পর দুদুকছড়ি ফিরে গিয়ে সন্তু লারমা বলেছিলেন, সরকারের সাথে সব বিষয়ে সমঝোতা হয়নি। পাঁচ দফার প্রশ্নে তাঁরা আপোস করবেন না। ধারণা করা হচ্ছে, আজকের বৈঠক শুরুর পর সরকার পক্ষ আগের বৈঠকের আলোচনাক্রম সম্পর্কে জনসংহতি নেতাদের মতামত জানতে চাইবে। তারপর শুরু হবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপর্ব।

এদিকে ঢাকা শান্তি বৈঠকের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে পার্বত্য তিন জেলা জুড়ে এখন চরম উত্তেজনা চলছে। বিএনপি, জামায়াত, বাঙালী কৃষক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, বাঙালী ঐক্য পরিষদসহ কয়েকটি সংগঠন আজ বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করেছে সেখানে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩ই মার্চ ১৯৯৭

রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল

পার্বত্য আলোচনায় জনসংহতি দাবিতে অনড়

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে দ্বিতীয় দফা ঢাকা শান্তি বৈঠক শুরু হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকে শুরুর পর দু'দফা বিরতিসহ রাত পর্যন্ত এই বৈঠক চলে। জানা গেছে গতকাল আবার দফাওয়ারী আলোচনা হয়েছে। কোন ব্রিফিং দেয়া হয়নি সাংবাদিকদের উদ্দেশে। একটি সূত্র বলেছে, ভূমি বন্টন এবং বাঙালী সেটেলার প্রত্যাহার প্রশ্নে জনসংহতি নেতারা পুরনো অবস্থানে অনঢ় ছিলেন। শুক্রবার পর্যন্ত বৈঠক চলার সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় এই বৈঠক উপলক্ষে জনসংহতি নেতাদের পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। সমিতি নেতারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় রাতযাপন করবেন। এ উপলক্ষে রমনা থানা সংলগ্ন ওই এলাকা ঘিরে ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বৈঠকের বিরোধিতা করে বৃহত্তর পার্বত্য এলাকায় বিএনপি, জামায়াতের সমর্থনে সকাল-সন্ধ্যা শান্তিপূর্ণ হরতাল হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় কমিটিতে থাকলেও বিএনপি এই শান্তি বৈঠক বয়কট করে আসছে।

সন্তু লারমার নেতৃত্বে বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে অংশ নেন গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, সুধাসিন্ধু খীসা এবং ডাঃ বাবুল চাকমা। চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লার নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির পক্ষে অংশ নেন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার, সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, বীর বাহাদুর, দীপংকর তালুকদার, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, মহাপরিচালক এ এফ এম মোবাইদুল ইসলাম, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। চট্টগ্রামের মেয়র এবং বিভাগীয় কমিশনার সন্ধ্যায় ঢাকা পৌঁছে বৈঠকে যোগ দেন। এছাড়া বৈঠক উপলক্ষে ঢাকা এসেছেন যোগাযোগ কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ চাকমা, কৈশয়ং মারমা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আশীষ চাকমা, শক্তিপদ ত্রিপুরা। দুদুকছড়িতে অবস্থানরত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বার্থ দেখার জন্য যোগাযোগ কমিটির দুই সদস্য মথুরা লাল চাকমা ও মোহাম্মদ শফি এখন সেখানে আছেন। খাগড়াছড়িতে থেকে সরকার-শান্তিবাহিনী দু'পক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন হংসধ্বজ চাকমা এবং নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা। ঢাকার এই বৈঠকের বিরোধিতা করে বুধবার তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। রাঙামাটিতে একটি সরকারী অফিস ও ২টি দোকান ভাংচুর করা হয়েছে। ভীতি, উত্তেজনা থাকলেও বাদবাকি পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। বিএনপি, জামায়াত, পার্বত্য ঐক্যপরিষদ, বাঙালী ঐক্য পরিষদসহ একাধিক আঞ্চলিক সংগঠন এই হরতাল ডেকেছিল। রাঙামাটি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা মোহাম্মদ আলী জানান, হরতাল শেষে সর্বদলীয় পার্বত্য ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে শহরের বনরূপা মার্কেট চত্বরে এক সভা হয়েছে। এম শহীদুল্লাহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। নিজস্ব সংবাদদাতা জিতেন বড়ুয়া খাগড়াছড়ি থেকে জানান, হরতালে সেখানে সবকিছু বন্ধ ছিল। বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি পৃথক পৃথক মিছিল ও সভা করেছে। বান্দরবান থেকে মনিরুল ইসলাম জানান, হরতালে পথঘাট শূন্য থাকলেও বিকালে রাজবাড়ী মাঠে পাহাড়ী-বাঙালী যুবকদের প্রীতি ভলিবল খেলতে দেখা যায়। গোলমালের ভয়ে পাহাড়ীদের যাঁরা শহর সংলগ্ন গ্রামগুলো ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকে সন্ধ্যার পর বাড়িঘরে ফিরে আসেন। তিন জেলা শহরেই সতর্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩ই মার্চ ১৯৯৭

মিথ্যা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

পার্বত্য এলাকা থেকে অউপজাতীয়দের কোন অবস্থাতেই সরানো হবে না ॥ প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রাম, ১২ মার্চ (বাসস)।–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসা উপজাতীয় শরণার্থীদের সুষ্ঠু ও যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বুধবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। ২৮ মার্চ থেকে উপজাতীয় শরণার্থীরা ত্রিপুরার শিবির থেকে তাদের স্বদেশভূমিতে ফিরে আসতে শুরু করবে। তিনি বলেন, যথাযথভাবে উপজাতীয় শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হলে দেশ বিদেশে আমাদের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম সেনানিবাসে চট্টগ্রাম বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এক বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে তাঁর সরকারের শুরু করা শান্তি প্রক্রিয়া কেউ নস্যাত করতে না পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁর সরকার জাতীয় উন্নয়ন ও অখণ্ডতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে সকল সমস্যা সমাধানে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের পাহাড়ী জনগণকে নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ দেশে ও বহির্বিশ্বে স্বাগত জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, কতিপয় মহল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করছে।

পার্বত্য জেলাসমূহের অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে কোনমতে তাদের বসতবাড়ি থেকে সরানো হবে না–এ ব্যাপারে জোরালো আশ্বাস দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সরকার পার্বত্য জেলাসমূহের অউপজাতীয় বাসিন্দাদের সরাতে যাচ্ছে–কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের এই অপপ্রচার প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ ধরনের মিথ্যা কথা যারা রটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব.) কেএম শফিউল্লাহ এমপি, মেজর জেনারেল (অব.) আবদুস সালাম এমপি, কর্নেল (অব.) শওকত আলী এমপি, কর্নেল (অব.) ফারুক খান এমপি, ক্যাপ্টেন (অব.) তাজুল ইসলাম এমপি, এটিএম রফিকুল আনোয়ার এমপি, আবুল কাশেম মাস্টার এমপি, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এমএ সামাদ, প্রতিরক্ষা সচিব কাজী মঞ্জুর-ই-মাওলা, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর

রহমান, পুলিশের মহাপরিদর্শক এম আজিজুল হক এবং অন্যান্য উর্ধতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির এডিএম, রাঙ্গামাটির, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপারগণ এবং চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার বিভাগের সর্বশেষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা উপজাতীয় শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতিসহ পার্বত্য জেলাসমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি এতে প্রাধান্য পায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারসমূহ বহু জাতীয় ইস্যুর নিষ্পত্তি করতে না পারায় বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সব অনিষ্পন্ন সমস্যা সমাধানের অর্থবহ উদ্যোগ নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। তিনি বলেন, বিদেশীরা এখন বিনিয়োগের জন্য দেশে আসছে। এছাড়া রফতানি আয় বৃদ্ধি এবং বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য ইতিবাচক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, উন্নয়নের গতিধারা নির্বিঘ্ন রাখতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার খুব বেশি প্রয়োজন। তিনি কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন যাতে জাতির সুন্দর ভবিষ্যত স্বার্থান্বেষী মহলের দ্বারা নষ্ট না হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার দেশের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করে সফলভাবে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করেছে। আর এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উপজাতীয় ও অউপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য পার্বত্য জেলাসমূহের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের কোন ধরনের গাফিলতি হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি পার্বত্য জেলাসহ বিভাগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫ই মার্চ ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রামে কি আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে ভূমি লড়াই?

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আবার কি নতুন করে শুরু হচ্ছে ভূমির লড়াই? সর্বশেষ ঢাকা শান্তি বৈঠকের পর এ প্রশ্নটি এখন সেখানে মূল ইস্যু। ঢাকা বৈঠকের আগে তিন পাহাড়ী জেলায় প্রচার করা হয়েছিল সরকার যে কোন

মুহূর্তে সেখান থেকে সেটেলার বাঙালীদের বহিষ্কার শুরু করবে। বুধবার চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর একটি ঘোষণার পর অবশ্য এই পক্ষ চুপসে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেখান থেকে বাঙালী সেটেলারদের প্রত্যাহারের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর এই ঘোষণায় সেটেলার বাঙালীরা এখন আশ্বস্ত। আবার কোন কোন পাহাড়ী নেতৃত্ব এই আশ্বাসে নাখোশ। ঢাকা বৈঠকে সেটেলার ইস্যুই ছিল সমঝোতার বড় বাধা। অথচ জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা এখনও একটি সমঝোতার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার দুদুকছড়ি ফিরে গিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা পাহাড়ীদের সমাবেশে বলেছেন, সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা আমাদের দাবি আদায় করে ছাড়ব। বিভিন্ন সূত্র বলেছে, সেটেলার ইস্যুতে সন্তু লারমা এখন চাপের মধ্যে আছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত প্রীতি কুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন গ্রুপ ঠায় অপেক্ষায় আছেন–সন্তু কোন আপোস করেন কিনা তা দেখার জন্য। চলতি শান্তি উদ্যোগ যাঁদের পছন্দের নয়– তাঁরা প্রীতির রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থক না হলেও এখন তাঁকে নানা সহযোগিতা দিতে শুরু করেছেন বলে শোনা যায়। পার্বত্য এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারাও সচল। বুধবার ঢাকা বৈঠকের দিনে সেখানে ৩ জেলায় হরতাল পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মসূচীর বিরোধিতা করে হরতাল ডাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ বান্দরবানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সেখানে তাদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল। এর জের হিসাবে সেখানে পাহাড়ীদের ১০৭টি, বাঙালীদের ১০৯টি বসতবাড়ি ভস্মীভূত করা হয়। ৮ জন পুলিশসহ ৩০ জন আহত, ১৫ জন গ্রেফতার হয়েছিল ওই ঘটনায়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গত বছরের মতো এবারও দিনটির স্মরণে সভা-মিছিলের কর্মসূচী দিয়েছিল। শুক্রবার বিকালে সেখানে এর পাল্টা হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাঙালী ছাত্র-যুব পরিষদ নামের একটি সংগঠন এই হরতাল ডেকেছে।

বৃহস্পতিবার সমাপ্ত ঢাকা বৈঠকে সরকারের পক্ষে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন– সেটেলার ইস্যুতে এটাই সরকারের নীতি। সরকার পক্ষ বলেছে, প্রস্তাবিত স্থানীয় পরিষদ আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি হস্তান্তরের বিষয় দেখবে। ওই পরিষদে যেহেতু পাহাড়ীরা সংখ্যাগুরু থাকবেন সেহেতু এ ব্যাপারে তাদের মতামতই চূড়ান্ত হবে। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য এলাকার স্থানীয় পরিষদের জাতীয় সংসদের সমান মর্যাদাদানের দাবি তুলেছিল। তাদের দাবি যুক্তির কাছে টেকেনি। সরকার পক্ষ বলেছে, জাতীয় সংসদ একক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। এক দেশে এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। সেনাবাহিনীর বিষয়ে আবারও বলা হয়, তারা সেখানে ক্যান্টনমেন্টে থাকবে। পরিস্থিতির উন্নতিসাপেক্ষে ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করা হবে। জনসংহতি

পরবর্তী বৈঠক মে মাসে টেনে নিতে চেয়েছে। সূত্র বলেছে, তারাও যে নানা চাপের মুখে এটা তাদের আচরণে-কথাবার্তায় স্পষ্ট ছিল। সরকার জুন মাসের আগে একটি সমঝোতা চুক্তি চায়। ৫ জুলাই স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ ফুরাবার আগেই সমাধান চায়। সেজন্য সরকারী উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল বৈঠকে তাদের রাজি করানো হয়। উল্লেখ্য, পাহাড়ীদের তিন প্রকাশ্য সংগঠন পার্বত্য গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন সম্প্রতি ঢাকায় ঘোষণা দিয়ে বলেছে– যত চুক্তি স্বাক্ষর হোক, স্বায়ত্তশাসন, জাতিগত স্বীকৃতি, সেটেলার বাঙালী এবং সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ছাড়া সেখানে শান্তি আসবে না। এই সংগঠনগুলোও এখন সন্তু লারমার বিপক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করেছে ধারণা করা হয়। বান্দরবানের উত্তেজনা তাদেরকে আরও প্রকাশ্য করবে ধারণা করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭ই মার্চ ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাহানি চাই না

নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে গত বছরের ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদত্ত জনগণের রায় অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে প্রতিবেশী ভারতের সাথে সমঝোতা ও সম্পর্কোন্নয়নের পথ অনুসরণ করে গঙ্গার পানি চুক্তিসহ অন্যান্য অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসার উদ্যোগ গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাও এরূপ একটি দীর্ঘকাল যাবত অমীমাংসিত সমস্যা। শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে একটা স্থায়ী সমাধানে উপনীত হবার অর্থবহ উদ্যোগ বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগে আর কোন সরকারই নেয়নি। সামরিক সমাধান যে প্রকৃত সমাধান হতে পারে না এটা একুশ বছরের অভিজ্ঞতা হলেও সেটাকে গ্রাহ্য করা হয়নি। প্রতিবেশী ভারতের সাথে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটায় বর্তমানে রাজনৈতিক সমাধানের, অর্থাৎ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যাটি সমাধানের অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের আন্তরিকতা উপজাতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। দু'বার তাঁরা ঢাকায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে গেছেন। প্রথমবারের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গত জানুয়ারি মাসে। জনসংহতি সমিতির প্রধান দাবি ছিল পার্বত্য এলাকার স্থানীয় পরিষদকে জাতীয় সংসদের সমান

মর্যাদাদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি হস্তান্তর এবং অ-উপজাতীয় অর্থাৎ বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার। একটি স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড রাষ্ট্র ও তার সরকারের পক্ষে এরকম দাবি মেনে নেয়া যে সম্ভব নয় তা সম্ভবত জনসংহতি নেতৃবৃন্দও বুঝতে পারেন। তাই প্রথমবারের বৈঠকের পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে যখন বলা হয় যে, মাত্র দু'টি প্রশ্ন–পার্বত্য অঞ্চলের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহারের প্রশ্নটি ছাড়া বাকি সকল প্রশ্নে দু'পক্ষের অবস্থানের ব্যবধান কমে গেছে, তখন কেউ বিস্মিত হয়নি। বরং সবাই আশা করছিল যে, ১২ মার্চের বৈঠকে ঐ দু'টি প্রশ্নেও সমঝোতা হয়ে যাবে। কিন্তু সমঝোতা হয়নি।

জনসংহতি সমিতির দাবিগুলো সম্পর্কে সরকার পক্ষের বক্তব্য পরিষ্কার। জাতীয় সংসদ সমগ্র দেশের একক সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বা অন্য কোন অঞ্চল বা জেলার পরিষদ জাতীয় সংসদের সমমর্যাদা পেতে পারে না। এক দেশে ওরকম দু'টি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান থাকা অসম্ভব। সেনাবাহিনী দেশের যেখানেই থাকা প্রয়োজন সেখানেই থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্যান্টনমেন্টেও থাকবে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং সহিংসতা ও নাশকতামূলক তৎপরতার অবসান ঘটলে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে অবস্থিত ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করা হবে। ভূমি সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হবে সেটা দেখবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রস্তাবিত স্থানীয় পরিষদ–যে পরিষদে উপজাতীয় প্রতিনিধিরাই হবেন সংখ্যাগুরু। আর অউপজাতীয় বা বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহারের প্রশ্নে সরকার পক্ষের বক্তব্য কি ছিল তা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই বলে দিয়েছেন চট্টগ্রামে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহারের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ অবস্থায় কোন সমঝোতা বা চুক্তি ছাড়া দ্বিতীয় বৈঠকও শেষ হয়েছে। তবে এতে শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে একেবারে হতাশ হবার কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না, যেহেতু দ্বিতীয় বৈঠকের পরও দেখা যাচ্ছে উভয় পক্ষের মতদ্বৈধতা সীমিত রয়েছে পূর্বোক্ত দু'টি প্রশ্নেই–ভূমি ও বসতি স্থাপনকারীদের বিষয়ে। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) দুদুকছড়িতে জনতার উদ্দেশে বলেছেন, সমাধান নিয়ে নিরাশ হবার কারণ নেই। অনেক বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে...ভূমির বিষয়েও বেশকিছু অগ্রগতি হয়েছে। তার মানে, মতদ্বৈধতা শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ে–বাঙালী বসতি স্থাপনকারী প্রত্যাহারের প্রশ্নে এসে ঠেকেছে। সন্তু লারমা বিশ্বাস করেন যে, পরবর্তী বৈঠকে সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু এ আশাবাদ কতটুকু সত্য প্রমাণিত হবে তা নির্ভর করছে আগামী দিনগুলোর ওপর। দেশের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে যাক, কোন সমস্যারই সমাধান না হোক, রক্তপাত-হানাহানি চলতেই থাকুক পার্বত্য চট্টগ্রামে, পাহাড়ী-অপাহাড়ী জনগণের মধ্যে বিভেদের অনতিক্রম্য পাহাড় সৃষ্টি হোক–এসব যাদের কাম্য তারা অতি সক্রিয়। জনসংহতি নেতারা যেদিন ঢাকার সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন সেই ১২ মার্চই তারা হরতাল পালন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায়। অজুহাত ছিল সরকার বাঙালীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে উপজাতীয়দের তোষণ করছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে, বাঙালী বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করছে। প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম ঘোষণা হরতাল আহ্বানকারীদের নেতৃত্বের মুখে চপেটাঘাত করায় তারা এখন নিশ্চুপ হলেও সরব হয়ে উঠেছে উপজাতীয়দের তিন সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন। তারা যেন বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির বিপরীত মেরুর সহযোগী হিসাবে জনসংহতি তথা সন্তু লারমার বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদান ও কর্মপন্থা নিচ্ছে উপরোক্তদের সাথে তাল মিলিয়ে। এর পরিণতি দাঁড়াতে পারে পাহাড়ী-অপাহাড়ী দাঙ্গা, হানাহানি এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা নস্যাত করে দেয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামে যাঁরা শান্তি চান, পাহাড়ী-অপাহাড়ী নির্বিশেষে সকলেরই উচিত আজ সম্মিলিতভাবে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সরকারেরও উচিত সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টির ও শান্তি বিঘ্নিত করার যে কোন প্রয়াসকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং এদের আসল উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর সামনে ফাঁস করে দেয়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৪শে মার্চ ১৯৯৭

প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর

প্রথম দফায় পৌনে ৭ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রত্যাবাসন প্রশ্নে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ তৎপরতায় শরণার্থী নেতারা খুশি। সেজন্য প্রথম দফায় ৫ হাজার শরণার্থী দেশে ফেরার কথা থাকলেও আসছেন প্রায় পৌনে ৭ হাজার। ১৫শ' ৭২ পরিবারের সদস্যরা ফিরছেন প্রথম দফায়। এ ব্যাপারে একটি প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষরের পর দেশে ফিরে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল জনকণ্ঠকে

বলেছেন, শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমাই তাকে বলেছেন প্রত্যাবাসন উদ্যোগ প্রশ্নে তাদের এই সন্তুষ্টির কথা।

ত্রিপুরায় ১৯-২০ মার্চের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, প্রথম দফায় ৬ হাজার ৭শ' ৪০ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসবেন। ২৮ মার্চ প্রথম দিনে রামগড় ট্রানজিট সীমান্ত পথে দেশে ফিরবে ৬৩টি শরণার্থী পরিবার। সেদিন সকাল ১০টায় তাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার দু'জন মন্ত্রীসহ কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার কথা আছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থাকবেন সেই অনুষ্ঠানে। চীপ হুইপ সরকারের পক্ষে শরণার্থীদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন। এ উপলক্ষে রামগড় এবং তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্টে অভ্যর্থনা ক্যাম্প, অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ করা হচ্ছে, দেশে ফেরার সাথে সাথে সরকারি বিশেষ মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা শরণার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। শরণার্থীদের জন্য ঘোষিত আর্থিক সুবিধাদির দাবি মেটাতে দুই সীমান্ত পয়েন্টে সোনালী ব্যাংকের অস্থায়ী শাখা স্থাপন করা হচ্ছে। রেডক্রিসেন্ট শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করবে। আর শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও বাড়ি পৌঁছার গাড়ির ব্যবস্থা করবে পুলিশ বিভাগ। ত্রিপুরার অমরপুরে বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশের জেলা প্রশাসক পর্যায়ের বৈঠকে প্রথম দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হয়েছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি শনিবার জনকণ্ঠকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, প্রত্যাবাসন বিষয়ে আলোচনার জন্য মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি দল ১৯ মার্চ ত্রিপুরার অমরপুরে গিয়েছিল। শুক্রবার রাত ১২টায় দলটি খাগড়াছড়ি ফিরেছে।

উল্লেখ্য, ৯ হাজার ২৬৭ পরিবারের ৪৯ হাজার ৮১২ জন সদস্য ত্রিপুরায় ৬টি শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছেন। জেলা প্রশাসক জানান, প্রথম দিনে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান থাকায় কমসংখ্যক শরণার্থী আসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রামগড় সীমান্ত দিয়ে শরণার্থীরা আসবেন ২৮, ২৯, ৩০ এই তিনদিন। এরপর এপ্রিলের ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত ৭ দিনে প্রথম দফায় প্রত্যাবাসনকারীদের তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

প্রত্যাবাসন প্রস্তুতির বিষয়ে শনিবার খাগড়াছড়িতে কর্মকর্তা পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়। জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ আজ ২৪ মার্চ সেখানে প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি দেখতে যাবেন। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক জনকণ্ঠকে বলেছেন, যদ্দুর জানা গেছে শরণার্থীদের বাড়িঘর এখন খালি আছে। তবে তারা ফেরার পর এসব বিষয় শনাক্ত সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার

প্রতিপক্ষের সাথে শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প সম্পর্কিত রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর কথাবার্তা হয়নি, শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দেখতে ২৫ এপ্রিল ৫ সদস্যের একটি ভারতীয় দলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসার কথা আছে। ওই সময়ে বা তার আগেপরে উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির একটি দলও প্রত্যাবাসনকারীদের পুনর্বাসন দেখতে আসবে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে শরণার্থীরা ব্যাপক সংখ্যায় দেশ ছেড়ে ত্রিপুরায় গিয়ে ওঠেন।

বিএনপি সরকারের আমলে ১ হাজার ২৭ পরিবারের ৫ হাজার ১৮৬ শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু পুনর্বাসন যথাযথ না হবার অভিযোগে সেই প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৮শে মার্চ ১৯৯৭
চাকমা প্রত্যাবাসন আজ শুরু ॥
প্রস্তুতি সম্পন্ন

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: ত্রিপুরা থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের আজ শুক্রবার স্বদেশপ্রত্যাবর্তন শুরু হচ্ছে। এ উপলক্ষে ফেনী নদীর ওপারে-এপারে, ভারত ও বাংলাদেশ উভয় পক্ষ প্রস্তুত। দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে ফেনী নদীর ওপর ২২৫ ফুট দীর্ঘ একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। অনেক শরণার্থী এক যুগের বেশি সময় পর এই সেতু পথে ফিরে আসবেন স্বপ্নের স্বদেশে। ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদারসহ নেতৃবৃন্দ শরণার্থীদের বিদায় জানাবেন। বাংলাদেশের পক্ষে তাদের বরণ করে নেবেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। শরণার্থী প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি জেলা জুড়ে নানামুখী মিশ্র প্রতিক্রিয়া চলছে। প্রশাসনিক পক্ষে আছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। আবার প্রক্রিয়াটি ভন্ডুল করার পুরনো তৎপরতাও আছে। শান্তিবাহিনীকে চাঁদা দেবার কথিত অভিযোগে রামগড়ের নাকাপা এলাকায় পাহাড়ী পরিবারের সদস্যদের গ্রেফতার, মারধর করাতে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ওই এলাকায় বেশ কিছু শরণার্থী পরিবারের প্রত্যাবাসনের কথা আছে। এই অবস্থায় সেখানে এখন চলছে ভীতিকর অবস্থা। শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে বাঙালীদের উচ্ছেদ করা হবে এমন মাইকিং করা হয়েছে রামগড় এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এলাকার পাহাড়ীরা অভিযোগ করে বলেন, ১৯৯৪ সালে তারা ত্রিপুরা থেকে ফিরে এসেছিলেন।

এখন কতিপয় বাঙালী তাদের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীকে চাঁদা দেবার অভিযোগ করাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাদের ৪ জনকে রবিবার ধরে নিয়ে গেছে। আটককৃত মনিন্দ্র ত্রিপুরা, পূর্ণরোয়ার ত্রিপুরা, ভদ্রমোহন ত্রিপুরা, দরাকুপা ত্রিপুরার মা, স্বজনরা আহাজারির মাধ্যমে বলেন, আমরা নিজের দেশে থাকতে চাই। আমাদের এখানে থাকতে দিন। মেরাকুমার ত্রিপুরা নামের অপর একজন তাঁর সারা শরীরে রড দিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখান। প্রত্যাবাসন শুরুর শুভ মুহূর্তে এমন উস্কানিমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসক সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালেও একবার শরণার্থী প্রত্যাবাসন ভন্ডুল করা হয়েছিল।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন উপলক্ষে প্রায় ৪০ কোটি টাকার মতো লাগতে পারে বলে জানা গেছে। স্বদেশ ফেরা উপলক্ষে রামগড়ের ওপারের সাব্রুমের মন্দিরঘাট এলাকায় বেশ কিছু তাঁবু, প্যান্ডেল নির্মাণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সীমান্ত পেরিয়ে সেখানে গেলে প্রস্তুতি তদারকির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসবি বিশ্বাস জনকণ্ঠকে বলেন, আপনাদের লোকজনকে সম্মানের সাথে ফেরত পাঠানোর সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। শরণার্থীরা যাবার আগে তাদের জন্য সেখানে বিদায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। বললেন–ভিডিও, ক্যামেরা সব কিছুই থাকবে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকসহ কর্মকর্তারাও কাঠের সেতু পেরিয়ে সেখানকার প্রস্তুতি দেখতে যান। প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এপারে তিনটি তোরণ, অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। রামগড়ে বিদ্যুত সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দুটো জেনারেটর এবং জরুরী প্রয়োজনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি এসটিডি টেলিফোনের। শরণার্থীরা আজ সেখানে দুপুরের খাবার খাবেন। তবে আপাতত তাদের সবাইকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এটি শরণার্থী প্রত্যাবাসনের তৃতীয় দফা প্রক্রিয়া। এর আগে ১৯৯৪ সালে দু'দফায় (ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে) ১০২৭ পরিবারের ৫১৮৬ জনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সেই প্রক্রিয়াটি নানা অভিযোগে পণ্ড হয়ে যায়। এর তিন বছর পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ'র দু'দফায় আগরতলা বৈঠকের পর প্রত্যাবাসন শুরুর নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।

প্রত্যাবাসন উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গত কয়েকদিন প্রায় বিরতিহীন পরিশ্রমী কাজ করেছেন। মঙ্গলবার ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তারাও রামগড়ে প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি দেখেছেন। উভয়পক্ষের কর্মকর্তারা এরপর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসের বৈঠকে প্রথম দশ দিনে যারা আসবেন এমন

১২৬৫ পরিবারের ৬৭২০ জনের তালিকায় সর্বসম্মত স্বাক্ষর করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরকে রাজেশ্বর রাও'র নেতৃত্বে দলটিতে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এসএম চর্তুবেদী, অমর পুরের এসডিও শেখর আগরওয়ালা, সহকারী কালেক্টর এ, কিন্দাল এবং সাব্রুমের এসডিও এমএ দে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের যে দলটি ১৯ থেকে ২১ মার্চ ত্রিপুরা সফর করেন তার ফিরতি সফরেই তারা এসেছিলেন। ত্রিপুরার দলটি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেনের সাথে দেখা করেন। চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি ফিরে তারা ২৬ মার্চ স্থানীয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ উপভোগ করে দেশে ফিরে গেছেন।

প্রত্যাবাসনকারী প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা অভ্যর্থনা ক্যাম্পে তাদের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দেয়া শরণার্থী পরিচয়পত্র সমর্পণের পর সেখানেই, তাদের একটি পরিবার কার্ড এবং পরিচয়পত্র দেয়া হবে। এই পরিবার কার্ডে সংযুক্ত করা হবে তাদের সমুদয় তথ্যাদি, নগদ অর্থ সাহায্য প্রদানের প্রমাণ এবং রঙ্গিন ফটোগ্রাফ। টাকা দেয়া হবে সেখানে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত সোনালী ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে। উল্লেখ্য, প্রতিটি শরণার্থী পরিবার ফেরার সময়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পরিশোধিত বকেয়া ৪ থেকে ১০ হাজার রুপী পর্যন্ত সাথে নিয়ে আসছেন। সীমান্তের সেই ব্যাংক শাখাতেই তাদের ওই রুপীর বিনিময়ে প্রাপ্য বাংলাদেশী টাকা বুঝিয়ে দেয়া হবে। নিরাপত্তার কারণে তারা নগদ টাকা বহন করতে না চাইলে সেখানেই একাউন্ট খুলে তা জমা রাখতে পারবেন। স্বদেশ ফেরার পরই একটি মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন শরণার্থীদের।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০শে মার্চ ১৯৯৭

ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে দেশে ফেরার প্রতিযোগিতা ॥ দ্বিতীয় দিনে ফিরেছে ৯৯ পরিবারের ৪২০ জন

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া, মাব্রুম (ত্রিপুরা) থেকে ফিরে: ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলোতে এখন দেশে ফেরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা শনিবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, কেউই আর এখানে থাকতে চাইছে না। পারলে এক দিনেই সবাই চলে যায়। প্রথম দিনে প্রত্যাবাসন উপলক্ষে উৎসবমুখর আমেজের প্রতিক্রিয়ায় তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে শিবিরে শিবিরে। কিন্তু তালিকাভুক্তি ছাড়া কাউকে ফিরতে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না দুই সরকার এবং শরণার্থী কল্যাণ সমিতির মধ্যে

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির কারণে। শনিবার দ্বিতীয় দিনের প্রত্যাবাসন কাজ হয়েছে প্রায় ঝড়ের গতিতে। সকাল পৌনে ১০টায় শুরু হয়ে তা বিকাল ৩টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে ৯৯ পরিবারের ৪২০ জন দেশে ফিরেছেন। আগের ঘোষণা অনুসারে ৯৮ পরিবারের ফেরার কথা ছিল। হিসাবের বাইরে একটি পরিবার ফিরল কিভাবে তা তদন্তে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল স্বয়ং সেখানে চলে যান। পরে দেখা যায় তালিকা ঠিকই আছে। হিসাবের ভুলে ৯৯-এর জায়গায় ৯৮ লেখা ছিল। আজ রবিবার তৃতীয় দিনে ১০৭ পরিবারের ৫০১ জনের ফেরার কথা। এরপর আগামীকাল ৩১ মার্চ থেকে তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবাসন শুরু হবে। পহেলা এপ্রিল সেই সীমান্ত পথে দেশে ফিরছেন শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক অক্ষমান চাকমা সপরিবারে। দিঘিনালা থানার বোয়ালখালী মৌজার তামাবুছড়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। নতুন দফা প্রত্যাবাসনের প্রথম পর্যায়েই তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।

মাক্রুমের মহকুমা প্রশাসক এম এ কে শনিবার দুপুরে জনকণ্ঠকে বলেন, ভোর হবার আগেই শরণার্থীরা প্রত্যাবাসন শুরুর জন্য তাগাদা শুরু করেন। আগে নানা ভয়ের কথা বলে যারা যেতে চাইতেন না তারাই এখন তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব। আরেক কর্মকর্তা বললেন, প্রত্যাবাসন চলাকালে তালিকাভুক্ত নন–এমন অনেকেই চুপিসারে রামগড়ে গিয়ে অভ্যর্থনা ব্যবস্থাপনা দেখে আসছেন। মন্দিরঘাট এলাকার এক গ্রামবাসী জানান, শরণার্থী হবার কারণে আগে যাদের ম্রিয়মাণ, মাথা নিচু করে চলতে দেখেছি তারাই এখন প্রাণবন্ত, হাসিখুশি মানুষ। আর এখানে থাকতে হবে না শিবিরের জীবনে, সেজন্য তারা উৎফুল্ল। প্রত্যাবাসনকে কেন্দ্র করে মন্দিরঘাট এলাকার চোরাই ব্রোকাররা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ১শ' টাকার বিনিময়ে রামগড়ে অভ্যর্থনা ক্যাম্পে যেখানে ১শ' ২০ টাকা দেয়া হচ্ছে সেখানে ব্রোকাররা ভারতীয় ৮০-৮৫ টাকায় বাংলাদেশী এক শ' টাকা বুঝিয়ে দিচ্ছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক বিষয়টি কালই মাক্রুম প্রশাসনকে অবহিত করেছেন। শনিবার রামগড় অভ্যর্থনা ক্যাম্পে স্থাপিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় প্রত্যাগত শরণার্থীরা ৪৭টি একাউন্ট খুলে ৫ লাখ ২৯ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। ভারতীয় ৪০১৬ টাকা জমার বিপরীতে শরণার্থীদের বাংলাদেশী ৪৯৯৫ টাকার দাবি মেটানো হয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষ কাল প্রত্যাগতদের মধ্যে ৩৫৬৪ কেজি ডাল, ১৭৮২ কেজি লবণ বিতরণ করেছে পরিবার পিছু ৯ মাসের রেশন হিসাবে। এ ছাড়া পরিবার পিছু ২৫ কেজি চাল দেয়া হয়েছে প্রাথমিকভাবে। প্রত্যাগতদের বেশির ভাগ ভগ্নস্বাস্থ্যের, দীর্ঘ শিবিরবাসে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত। অভ্যর্থনা ক্যাম্পে

স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নূর মোহাম্মদ জনকণ্ঠকে বলেছেন, শনিবার তাঁরা মোট ২৩ জনকে চিকিৎসা দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৮ জন মহিলা গনোরিয়া, এসটিডিসহ বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তির চেষ্টা হয়েছিল। তারা রাজি না হওয়ায় রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। শনিবার সকালে প্রথম ফেরেন রামগড়ের নাকাপা এলাকার চোথাই মগ। গত দু'দিন সেনাবাহিনীর গুইমারা ব্রিগেডের উদ্যোগে শরণার্থীদের দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয়েছে।

মাক্রুম বাজারে গতকাল শনিবার দুপুরে শরণার্থী যাদের সাথেই কথা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার অপেক্ষার কথা। এঁরা কেউ বাজার করতে, কেউ সিনেমা দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন। শরণার্থীরা ১৯৯২-৯৪ সময়ের বকেয়া রেশনের মূল্য বাবদ নগদ টাকা পেয়েছেন। ভারতীয় মুদ্রায় ডাল ১৪ টাকা ৫০ পয়সা, তেল ৩২ টাকা কেজি মূল্যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকে ৬৯৪ টাকা ৪০ পয়সা, অপ্রাপ্তরা অর্ধেক মূল্য পেয়েছেন। দেশে ফেরার আগে এঁরা এই টাকায় কেনাকাটা করছেন। অনেকেই কিনছেন নতুন সাইকেল। বাজারের এক দোকানী বললেন, দিনে গড়ে ৫০টির মতো সাইকেল তাঁরা বিক্রি করছেন শরণার্থীদের কাছে। এক শরণার্থী তরুণ মা-বাবার সাথে থাকে কাঁঠালছড়ি শিবিরে। আবার সীমান্ত পেরিয়ে এসে দেশের এক স্কুলে নবম শ্রেণীতেও পড়ে। শরণার্থীরা ফিরে আসছেন দেশে। বাবা, মা, ভাই, বোনদের নাম এখনও প্রত্যাবাসন তালিকায় না ওঠাতে সে অস্থির।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩০শে মার্চ ১৯৯৭
সম্পাদকীয়

প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সফল হোক

আবার শুরু হয়েছে একটি শুভ, কল্যাণকর প্রক্রিয়া। শান্তির প্রক্রিয়া। ত্রিপুরা থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছে গতকাল। এ উপলক্ষে প্রস্তুতি ছিল আগেরই। ফেনী নদীর এপারে-ওপারে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়পক্ষই প্রস্তুতি নিয়েছে যথাযথভাবে। ঐ নদীর ওপর তৈরি করা হয়েছে ২শ' ২৫ ফুট দীর্ঘ কাঠের একটি সেতু। এই সেতু দিয়ে ফিরে আসতে শুরু করেছেন উপজাতীয় শরণার্থীরা। ফিরে আসছেন তাঁরা, যাঁরা গিয়েছিলেন এক যুগেরও বেশি আগে। ফিরে আসছেন শরণার্থীরা তাঁদের স্বপ্নের স্বদেশে। প্রত্যাবাসনের প্রথম দিন দেশে ফিরেছে ৬৪টি পরিবারের ২শ' ৭৮ শরণার্থী। শুক্রবার শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া তিন দিন চলার কথা। এরপর শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে পানছড়ি সীমান্ত দিয়ে এবং চলবে

আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত। শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া এটি অবশ্য প্রথম নয়। এটি তৃতীয় দফা প্রক্রিয়া। এর আগে ১৯৯৪ সালে দু'দফায় (ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে) ১ হাজার ২৭ পরিবারের ৫ হাজার ১শ' ৮৬ জন ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হতে পারেনি। নানান অভিযোগে তা পণ্ড হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর দু'দফায় আগরতলা বৈঠকের পর প্রত্যাবাসন শুরু করার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বেশ জোরালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সাম্প্রতিককালে। সেখানে শান্তি যে পুনর্প্রতিষ্ঠিত হবেই সে ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলার অপেক্ষা রাখে না সেই লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজও করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সন্ধানে ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এই প্রথম জনসংহতি সমিতির নেতারা ঢাকায় এসে বৈঠকে বসেছেন। এ সবই করা হয়েছে উল্লিখিত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই। কিন্তু সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক তা কোন কোন মহল যে চায় না, বার বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা অশান্তি জিইয়ে রাখতে চায়। হানাহানি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য এ এলাকাতেও কেউ কেউ তৎপর। তারা চায় না সেখানে উপজাতীয় ও অউপজাতীয় লোকদের মধ্যে সোহার্দ্য সৃষ্টি হোক। তারা গুজব ছড়ায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করে, শান্তি প্রক্রিয়াকে বানচাল করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বসেছে। শান্তির জয় সূচিত হতে চলেছে। ফিরে আসতে শুরু করেছে চাকমা শরণার্থীরা। শুরু হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের কাজ। এই কাজটি যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়, কোন প্রকার শৈথিল্য বা গাফিলতি সৃষ্টি না হয় এতে, সেটি সব সময় নিশ্চিত করতে হবে। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, উপজাতীয়দের পুনর্বাসনে কোন ধরনের গাফিলতি হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পার্বত্য জেলাগুলোর অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের কোনমতেই তাদের বসতবাড়ি থেকে সরানো হবে না–এ ব্যাপারে জোরালো আশ্বাস দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, এবারে নতুন করে শুরু হওয়া এই শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে পাঁচ হাজার শরণার্থী দেশে ফিরে আসবে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্প্রতি দৈনিক জনকণ্ঠে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাতকারে চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আশা প্রকাশ করে বলেছেন, সম্পূর্ণ শরণার্থী প্রত্যাবাসনে সর্বোচ্চ তিন মাস সময় লাগতে পারে। তিনি বলেছেন,

বর্ষা শুরুর আগেই আমাদের সকল শরণার্থী ভাইকে আমরা দেশে ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা মনে করি, গত ২৮ মার্চ যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সে প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতায় পৌঁছবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি জিইয়ে রাখার ব্যাপারে যারা বা যেসব মহল সেখানে তৎপর, তাদের অপচেষ্টা স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে পারলে এই প্রক্রিয়াটিকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমরা মনে করি। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সেই দিকেই দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে ঝুলে থাকা এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান হোক–দেশবাসী সেটাই চায়। এতেই নিহিত রয়েছে ঐ এলাকায় স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা। এতেই নিহিত রয়েছে দেশের স্বার্থ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৫ই এপ্রিল ১৯৯৭
শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নজরদারির জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পাহাড়ী শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নজরদারির জন্য একটি শক্তিশালী টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে। শুক্রবার রাতে সরকারী একটি সূত্র বলেছে, টাস্কফোর্সে স্থানীয় সাংসদ, পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলা-থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

পুনর্বাসন উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলায় যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেগুলোর পরিপূরক হিসাবে টাস্কফোর্স উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। এই সূত্র বলেছে, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী সাধারণ সম্পাদক অক্ষয় মণি চাকমাকেও এই টাস্কফোর্সে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা আছে।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র বলেছে, শরণার্থীদের স্বদেশ ফেরার পর তাদের জমি সংক্রান্ত সমস্যাবলী শনাক্ত শুরু হয়েছে। দীঘিনালা থানার বড় মেরুং মৌজার ভৈরবমুখ এলাকার পুতুল বিকাশ চাকমা সাত সদস্যের পরিবারসহ দেশে ফিরে দেখেন তাঁর বাড়ি-জমিতে বসবাস করছে ৩০টি হিন্দু পরিবার। এরা নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে হাতিয়া থেকে গিয়ে সেখানে বসবাস করছিল। এমন একটি পরিবারের কর্তা পরেশচন্দ্র নাথ শুক্রবার সেখানে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে দু'টি ঘর সরিয়ে ফেলেন। তিনি জানান, তাঁরা ইতোমধ্যে তাঁদের একটি মন্দির ভেঙ্গে চাকমা পরিবারটিকে থাকতে দিয়েছেন। পরেশচন্দ্র

জানান, তাঁরা থাকার জমি পেলেই সেখান থেকে চলে যাবেন। কালাচান কারবারী পাড়ার কামিনি চাকমার জমির পাশে জনৈক বাঙালী মালিকের ব্রিক ফিল্ড গড়ে ওঠায় ওই এলাকাটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের সাথে যোগাযোগ করা হলে শুক্রবার রাতে তিনি জনকণ্ঠকে জানান, যেখানে যে সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে তা তারা সাথে সাথেই মিটিয়ে দিচ্ছেন। কয়েকটি শরণার্থী পরিবারের পরিত্যক্ত বাড়িতে আনসার ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৭ই এপ্রিল ১৯৯৭
চাকমা শরণার্থী ॥ প্রথম পর্বের প্রত্যাবর্তন শেষ হচ্ছে আজ

জিতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে : আজ আপাতত শেষ হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে পাহাড়ী শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্ব। ২৮ মার্চ রামগড় সীমান্ত পথে যে অচলায়তন খুলে গিয়েছিল আজ তা আবার বন্ধ হয়ে যাবে তবলছড়ির সীমান্তে। কাল পর্যন্ত এ দফায় দেশে ফিরেছেন ১১ শত পরিবারের ৬ হাজার ৩শ' ৯৫ জন। আজ থেকে দিনে ১৬৫ পরিবারের ৩শ' ২৫ জন ফিরে আসবেন দেশে। আগামী এক মাসের মধ্যে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির একটি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দেখতে আসার কথা আছে। গতমাসের প্রথমদিনে আগরতলা বৈঠকে সরকারের সাথে শরণার্থী নেতাদের এমন কথাবার্তাই হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, একমাসের মধ্যে দলটি আসার বিষয়টি এখন নিশ্চিত নয়। শরণার্থীদের প্রধান নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা ক'দিন আগে ওপেন হার্ট সার্জারির জন্য টাকুমবাড়ির শিবির থেকে মাদ্রাজ গেছেন। শরণার্থীদের আরেক নেতা প্রভাকর চাকমা জনকণ্ঠকে বলেছেন, উপেন্দ্র সুস্থ হয়ে শিবিরে ফেরার পরেই প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশে আসার তারিখ ঠিক হবে।

নয় দিনে দেশে ফেরা পরিবারগুলোকে ইতোমধ্যে গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি হিসাবে দেয়া হয়েছে ১ কোটি ৫৮ লাখ ১০ হাজার টাকা। এছাড়া দেশে ফেরার পর প্রত্যেককে একবেলা খাবারের জন্য ১১ লাখ ৬ হাজার ৪ শত ২৫ টাকা, পরিবার পিছু একসপ্তাহের জন্য ২৫ কেজি হিসাবে ২৭ হাজার ৫শ' কেজি চাল, ৯ মাসের রেশন হিসাবে ১৯ হাজার ৮শ' লিটার তেল, ১৯ হাজার ৮শ' কেজি লবণ, ৩৯ হাজার ৬শ' কেজি ডাল বিতরণ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৩শে এপ্রিল ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি প্রশ্নে ৩০ এপ্রিলের বৈঠক হচ্ছে না ॥ জনসংহতি ১১ মে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে

ফজলুল বারী ॥ পাহাড়ে শান্তির বিষয়ে ৩০ এপ্রিলের বৈঠকটি হচ্ছে না। শান্তিবাহিনী এ ক্ষেত্রে এক তরফাভাবে ১১ মে পরবর্তী বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছে। গত ১৩ মার্চ ঢাকায় সরকার-শান্তিবাহিনীর মধ্যে সর্বশেষ আলোচনায় উভয় পক্ষ ৩০ এপ্রিল পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক করেছিল। সরকারের তরফ থেকে সে রকম প্রাকপ্রস্তুতিও নেয়া হচ্ছিল। গত ১২ এপ্রিল শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক শাখা জনসংহতি সমিতির কাছে সরকারের একটি চিঠি পাঠানো হয় যোগাযোগ কমিটির নেতা হংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে। বৈঠকের স্থান সম্পর্কে চিঠিতে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ২১ এপ্রিল পাঠানো জবাবে বলেছে, 'অনিবার্যকারণ'বশত ৩০ এপ্রিল বৈঠক করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার শাখার পরিচালক ঊষাতন তালুকদার স্বাক্ষর করেছেন চিঠিতে। তারা আরও বলেছে, ঢাকায় বৈঠকে বসতে আগ্রহের কথা। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শান্তিবাহিনীর সাথে অনুষ্ঠিত তিনটি বৈঠকের দু'টি ঢাকায়, একটি খাগড়াছড়িতে হয়েছে। গত বৈঠকের পর ১৪ মার্চ দুদুকছড়িতে পৌঁছে শান্তিবাহিনী নেতা মানবেন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বলেছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন। এর মাঝে গত ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের পর পার্বত্য এলাকায় নতুন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কিন্তু দু'পক্ষের ঠিক করা তারিখে নতুন বৈঠকটি কেন হচ্ছে না সেটি গতকাল জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছে ওয়াকিফহাল মহলে। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, "শান্তিবাহিনীর 'অনিবার্য কারণটি' আমরা জানি না। এটা তারাই বলতে পারবে। আমরা ৩০ তারিখই বসার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এখন ১১ মে'র জন্য প্রস্তুত থাকব।" পার্বত্য চট্টগ্রামের একাধিক সূত্র এ ব্যাপারে সম্ভাব্য দু'টো কারণের কথা উল্লেখ করেছে বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়ে।

সূত্রগুলোর বক্তব্য হচ্ছে সম্ভবত শান্তিবাহিনীর নিজস্ব বোঝাপড়ার সমস্যা এখনও কাটেনি। শান্তিবাহিনীর অনড় একটি দাবি হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালী সেটেলারদের প্রত্যাহার করতে হবে। এ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব জানার পর শান্তিবাহিনী নেতা সন্তু লারমা এ বিষয়ে একটি আপোস ফর্মুলার সন্ধান করছিলেন। কিন্তু তিনি দলে এ ব্যাপারে কট্টরপন্থীদের সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। আগরতলার একটি সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ ঢাকা বৈঠকের পর সেখানকার কুঞ্জবন এলাকায় শান্তিবাহিনীর বিশেষ একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই সন্তু লারমা স্বদলীয় কট্টরদের তোপের মুখে পড়েন। খাগড়াছড়ির অপর একটি সূত্র বলেছে, বছর দশেক আগের একটি ট্র্যাজিক ঘটনার কারণেই সম্ভবত শান্তিবাহিনী নেতারা ৩০ এপ্রিল বৈঠকে না বসতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। ১৯৮৬ সালের পহেলা মে খাগড়াছড়ির মহাজনপাড়া, দীঘিনালা, পানছড়িতে পাহাড়ী বাঙালী জাতিগত দাঙ্গায় অনেক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেই ঘটনায়। সেই থেকে দিনটি সেখানে ট্র্যাজিক ঘটনার স্মারক হিসাবে পালিত হয়। ৩০ এপ্রিল বৈঠক শুরু হলে তা পহেলা মে পর্যন্ত গড়াতে পারে, সে জন্য তারা ওই সময়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের ধারণা।

এদিকে এই বৈঠকের বিষয় ছাড়াও পার্বত্য এলাকার আগ্রহ-উৎকণ্ঠা এখন মহালছড়ি পরিস্থিতি এবং ২৫ এপ্রিল ঢাকায় বিএনপি-পন্থীদের একটি সম্মেলনকে উপলক্ষ করে কেন্দ্রীভূত। ১২ এপ্রিল এক পকেটমার ধরার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহালছড়ির মাইচছড়ি এলাকায় যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার এখনও অবসান ঘটেনি। পাহাড়ী-বাঙালী দাঙ্গায় সেখানে বেশ ক'জন আহত হন। আসামী গ্রেফতারের ব্যর্থতায় মহালছড়ির ওসি'কে পর্যন্ত ক্লোজড করা হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে পার্বত্য গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ওই এলাকায় অবরোধ কর্মসূচী বহাল রেখেছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহসভানেত্রী কবিতা চাকমা জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁরা খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম-ঢাকা-রাঙ্গামাটি সড়ক থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এখনও অবরোধ বহাল আছে মহালছড়ি, মাইচছড়ি এলাকায়। কবিতা চাকমা জানায়, তাঁরা তাঁদের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জেলা প্রশাসকের কাছে। ১৮ এপ্রিলের মধ্যে দাবি পূরণের ডেটলাইন দেয়া হয়েছিল। এখন দাবিপূরণ না হলে ২৫ এপ্রিল থেকে তাঁরা ওই এলাকায় সর্বাত্মক কর্মসূচীতে যাবেন। এদিকে এই অবরোধ কর্মসূচীর কারণে পুরো এলাকায় বহু লোক আটক পড়ায় অনেকেই স্বজনের সাথে ঈদ করতে পারেননি। ২৫ এপ্রিল ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিএনপি-পন্থীদের সম্মেলন নিয়েও সেখানে সতর্ক পর্যবেক্ষণ চলছে। অনেকের ধারণা, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে উস্কানিমূলক কোন ঘটনার সৃষ্টি করা

হতে পারে। ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির থেকে যাঁরা দেশে ফিরে এসেছেন তাঁদের নিয়েও সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা চলছে। জমি ফেরত না পাওয়ায় তাঁদের অনেকে এখনও ঘর তোলেননি। থাকছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। আগামী ৮ মে প্রত্যাবাসনের এক মাস পূর্তির পর শরণার্থী নেতাদের প্রত্যাবাসন দেখতে আসার কথা আছে। নতুন দফা প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য সর্বশেষ আগতদের পুনর্বাসন সম্পন্ন করতে হবে। এই সময়েই তা সম্ভব হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। প্রশাসন অবশ্য বলেছে, সমস্যা থাকবে না। এর মাঝেই সমাধান বের করা যাবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬শে এপ্রিল ১৯৯৭

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের আলোচনা সংবিধানবিরোধী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সম্মেলনে অভিমত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সম্মেলনের বক্তারা বলেছেন, পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধানের নামে সংবিধানবিরোধী কোন আলোচনা দেশবাসী মেনে নেবে না। তাছাড়া অন্তর্ঘাতে লিপ্ত একটি সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনাও চলতে পারে না।

শুক্রবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী সম্মেলনে চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য জেলার দু'হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন।

সম্মেলনের তিনটি অধিবেশনে বিএনপি, জামায়াত, জাগপা, ডিএল, খেলাফত মজলিশের নেতৃবৃন্দ এবং সমমনা বুদ্ধিজীবীরা বক্তৃতা করেন। প্রথম অধিবেশন শেষে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে আগত প্রতিনিধিরা নগরীতে একটি মিছিল বের করেন এবং বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তিনটি অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। আলোচনা করেন ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, মতিউর রহমান নিজামী, অলি আহাদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এমএ মতিন, সাদেক খান, আমান উল্লাহ কবির, অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন উর-রশীদ, মইনুদ্দিন নাসের, আসাদুজ্জামান রিপন, জয়নাল আবেদীন, মেজর (অব) আসাদুজ্জামান প্রমুখ।

বিএনপি'র সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার পার্বত্য অঞ্চলের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য ভারতকে দায়ী করেন। তিনি

বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাত করতে ভারত শান্তিবাহিনীকে মদদ দিয়ে থাকে। তিনি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের আলোচনাকে সংবিধান বিরোধী বলেও অভিহিত করেন।

জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর ওপর চাপ দেয়া হচ্ছে। ফলে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় শান্তিবাহিনী এখন বেশি শক্তিশালী।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এমপি বলেন, এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোন সন্ত্রাসীর সঙ্গে আলোচনার কোন সুযোগ নেই।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। তাঁরা বলেন, যে সকল সন্ত্রাসী দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি বা অস্ত্র প্রত্যাহার সংবিধান লঙ্ঘনের নামান্তর।

সম্মেলন থেকে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রদত্ত স্মরকলিপিতে হিল ট্রাস্টস্ ম্যানুয়েল বাতিল সংলাপে বাঙালীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া, বৈষম্যমূলক নীতি প্রত্যাহার, সন্ত্রাসীদের বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১লা মে ১৯৯৭
পার্বত্য সমস্যা সমাধানে চলতি শান্তি উদ্যোগের প্রতি ৪৫ বিশিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ সমর্থন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের ৪৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুধবার এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চলতি শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা মতপ্রকাশ করে বলেছেন, পাহাড়ী জনগণের প্রথাগত ভূমির অধিকার নিশ্চিত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুনর্বাসিত অসহায় বসতি স্থাপনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যত্র সম্মানজনক ও যথাযথ পুনর্বাসন বিষয়ক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যার সমাধান সহজতর হবে। বিবৃতিদাতারা বলেন, ভ্রান্তনীতি ও মহলবিশেষের ইন্ধনে এ যাবত সমস্যা সমাধানের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকার এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ইতোমধ্যে খাগড়াছড়ি ও ঢাকায় তিনদফা বৈঠক করেছে। বৈঠক প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শান্তিসংলাপ প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এ

ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য তারা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিদাতারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সরকার ও পাহাড়ী জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন জনসংহতি সমিতির মধ্যে চলমান বৈঠক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার এবং পাহাড়ী জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান সরকারের প্রতি। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন শওকত ওসমান, কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নীলিমা ইব্রাহিম, বদরউদ্দিন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, ফয়েজ আহমদ, মুনতাসীর মামুন, গাজী শামছুর রহমান, রাবেয়া খাতুন, হুমায়ুন আজাদ, হাসানুল হক ইনু, খালেকুজ্জামান, আফম মাহবুবুল হক, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, মঞ্জুরুল আহসান খান, আরেফিন সিদ্দিক, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, রশীদ হায়দার প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৮ই মে ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পার্বত্য তিন জেলার পরিস্থিতি

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলার জাতিগত সমস্যা নিরসনের প্রক্রিয়াটি আবার জটিলতার শিকার হয়েছে। জাতীয় রাজনীতির একাংশ এবং আঞ্চলিক নৈরাজ্যবাদী একটি চক্র যে হীনস্বার্থে বিরোধকে জিইয়ে রাখতে চাচ্ছে কিংবা পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলতে চাচ্ছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। ১১ মে ঢাকায় প্রস্তাবিত বৈঠককে সামনে রেখে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে যাতে করে এই নতুন সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর পূর্ববর্তী তিন দফা বৈঠক থেকে অর্জিত সাফল্য নস্যাত হয়ে যায়। এ কাজটি করার জন্য জাতিগত বিদ্বেষকে উস্কে দেয়ার মতো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। রাজধানী ঢাকায় উপজাতি বিদ্বেষী বাঙালীদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। আবার গত ৩ মে বান্দরবান জেলার থানচিতে বিডিআরের ওপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালায় উপজাতীয় সশস্ত্র হামলাকারীরা। ৪ ঘণ্টার বন্দুকযুদ্ধে বিডিআরের এক ল্যান্সনায়েক নিহত হয়েছেন, আর উপজাতীয় আক্রমণকারীদের দু'জন নিহত হয়েছে। এই সংঘাতের জন্য শান্তিবাহিনীর একটি গোষ্ঠীকে দায়ী করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো। ইতোমধ্যে এই মর্মে খবর পাওয়া গেছে যে, বান্দরবান বিডিআর ক্যাম্পে এই হামলা শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাত করার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশবিশেষ। শান্তিবাহিনীর যে গোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছে তারা

শান্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড পরিচালিত শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী। তাদের বিরোধিতাকে প্রমাণ করার জন্যই যে তারা এক সন্ধিক্ষণে এই হামলা চালিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সম্মেলনের নামে যা করা হয়েছে তা উপজাতি বিদ্বেষী সমতলের মানুষদের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্মেলনে প্রকাশ্যে অস্ত্র চাওয়া হয়েছে শান্তিবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য। সন্ত লারমার ফাঁসিও চাওয়া হয়েছে। এমনকি ১১ মে নির্ধারিত বৈঠকের দিন তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল আহ্বানও করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক সহমর্মিতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে যখন শান্তি আলোচনা চলছে শান্তিবাহিনী ও সরকারের মধ্যে তখন এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী উস্কানি পারস্পরিক বিশ্বাস যতটুকু গড়ে উঠেছিল তাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। অথচ এই সম্মেলনের আয়োজনে ও নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির মহারথী হিসাবেই পরিচিত। অথচ তাঁদেরই দেখা গেছে সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে। এই মিথ্যা অভিযোগগুলোর মধ্যে মারাত্মক হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালী উচ্ছেদ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। অথচ সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়নি।

আসলে পার্বত্য তিন জেলার অধিবাসীদের মূল সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে দিতে চাচ্ছে না উপজাতীয় একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশী উগ্র জাতীয়তাবাদী একটি গোষ্ঠী। এদের দু'পক্ষই যে সুবিধাবাদী তার প্রমাণ মিলেছে, কারণ অন্যান্য বিষয়ে বাঙালী জাতীয়তাকে স্বীকার না করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে তারা ঠিকই বাঙালী স্বার্থের ধুয়া তুলেছে। আবার উপজাতীয় বিশেষ গোষ্ঠীটিও বিনা উস্কানিতে সহিংসতার মাধ্যমে শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে তাদের তথাকথিত বিপ্লবী আদর্শ পরিত্যাগ করে। এ সবের পিছনে সূক্ষ্ম কূটকৌশল এবং যোগসাজশের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

যোগসাজশ তৈরি হওয়ার অনেক কারণও আছে, যদিও এ কারণগুলো নৈতিকতা পরিপন্থী এবং একই সঙ্গে বাঙালী ও পাহাড়ী জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী। এর পিছনে রয়েছে অবৈধ অস্ত্রবাণিজ্যসহ হীন চক্রান্ত; পার্বত্য সমস্যা জিইয়ে রেখে বিশেষ একটি দেশের স্বার্থরক্ষা এবং আর একটি দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টির নোংরা খেলাও চলছে। এই অঞ্চলটি একটি বিরাট নৈরাজ্যিক শক্তির অবাধ চারণ ভূমি হয়ে আছে বহুদিন থেকে। এদের ভয় বিরোধী দু'পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে যদি শান্তি আসে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাদের অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে ঐ অপকর্মের মদদদানকারী শক্তিসমূহ পিছটান দিচ্ছে। আর

এ কারণেই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হতে পেরেছে, শরণার্থী প্রত্যাবাসন হতে পারছে। কাজেই বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা ভারত দখল করে নেবে বলে যে ভয় দেখানো হচ্ছে সেটাও অমূলক। এ ঝুঁকি যদি থেকেও থাকে তাহলে পাহাড়ী অধিবাসী এবং মূল ভূখণ্ডের মানুষদের সহাবস্থানের প্রক্রিয়া শুরু হলে ঝুঁকি কমতে বাধ্য। কারণ নৈরাজ্যিক অবস্থা থাকলেই কেবল অপশক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। পার্বত্য তিন জেলার মূল সমস্যা হচ্ছে আদি উপজাতীয় অধিবাসী ও বহিরাগত সমতল অঞ্চলের মানুষদের বসতি নিয়ে।

প্রাচীন উগ্র জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ কিংবা ঔপনিবেশিক ভাবধারায় এই যুগে ঐ সমস্যার সমাধান হবে না। নিশ্চয়ই সমতলের মানুষ বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উপজাতীয় পাহাড়ীদের কাছে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিপন্ন করতে চায় না। এ যুগে পশ্চিম গোলার্ধে রেড ইন্ডিয়ান নিধনের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা সম্ভব নয়। বিবেক ও সমঝোতার মনোভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে কাজে লাগিয়েই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। কাউকে জোর করে বাঙালী বা বাংলাদেশী বানানোর চেষ্টা যেমন সফল হবে না তেমনি অনন্যোপায় হয়ে বসতি স্থাপনকারী সমতলের মানুষদের হত্যা করে বিতাড়ন করা যাবে না।

কারুরই স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও যাতে সমুন্নত থাকে এসব দিকে লক্ষ্য রেখে সঙ্কট নিরসনের পথ খুঁজতে হবে। জবরদখল বা জবরদস্তি বিতাড়ন কোনটিই অভিপ্রেত নয়। এ পথে নৈরাজ্য বাড়া ছাড়া এবং হীন স্বার্থান্বেষীদের লক্ষ্য পূরণ হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। কাজেই শান্তি প্রক্রিয়া বানচালের অপচেষ্টাকারী কুচক্রীদের বিষয়ে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী দু'পক্ষকেই সজাগ থাকতে হবে। কোন ধরনের বিভ্রান্তি যেন তাঁদের পিছপা না করে। বাংলাদেশ সরকারেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এ বিষয়ে, যদিও এ পর্যন্ত সরকারের ও শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয়ই দিয়েছেন, তবু বৈরী ষড়যন্ত্র নস্যাত করতে হলে আরও একটু উদ্যমী হওয়া প্রয়োজন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১১ই মে ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান শীঘ্রই হবে ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তিনি আশা করছেন শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ওই এলাকায়। তাঁর সরকার ওই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী শনিবার বিকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগে জাপা নেতা কর্নেল (অব) মালেকের যোগদান উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকার সাবেক মেয়র এবং মহানগরী জাপার সভাপতি তাঁর সাবেক দলের ৫ হাজার নেতা-কর্মীসহ ওই অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। এর আগে শুক্রবার তিনি জাতীয় পার্টির সাথে সম্পর্কছেদ করেন।

আজকের শান্তি বৈঠকের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য এলাকার বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতির নিরসনে তাঁর সরকার খুবই আন্তরিক। ৬ হাজারের বেশি শরণার্থীদের সদস্য প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আমাদের নাগরিকদের অন্য দেশে দেখতে চাই না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকার দেশের বিপুল তেল, গ্যাস এবং কয়লা সম্পদকে কাজে লাগাতে পারেনি। বিদেশী সাহায্যের আশায় তারা জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করে রেখেছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আর ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে পরিচিত হতে চাই না। স্বনির্ভর জাতি হিসাবে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। শেখ হাসিনা বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে পূর্ববর্তী সরকার গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যার সমাধান চায়নি। আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে সমস্যার সমাধান করেছি। জি কে সেচ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এর প্রভাবে আগামীতে দেশ বাড়তি খাদ্য উৎপাদনেরও সুফল ভোগ করবে। আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশে ৪৫ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। এ বছর ২ কোটি ৭ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন হবে বলে তিনি আশা করে বলেন, আমাদের লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সুষ্ঠু উন্নয়নের স্বার্থে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কার খবর প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে এসেছেন। বিদ্যুত সঙ্কট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকার নাকি এ খাতে ৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু বিদ্যুত উৎপাদন বাড়েনি। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, তারা এত বিপুল অঙ্কের অর্থের ব্যবহার করে থাকলে আজকের বিদ্যুত সঙ্কট কেন? শেখ হাসিনা নবাগতদের আওয়ামী লীগে স্বাগত জানিয়ে জাতি গঠনে প্রাচীন এই দলের নেতা-কর্মীদের সাথে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে বলেন। নবাগতদের পক্ষে কর্নেল (অব) মালেক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। মহানগর আওয়ামী লীগের

সভাপতি ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে সভায় প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিলও বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ই মে ১৯৯৭

আজ আবার বসছে পার্বত্য শান্তি আলোচনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ আজ রবিবার আবার বৈঠক শুরু হচ্ছে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের। পার্বত্য এলাকায় শান্তির সন্ধানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর ৪র্থ এই বৈঠকটি দুপুর ১২টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় শুরু হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ যথারীতি বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে থাকছেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। এ উপলক্ষে পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে সহযোগীদের নিয়ে সন্তু ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন সকাল ১১টায়। সরকারের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন তাঁদের সেখান থেকে নিয়ে আসবেন। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সমস্যা এ দফাতেও মূল ইস্যু থাকবে বৈঠকে। এছাড়া পার্বত্য তিন জেলার স্থানীয় সরকার কাঠামো সম্পর্কে জনসংহতির পক্ষে একটি নতুন প্রস্তাব দেয়ার সম্ভাবনা আছে। চলতি শান্তি উদ্যোগের বিরোধিতা করে বিএনপি নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্বদলীয় ঐক্য-পরিষদ আজ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে পার্বত্য তিন জেলায়। এ নিয়ে গত রাতে খাগড়াছড়ি থেকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির খবর এসেছে। এর আগের ১২ মার্চের বৈঠকের দিনেই তারা একইভাবে হরতাল করেছে পার্বত্য এলাকায়। উল্লেখ্য, বিএনপি আমলেও জনসংহতি সমিতির সাথে ১৩ দফা বৈঠক হয়েছিল। সেসব ব্যর্থ বৈঠকের সূত্রে বিএনপি চলতি শান্তি উদ্যোগের বিরোধিতা করে আসছে শুরু থেকেই। এ দফায় মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীসহ রাজনৈতিক কারণে পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসিত কয়েকটি সংগঠনও তাদের সহযোগী।

উল্লেখ্য, এর আগের দুটি বৈঠক ঢাকায় এবং একটি খাগড়াছড়িতে হয়েছিল। খাগড়াছড়িতে নানা প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে জনসংহতি নেতারা পরবর্তীতে ঢাকাতেই বৈঠকের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তাছাড়া ঢাকায় বৈঠকের সুযোগে জাতীয়-আন্তর্জাতিক মাধ্যমে গুরুত্বসহ প্রেস কভারেজ পাবার বিষয়েও তারা সন্তুষ্ট। এ দফাতে বৈঠকে সন্তু লারমার সাথে ঢাকা আসছেন সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং রূপায়ন দেওয়ান। উল্লেখ্য, রূপায়ন গত বৈঠকে না আসায় ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১২ই মে ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি আলোচনা

পাহাড়ীদের ভূমির অধিকারের বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা হলে অন্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত সহজ হবে

ফজলুল বারী ॥ সেই ভূমির বিষয়টিই এখনও মূল সমস্যা। সন্তু লারমা আবার বলেছেন, পাহাড়ীদের ভূমির অধিকারের বিষয়ে সরকারী তরফের চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত আমরা চাই। এ বিষয়টির ফয়সালা হলে অন্য সব বিষয়ের ফয়সালাও সহজ হবে। রবিবার শুরু চতুর্থদফা ঢাকা শান্তি বৈঠকের এটিই ছিল মূল সুর। জটিল এ বিষয়টি নিয়ে গতকালের ৪ ঘণ্টা বৈঠকের পর দুই পক্ষ আবার আলোচনায় বসবে আজ সকাল ১০টায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এ বৈঠক গতকাল দুপুর ২টা ২০ মিনিটে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মায়। অপর অতিথিশালা মেঘনায় জাতিসংঘ খাদ্য কর্মসূচীর কর্মকর্তা উপস্থিত থাকায় এবার পদ্মাতেই পাহাড়ী নেতাদের থাকার এবং তাঁদের সাথে বৈঠকেরও ব্যবস্থা হয়েছে। ভূমির বিষয়ে পুরনো অচলাবস্থা দূর না হওয়াতে সংশ্লিষ্টরা সাংবাদিকদের উদ্দেশে ব্রিফিংয়ের মুখোমুখি হতে চাননি। অনেক অপেক্ষা, পীড়াপীড়ির পর অতিথিশালা থেকে রাতে বেরিয়ে যাবার মুখে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেছেন, অনেক দিনের সমস্যার সমাধানে সময় লাগবে। তবে অগ্রগতি হচ্ছে। চীফ হুইপ বিএনপি'র কড়া সমালোচনা করে বলেন, পার্বত্য তিন জেলায় আজ কেন হরতাল ডাকা হলো তা আমরা বুঝতে পারলাম না। সেনা প্রত্যাহারের কোন চুক্তিই হয়নি। আর প্রধানমন্ত্রীতো সাফ বলেই দিয়েছেন বাঙালী সেটেলারদের সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হবে না। পীড়াপীড়ির মুখে চীফ হুইপ বলেছেন, আজ সোমবার রাত ৮টায় তাঁরা একটি ব্রিফিং দেবেন। উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং না হওয়ায় বৈঠক সম্পর্কে গতকাল জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৈঠকের শুরুতেই জনসংহতি নেতারা অভিযোগের সুরে বলেন তাঁরা সমস্যার সমাধান চান বলেই বার বার ঢাকায় আসছেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সমিতি, শান্তিবাহিনীকে অযথা জড়ানো হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে বলা হয়, শান্তিবাহিনী এমন ঘটনা আগে বিভিন্ন সময়ে ঘটিয়েছে বলেই এমন বক্তব্য আসে। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির তথ্য শাখার দুর্বলতার কারণে তাৎক্ষণিক কোন ব্যাখ্যা না আসায় বিভ্রান্তি হয়। প্রাথমিক এই আলোচনার

পরেই দুইপক্ষের ৩ জন করে ৬ নেতা অতিথিশালার দোতলার একটি কক্ষে রুদ্ধদ্বার একান্ত বৈঠকে বসেন। রুদ্ধদ্বার এই বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, আতাউর রহমান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং জনসংহতির পক্ষে সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম ঢাকমা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র বলেছে, ভূমি সমস্যা এবং স্থানীয় সরকার কাঠামো নিয়েই গতকাল মূল আলোচনা হয়। এই বৈঠক উপলক্ষে জনসংহতি নেতারা দুপুর পৌনে ১২টায় পৌঁছেন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়। পানছড়ির দুদুকছড়ি থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে তাঁদের সাথে এ ছাড়া এসেছেন সমিতির রক্ত উৎপল ত্রিপুরা, ডাঃ বাবুল চাকমা। যোগাযোগ কমিটির দু'জন, স্বেচ্ছাসেবক দু'জন সদস্যও এসেছেন তাঁদের সাথে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, ভারতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকায় বিশেষত আইকে গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জনসংহতি নেতারা সমাধান প্রশ্নে সেখানকার চাপের মুখে আছেন। সন্তু লারমা চাপের মুখে আছেন শান্তিবাহিনীতে। কারণ শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বের পদটি এখন তাঁর হাতে নেই। সমিতির সর্বশেষ কংগ্রেসে ঊষাতন তালুকদার ওরফে সমীরণ তালুকদারকে এই পদটি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সন্তু এখনও বৈঠকে কম কথা বলছেন। তাঁর পক্ষে সচিবের ভূমিকায় রবিবার গৌতম চাকমা বৈঠকের সব কথামালা লিখে নিয়েছেন। গতকালের বৈঠকের শুরুতে জাতীয় কমিটির নতুন সদস্য এম এম চাকমা প্রথমবারের মত অংশ নেন। অন্যান্য সদস্যের মাঝে জাপার সাংসদ এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বীও প্রথম দিকে বৈঠকে ছিলেন। বিকালে চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বৈঠক থেকে ভিন্ন ব্যস্ততায় চলে যান। রাত ৯টায় রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মার গেটে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের পীড়াপীড়ির মুখে বলেন, দীর্ঘ দিনের সমস্যা, এক-দুই বৈঠকেই এর সমাধান হয়ে যাবে না। তবে আলোচনার অগ্রগতি হচ্ছে বলেই আজ আমরা ৪ ঘণ্টা আলোচনা করেছি। আগামীকাল সকাল ১০টায় আবার আমরা বসব। হুইপ বলেন, শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হওয়াতে জনসংহতি নেতারা খুশি। থানচি হত্যাকাণ্ডের সাথে শান্তিবাহিনী জড়িত নয়–এটা তাঁরা জোরের সাথে বলেছেন। পত্রিকাতেও তারা এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছেন। ১০ মার্চ বান্দরবানে গ্রেফতারকৃত ৪ জনকে মুক্তি দেবার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বললেন তিনি। উল্লেখ্য জনসংহতি সমিতি শুক্রবার সরকারের কাছে পাঠানো চিঠিতে তাদের তিন সক্রিয় সদস্য এবং একজন গ্রামবাসীর মুক্তি দাবী করেছে। চীফ হুইপ বলেন, বিএনপি আমলে জনসংহতির সাথে তারা ১৩ দফা বৈঠক করেছে। ত্রিপুরা গিয়েও বৈঠক করেছে। তাদের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় আমরা বৈঠক করছি। কিন্তু তারা

এখন এই বৈঠকের বিরোধিতা কেন করছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তারা সংসদে যাচ্ছে, ওয়াকআউট করছে, সব কমিটি বৈঠকে যাচ্ছে কিন্তু এই বৈঠকে কেন যোগ দিচ্ছে না, তাও আমাদের বোধগম্য নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই মে ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি আলোচনা
পাহাড়ীদের ভূমির অধিকার প্রশ্নে
দুই পক্ষের অবস্থান কাছাকাছি

ফজলুল বারী ॥ পাহাড়ীদের ভূমির অধিকার ইস্যুতে নতুন একটি প্রস্তাবসহ ফয়সালায় পৌঁছতে চাচ্ছে সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে। সন্তু লারমা এই প্রস্তাবকে বলেছেন খারাপ নয়। তবে এ ব্যাপারে তাঁদেরকে নিজস্ব ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। সুধাসিন্ধু খীসা প্রস্তাবটিকে একদম আমলে নেননি। গৌতম চাকমা সন্তুকে সমর্থন করে বলেছেন, নিজস্ব ফোরামে আলোচনা করে এ ব্যাপারে মতামত দেয়া যায়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, চলতি দফা শান্তি বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে এ বিষয়টি নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সরকারী প্রস্তাব হচ্ছে– যে সব পাহাড়ীর জমি অবৈধ দখলে আছে এবং পাহাড়ীদের যে সব জমি সরকারী নির্দেশে বাঙালী সেটেলারদের বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল সে সব উদ্ধার করে তা প্রকৃত পাহাড়ী মালিকদের হাতে ফেরত দেয়া হবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালী সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতেই দেয়া হবে প্রযোজনীয় জমি। কেউ সেখানে না থাকতে চাইলে তাদের দেশের অন্যত্র পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেয়া হবে। তবে কাউকে জোর করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া হবে না। জনসংহতি সমিতির পুরনো দাবি অবশ্য ভিন্ন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুনর্বাসিত সব সেটেলারকে সেখান থেকে সরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে আসছে। তারা বলে আসছে সেটেলার সরাতেই হবে। কারণ তাদের দেবার মতো ধানী জমি পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই।

সূত্র বলেছে, জমি প্রসঙ্গে দুই পক্ষের অবস্থান এখন এই পর্যন্ত কাছাকাছি। চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আরও একাধিক বৈঠকের প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান সরকারের সাথে চতুর্থ দফা আলোচনার গতকাল পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে এখনই মনে করা হচ্ছে– পার্বত্য তিন জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ আবার বাড়ানো হতে পারে। তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ আগামী মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহবায়ক হংসধ্বজ চাকমা সোমবার জনকণ্ঠকে বলেছেন- তিনি সরকারকে বলেছেন জনসংহতি সমিতির সাথে ফয়সালায় না

পৌঁছা পর্যন্ত যেন স্থানীয় সরকার পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া না হয়। কারণ এতে চলতি শান্তি আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কারণ এখন পরিষদ ভেঙ্গে দিলেই সেখানে নির্বাচন করতে হবে। আর ফয়সালা ছাড়া নির্বাচনে গেলে সেখানকার বর্তমান শান্তিপূর্ণ অবস্থার অবনতি হতে পারে। আপাতত আবার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিন পরিষদের মেয়াদ বাড়ানো যাবে। অবশ্য এটি পরবর্তীতে আইনে পরিণত করতে হবে সংসদের মাধ্যমে। তবে আর একটি সূত্র মতে পরিষদ তিনটির মেয়াদ আর বাড়ানো সম্ভব নয় অথবা সহজ নয়। সেজন্য সরকার জনসংহতির সংশোধিত একটি প্রস্তাব নিয়েই ফয়সালায় পৌঁছতে চাচ্ছে। এই প্রস্তাবে পরিষদ তিনটিকে আরও স্বাধীন, শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে।

পার্বত্য শান্তি প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির সাথে চতুর্থ দফা বৈঠক সোমবার দ্বিতীয় দিনের মতো চলে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মায়। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু বৈঠক দুপুরে খাবার বিরতিসহ চলেছে রাত পর্যন্ত। সেখানেই সাংবাদিকদের উদ্দেশে একটি ব্রিফিংয়ের ভাষা তৈরি করা হয়। তবে ব্রিফিং ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। জাতীয় কমিটির প্রধান লিখিত ব্রিফিংয়ের বাইরে কিছুই বলেননি।

অতিথিশালা পদ্মার বারান্দায় এক সংক্ষিপ্ত ব্রিফিংয়ে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ গতরাতে বলেন, আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। শীঘ্রই আমরা একটি সমঝোতায় পৌঁছার ব্যাপারে ভীষণ আশাবাদী। আগামীকাল (মঙ্গলবার) আবার আলোচনা হবে। সন্তু লারমা এ সময় পীড়াপীড়িতে বলেন, 'সেইম ওপিনিয়ন আমাদেরও। এভরি থিং ইজ গোয়িং ওয়েল।' এর বেশি আর কিছু বলতে তাঁরা রাজি হননি। ব্রিফিংয়ের আগে ফটোসেশনের সময় চীফ হুইপ সন্তুকে বলেন, 'একটু হাসুন না!' এরপর তাঁরা দু'জনেই হাসিমুখে ক্যামেরার ক্লিক-ক্লিককে অভিবাদন জানান। ব্রিফিংয়ের পর সাংবাদিকদের অনেকে কিছু প্রশ্নের জবাব আদায়ের জন্য উভয় নেতাকে ছেকে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু চীফ হুইপ প্রায় ঝড়ের বেগে সন্তুকে নিয়ে অতিথিশালার ভিতরে ঢুকে যান। কোন প্রশ্নের জবাবই তাঁদের মুখ দিয়ে বার করা যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই মে ১৯৯৭
পার্বত্য আলোচনায় অগ্রগতির আভাস

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির আভাস দিয়েছে সরকারী একটি সূত্র। জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা বিভিন্ন

বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনার আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান। প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত পাবার আশ্বাস পেলে তিনি দলবলসহ আজও ঢাকায় থাকতে পারেন। সরকারী একটি সূত্র এ ব্যাপারে গত রাতেই মালেতে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রীর মতামত সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছে। চতুর্থ দফা শান্তি আলোচনার তৃতীয় দিনে গতকাল মঙ্গলবার কোন প্রেস ব্রিফিং হয়নি। সাংবাদিকদের বলা হয়েছিল, রাত সাড়ে ৮টায় ব্রিফিং হবে অতিথিশালা পদ্মায়। কিন্তু ঐ সময় অতিথিশালার গেটে সাংবাদিকদের অপেক্ষমাণ রেখেই নেতৃবৃন্দ ভিন্ন পথে সেখান থেকে চলে যান। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে সরকারী সূত্রটি বলেছে ব্রিফিংয়ের কোন সিদ্ধান্ত ছিল না।

জানা গেছে, তৃতীয় দিনের আলোচনাতেও ভূমির অধিকার, স্থানীয় সরকার পরিষদ তথা জনসংহতির দাবিকৃত আঞ্চলিক কাউন্সিলসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে উভয়পক্ষ পরস্পরের যুক্তিতর্ক শুনেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন। স্থানীয় সরকার পরিষদ তিন জেলায় এখন যা আছে তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী মাসে। এ ব্যাপারে তিন পার্বত্য আসনের তিন সাংসদের মতামত চেয়ে ইতোমধ্যে চিঠি দেয়া হয়েছে। জনসংহতি সমিতি আর এগুলোর মেয়াদ বাড়ানোর বিপক্ষে। সমিতি নেতারা সেনাবাহিনী এবং সেটেলার ইস্যুতেও প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত আছেন। জানা গেছে, তারা এসব বিষয়ে একগুয়েমির বদলে নিজেদের জন্য শ্রেয় এবং সম্মানজনক বিকল্পের সন্ধানে আছেন। সরকারের তরফ থেকে কিছু প্রস্তাব ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত ফয়সালার আগে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তাঁর কথা শুনতে চান। সূত্র বলেছে, জনসংহতি নেতারা এবার ঢাকা এসে আগের মতো তাড়াহুড়া করছেন না। আগে এসেই যাবার ব্যবস্থা কখন কিভাবে হচ্ছে জানতে চেয়েছেন। এবারই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। জানা গেছে, নিজস্ব সাংগঠনিক কিছু সমস্যার কারণে সমিতি নেতারা দ্রুত ফয়সালায় মন দিয়েছেন। সন্তু লারমা আর শান্তি বাহিনীর এফসি (ফিল্ড কমান্ডার) নন। গত ডিসেম্বরে সমাপ্ত কাউন্সিলে উষাতন তালুকদারকে নতুন এফসি করা হয়েছে। এ বিষয়ে কড়া গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ একটি সমস্যায় এটি আর গোপন থাকেনি। রূপায়ন দেওয়ান এফসি হতে চেয়েছিলেন। তাঁকে দায়িত্ব না দেয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। সর্বশেষ দু'টো শান্তি বৈঠকেও তিনি আসছেন না। শান্তিবাহিনীর প্রধান না হয়েও বৈঠককালে দুদুকছড়ির নিয়ন্ত্রণ রূপায়নই হাতে রাখছেন। ফয়সালা প্রশ্নে কট্টরপন্থীদের চাপের মুখে আছেন সন্তু লারমা। কোন আপোসেরই তাঁরা পক্ষে নন। সন্তু

লারমা জানেন, বর্তমান সরকার তাদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। তিনি এর পুরো সুযোগ কাজে লাগাতে চান। শরণার্থী প্রত্যাবাসন সুষ্ঠু হচ্ছে এ বিষয়টিকেও জনসংহতি নেতারা প্লাস পয়েন্ট হিসাবে দেখাতে চান। আগের দফায় পুনর্বাসন সুষ্ঠু না হওয়ায় শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমারও একগুয়েমি ছিল বলে অভিযোগ আছে। সূত্র বলেছে, উপেন্দ্রকে সেজন্য নেতৃত্বের পদ থেকে সরানোর একটি প্রক্রিয়াও চলছে। এবাব দুদুকছড়ি ফিরে সন্তু নাকি বিশেষ কিছু বলবেন আশ্বাস দিয়ে এসেছেন। সেজন্য আলোচনা, প্রতিশ্রুতি এ সবের 'গ্যারান্টার' হিসাবে তিনি চান প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি বক্তব্য। দিনের প্রথম দিকেই যদি নিশ্চিত হয় প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত পাওয়া যাবে। তবে সন্তুরা এখানে আর একদিন থাকতে পারেন। প্রতিশ্রুতি না পেলে ফিরে যাবেন। উল্লেখ্য, চলতি শান্তি উদ্যোগ শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তু লারমার চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সন্তু তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর রাজনৈতিক কারণে। তবে ঢাকার প্রথম বৈঠকের সময়েই বলেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে আগ্রহী। সরকার পক্ষে তখন বলা হয়েছিল চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এই সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর শান্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হলে প্রধানমন্ত্রী সন্তুদের রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দেবেন। সেজন্য এখনই সন্তুরা এই সাক্ষাত পাবেন কিনা সে বিষয়টি নিয়ে সংশয় আছে। জানা গেছে, সন্তু লারমা চলতি শান্তি উদ্যোগের ফয়সালায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে এ কথা গতকালই জাতীয় কমিটির নেতাদের জানিয়েছেন। গত রাতে সুধাসিন্ধু খীসা, গৌতম চাকমা এ বিষয়ে অতিথিশালার বাইরে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকেও কথাটি বলেছেন। সন্তু লারমা এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ বাবুল বিশ্বাস ঐ সময়ে পদ্মাতেই ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫ই মে ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি আলোচনায় সকল বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত

ফজলুল বারী ॥ গঙ্গার ঐতিহাসিক পানি বণ্টন চুক্তির পর আরেক সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত পরিস্থিতির অবসান হচ্ছে, শান্তি ফিরছে সবুজ শ্যামল পাহাড়ে। জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সাথে তিন দশকের পুরনো বিরোধ মীমাংসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রার্থিত ঐকমত্য। আজ সকালে জনসংহতি নেতাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌজন্য সাক্ষাত দেবার কথা আছে। বিরোধ মীমাংসায় সরকার পক্ষের নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ গতরাতে বলেছেন, 'সকল বিষয়ে

আমরা একমত হয়েছি। অতি শীঘ্র আমরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি।' চীফ হুইপ আরও বলেছেন, 'জনসংহতি নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাদের সাথে আলোচনাপর্ব শেষ হয়েছে। গতকালই ছিল শেষ বৈঠকের দিন।' জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ হবে। তারপর চুক্তি স্বাক্ষর হবে। জনসংহতি নেতারা আজ (বৃহস্পতিবার) বা কাল ফিরে যাবেন।' চীফ হুইপ আভাস দিয়ে বলেছেন, জনসংহতি নেতারা আজই ফিরে যেতে পারেন। উল্লেখ্য, সার্ক সম্মেলন শেষে প্রধানমন্ত্রী গতরাতেই মালে থেকে দেশে ফিরেছেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, সমঝোতা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী, সেটেলার বাঙালীরা থাকবে। বাংলাদেশের আর সব এলাকার মতো সেখানে সেনা সদস্যরা থাকবেন সেনানিবাসে। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে অপ্রয়োজনীয় সব সেনা ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া হবে। পরিস্থিতির উন্নতির নিরিখে সিভিল প্রশাসনে সেনাবাহিনীর পুরনো খবরদারির ভূমিকা থাকবে না। পাহাড়ীদের জমি যেখানে যে অবস্থায় অবৈধ দখলে আছে তা পুনরুদ্ধার করে ফিরিয়ে দেয়া হবে প্রকৃত পাহাড়ী মালিকদের কাছে। আর পাহাড়ীদের যেসব জমি অপাহাড়ীদের কাছে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল সেসব জমিও প্রকৃত মালিকরা ফিরে পাবেন। সেটেলার বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতেই খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে পুনর্বাসিত করা হবে। সমঝোতা হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের পর 'অতি শীঘ্র' শান্তি বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হবে। শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে। জনসংহতি এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের যথাযথ যোগ্যতা, সাম্মানসহ পুনর্বাসিত করা হবে। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পার্বত্য এলাকার পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব হয়েছে। সমঝোতা অনুসারে পাহাড়ী জনগণের সাংবিধানিক মর্যাদা দেয়া হবে। পার্বত্য তিন জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ পরিচালনায় জনসংহতি সমিতির বিশেষ ভূমিকা থাকবে। সরকার এবং জনসংহতি সমিতি সম্মিলিতভাবে স্থানীয় সরকার পরিষদ পুনর্গঠন, শক্তিশালী করার কাজ করবে। স্থানীয় পরিষদ প্রশাসনে পাহাড়ী-অপাহাড়ীদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ভূমি অধিকার, ভূমির মালিকানার বিষয়টিও দেখভাল করবে স্থানীয় সরকার পরিষদ। উল্লেখ্য, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ৫ হাজার ৯ বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট পার্বত্য তিন জেলায় মোট জমির পরিমাণ ৩২ লাখ ৫৯ হাজার ৫২০ একর। এর মধ্যে অরণ্য ২৯ লাখ ২ হাজার ৭৩৯ একর এবং ধানী জমি ২৩ হাজার ২ একর। সেখানে এখন ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৫৯৫ জন পাহাড়ী, ৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮২৫ জন অপাহাড়ী বাসিন্দা রয়েছে।

রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে ৫৮ হাজার ৭শ' ১৬ জন পাহাড়ী শরণার্থী স্বদেশ ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। ১৯৯৪ সালে দু'দফায় প্রথমে ১৮৪৬ জন, পরে ৩৩২৩ জন শরণার্থী দেশে ফিরেছিল। তাদের পুনর্বাসন যথাযথ না হবার অভিযোগে এই প্রত্যাবাসন বন্ধ ছিল ৩ বছর। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ১২৫২ পরিবারের ৬৭০০ শরণার্থী দেশে ফিরেছে। শীঘ্রই তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া দেখে নতুন দফা প্রত্যাবাসন শুরুর তারিখ ঘোষণার কথা আছে।

বুধবার জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের দীর্ঘতম ৪র্থ দিনের বৈঠকে সমঝোতার খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হয়। দুই নেতা আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং সন্তু লারমা গতকাল দীর্ঘ একান্ত বৈঠকও করেছেন। উল্লেখ্য, এটি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতির চতুর্থ দফা বৈঠক। এর আগে বিএনপি সরকারের সাথে ১৩ দফা, জাতীয় পার্টির সরকারের সাথে ৬ দফা নিষ্ফল বৈঠক হয়েছিল। বিএনপি শুরু থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের এই শান্তি উদ্যোগের বিরোধিতা করে আসছে। জাতীয় কমিটিতে তাদের দুই সাংসদও নিয়মিত অনুপস্থিত থাকেন। সর্বশেষ ১২ মার্চ এবং ১১ মে ঢাকা বৈঠক উপলক্ষে তিন পার্বত্য জেলায় তাদের উদ্যোগে হরতালও হয়েছে।

অশান্ত পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তি সংলাপ শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। ব্রিটিশ আমলের জন সমিতি, পাকিস্তান বাংলাদেশ আমলে জনসংহতি সমিতিতে রূপান্তরের পর সামরিক শাখা শান্তি বাহিনী গঠন করেছিল ১৯৭৪ সালে। তারপর থেকে এই বাহিনী প্রথমে স্বাধিকার, পরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে শুরু করলে পাহাড়ী-বাঙালী মিলিয়ে ২০ সহস্রাধিক নিহত হবার তথ্য আছে। এদের মধ্যে ৫ হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি নিহত হন। ১৯৯২ সালের ১০ আগস্ট থেকে সেখানে দফায় দফায় অস্ত্রবিরতি ঘোষণা হলেও রক্তক্ষয় থামেনি। সর্বশেষ ঘোষিত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ আছে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতাসীন হবার পর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ প্রশস্ত হয়। নতুন সরকারের সাথে ২১ ও ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সমিতি সংশোধিত ৫ দফা উত্থাপন করলে সৃষ্টি হয় নতুন আশাবাদের। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হতে থাকে সমিতির নেতারা ঢাকায় বৈঠকে রাজি হবার পর। গত ৭ জানুয়ারি সরকারের তরফ থেকে জনসংহতিকে চিঠি দেয়া হয় ঢাকায় বৈঠকের জন্য। ১৪ জানুয়ারি তারা চিঠি পাঠিয়ে জানায়, ঢাকায় বৈঠকে তারা রাজি। ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারি প্রথম দফা ঢাকা বৈঠক হয়। এরপর ১২, ১৩ মার্চ দ্বিতীয় দফা,

১১ মে থেকে তৃতীয় দফা বৈঠক হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত ৫ দফাই ছিল এই আলোচনার এজেন্ডা। পরে এতে যোগ-বিয়োগ নানা কিছু ঘটেছে। ২২ পৃষ্ঠার ৪৪টি উপদাবি সংবলিত ৫ দফায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেবার দাবি জানানো হয়। তিন পার্বত্য জেলাকে বলবত রেখে একত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট সংগঠন, জুম্মল্যান্ড, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, স্বাধীনভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদনের ক্ষমতা, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, পুলিশসহ ৩৬টি বিষয়ে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব, ক্ষমতা, দেশের অন্যান্য স্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে সম্পত্তি, জমি ক্রয়, বন্দোবস্ত নিতে না পারার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠন, উপজাতীয় জনগণের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, সাজাপ্রাপ্ত, আটক, বিচারাধীন সকল পাহাড়ী বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথ পুনর্বাসনের দাবি ছিল সংশোধিত পাঁচ দফায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই মে ১৯৯৭
চুক্তি স্বাক্ষরে আবার ঢাকা আসব ॥ সন্তু

ফজলুল বারী ॥ সন্তু লারমা বললেন, চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যই আবার আসব ঢাকায়। দু'পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যমেই শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ঠিক হবে।

জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মার গেটে জনকণ্ঠসহ একাধিক পত্রিকা, সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের কাছে কথাগুলো বলেন। হাসিখুশি সন্তু বলেন, প্রয়োজন ছিল না বলেই এ দফায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা হয়নি। আগামীতে প্রয়োজনের সময় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা হবে, বৈঠক হবে। চীফ হুইপ এসময় শুধু বলেন, শীঘ্র-শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর হবে। জনসংহতি নেতারা গতকালই দুপুর ২টায় তেজগাঁও বিমান ঘাঁটির উদ্দেশে অতিথিশালা পদ্মা ছেড়ে যান। পার্বত্য শান্তি আলোচনা উপলক্ষে এবারই তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন দীর্ঘতম সময় প্রায় ৫ দিন। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সমেত কড়া পাহারায় তাঁদেরকে তেজগাঁও বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে তাঁরা উড়ে যান খাগড়াছড়ির দুদুকছড়িতে। শান্তি বৈঠক উপলক্ষে সন্তু'র অনুসারী জনসংহতি শান্তিবাহিনীর নেতা-সদস্যরা গত এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান

করছেন সেখানে। হেলিকপ্টার থেকে নেমে তিনি সেখানে বক্তব্য রেখেছেন অপেক্ষমাণ অনুসারী, পাহাড়ী জনতার উদ্দেশে।

জানা গেছে, ৪র্থ দফা বৈঠকের ৪র্থ দিন বুধবারে জনসংহতি নেতাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পর একটি খসড়া চুক্তি হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা এটিকে টার্মস অব রেফারেন্স হিসাবেও উল্লেখ করছেন। বৈঠকের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার পাহাড়ী নেতা সমঝোতা বাস্তবায়নের গ্যারান্টার হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করলে নতুন একটি পর্বের সূচনা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার পক্ষ সতর্কতার নীতি নেয়। সমঝোতার এ পর্যায়ে এসে কোন ভুলবোঝাবুঝি বা বিতর্কের সৃষ্টি যাতে না হয় সে জন্যই এই সতর্কতা। সূত্র বলেছে, সরকারী নেতারা জনসংহতি নেতাদের বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হন। সেজন্য তাঁরাও এখনই এ বিষয়ে গোঁ ধরেননি। তবে তাঁরা আবারও বলে গেছেন, চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে তাঁদের আগ্রহের কথা। জানা গেছে, সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে মালদ্বীপ থাকতেই প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নিয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকায় ফিরে এবং বৃহস্পতিবার সকালে তিনি অগ্রগতির বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে অবহিত হন। অসমর্থিত একটি খবরে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে জনসংহতি নেতার টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি সমঝোতার স্বার্থে তাঁর আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। অপর সূত্রটি বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটি চীফ হুইপ সন্তু লারমাকে অবহিত করেছেন।

সূত্রমতে, জনসংহতির সাথে পার্বত্য তিন জেলার স্থানীয় প্রশাসন এবং ভূমি অধিকারের বিষয়ে পুরোপুরি সমঝোতা হয়েছে। সেনাবাহিনী সেটেলার ইস্যুতে অবস্থানগত দূরত্ব কমেছে। উভয় পক্ষ ছাড় দেয়াতে অগ্রগতি নাটকীয় মোড় নেয়। জনসংহতি জুম্মল্যান্ড প্রশ্নে নমনীয়তা, সরকার পাহাড়ীদের জাতিগত স্বীকৃতির বিষয়ে এবং জনসংহতি নেতা, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনের অঙ্গীকার করলে সমঝোতা সহজ হয়ে ওঠে। জনসংহতি নেতারা ভারতীয় পক্ষ থেকেও চাপের মধ্যে আছেন। ভারত সরকার চাপ দিচ্ছে, ট্রেনিং, খাবার দেয়া বন্ধ করেছে এসব কারণে সেখানেও সমঝোতার তাড়া আছে। তবে সমিতি নেতারা যে সংশয়ের মাঝে আছেন তাহলো বর্তমান সরকারের সাথে চুক্তি করলেও ভবিষ্যতে অন্য কোন সরকার ক্ষমতাসীন হলে এই চুক্তি কার্যকর কতটা হবে সে বিষয়ে। সরকার পক্ষ ৩০ জুনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী। জনসংহতি নেতারা বলে গেছেন, তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডেকে খুঁটিনাটি আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকের তারিখ সম্পর্কে লিখিতভাবে জানাবেন। সংশ্লিষ্টরা আগামী বৈঠকের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও

চিন্তিত আছেন। সমঝোতা বিরোধীরা অন্তর্বর্তী সময়ে সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করতে পারে। এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে সূত্রটি বলেছে, আগামী একমাস সেজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়।

রাঙ্গামাটিতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা

রাঙ্গামাটি থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বিরাজমান সমস্যা সমাধানে জনসংহতি সমিতির সাথে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার খবরে সেখানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। জেলাবাসী এখন শান্তি প্রক্রিয়ার পরবর্তী খবরাখবর জানতে উদগ্রীব। রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্র লাল চাকমা, সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি একেএম মকসুদ আহমেদ প্রমুখ এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী, চীফ হুইপসহ অন্যান্য নেতা এবং জনসংহতির নেতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২০শে মে ১৯৯৭

সরকার ও শান্তি বাহিনীর প্রস্তাবিত চুক্তি প্রসঙ্গে

হারুন হবীব

আগামী ৩০ জুন সরকার এবং শান্তি বাহিনীর মধ্যে চলতি দফা অস্ত্র বিরতির মেয়াদ শেষ হবে। ধারণা করা যায়, সরকার এবং পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিটি এ সময়ের মধ্যেই সই করা হবে।

এই চুক্তিতে কি এবং কোন্ কোন্ ধারা থাকবে–তা নিয়ে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ কেউ-ই মুখ খোলেননি। তাঁরা শুধু বলেছেন, বৈঠক সফল হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবু সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর বরাত দিয়ে প্রস্তাবিত চুক্তিটির ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–এমন প্রায় প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে দফাওয়ারী বৃত্তান্ত ছাপিয়েছে খবরের কাগজগুলো। এবং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে যে, সেই বৃত্তান্তগুলো সঠিক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সহিংসতা দুই দশকের বেশি পুরনো। হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছে এই জাতিগত দাঙ্গায়। ঘরবাড়ি, গ্রাম উজাড় হয়েছে, ভস্মীভূত হয়েছে শত শত। কখনও পাহাড়ী উগ্রপন্থীরা, যারা 'শান্তি বাহিনী' নামে পরিচিত, হত্যা করেছে বাঙালীদের, কখনও আবার জোট বেঁধে বাঙালীরা হত্যা করেছে পাহাড়ীদের। এর

বাইরেও রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা। অথচ উপজাতিদের দাবিগুলোকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার চেষ্টাটা প্রথম থেকেই নেয়া হলে–বলাই বাহুল্য–এই জাতিগত দাঙ্গা আর রক্তপাতকে অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হতো। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সহিংসতা, তার প্রধান কারণ, শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক উপজাতি বিদ্রোহীদের অস্ত্র এবং গোলাবারুদের ব্যবহার নয়, সেই সাথে সমস্যাটিকে রাজনৈতিক সমাধান না করতে সমভাবে দায়ী। বাংলাদেশের তৎকালীন সামরিক শাসকেরা–যাঁরা গণতান্ত্রিক মনমানসিকতার বদলে নিজেদের চরিত্রগত কারণেই প্রতিটি সঙ্কটের সামরিক সমাধান খুঁজতে অভ্যস্ত ছিলেন–হুট করে পাঠিয়ে দিলেন একদিন সেনাবাহিনী। সেই সাথে সরকারী উদ্যোগে চালানো হলো সমতলবাসীদের পাহাড়ী এলাকায় পুনর্বাসন। বুদ্ধিটা এ রকম, একদিকে অস্ত্র দিয়ে দাবি ঠেকানো হবে, অন্যদিকে বাঙালী জনগোষ্ঠী বসিয়ে পাহাড়ীদের জনসংখ্যা সীমিত করে আনা হবে।

কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে, সামরিক সমাধান রাজনৈতিক সঙ্কটের সত্যিকার সমাধান হয় না কখনও। বাংলাদেশ প্রায় গোটাটাই সমতল ভূমি। এই দেশের মানুষ, এই দেশের জনগোষ্ঠী বলতে, প্রায় গোটাটাই বাঙালীকে বোঝায়। এই ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতাও অর্জিত হয়েছে বাঙালী জাতীয়তাবাদেরই ভিত্তিতে। কিন্তু এই দেশের পাহাড়ে বাঙালীদের বাইরেও যে যৎকিঞ্চিৎ পাহাড়ী জনগোষ্ঠী আছে–তাকে অস্বীকার করার যুক্তি আমাদের কোথায়? এই সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা কোনদিনও স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের পূজারী হতে পারেন না। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী বিশেষত তাদের একটি শ্রেণীর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে ছিল না, তা আমি কখনই বলব না। কিন্তু এর পরও আমি বলতে বাধ্য, আমাদের সামরিক শাসকরা অনেকেই এই সঙ্কটটিকে জিইয়ে রেখেছে। রেখেছে, কারণ, ওতে একদিকে তাদের সামরিক পোশাকের জয়গান করা গেছে, অন্যদিকে বৈদেশিক যে প্রভুরা তাদের চালাত–তাদেরও সন্তুষ্ট করা গেছে একই সাথে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, আজ যা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি আর বান্দরবান, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভূমি পাহাড়ী হতে পারে, কিন্তু তা বাংলাদেশ। এই সত্যটিকে যে সব পাহাড়ী নেতা ভুলে যেতে চেয়েছিলেন, আমার ধারণা, তাঁদেরও সত্য অনুধাবনের সুযোগ করে দিয়েছে সময়। সময় আরও প্রমাণ করেছে, আলোচনাই সঙ্কট নিরসনের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র পথ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর বিবাদ নয়, বন্ধুত্বই হতে হবে শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। পাহাড় শুধুমাত্র যদি পাহাড়ীদের হয়, তাহলে সমতল ভূমিও হতে বাধ্য শুধুমাত্র সমতলবাসীদের। কিন্তু এটা কোন

গণতান্ত্রিক বা সভ্যতার সমাধান হতে পারে না। অতএব বন্ধুত্ব আর সহযোগিতাই হোক আদর্শ উপলব্ধি।

এত কিছুর পরও আমি বলব, যারা সংখ্যায় অল্প, তাদের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সভ্যতাবোধ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই দেখাতে হবে। না হলে বড়রাই কেবল পৃথিবী শাসন করত, ছোটদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। ছোট এবং বড় মিলেই সমাজ। বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলের মাটিতে পাহাড়ীরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য, তাঁদের যোগ্য এবং ন্যায্য অধিকার নিয়ে থাকবে, এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সময়ের বিচারে। একই সাথে এও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে যে বাঙালীরা তাদের জীবন-জীবিকার তাগিদে পাহাড়ে বসবাস করে যাচ্ছে বছরের পর বছর, তাদেরও উৎখাত করার দাবিটি সঙ্গত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম মুখ্যত পাহাড়ের আদিবাসীদের, এটি যেমন সত্য, তেমনি সত্য–এই পাহাড়ে সমতলবাসীদের অভিবাসনও।

বিপুল সংখ্যার মানুষের ছোট্ট এই বাংলাদেশে কে কখন কোথায় থাকবে–জীবিকার তাগিদে কে কখন কোথায় আশ্রয় নেবে–সে নিশ্চয়তা দেবে কে! অতএব, পারস্পরিক সহনশীলতাবোধ একান্তভাবে জরুরী।

প্রত্যাশিত চুক্তিটি কবে, কখন স্বাক্ষর করা হবে–তার ঘোষণা এখনও আসেনি। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বা সন্তু লারমা বা তাঁর সমর্থকদের হাতেই এখন জনসংহতি সমিতি আর 'শান্তি বাহিনী'র মূলধারার নেতৃত্ব। এর পরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে, নতুন কিছু সঙ্কটের। পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের একটি অংশ, ধরেই নেয়া যায়, এই চুক্তির বিরোধিতা করবে। বিরোধিতার এই পালা শুরুও হয়েছে। কিন্তু এই সমাজের যে কোন গণতান্ত্রিক মানুষই প্রত্যাশা করবে, যে যে শর্তে প্রস্তাবিত চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে বা দু-পক্ষ মিলেই যৌথ ঘোষণা দিয়েছে, তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। তা নাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী আর সংশ্লিষ্ট বাঙালী অধিবাসীদের নিয়ে যারা ব্যবসা আর দলীয় রাজনীতি করছে–তারাই কেবল লাভবান হবে। একটা কথা ভুললে চলবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্তপাত আর অস্থিতিশীলতার বিনিময়ে অনেকেরই ভাল 'ট্রেড' হচ্ছে। অনেকের কাছেই এই সঙ্কটটি চাকমা, ত্রিপুরা, মগ আর মারমা রমণীদের হাতে স্বল্প হলেও কমবেশি লাভের 'কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি'। এই শ্রেণীটির 'বিগ ইন্ডাষ্ট্রি' করার সুযোগ নেই, সেকারণেই 'কটেজ ইন্ডাষ্ট্রি'-তে তারা মনোযোগী। শুধু দেশী নয়–বিদেশীদেরও কেউ কেউ এতে যুক্ত। এরা চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি রক্তাক্ত হোক, এই অঞ্চলের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল থাকুক, আর বিনিময়ে তাদের কার্যসিদ্ধি হোক। এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কখনই ভেবে দেখে না, তাদের এই লভ্যাংশের বিনিময়ে শত মানুষের জীবন যাচ্ছে,

হাজার মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মতো স্বল্প ভূমিখণ্ডের দেশে বড় একটি জায়গা অব্যবহৃত থাকছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধান কোন্ দল বা কোন্ সরকারের হাতে হচ্ছে, এটা বড় বেশি উল্লেখের ব্যাপার নয়। বড় যা–তা হচ্ছে এর সমাধান। সঙ্কট আর সন্দেহ-অবিশ্বাসের দ্রুত অবসান। জেনারেল এরশাদের পূর্বতন সরকার বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেছে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী কর্মকর্তা পর্যায়ে। সে বৈঠকগুলোতে লাভ কিছু হয়নি। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১০ দফা বৈঠক হয়েছে শান্তি বাহিনীর নেতাদের সাথে। খালেদা সরকারের একজন মন্ত্রী পর্যন্ত সশরীরে গেছেন ত্রিপুরাতে। অলি আহমদ আর রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীনে আলোচনা হয়েছে একাধিকবার। সকল অর্থেই–এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল আগের সরকারগুলোর আমলে। হয়তবা তখন প্রত্যাশিত চুক্তিটি স্বাক্ষর করা যায়নি, এখন যাচ্ছে। কিন্তু তখন যায়নি এখন কেন যাচ্ছে বলে উষ্মা বা দুঃখ প্রকাশেরও কিছু নেই। সময় অনেক কিছুরই নিয়ামক। সেই সময়ই আজ পার্বত্য জেলাগুলোতে শান্তির সু-বাতাস বইতে সহায়ক হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সেই সু-বাতাসকে আমাদের তাই অভিনন্দন জানানো উচিত।

আদিবাসী বা উপজাতি সমাজের সশস্ত্র তৎপরতার একটা ট্র্যাডিশন উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বর্মা কিংবা অধুনা মিয়ানমারের পাহাড়গুলোতে রয়েছে। বান্দরবানের সাম্প্রতিক উগ্রপন্থী তৎপরতার সাথে সীমান্তের ওপারের চরমপন্থীদের যোগসাজশের কথাও শোনা যাচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরই কেবলমাত্র পাহাড়গুলোতে পরিপূর্ণভাবে শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবু এটা ধরে নিতে হবে–প্রস্তাবিত এই চুক্তিটিই হতে যাচ্ছে বৃহত্তর স্থিতিশীলতার পথে একটি বড় রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই চুক্তির ফলে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ 'শান্তি বাহিনী'-কে বিলুপ্ত ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। পাহাড়ের ক্যাম্পগুলো থেকে, ছড়ানো ছিটানো শিবিরগুলো থেকে, সেনাবাহিনী তাদের জন্য নির্ধারিত সেনানিবাসে ফিরে যাচ্ছে। এতে পাহাড়ীদের একটি বড় দাবি পূরণ করা হবে। অন্যদিকে গঠিত হবে শক্তিশালী স্থানীয় পরিষদ–যাতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত হবে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় গোটা পরিস্থিতির একটা সম্মানজনক সমাধান খোঁজা সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবিত চুক্তিটির বাস্তবায়নে দু'টি পক্ষকেই তাই দৃঢ়পদক্ষেপ নিতে হবে। শান্তির সু-বাতাস বইবার যে সুযোগ আজ তৈরি হয়েছে, সেই সুযোগকে স্থায়িত্ব দিতে হবে। বিরূপ প্রচারণা বা ষড়যন্ত্র তো চলবেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে মে ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রস্তাবিত চুক্তি প্রসঙ্গে

অজয় রায়

শেষ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান হয়ত হতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অবশ্য এখনও নিষ্কণ্টক এটা বলা যায় না। বাধা দেবার লোক আছে, মহল আছে, অশান্ত পরিবেশ বজায় রাখার মধ্যে স্বার্থ আছে–এরূপ মহলও আছে আমাদের দেশে।

কোন্ ভিত্তিতে দু-পক্ষের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে পত্র-পত্রিকায় যেটুকু বেরিয়েছে, তাতে মোদ্দা যে কথাটা এসেছে তা হলো, ঐ এলাকার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারা, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি মিলে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর থেকে তাদের যে স্বাতন্ত্র্য সে বিষয়টির স্বীকৃতির ভিত্তিতেই অন্যান্য বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হয়েছে দু'পক্ষ। স্বাভাবিকভাবে যার যার অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসার ফলে অর্থাৎ সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের কারণেই সম্ভব হয়েছে এই সমঝোতা। যে সমস্যা ইচ্ছা করে পাকিয়ে তোলা হয়েছিল এবং যার ফলে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়েছে গত দুই দশকের বেশি সময় জুড়ে সেই সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে একটি শুভ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে জাতীয় সংহতি যেমন মজবুত হবে, তেমনি প্রশস্ত হবে সামগ্রিক উন্নয়নের পথ।

পিছনের দিকে তাকালে মনে হয়, যে চুক্তি আজ হলো, সেই চুক্তি আজ থেকে বিশ বছর আগেও হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, কারণ সেদিনকার সরকার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল সমস্যাটির ব্যাপারে। তার আগে ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হচ্ছিল তখন যখন জাতীয়তার প্রশ্নটি সামনে আসে, তখন সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অন্যদের সাথে পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর পার্থক্যের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর স্বীকৃতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিও একই কথা বলে বঙ্গবন্ধুর কাছে স্মারকলিপি দেয়। পরে বঙ্গবন্ধু যখন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য যান, তখন তাঁর বক্তব্যে এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করে নেন। কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেব সে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন না রেখে নিজ ঘরে পরবাসী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল থেকে বাঙালীদের সেখানে নিয়ে জমি দিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে দেবার প্রয়াস পান। মনে হয় তিনি এই পাঠ নিয়েছিলেন জনাব নূরুল আমিনের কাছ থেকে। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৫০ সালে। স্থান ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে। সেখানে মূলত হাজং কৃষকরা টংক প্রথা অর্থাৎ ধানে খাজনা প্রথা

বিলোপের দাবিতে এবং তার বদলে টাকায় খাজনা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন এক পর্যায়ে সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নিয়েছিল। ১৯৫০ সালে নূরুল আমিন সে দাবি মেনে নেন। কিন্তু তার পর পরেই তদানীন্তন সরকারের প্ররোচনায় সংঘটিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার ছোঁয়া লাগে হাজং অঞ্চলেও। তাছাড়া মুসলিম লীগ ও সরকারের প্ররোচনায় জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোক নিয়ে বসত করানো হয় হাজং এলাকাগুলোতে এবং তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। মনে হয় এরকমই কোন সমাধান চেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা দু'টি–একটি স্বকীয়তা ও অন্যটি জমি। স্বাভাবিকভাবে সংগঠিত প্রতিরোধ শুরু হয় এ সময় থেকে। এ সময়ই দেশত্যাগে বাধ্য হলো অনেকে একদিকে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদলে দেয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে সামরিক তৎপরতা ও নির্যাতন–সব কিছু মিলে অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। এরশাদ এবং পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার আমলেও একই ধারা অব্যাহত থাকে।

পৃথিবীর দেশে দেশে আদিবাসীদের নিয়ে সমস্যা রয়েছে এবং সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে অনেকটা অনুরূপ কারণে। সব জায়গায় সমস্যার সূচনায় আদিবাসীদের স্বকীয়তা অস্বীকারের চেষ্টা এবং তাদের জমি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা হয়েছে। এ থেকে এক সময় প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম হয়েছে অনেক জায়গায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংঘাতের। অভিজ্ঞতা আরও প্রমাণ করেছে যে, এই জাতীয় সমস্যা কোন সময়ই সশস্ত্র সংঘাতের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। দমননীতির মধ্য দিয়ে এক সময় তা স্তিমিত হলেও পরে আরেক সময় তা ফুঁসে ওঠে। সেজন্য শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলেই তার সমাধান খুঁজতে হবে।

প্রশ্ন হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে কি? বিভিন্ন মহল থেকে বাধা যে আসতে পারে, সে কথা আগেই বলেছি। শোনা যাচ্ছে, এই জাতীয় কোন সমাধানের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বসবাসরত বাঙালীদের উত্তেজিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া একটি অশুভ পরিবেশে যারা বৈষয়িকভাবেই লাভবান হয়েছে, তাদের দিক দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা তো আছে। তার একটি সহজ উপায় হলো পাহাড়ীদের মধ্যে নানা কায়দায় কিছু লোককে হাত করে তাঁদের মাধ্যমে উগ্রতা প্রচার করে জটিলতা সৃষ্টি করা। এরকম করা গেলে বাড়তি লাভ হলো, বাঙালীদের বোঝানো যাবে যে, পাহাড়ীদের আসল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাঙালীদের বিতাড়ন। কিন্তু শোনা যায়, জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে যে বাঙালীদের সেখানে বসত করানো হয়েছে, তাদের অপসারণের যে দাবি জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে করে আসা হচ্ছিল, আলোচনায় তারা অর্থাৎ জনসংহতি সমিতি সেখান থেকে অনেকখানি

সরে এসেছে। তাছাড়া সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতেও তারা অর্থাৎ জনসংহতি সমিতি অটল থাকেনি। আর এগুলো নিয়ে পাহাড়ীদের কারও কারও মাঝে উগ্রতা সৃষ্টি যে সম্ভব সে কথা বলে বোঝাতে হয় না। তার ওপর আছে আরেক প্রতিবেশী মিয়ানমারের কিছু সশস্ত্র গ্রুপ–যাদের তৎপরতা সহজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের তৎপরতা বলে চালিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি সম্ভব। সর্বোপরি বাঙালীদের উত্তেজিত করা তো আছেই। যারা এরকম চেষ্টা চালাবে তারা কতদূর সফল হবে তা অবশ্য নির্ভর করবে জনগণের ওপর, অর্থাৎ সরকারের জনসমর্থন কতটুকু দৃঢ় তার ওপর।

আর এ প্রসঙ্গে সত্য কথা হলো, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা প্রভৃতি কারণে জনসমর্থন যতটুকু দৃঢ় থাকা উচিত ছিল গত ১০ মাসে তা হয়নি। বর্তমান সরকার বদল করে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠার মতো সিদ্ধান্তে জনসাধারণ এখনই না পৌঁছলেও একটু একটু করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে আমলাতন্ত্র সমেত নানা ক্ষেত্রে। এই সমস্যাসমূহ যেমন সৃষ্টি করা হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নানা কার্যক্রমের ফলে তা জন্মও নিচ্ছে। বিদ্যুত মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে নানা কারণে। তার ওপর আছে নানা টানাপোড়েন।

অন্যদিকে শক্তির ভারসাম্যের দিক থেকে বিচার করলে এখন পর্যন্ত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই অবস্থা পাল্টানোর জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে জনগণের পর্যায়ে যে প্রচার চালানো প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে অপূর্ণতা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট প্রকট। সদ্য সমাপ্ত কাউন্সিল সভার পর দল হিসাবে আওয়ামী লীগ এখনও সক্রিয় নয়। মূলত ভারতের সাথে সম্পাদিত পানি চুক্তি, উপআঞ্চলিক জোট, ট্রানজিট প্রভৃতি প্রশ্নকে ব্যবহার করে ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে প্রচার চালিয়ে জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমঝোতাকেও একই ধারায় বিরোধিতা করা হবে, তার সাথে নতুন উপাদান হয়ে সংযোজিত যা হলো চুক্তি করে বাঙালীদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে–এই কথা। এই প্রচারে ইন্ধন যোগাবে জামায়াতসহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল। আর সে কারণেই এদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে জনসাধারণের পর্যায়ে যেমন ব্যাপক প্রচার দরকার, তেমনি সরকারের কার্যক্রমকেও সংগঠিত ও উন্নত করা দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত সরকারের কার্যক্রমের মানদণ্ডেই আওয়ামী লীগসহ গণতান্ত্রিক ধারার শক্তিগুলোর সাফল্য বা ব্যর্থতা বিবেচিত হবে জনসাধারণের কাছে।

জনমতকে সংগঠিত করার জন্য সরকার কিভাবে নিজেদের কাজ-কর্ম গুছিয়ে তুলবে, তা ঠিক করতে হবে তাদেরই। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যারা সব কিছু ঠিক আছে বলে সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের আত্মসন্তুষ্টিতে ডুবিয়ে রাখতে চায়, তাদের কথায় কতটুকু কান দেবে সেটা তাঁদেরই নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার আমলাতন্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় আসা এবং টিকে থাকাটা খুশি মনে নেয়নি। তার ওপরে আছে দেশী-বিদেশী নানা মহলের চক্রান্ত। এসবের কারণে নানা মহল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে যখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় তখন তা বুঝে উঠে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রকে দৃঢ়মূল করা ও গণতন্ত্রায়ন একটি কঠিন প্রক্রিয়া। এই কঠিন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্বে জনমতকে যদি সুসংহত না করা যায় তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা কম। আর সে প্রয়োজনেই সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ করা এবং প্রতিক্রিয়ার পক্ষ থেকে যে প্রশ্নগুলো তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে, তার মোকাবিলা করাটা আরেকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ–যা কার্যকরভাবে গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকেই। গত ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ধারার দলগুলোর সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এর পর মতবিনিময় করা হয় বুদ্ধিজীবীদের সাথে। শুধু মতবিনিময় নয়, এই ধারায় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্য কোন কার্যকর উদ্যোগ নেবে কিনা সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে মনস্থির প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে সবার মতামত গ্রহণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নকে সামনে রেখে একথাগুলো বললাম, কারণ আগামীতে যে ইস্যুগুলোকে নিয়ে পানি ঘোলা করার চেষ্টা হবে তার মধ্যে এটি একটি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৫শে মে ১৯৯৭

শরণার্থীদের মধ্যে আস্থা এসেছে

ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসা-উপজাতীয়রা নতুন উদ্যমে ঘর তৈরি করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, খাগড়াছড়ি থেকে: ত্রিপুরা শরণার্থী শিবির থেকে স্বদেশে ফিরে আসা উপজাতীয়রা আবার নতুন উদ্যমে ঘরবাড়ি বাঁধতে শুরু করেছে। সরকারী ত্রাণ ঢেউটিন ও আর্থিক অনুদান দিয়ে কোথাও দোচালা কিংবা কোথাও একচালা ঘর নির্মাণ চলছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরিতে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই ব্যস্ত নয়, মহিলা, কিশোর ও কিশোরীরাও নিরন্তর কষ্ট করে

চলেছে। কেউ জঙ্গল থেকে গাছ বাঁশ নিয়ে আসছে। কেউবা বাঁশের ফলা করে ঘেরা বুনছে।

খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে দীঘিনালা থানার বোয়ালখালী ও কালাচরণ কাঠালীপাড়া গ্রামে সম্প্রতি এ দৃশ্য চোখে পড়ে।

তৃতীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ফিরে আসা ১২শ' ৪৮ পরিবারের মধ্যে ১১শ' ৭১ পরিবারই গৃহ নির্মাণ করেছে। ৭৭টি পরিবার আজও গৃহ নির্মাণ করতে পারেনি। তারা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে রয়েছে। তারা গৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ পর্যন্ত যারা গৃহনির্মাণ করেছে তাদের মধ্যে ৮১২ পরিবার নিজেদের পৈতৃক বসত ভিটায় ঘর তুলেছে। ২৪৯ পরিবার আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ির কাছাকাছিতে ঘর তুলেছে। ভূমিহীন ১১০ শরণার্থী পরিবার সরকারী খাস জমিতে ঘর তৈরি করেছে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল জানান, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন চুক্তির আওতায় ফিরে আসা উপজাতীয়দের মধ্যে ২১ জন চাকরিতে পুনর্বহালের আবেদন করে। আবেদনকারীদের মধ্যে ১৫ জনকে ইতোমধ্যে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে। ৬ জনের চাকরি পুনর্বহালের বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন।

প্রত্যাগত শরণার্থী পরিবারদের মধ্যে যাদের নিজস্ব জমি আছে এমন ২১ পরিবারকে হালের বলদ কেনার জন্য পরিবার প্রতি ১০ হাজার টাকা এবং যাদের জমি নেই এমন ৩০৯ পরিবারকে গাভি ক্রয়ের জন্য ৩ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে পাহাড়ী শরণার্থীদের দখলী ভূমি সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ফিরে আসা শরণার্থীদের মনে আস্থা ও বিশ্বাসের বীজ মজবুত হয়েছে।

এদিকে দীঘিনালা বাজার এলাকায় শরণার্থীদের জায়গায় বসতি স্থাপনকারী ২শ' বাঙালী পরিবার স্বেচ্ছায় বাড়িঘর ভেঙ্গে পাহাড়ীদের জায়গা খালি করে দিতে শুরু করেছে। একই থানার কবাখালী গ্রামে বাঙালী বসতি স্থাপনকারীরা তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। এ গ্রামে বসতি স্থাপনকারী প্রায় ৩ শতাধিক পরিবার বসবাস করছিল। প্রত্যাগত শরণার্থীরা এসব জায়গা নিজেদের দাবি করে ফেরত পাওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি করলে প্রশাসন জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেয়।

দীঘিনালার চিরজীবী চাকমার মা রবামুখী চাকমা জানান, ১১ বছর আগে গ্রাম ছেড়ে ভারতে গিয়েছিলাম। গত ১ এপ্রিল নিজ দেশে ফিরে এসেছি। দেশে ফিরে নিজ ভিটায় বাড়িঘর বাঁধতে পেরে সুখ লাগছে। জীবনের শেষ বয়সে নিজ গ্রামে ফিরে আসার সুযোগে কাল্যমনি চাকমা (৫০) নবজীবনের

ছন্দ পেল। সে এই কথাই বলল। কাল্যমনির সঙ্গে এসেছে একই গ্রামের আচরাও ৫ পরিবার। এরা সকলেই ঘর বাঁধছে। স্বাভাবিক জীবনের গতি নিয়ে বেঁচে থাকার আশায় বুক বাঁধছে। ফিরে আসা সূর্য্যধন চাকমা, স্ত্রী শরৎমুখী চাকমা তাঁর পুত্র কন্যা সন্তানদের নিয়ে টিনের চাল আর বাঁশের বেড়ার ঘর করছে জীবনের শেষ দিনগুলোর জন্য।

অপরদিকে দীঘিনালা থানার নির্বাহী অফিসার এসবিআই শফিক উদ-দৌলা জানান, দীঘিনালায় প্রত্যাবাসিত প্রায় দেড়শ' শরণার্থী পরিবারের কাছ থেকে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তা সমাধানের জন্য এখন প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬শে মে ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা ॥ আর যুদ্ধ নয়!

মুনতাসীর মামুন

'আর যুদ্ধ নয়'–পার্বত্য চট্টগ্রামের যেখানেই গেছি সেখানেই একই সুর–যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়; এখন সমঝোতা চাই। পাহাড়ী-বাঙালী, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রাক্তন শান্তিবাহিনী, সাংবাদিক–সবার মুখে একই কথা। সমঝোতার বিষয়ে দাবিটি আরও জোরদার হয়ে উঠেছে সরকার ও জনসংহতির সর্বশেষ বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে।

হ্যাঁ, আর যুদ্ধ নয়, সমঝোতা চাই, কারণ, সবাই ক্লান্ত।

কারণ, জনসংহতি এমন এক লক্ষ্য বেছে নিয়েছে যা সফল হবার নয়, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি যেখানে শান্তিবাহিনীর দাবি সমর্থন করে না। তবে বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে মনে হয়েছে, সমঝোতা হলেও সঙ্গে সঙ্গে পুরো পার্বত্য এলাকায় শান্তি নেমে আসবে তেমন ভাবার কোন কারণ নেই। সময় লাগবে। সমঝোতায় সবাই আশাবাদী। কিন্তু কি ধরনের চুক্তি হচ্ছে কারও জানা নেই। ফলে, স্বার্থান্বেষী মহল এ সুযোগে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য চুক্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছে। পাহাড়ী-বাঙালী দু'ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। এ কারণে, পার্বত্য এলাকায় চাপা টেনশনের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের কিছু কিছু ব্যক্তি এ ধরনের উস্কানিতে সহায়তা করছে না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে সামগ্রিকভাবে বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে ও লক্ষ্য রাখছে; না হলে যে কোন সময় পার্বত্য এলাকায় যে কোন ধরনের অঘটন ঘটেও যেতে পারে।

প্রথমেই জনসংহতি বা শান্তিবাহিনীর কথা ধরা যাক। পুরো এলাকায় তারা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ভয়ের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ীদের মধ্যে তাদের সমর্থন আছে সত্যি, কিন্তু সে সমর্থন অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত নয় বরং অস্ত্রের ভয়। মাত্র, হাজার দুয়েক সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর পক্ষে এ ভয় সৃষ্টি করা সম্ভব হলো কিভাবে? এখানে বসতিগুলো ছাড়া ছাড়া। দূরতিগম্য। সেনাবাহিনীর দু'দশকের অবস্থানের কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সত্যি, কিন্তু তবুও তা দূরতিগম্য। এ ধরনের এলাকায় আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এক বা দু'জন এসে নিঃস্ব, অসহায় নিরস্ত্র লোকের মাঝে দাঁড়ালেই যথেষ্ট। শান্তিবাহিনী বাঙালী-পাহাড়ী সবার ওপর লেভি ধার্য করেছে। একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া সবাইকে তা দিতে হয়, এমনকি শুনেছি পুলিশকেও। এই চাঁদাবাজি পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

শান্তিবাহিনীর পক্ষে ব্যাপক প্রচার লাভ সম্ভব হয়েছিল ভারতের কারণে। সেখানে ব্যাপক সংখ্যক উপজাতি বাস্তুহারার গমন পাহাড়ীদের পক্ষে সমর্থনের সৃষ্টি করেছিল। তবে, পাহাড়ীদের যারা বাস্তুহারা হননি, তাদের কেউ কেউ বলেছেন, অধিকাংশ বাস্তুহারাকে ভয় দেখিয়ে নেয়া হয়েছে। হিসাব নিলে দেখা যাবে সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে যত বাস্তুহারা গেছে, অন্য অঞ্চল থেকে তত যায়নি। এ ছাড়া শান্তিবাহিনী পাহাড়ীদের ওপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে যা অনেকে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।

এসব কারণ ছাড়াও, জনসংহতি যে আলোচনায় বসছে তার একটি বড় কারণ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পরিবর্তন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে এবং ভারত সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের ভার বহন করতে আর তারা রাজি নয়। পাহাড়ীদের ফিরে যেতে হবে। অস্ত্রের সরবরাহও কমবে। এ ছাড়া যে লক্ষ্যে শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল সে লক্ষ্য অর্জন যে সম্ভব নয়, এটাও পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ফলে, সাধারণ পাহাড়ীরা ক্লান্ত ও হতাশ। তাছাড়া জনসংহতিতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে। যেমন, জনসংহতি বা শান্তিবাহিনীতে চাকমারা আধিপত্য বিস্তার করে আছেন। তাতে মারমা বা অন্য সম্প্রদায় যে খুব সন্তুষ্ট এমন বলা যায় না। সুতরাং, শান্তিবাহিনীর আলোচনায় বসা ছাড়া উপায় ছিল না। অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে যে, জনসংহতি যদি কোন চুক্তিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় তাহলে পাহাড়ীদের মধ্যে হতাশা আরও বাড়বে, বাঙালীরা ক্ষুব্ধ হবে এবং শান্তিবাহিনী আগের মতো কার্যক্রম চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাহাড়ী-বাঙালী অনেকে বলছেন, এটা জনসংহতির জন্য শেষ সুযোগ।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জেনেছি যার সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, তা হলো যে, সরকারের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার পর শান্তিবাহিনীতে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, আলোচনা শেষে সন্তু লারমা যখন এবার দুদুকছড়ি ফেরেন তখন খানিকটা ভিন্ন দৃশ্য দেখা গেছে। আগে দুদুকছড়ি ফিরলে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি খোলামেলা আলাপ করতেন। এবার কিন্তু তা হয়নি। শান্তিবাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীরা এবার তাঁর জন্য নিরাপত্তা কর্ডন সৃষ্টি করে এবং সাংবাদিকদের সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। মিনিট কুড়ি পরে সন্তু লারমা এক বটগাছের নিচে এসে দাঁড়ান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে চলে যান। তিনি যা বলেছেন তার মূল কথা হলো–ধৈর্য ধরতে হবে, নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আশা করি সব ভালভাবেই শেষ হবে। এখন শোনা যাচ্ছে, একক নেতৃত্বে তিনি আর নেই। জনসংহতির একটি অংশ তাঁকে মানতে রাজি নয়। কিন্তু, পর্যবেক্ষকদের মতে, পরিস্থিতির র‍্যাডিকালাইজেশন হলে তা শান্তিবাহিনীর পক্ষে যাবে না। সব ধরনের বিদ্রোহে এমনটি ঘটে, র‍্যাডিকাল ফ্যাকশন হয়ত সন্ত্রাসমূলক কিছু ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু ফলাফল তাদের পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। তবে, এ ধরনের ধারণা চাপা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

দ্বন্দ্ব আছে পাহাড়ী এলিটদের মধ্যেও যাদের অধিকাংশ সম্পন্ন চাকমা। শান্তি প্রক্রিয়ায় তারা যুক্ত হতে না পেরে ক্ষুব্ধ। স্থানীয় বাঙালী নেতৃবৃন্দও ক্ষুব্ধ একই কারণে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই ক্ষোভ আরও জোরদার করছেন। তারা বলছেন, সরকার তাদের স্বার্থ বিকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা তো চুক্তির কোন শর্তই জানি না। আর যে দু'টি বিষয়ে তাঁরা বাঙালীদের ক্ষুব্ধ করে তুলতে চাইছেন সে সম্পর্কে তো শেখ হাসিনা স্পষ্ট কথা বলে দিয়েছেন–এক. বাঙালীদের সরানো হবে না, দুই সামরিক বাহিনী সরানো হবে না।

পাহাড়ী-বাঙালীদের দাবি, প্রতি দাবিতে যৌক্তিকতা কিছু আছে, কিন্তু আছে অতিরঞ্জনও; ভুল ব্যাখ্যা তো আছেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘদিনের অশান্তিতে দু'পাশের যারা এক ধরণের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করেছে সে স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা।

পাহাড়ীরা ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলে তাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা থেকে তাদের কাহিনী শুরু করেন। কিন্তু সে দায়দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের ওপর বর্তাবে কেন? বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে নব্বই পর্যন্ত বিভিন্ন কারণের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে দু'টি কারণ উল্লেখযোগ্য। এক. নিরাপত্তা বাহিনীর অত্যাচার, দুই. বাঙালীদের অভিবাসন। এর মধ্যে সত্যতা নেই এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু এ কথাও তো সত্য যে, এরশাদ আমল

থেকে তাদের সঙ্গে সমঝোতারও চেষ্টা হয়েছে। বিএনপি আমলে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং গত সরকারসমূহের আমলে পাহাড়ীদের প্রচুর সুযোগ-সুবিধাও দেয়া হয়েছে যার অনেক সুযোগ হয়ত তাঁরা গ্রহণ করেননি। আর নব্বই'র পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তনও হয়েছে। জে. জিয়ার আমলে যে সামরিক সমাধানের কথা বলা হয়েছিল এবং যা সৃষ্টি করেছিল তীব্র অসন্তোষের তা পরিত্যক্ত হয়েছে। তার স্থান নিয়েছে রাজনৈতিক সমঝোতা। সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে অন্তত সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাই মনে হলো। তারাও রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। বেসামরিক প্রশাসনের অনেকে জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী এখন আর প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করছে না। তাঁরা শুধু এখন নিরাপত্তা রক্ষায় আছেন। সেনাবাহিনী যে এ দীর্ঘদিনের লাড়ইয়ে ক্লান্ত তা নয়, তবে যে পরিস্থিতিতে তারা আছেন তা সুখকরও নয়। কিন্তু, সরকার যতদিন চাইবে ততদিন তাঁরা সেখানে থাকবেন। পার্বত্য এলাকায় এখন প্রায় ছয় শ' নিরাপত্তা ক্যাম্প আছে। এত ক্যাম্পের অবস্থান নিশ্চয় কারও কাম্য নয় এবং তা পরিস্থিতি স্বাভাবিকের উদাহরণও নয়। তাই তাঁরাও এ পরিস্থিতির অবসান চান। বেসামরিক কর্মকর্তাদের মতামতও তাই। জনসংহতি যে দাবি করছে কোন সরকারের পক্ষেই তা মানা সম্ভব নয়। বাঙালীরা বলছেন যা একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না তাহলো–বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চলে বসবাসরত পাঁচ লাখ পাহাড়ীর জন্য আর কি করা সম্ভব। তাঁরা বলছেন, এখানে সবাই অভিবাসী। কেউ আগে এসেছে, কেউ পরে। আর অনেক বাঙালী বিশেষ বিশেষ ঋতুতে কাজ করতে আসে এবং তারপর ফিরে যায়। সুতরাং একই দেশের বাসিন্দা হয়ে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেন কেন? কৃষির জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিঃস্ব কোন পাহাড়ী যদি ৫% হারে ঋণ পান, তবে একই অঞ্চলে বসবাসরত নিঃস্ব এক বাঙালীকে কেন ঋণের জন্য ১৮% সুদ দিতে হবে? পাহাড়ীরা যদি পার্বত্য এলাকা ছাড়াও বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে একজন বাঙালী নাগরিকের সমস্ত অধিকার ভোগ করেন, তাহলে বাঙালীরা পার্বত্য অঞ্চলে সে অধিকার ভোগ করবেন না কেন। এ ধরনের অনেক কথা আছে যা একেবারে অযৌক্তিক, তা বলা যাবে না।

অন্তিমে সমস্যা দেখা দেবে জমি বন্টন নিয়ে। পার্বত্য এলাকায় জমি সীমিত। পাহাড়ী-বাঙালী সব 'সম্প্রদায়ের'ই জনসংখ্যা বাড়ছে। সে ক্ষেত্রে জমির দাবি মিটানো সহজ নয়। এর বিকল্প হতে পারে, কৃষিভিত্তিক বা বনভিত্তিক শিল্পায়নে যেখানে সব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে টেনশনও কমবে। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে যে আইন আছে তারও সংস্কার করতে হবে। এ আইন শুধু

পাহাড়ীদের জন্য নির্দিষ্ট হলে অন্যপক্ষ বঞ্চিত হবে। সংখ্যালঘু হিসাবে পাহাড়ীরা অবশ্যই কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বা সুবিধা পাবেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া একই সঙ্গে ব্রিটিশ আমলে করা পার্বত্য এলাকা ম্যানুয়েল থাকতে পারে না। দু'ধরনের সমান্তরাল আইন জটিলতার সৃষ্টি করবে।

সবশেষে বলা যায়, সমঝোতায় পৌঁছার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সবাই স্বীকার করছেন সমস্যা সমাধানে শেখ হাসিনার সরকার আন্তরিক। চাপা টেনশন বিরাজ করলেও সবার ধারণা অস্ত্র দিয়ে কখনও কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, আজ পর্যন্ত হয়ওনি। রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা নিঃস্ব পাহাড়ী-বাঙালী এ জটিল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান না, যুক্তও নয়। তাঁরা শান্তিতে শুধু বসবাস করতে চান। এ পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি আলোচনার সঙ্গে যুক্ত শ্রী হংসধ্বজ চাকমাকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জনসংহতি-সরকারী আলোচনার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি কিছুই বলবেন না। তিনি শুধু চান, বাস্তবতার নিরিখে সমাধান হোক। এবং সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে কিছু পর্যালোচনা শুধু বাকি। আমরাও তাই চাই। সমঝোতার পরও হয়ত অসন্তোষ খানিকটা থাকবে, সন্ত্রাসী ঘটনাও কিছুটা ঘটবে, বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামায়াত হয়ত বাঙালীদের নিয়ে রাজনীতিরও চেষ্টা করবে কিন্তু সমঝোতা চুক্তি সমাধানের পথ উন্মুক্ত করবে। তাতে সময় লাগতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে সবাই আশাবাদী। কারণ, পার্বত্য এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠের মত–'আর যুদ্ধ নয়'।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ঠা জুন ১৯৯৭
বান্দরবানের জনতাকে
বিক্ষুব্ধ করা হলো
যে কারণে–

মহসিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম অফিস: সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট, পার্বত্য এলাকায় বিরাজমান শান্তি ভঙ্গ এবং পার্বত্য এলাকার বনজসম্পদ পাচারের চক্রান্তকারীরা ষড়যন্ত্র করে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বান্দরবানের প্রকৃতি সৃষ্ট বিদ্যুত ও পানি সমস্যাকে পুঁজি করে সাধারণ জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার দাবি করে পাহাড়ী এ শহরে অবস্থানকারীদের সংগঠিত করে চক্রটি অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ করেছে বলে বিশেষ একটি সংস্থার সূত্র জানায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক, বিশেষ করে আশু পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচনের ফায়দা লুটতে রাজনৈতিক

সব ক'টি সংগঠনও মাঠে নেমে যায়। চক্রটি সুকৌশলে বান্দরবানে সৃষ্ট সমস্যা বাকি দুই পার্বত্য জেলায় ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

বিশেষ সংস্থার সূত্রটি জানায়, গত ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের ন্যায় বান্দরবানেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিপুল বাগান বিধ্বস্ত হয়েছে। উন্নতমানের কাঠের বনজসম্পদের ক্ষতি হয়েছে। পুরো বন এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে হাইটেনশনের বিদ্যুত লাইন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিদ্যুত লাইন পুনর্স্থাপনের জন্য শক্তিশালী জরুরী কয়েকটি ইউনিট দিনরাত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে পাহাড়ী এ শহরটিতে পানি সঙ্কটও দেখা দেয়। দীর্ঘ দিন ধরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগে নির্বাহী প্রকৌশলীর পদটি খালি থাকায় পানি সমস্যার স্থায়ী সমাধানও না হওয়ায় পাহাড়ী এলাকার লোকজনের ক্ষোভ বিস্ফোরণ ঘটে। দক্ষিণ চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুত সরবরাহ এখন পর্যন্ত পুনর্স্থাপিত না হলেও বান্দরবানের ৩৩ কেভি স্টেশনে ৩০ মে রাতে বিদ্যুত সংযোগ পুনর্স্থাপিত হয়। তার পর হতেই বিভিন্ন উপকেন্দ্রে বিদ্যুত সরবরাহ শুরুর প্রক্রিয়া চলছিল। এ অবস্থায় একটি মহল ডিসি ও এসপির বাসায় বিদ্যুত সরবরাহ আছে এবং বিদ্যুত আনতে দু'জনই ব্যর্থ–এ অভিযোগে ৪/৫ জন স্থানীয় লোক বিদ্যুত-পানির দাবি ও কর্মকর্তাদের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ করে। এ পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ ক্ষতির চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এর পর পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে পুরো শহরে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। পুলিশ প্রশাসনকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখে ২/৩ দিন ধরে। ২ দিন হরতাল হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার তদন্তের পর আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় এমপিকে সমঝোতায় আনার চেষ্টা করে। মহলটি আন্দোলনকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের নেতারা আশু নির্বাচনে নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে নিজেদের জড়িত করে ইন্ধন দেয়।

সংস্থার সূত্র জানায়, বান্দরবানের পাহাড়ী এলাকা থেকে কাঠ পাচারের জন্য ঘূর্ণিঝড়ের অজুহাতে বিভিন্ন প্রকার পার্মিট প্রদানের জন্য চোরাকারবারী মহলটি বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে। পুরো প্রশাসনকে আয়ত্তে আনতে না পেরে মহলটি তাদেরকে সরিয়ে দেয়ার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করে, বিদ্যুত ও পানি সমস্যা নিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রশাসনকে দায়ী করে প্রত্যাহার দাবি করলে বিষয়টি গোপন সংস্থার কাছে ফাঁস হয়ে যায়।

পুলিশ প্রশাসন ও পিডিবি ক্ষয়ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার জন্য পৃথক দু'টি মামলা করেছে। পুলিশ বাদী হওয়া মামলায় ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে সাড়ে ৪ শ' জনকে আসামী করা হয়। যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে পুলিশ তাদেরকে প্রকৃত হোতা বলে দাবি করেছে। উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে শহরে এখনও অসন্তোষ চলছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য বিরোধী একটি মহলও উস্কানি দিচ্ছে। শীঘ্রই শান্তিবাহিনীর সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি বাতিলেরও চেষ্টা চলছে। বর্মীপন্থী পাহাড়ী গ্রুপটি এ ঘটনার সাথে জড়িত কিনা তা সংস্থাটি স্পষ্ট করতে পারেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই জুলাই ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি আলোচনা ব্যর্থ করার চেষ্টা চলছে

আমান-উদ-দৌলা ॥ জনসংহতির সঙ্গে সরকারের যখন পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠিত হবার পথে তখন বিভিন্ন মহল থেকে এই চুক্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ করে দেবার নানারকম উস্কানি এবং তৎপরতা সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সরকারের সদিচ্ছার প্রতি অবিশ্বাস তৈরি বাঙালী, পাহাড়ীদের মধ্যে নতুন করে বিদ্বেষ সৃষ্টি শরণার্থী পুনর্বাসনে অচলাবস্থার নতুন পরিস্থিতি তৈরি, পাহাড়ী গ্রুপগুলোর মধ্যে কোন্দলের সূচনা, নতুন করে শক্ত দাবি উত্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তি চুক্তির পথ বন্ধ করার বিভিন্নমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও আগামীকাল সোমবার ঢাকায় সরকার পক্ষ এবং জনসংহতি নেতারা পুনর্বার বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন। গত ১১-১৫ মে ঢাকায় দু'পক্ষের মধ্যে চতুর্থ সংলাপ শেষে ৫টি ইস্যুর সব বিষয়ে ঐকমত্যের পর উভয়পক্ষের নাটকীয় ঘোষণা ছিল, "শীঘ্রই শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে।" সেই বৈঠকের সূত্র ধরেই আগামীকাল ১৪ জুলাই ঢাকা দু'পক্ষের মধ্যে ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই বৈঠকে শান্তি চুক্তির প্রক্রিয়া, চুক্তির খুঁটিনাটি দিক বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগ-সুবিধার যেসব দাবি রয়েছে, সে সম্পর্কে সরকার পক্ষ তাদের লিখিত মতামতও হস্তান্তর করবে। ইতোমধ্যে জনসংহতির আলোচনাকারী নেতারা ত্রিপুরা থেকে দুদুকছড়িতে এসে পৌঁছেছে বলে খাগড়াছড়ি থেকে খবর পাওয়া গেছে। শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত করতে আরও দু'একটি বৈঠক প্রয়োজন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জুলাই-এর শেষ সপ্তাহ কিংবা আগস্টের প্রথম দিকে এই চুক্তি অনুষ্ঠানের একটা লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে কয়েকটি পরিস্থিতিতে নতুন করে একটা অনিশ্চয়তার পটভূমিও সৃষ্টি হয়েছে।

সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলাকালে গত মার্চে দু'দফায় ত্রিপুরা থেকে ১ হাজার ২৪৮ পরিবারের ৬ হাজার ৭০৩ জন শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করে। এর পর তৃতীয় দফা প্রত্যাবর্তনের আগে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা রঞ্জিত নারায়ণ ত্রিপুরার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পার্বত্য

চট্টগ্রাম সফর করে ফিরে গিয়ে সরকার লিখিতভাবে বেশ কিছু জটিলতার কথা উল্লেখ করেছে। তারা শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত ৩০১টি বিরোধ চিহ্নিত করেছে।

সংলাপে প্রধান যে পাঁচটি ইস্যুতে দু'পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছেছে, সেগুলো হলো–ভূমির ওপর পাহাড়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তিন পার্বত্য জেলায় সেনানিবাস বাদে অন্যান্য সেনা ঘাঁটি প্রত্যাহার, খাস জমিতে বাঙালী সেটলারদের অবস্থান নিশ্চিত, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদে জনসংহতির নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, শরণার্থী ও শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি। ইতোমধ্যে জনসংহতির নেতা ও প্রধান আলোচনাকারী সন্তু লারমার বিরুদ্ধে চরমপন্থী পাহাড়ীরা বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। পাহাড়ী অন্যতম তিনটি সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী-গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন চুক্তির বিষয়বস্তুর সাংবিধানিক গ্যারান্টি ও পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসন দাবি করছে। এদিকে সঞ্চয় চাকমার নেতৃত্বে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একটি ভাঙ্গন ঘটেছে। শক্তিশালী অংশটি স্বায়ত্তশাসন ও সাংবিধানিক গ্যারান্টির পক্ষে।

ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর ৫টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ৮টি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। সোমবারের আলোচনায় আঞ্চলিক আইন পরিষদের আইনগত জটিলতা এবং সাংবিধানিক গ্যারান্টির বিষয়টি জনসংহতির নেতারা তুলবেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাঠামোর ঘোষণাতে চুক্তির আগে প্রকাশের দাবি উঠতে পারে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে জটিল কিছু আইনগত ও প্রশাসনিক সমস্যা রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত ১৯০০ সালের হিলট্যাক্ট মেনুয়াল আইন এবং এরশাদের আমলে ১৯৮৯ সালে তিনটি স্থানীয় পার্বত্য পরিষদ আইন একই সঙ্গে চালু রয়েছে। ১৯০০ সালের আইনে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তিন রাজার অধীনে তিনটি সার্কেলে রাজা এবং তাঁদের নিযুক্ত হেডম্যানরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। ১৯৮৯ সালের আইনে স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তা ছাড়াও সেখানে জেলা প্রশাসন রয়েছে। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। সেখানে নতুন আইনগত কাঠামো প্রবর্তন জরুরী মনে করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সমন্বয় ও শান্তি পরিষদ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ১৯০০ এবং ১৯৮৯ সালের দু'টি আইন বাতিল করে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বজন গৃহীত একটি নতুন আইনের দাবি করেছে। এদিকে জনসংহতি তাদের যুদ্ধ বিরতি ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ত্রিপুরায় অবস্থানরত মোট ৫৫ হাজার শরণার্থীর মধ্যে '৯৪ সালে প্রথম পর্যায়ে দু'দফায় ১ হাজার ২৭টি পরিবারের

৫ হাজার ১৮৬ জন, চলতি সালে বর্তমান সরকারের আমলে ৬ হাজার ৭০৩ জন ফিরে আসে। এখন আরও ৪৩ হাজার শরণার্থী ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই জুলাই ১৯৯৭
আজ আবার বসছে
পার্বত্য শান্তি আলোচনা

আমান-উদ-দৌলা/জীতেন বড়ুয়া ॥ পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আজ সোমবার সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি সংলাপ পুনরায় শুরু হয়েছে। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সরকারের সাথে সমিতির এটা হবে পঞ্চম বৈঠক। সরকারের পক্ষে এতে নেতৃত্ব দেবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক এবং জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্বে থাকছেন বরাবরের মতো সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা ও তাঁর সহযোগীরা গতকালই ত্রিপুরা থেকে সীমান্ত এলাকা দুদুকছড়ায় এসে পৌঁছেছেন। আজ সকাল ১১টায় সমিতির নেতৃবৃন্দ হেলিকপ্টারযোগে সরাসরি দুদুকছড়া থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছবেন।

দুপুর আড়াইটা থেকে শুরু হবে শান্তি সংলাপ। বৈঠকে সরকারের পক্ষে অন্য যাঁরা থাকছেন তাঁরা হলেন, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী এমপি, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার, চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার আলী হায়দার খান, সাবেক যুগ্ম সচিব শরদিন্দু চাকমা। বিএনপির দুই এমপি ওয়াহিদুল আলম ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আলোচকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। বরাবরের মতো এবারও তারা অনুপস্থিত থাকতে পারেন। অন্যদিকে, জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমার সহযোগী থাকছেন রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, আশীষ চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা ও শান্তিপদ ত্রিপুরা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫ই জুলাই ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি সংলাপ ॥ সিদ্ধান্ত ছাড়া প্রথম দিনের আলোচনা শেষ ॥ আজ আবার বৈঠক বসছে

আমান-উদ-দৌলা ॥ পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে গতকাল সোমবার ঢাকায় সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে ৫ম দফা শান্তি সংলাপ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা'য় অনুষ্ঠিত এই আলোচনা বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে। কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে শান্তি বৈঠক আবারও বসবে বলা হয়েছে। রাত ৯টার দিকে বৈঠককারীদের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের জানানো হয়, "আলোচনা শুরু হয়েছে। আরও চলবে। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই বিস্তারিত কিছু বলার নেই।" আজ মঙ্গলবার বৈঠকের পর বিস্তারিতভাবে প্রেস ব্রিফিং করা হবে বলে জানালেন স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের পরিচালক মতিউর রহমান।

তবে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, গতকালের আলোচ্য বিষয় ছিল ২টি পর্বে বিভক্ত। একটি ছিল, শরণার্থী পুনর্বাসনে সৃষ্ট সমস্যা, ২০ দফা প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধা ও ভূমির আইনগত জটিলতা নিরসনে বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা। দ্বিতীয় পর্বে ছিল প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। এই পর্বের আলোচনায় পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটা আইনগত গ্যারান্টি চেয়েছে। সাংবিধানিক গ্যারান্টির ব্যাপারে সরকার পক্ষ আগেই জানিয়ে দিয়েছে, সেটা সম্ভব হবে না। তবে জনসংহতি নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন, যদি সরকার পরিবর্তন হয় তখন শান্তি চুক্তির বিষয়বস্তু বহাল থাকবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি ছাড়াই গতকালের বৈঠক শেষ হয়ে যায়।

প্রথম পর্বের আলোচনায় সরকার প্রস্তাবিত শরণার্থীদের জন্য ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতে ফিরে আসা শরণার্থীদের জন্য ৯ মাসের স্থলে ১ বছরের রেশন, ঘরবাড়ি নির্মাণের নগদ টাকা, হালের বলদ কেনার টাকা পর্যাপ্ত পরিমাণে দাবি করা হয়। সেই সঙ্গে ফেলে যাওয়া জমি শরণার্থীরা ফিরে পেতে গিয়ে যেসব জমি অন্যরা দলিল করে নিয়েছে, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারাই বিক্রি করে গেছে। এ নিয়ে যে আইনগত জটিলতা দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে সুরাহার বিষয় নিয়েও কথা হয় বলে জানা গেছে।

দুপুর ১২টা নাগাদ দুদুকছড়ি থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে জনসংহতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার নেতৃত্বে

সকল পাহাড়ী নেতা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তাঁদেরকে স্বাগত জানান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই জুলাই ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি আলোচনা ॥ চুক্তি প্রক্রিয়া চলছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ "খসড়া চুক্তির প্রক্রিয়া চলছে।" এই একটি মাত্র বাক্য দিয়ে প্রেস ব্রিফিং শেষ করলেন জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনারত সরকার পক্ষের নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। সারাদিন ধরে দ্বিতীয় দিনের মতো শান্তি আলোচনা গতকাল মঙ্গলবার পদ্মা অতিথি ভবনে চলার পর রাত ৮টা ২৩ মিনিটে সাংবাদিকদের ভিতরে ডাকা হলো। ভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ দোতলা থেকে নিচে নেমে দাঁড়ালেন। জনসংহতি নেতা সন্তু লারমাসহ সব নেতৃবৃন্দকেই হাস্যোজ্জ্বল মনে হলো। দু' একটি কথারও জবাব দিলেন সন্তু লারমা। বললেন, "তার শরীর এখন ভাল। শরীরে একটু অসুবিধাত আছেই, সেজন্য তার সঙ্গে ডাক্তার রয়েছে। চট্টগ্রামের সিটি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার, অন্যদিকে রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা প্রমুখ সবাই সাংবাদিকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ শেষ করলেন, 'খসড়া চুক্তির প্রসঙ্গ চলছে, ব্যস আজ এই পর্যন্ত' এই কথা বলে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত অবশ্য সোমবার রাতে মঙ্গলবারের হরতালেও যাতে আলোচনা করা যায় সেজন্য পদ্মা অতিথি ভবনেই রাত্রি যাপন করেন। জনসংহতির নেতাদের সঙ্গে একান্ত আলোচনার একটা বাড়তি সুবিধাও তিনি পেয়ে যান।

সংশ্লিষ্টরা ধারণা দিলেন, একটা স্থায়ী শান্তি চুক্তির কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, আর তাই উভয়পক্ষ সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছেন। সময়ও লাগছে তাই। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিশনের মধ্যস্থতায় শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব আবারও নতুন করে উত্থাপিত হওয়ায় একটা জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় পরিষদ গঠনের কাঠামো নিয়ে বেশ পার্থক্য এখনও রয়ে গেছে। চেয়ারম্যান পদে একজন পাহাড়ী নির্বাচিত হবেন উভয়পক্ষ মেনে নিলেও ভাইস চেয়ারম্যান পদে একজন অ-উপজাতীয় ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারবেন এই বিষয়ে আপত্তি রয়েছে জনসংহতির নেতাদের। ভূমির ওপর পাহাড়ীদের অধিকার এবং তার আইনগত ভিত্তি কি হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। সেনাবাহিনীর অবস্থান সীমিত করা হবে এ

ব্যাপারে অনেকটা ঐকমত্য হয়েছে। শরণার্থীদের সুবিধা নিয়ে সরকারের প্রস্তাবিত ২০ দফা প্যাকেজ কর্মসূচীর বিপরীতে পাহাড়ীদের আরও কিছু দাবি সরকার ভেবে দেখছেন। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বদলে সীমিত পর্যায়ে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে দরকষাকষি করছেন পাহাড়ী আলোচকরা। সবকিছুর একটা আইনগত গ্যারান্টি চাইছেন তারা। সরকারের দিক থেকে সব বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও ১০০ ভাগ দাবি মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাহাড়ী নেতারা বলছেন, পাহাড়ী সব জনগোষ্ঠী এবং আন্দোলনমুখী গ্রুপগুলোকে আস্থায় নিতে হলে, ভূমির ওপর আইনগত অধিকার, স্থানীয় পরিষদের পাহাড়ীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সবকিছুর আইনগত ভিত্তি বা গ্যারান্টি প্রয়োজন। আলোচনা এবং খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজ এখন যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে আলোচনা আজ বুধবারও চলবে। এমনকি চুক্তি চূড়ান্ত করে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরের জন্য আরও এক রাউন্ড বৈঠক প্রয়োজন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৭ই জুলাই ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি আলোচনা আজ শেষ হচ্ছে ॥
সন্তু লারমা ফিরে যাবেন,
ফের বৈঠক হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে একটি শান্তি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ গতকাল বুধবারও অব্যাহত ছিল। চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয়ে এবং বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার এবং জনসংহতির নেতাদের মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গিগত দূরত্ব কমানোর চেষ্টা চলছে। আজ বৃহস্পতিবার এবারের মতো বৈঠক শেষ হবে। আলোচনার পরপর বিকালে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ ফিরে যাবেন বলে জানা গেছে। ৫ম বৈঠকের আলোচনার অগ্রগতি এবং ফলাফল নিয়ে সন্তু লারমা এবং তাঁর সহযোগীরা ত্রিপুরা ফিরে গিয়ে নিজেদের সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে পর্যালোচনার পর আবারও তারা শীঘ্রই টাকা ফিরে আসবেন বলে জানা গেছে। সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার পরই একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ফিরার পর চুক্তির বিষয়বস্তু চূড়ান্ত হবে। পাহাড়ী নেতাদের স্পর্শকাতর দাবিগুলো নিয়ে শেষ কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের উর্ধতন নেতাদের প্রয়োজন হবে।

গতকালের আলোচনা বৈঠক সীমিত পর্যায়ে তিন-তিন মোট ছয়জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে জানা গেছে। সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান কায়সার ও কল্পরঞ্জন চাকমা আর পাহাড়ী নেতাদের মধ্যে সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান ও গৌতম চাকমা ছিলেন। বৈঠক দু'দফায় সকাল ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা, আবার ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলে। গতকাল কোন ব্রিফিং করা হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৮ই জুলাই ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি আলোচনা
চলছে ॥ অগ্রগতির
কোন খবর নেই

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জনসংহতি নেতাদের সঙ্গে সরকারের বৈঠক বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনের মতো অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মায়' গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক চলছিল। বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বারবার খবর দেয়া সত্ত্বেও কোন ব্রিফিং হবে কি না এ ব্যাপারে কোন তথ্য কিংবা কোন প্রকার সাড়া মেলেনি। এমনকি কোন ব্রিফিং করা হবে না এ রকম কোন খবরও পৌঁছানো হয়নি। এর ফলে উপস্থিত ৩০/৩৫ জন সাংবাদিককে সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষার বিড়ম্বনায় থাকতে হয়। পদ্মা অতিথি ভবনের গেটের পুলিশের লোকজনকে কয়েক দফা অনুরোধ করা হয়েছিল চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর কাছে সাংবাদিকদের অপেক্ষা করার কথা পৌঁছানোর জন্য। পুলিশের লোকজন অপারগতা প্রকাশ করে। এমনকি দুর্ব্যবহারও করেছে কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা। প্রতিদিন সাংবাদিকরা গেটে নিয়মিত অপেক্ষা করে থাকেন একথা চীফ হুইপ সাহেবের জানা থাকলেও একদিনের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং ছাড়া নিয়মিত ব্রিফিং কিংবা কোন ব্রিফিং না থাকলে সে খবর রাখার কোন ব্যবস্থাও তিনি করেননি।

নানা সূত্রে খবর মিলছে, শান্তি আলোচনার জন্য আগত পাহাড়ী নেতাদের সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনায় স্থানীয় পরিষদ কাঠামো এবং ভূমির ওপর অধিকার ইস্যুতে যথেষ্ট ব্যবধান বিরাজ করছে।

পূর্ণ ঐকমত্য ছাড়াই এবারের দফার আলোচনা আজ শুক্রবার কিংবা কাল শনিবারের মধ্যে শেষ হবে। নতুন করে শীঘ্রই বৈঠক আবার বসবে। শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের কাজে যেসব জটিলতা দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্য কল্পরঞ্জন চাকমা এমপির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শীঘ্রই ত্রিপুরা যাবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২০শে জুলাই ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি আলোচনা ॥ খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে ঃ হাসনাত ॥ আমার কিছু বলার নেই : সন্তু লারমা

আমান-উদ-দৌলা ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের গেরিলা নেতাদের সঙ্গে সরকারের একটানা ৬ দিনের পঞ্চম রাউন্ড শান্তি সংলাপ বৈঠকটি দৃশ্যত কোন ফল বয়ে আনেনি। তবে সামগ্রিক আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতির আভাস পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মায়' অনুষ্ঠিত টানা বৈঠক শেষে পাহাড়ী নেতারা গতকালই দুদুকছড়ার উদ্দেশে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় আলোচনা শেষে 'পদ্মা' অতিথি ভবন থেকে বেরুনোর সময় সরকারের পক্ষে আলোচনাকারী নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সংক্ষেপে জানান, "খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজ সন্তোষজনক পর্যায়ে"। আরও বলেন, "পরবর্তী বৈঠকটি ভবিষ্যতে যোগাযোগের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে"। –এই সময় তাঁর পক্ষে জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমাও ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি শুধু বলেন, "এই মুহূর্তে আমাদের কিছু বলার নেই"। এরপর উভয়পক্ষের নেতারা অজস্র প্রশ্নের জবাবে নির্বিকার থাকেন। অবিলম্বে গাড়িতে উঠে সন্তু লারমা তাঁর দলবলসহ তেজগাঁও হেলিপোর্টের দিকে রওনা হন। এর আগে সরকার পক্ষের অন্যতম আলোচক কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি কোন কোন সাংবাদিককে জানান, "আমরা একটি চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছি"। ১৪ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই এই ৬ দিন সকাল-সন্ধ্যার টানা আলোচনায় চীফ হুইপকে সহযোগিতা করেন আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান কায়সার এবং কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আর সন্তু লারমার সঙ্গে ছিলেন রূপায়ণ দেওয়ান ও গৌতম চাকমা।

এদিকে খাগড়াছড়ির জনকণ্ঠ সংবাদদাতা জীতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, গতকাল সকাল সোয়া এগারোটার দিকে জনসংহতির নেতারা হেলিকপ্টারে করে দুদুকছড়ায় এসে পৌছান। যোগাযোগ কমিটির মথুরা লাল চাকমা ও মোহাম্মদ শফি তাদেরকে স্বাগত জানান। শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হেলিপ্যাডে পৌঁছে সন্তু লারমা অপেক্ষমাণ উপজাতীয় নারী-পুরুষ ও অভ্যাগতদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়ে গভীর অরণ্যে চলে যান। এ সময় দুদুকছড়া এলাকার সশস্ত্র পাহাড়ীরা কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ

করে। ৬ দিন ধরে সমিতির ৫ দফা দাবি নিয়ে বৈঠক শেষে ফিরে আসার সময় শান্তি বাহিনীর নেতাদের হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল।

দুদুকছড়ার গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে অপেক্ষমাণ ঘনিষ্ঠ কয়েকজন উপজাতীয়দের উদ্দেশে জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা সংক্ষেপে বলেন, "সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। হতাশ হবার কিছু নেই। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিক"। তিনি আরও বলেন, কারও কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে শান্তি আলোচনা যাতে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে পারে এ ব্যাপারে সকলের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতা প্রয়োজন। বৈঠকস্থল থেকে ফিরে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উপজাতীয় যুবক এই তথ্য দেন। শান্তি চুক্তিব স্বার্থে মতবিনিময়কালে সন্তু লারমা বিস্তারিত কোন কথা বলেননি। ঢাকার বৈঠক শেষে খাগড়াছড়িতে ফিরে যাওয়া যোগাযোগ কমিটির আরেক অন্যতম সদস্য বিশ্বজিত চাকমা জানান, শান্তি আলোচনার মোটামুটি অগ্রগতি হয়েছে। ৫ দফার যে বিষয়গুলোতে উভয়পক্ষ চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছেছে তা সঙ্গে সঙ্গে লিখিত আকারে নোট করা হয়েছে। কম্পিউটারে ইনপুট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে বলে ঢাকার একটি সূত্র জানিয়েছে। খাগড়াছড়িতে যোগাযোগ লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় জানান, সরকার আন্তরিক হলে সমস্যা অবশ্যই সমাধানে পৌঁছবে। তিনি বলেন, আমরা দ্রুত এবং স্থায়ীভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান চাই। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো আরও বলেছে, প্রধান পাঁচটি দাবির ব্যাপারে সরকারপক্ষ যথেষ্ট ছাড় দিয়েছে। কিন্তু মূল ব্যবধান রয়েছে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে। সেগুলো হচ্ছে পার্বত্য এলাকার ভূমির ওপর পাহাড়ীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার বা আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামোতে পাহাড়ীদের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব এবং ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু কমিশনের মধ্যস্থতা। এই ক'টি দাবির মধ্যে ভূমি ও নেতৃত্বের প্রশ্নে সরকারপক্ষ তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্বের বদলে প্রাধান্য স্বীকার করেছে। আর শরণার্থীদের পুনর্বাসনে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় সরকারপক্ষ আপত্তি জানিয়েছে। সরকারের পক্ষের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ভূমি ও স্থানীয় সরকারের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব মানা হলে সেটা স্বায়ত্তশাসনের পর্যায়ে যাবে। তাতে গোটা দেশ সাংবিধানিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে। এতে শান্তি সুদূরপরাহত হবে। শরণার্থী পুনর্বাসনে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা অহেতুক বিলম্বিত প্রক্রিয়া ও নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। উভয় পক্ষের নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনে পঞ্চম রাউন্ড বৈঠকটি চূড়ান্ত পরিণতি ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। আগস্টের কোন একসময় দু'পক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে পুনর্বার বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছে বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১২ই আগস্ট ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম ॥ শান্তি প্রক্রিয়া জটিল করতে
শরণার্থী নেতাদের নয়া শর্ত

কূটনৈতিক রিপোর্টার : পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির উদ্যোগকে পরিকল্পিতভাবে কোন কোন মহল ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরায় অবস্থিত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে, এই বিরোধ পিছন থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃতীয় কোন দেশের যোগসূত্র রয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠাকে জটিল করার জন্য শরণার্থী নেতারা নতুন কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, যা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এর মধ্যে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত তিন দিনের আলোচনা ভেঙ্গে গেছে গত শনিবার। আগামী শীতে কয়েক হাজার চাকমা শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে সরকারী ৬ সদস্যের প্রতিনিধি কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি'র নেতৃত্বে ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। আলোচনায় শরণার্থী কল্যাণ সমিতির অন্যতম নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা তিনটি নতুন দাবি তুলেছেন। এই দাবি ক'টি হচ্ছে, ১৯৬০ সালের পর যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করে ত্রিপুরা ও মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকেও (৩৫ হাজার) ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু কমিশনকে জড়িত করতে হবে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত করতে হবে। উপেন্দ্রলাল চাকমা সরকারী পক্ষের শান্তি প্রক্রিয়ার নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগ করেছেন, গত মার্চ ও এপ্রিলে যে সব শরণার্থী ফিরে এসেছেন তাঁদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। ২০ দফা প্যাকেজ কর্মসূচী ঠিকমতো নেয়া হয়নি। ভূমির ওপর তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি সরকার রক্ষা করেনি। সরকারের আন্তরিকতার প্রশ্ন তোলেন। সরকারের পক্ষে কি করা সম্ভব তা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই করে দেখাতে হবে–এই আলটিমেটামের পর ৬ সদস্যের সরকারী প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে এসেছেন। ২০ দফা প্যাকেজ কর্মসূচীতে প্রতিশ্রুত ৯ মাসের রেশনের বদলে এক বছরের রেশন চাওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সংঘর্ষে নিহত পাহাড়ী ৮০ জনের পরিবারের জন্য ৭ হাজার করে টাকার ব্যাপারেও সরকারের কোন আপত্তি নেই, তা অচিরেই দেয়া হবে বলা হয়। অনেকের ওপর মামলাও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু কমিশনকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়ায় জড়িত করার ব্যাপারে সরকার বরাবরই অনিহা প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া এটা একটা নতুন দাবি ভারত

সরকারও তা মেনে নিতে রাজি নয়–সরকারী আলোচকরা সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এদিকে ৬ সদস্যের সফরকারী দলের নেতা কল্পরঞ্জন চাকমা দেশে ফিরে জানিয়েছেন, শরণার্থী নেতারা অবাস্তব দাবি তুলছেন নতুন করে। তাঁদেরকে তিনি বাংলাদেশে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সরেজমিনে ঘুরে দেখে যেতে বলেছেন, কিন্তু তাঁরা তাও দেখতে রাজি নন। তার পরও সরকার শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, পাহাড়ীদের রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গে সরকারের ৫ রাউন্ড শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত জুলাই (১৪-২১) তে ৫ দিনব্যাপী ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে শান্তি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ এগিয়ে রাখা হয়েছে। সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতির বড় অংশটি সরকারের সঙ্গে দ্রুত একটা স্থায়ী শান্তির জন্য চুক্তি করার পক্ষে। অন্যদিকে উপেন্দ্রলাল চাকমাসহ বেশ কিছু শরণার্থী নেতা বিভিন্ন অভিযোগ তুলে এই শান্তি প্রক্রিয়া জটিল করে তুলছেন। জনসংহতির নেতৃত্বকে তাঁরা মানতে রাজি নন। বিভিন্ন উপদলকে উপেন্দ্রলাল চাকমা শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন বলে জানা গেছে।

অপর দিকে আরও জানা গেছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তৎপর উল্‌ফা, নাগা, মিজো বিদ্রোহীদের যে সব গ্রুপ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পথে পাকিস্তানী সাহায্য এবং মদদ পেয়ে এসেছে তাদের অনেকেই এখন চাকমাদের বিভিন্ন উগ্রপন্থী গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে, তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য রসদ যোগানের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে যে কোন মূল্যে শান্তি প্রক্রিয়া পিছন থেকে ভণ্ডুলের চেষ্টা নেয়া হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য সমস্যা ॥ ১৪ সেপ্টেম্বর
জনসংহতির সঙ্গে চুক্তির
সম্ভাবনা কম

ফজলুল বারী ॥ চৌদ্দ সেপ্টেম্বরের বৈঠকেও জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা কম, তবে আসন্ন বৈঠকটি দু'পক্ষকে চুক্তির পথে আরও অগ্রসর করবে। এ তথ্য দিয়েছে জনসংহতি সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র। এখন শরণার্থী ইস্যুটি ট্রাম্পকার্ডের অবস্থায় আছে। জনসংহতির সাথে চুক্তি হয়ে গেলে বাকি শরণার্থীদেরও দেশে ফিরার বিষয়টি সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে নতুন দফা শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সরকারপক্ষও বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। চিন্তা-তৎপরতাও

চলছে সেভাবে। আগামী বৈঠকের আগে সে জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বিশেষ কিছু বিষয়ে আলোচনায় বসবেন ধারণা করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স সফর শেষে দেশে ফিরার পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে চীফ হুইপের এই বিশেষ আলোচনাটি হবার সম্ভাবনা আছে।

সামনের বৈঠককে কেন্দ্র করে জনসংহতি নেতারা নিজেদের মধ্যে খুঁটিনাটি আলোচনা চালাচ্ছেন। চুক্তি প্রশ্নে ভারত সরকারের মনোভাব এখনও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আছে। ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরী সম্প্রতি আগরতলায় সাংবাদিকদের বলেছেন, সেখানে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে শান্তিবাহিনীর ৮টি ক্যাম্প। বিদ্রোহী এই পাহাড়ী বাহিনীতে নতুন রিক্রুটিংও বন্ধ আছে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এখন কাঁঠালছড়িসহ বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরেই অবস্থান করছেন। সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির এখন পর্যন্ত সমঝোতা অনুসারে চুক্তি স্বাক্ষর কার্যকরের পর এই বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। তার আগে জনসংহতি সমিতি শান্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। চুক্তি কার্যকরের পর বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হবে পার্বত্য এলাকার পুলিশ বাহিনীতে। সরকার যোগ্যতা অনুসারে সাব ইন্সপেক্টর পর্যায় পর্যন্ত পদে এদের নিয়োগে রাজি হয়েছে। জনসংহতি সমিতির দাবি এর চেয়ে বেশি। পার্বত্য এলাকার সকল নিয়োগেও তারা অগ্রাধিকার চায়। সরকারপক্ষ বলেছে, এটা মানা সম্ভব ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদ পর্যন্ত।

আঞ্চলিক কাউন্সিল এবং ভূমি বিরোধ ফয়সালায়ও দু'পক্ষের অবস্থান এখন অনেক কাছাকাছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার কার্যক্রম জোরদারের সমন্বয়ের জন্য উভয়পক্ষ ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠনে একমত হয়েছে। একজন উপজাতীয় পুরুষ বা মহিলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন। কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য থাকবেন অউপজাতীয়। দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছাড়াও তিনজন উপজাতীয় মহিলার সংরক্ষিত আসন থাকবে কাউন্সিলে। পাঁচ বছর মেয়াদী কাউন্সিলে একটি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ রাখতে চেয়েছিল সরকারপক্ষ। জনসংহতির আপত্তির মুখে সরকার প্রস্তাবটি থেকে সরে আসে। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি জরিপ ও ল্যান্ড কমিশন গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য হলেও এর কার্যপরিধি নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে এখনও ভিন্নমত আছে। সমঝোতা হয়েছে জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেয়া, বাতিলের ক্ষমতা কমিশনের থাকবে। জনসংহতি সমিতি চার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত জমি, রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে শুরু করে কাপ্তাই বাঁধ সবকিছুই থাকবে এই কমিশনের কর্তৃত্বে। এছাড়া তাদের দাবির মধ্যে আছে

বাঙালী সেটেলারদের কাছে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ, পাহাড়ীদের জমি অপাহাড়ীদের কাছে বিক্রি নিষিদ্ধ, অপাহাড়ীদের অধিকারে থাকা জমি, পাহাড়ের মালিকানা বাতিল ইত্যাদি। তা ছাড়া বাজার, পৌর এলাকায় জমি বিক্রি, লিজ বা লাইসেন্সের বিষয়টিও কমিশনের হাতে রাখতে চায় সমিতি। সরকার এসব বিষয়ে এখনও রাজি হয়নি। পার্বত্য এলাকা থেকে বাঙালী সেটেলারদের উচ্ছেদের দাবি সমিতি অবিরাম করে আসছে। সেনা ক্যাম্পের বদলে সেনানিবাস রাখার সরকারী দাবির প্রশ্নে তারা আগের চেয়ে নমনীয়। তবে ১৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে এবং চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এসব নিয়ে তারা সরকারের সাথে আরও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করবে। উল্লেখ্য, আগামী বৈঠকটি হবে জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের ৬ষ্ঠ বৈঠক। আগের ৫টি বৈঠকের মাত্র ১টি হয়েছে খাগড়াছড়িতে। এর আগে এরশাদ আমলে ৬টি, খালেদা আমলে ১৩টি ব্যর্থ বৈঠক হয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কাজ ফের শুরু হতে যাচ্ছে ॥ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপেন চাকমার বৈঠক

ফজলুল বারী ॥ চাকমা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কাজ আবার শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। গতকাল শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার একটি একান্ত বৈঠকের পর নাটকীয় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সর্বশেষ দফা প্রত্যাবাসন পর্বে ৭ হাজারের বেশি শরণার্থী দেশে ফিরলেও নানা অভিযোগ-অসন্তুষ্টিতে সমস্যাটি আবার আটকে যায়। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, শান্তিবাহিনীর সাথে পরবর্তী দফা বৈঠকের আগে এটি একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। আগামীকাল রবিবার ঢাকায় এই বৈঠক শুরু হচ্ছে।

সূত্র বলেছে, উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল সকালে রাজধানীতে আসেন। শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার টাস্কফোর্সের যে দলটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে গিয়েছিল তারাই উপেন বাবু এবং প্রভাকর চাকমাকে সাথে করে নিয়ে আসেন ঢাকায়। অসমর্থিত একটি সূত্র বলেছে, এই দু'জন ঢাকায় ধানমন্ডির একটি অফিসে এবং সরকারী দলের দুই নেতার সাথেও দেখা করতে গিয়েছিলেন। দুপুরের পর তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যান। প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁদের বৈঠক দেড়-দু'ঘণ্টার মতো স্থায়ী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এ সময় উপস্থিত

ছিলেন। সূত্র বলেছে, শরণার্থী নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনের প্রতিনিধি প্রত্যাবাসনে সম্পৃক্ত করার তাদের সর্বশেষ দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেছেন। উল্লেখ্য, এরশাদ আমলে উপেন্দ্রলাল চাকমা দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে ভারতে চলে যান। খাগড়াছড়ির জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে তিনি যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী না হন সেজন্য তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল এমন অভিযোগও আছে। এক যুগেরও বেশি সময় পর উপেন্দ্র আবার দেশে আসলেন। বিবিসি খবরে গত রাতে বলা হয়–উপেন্দ্রলাল চাকমা ঢাকা থেকে চলে গেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সেখানে তিনি পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের নেতা কল্পরঞ্জন চাকমার সাথে বৈঠক করেন। আজ তাঁর আবার ত্রিপুরা ফিরে যাবার কথা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ॥ আজ আবার সংলাপ

ফজলুল বারী ॥ আজ রবিবার আবার শান্তি সংলাপ শুরু হচ্ছে ঢাকায়। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরতিহীন চেষ্টার অংশ হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির এটি হবে ষষ্ঠ দফা বৈঠক। একাধিক সূত্রের ধারণা, প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সরাসরি বৈঠকের আগ্রহ নিয়ে এবার ঢাকায় আসছেন পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ। সরকারী তরফ থেকে দ্রুত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের তাগিদ এ দফায়ও থাকবে। এই চুক্তিকে সামনে রেখে পাহাড়ী সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নতুন করে মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। সেজন্য জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা নাটকীয় কোন ভূমিকায় যেতে পারেন এমন ধারণাও আছে। তবে কোন পক্ষই আগাম নিশ্চিত করে কিছু বলছেন না। কাল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ বা আগাম মন্তব্য প্রশ্নে উভয়পক্ষ ছিল ভীষণ সতর্ক।

ধারণা করা হচ্ছে, ভূমি সমস্যার বিষয় এবারও মূল আলোচ্য বিষয় থাকবে। জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রিজার্ভ ফরেস্ট, কাপ্তাই বাঁধ ছাড়া পুরো এলাকা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষে। সরকার তরফ থেকে বলা হয়েছে, জমির মালিক রাষ্ট্র। এটি অন্য কারও কাছে ন্যস্ত করা যায় না। ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে উভয়পক্ষের মধ্যে। একজন উপজাতীয়কে এই মন্ত্রণালয়ের নির্বাহীর দায়িত্ব দেয়া হবে। তবে তিনি কেবিনেট না প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন হবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

পার্বত্য এলাকার সব কর্মসংস্থানের কর্তৃত্বও আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ন্যস্ত চায় জনসংহতি সমিতি। সরকার তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ কর্তৃত্ব তাদের দিতে রাজি হয়েছে। পুলিশের নিয়োগ সম্পর্কে সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা পর্যন্ত কর্তৃত্ব দিতে সম্মত হয়েছে সরকার। এসব বিষয়সহ পুরনো অমীমাংসিত বিষয়-আশয় নিয়ে এবার নতুন করে চূড়ান্ত দফা আলোচনা হতে পারে। জনসংহতি নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরাসরি কথা বলতে চান। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার সাথে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর এই দাবি আরও জোরালো হতে পারে।

একটি সূত্র বলেছে, এবার বৈঠক দু'দিন স্থায়ী হবে। আরেক সূত্রের মত হচ্ছে, তা তিন চার দিনেও গড়াতে পারে। সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল ১৪ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত। বৈঠক উপলক্ষে সন্তু লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি নেতৃবৃন্দ গতকাল সকালে খাগড়াছড়ির সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়ি পৌঁছেছেন। আজ সকাল সোয়া দশটায় হেলিকপ্টারে তাদের সেখান থেকে নিয়ে আসার কথা। তবে এ কর্মসূচী নির্ভর করবে আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর। জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান কায়সার তাদের দুদুকছড়ি থেকে নিয়ে আসবেন। ঢাকায় পুরনো বিমানবন্দরে তাদেরকে যথারীতি অভ্যর্থনা জানাবেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের পুরনো সব সদস্য এবারও উপস্থিত থাকার কথা বৈঠকে। দুপুর আড়াইটার দিকে এই বৈঠক শুরু হবার কথা।

খাগড়াছড়ির খবর–চুক্তির প্রশ্নে অগ্রগতিকে সামনে রেখে পাহাড়ী সংগঠনগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে, সন্তু লারমার সমর্থকরা পাহাড়ী গ্রামগুলোতে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ৮ সেপ্টেম্বর রাতে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর এলাকায় হোয়াং বৈ ওবা নামের উপজাতীয় যুবকদের পাঠাগার ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়। এই পাঠাগার সেখানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদর দফতর হিসাবে পরিচিত। ১৯৯৪, ১৯৯৬ সালে দু'দফায় পাঠাগারটি ধ্বংস করা হয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি

দীর্ঘ প্রলম্বিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সমাধান এবার হতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সরকারী সূত্র থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য

চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির বৈঠক শুরু হচ্ছে। এটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক। আর রাজধানী ঢাকায় এই নিয়ে পঞ্চম বার বৈঠক বসছে। গত বছরের মাঝামাঝি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ১১ বছরের পুরনো উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানেও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং ভারত থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়। পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতিও বর্তমান সরকারের নমনীয় মনোভাব এবং বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে তিনটি জেলায় বিভক্ত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট ভূমির পরিমাণ ৫ হাজার ৯৩ বর্গমাইল। কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। অথচ ঐ অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ায় কৃষি সম্প্রসারণ দুরূহ বলে শিল্পায়ন বা বিকল্প কিছু করা সম্ভব হয়নি অশান্ত পরিস্থিতির কারণে। এর উপরে আদি পাহাড়ী জনগণ এবং বসতি স্থাপনকারী অপাহাড়ী বাঙালী জনগণের মধ্যে ভূমির দখল নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৪ লাখ সাড়ে ৯৮ হাজার পাহাড়ী জনগণের বিপরীতে অপাহাড়ী বাঙালী বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৬৯ হাজার। স্বাভাবিকভাবেই তাই সীমিত চাষযোগ্য ভূমি নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। আশির দশকের বিএনপি শাসনামলে সুপরিকল্পিতভাবে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপাহাড়ী জনগণকে এনে সরকারী তত্ত্বাবধানে বসতি স্থাপন করানো হয়। এর পর থেকেই মূলত সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। এ বছর জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম ঢাকা বৈঠকে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল, সেগুলোর অন্যতম ছিল জাতীয়তা ও ভূমিপুত্রদের অধিকার বিষয়ক সমস্যা, আঞ্চলিক শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিয়ে সমস্যা। পাহাড়ী সশস্ত্র বিদ্রোহী সমস্যা এবং শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যা। জানুয়ারি মাসের ঐ বৈঠক থেকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন।

পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ধীরে ধীরে সমঝোতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে পাহাড়ী শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়েছিল গত মার্চ মাস থেকেই। এ সম্পর্কে সরকার ও শরণার্থীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে একটি যৌথ ঘোষণাও দেয়া হয়। এরপর শান্তিচুক্তির প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতি পালন করে। কিন্তু নানাভাবে এই

সমঝোতা এবং শান্তির পথের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে পাহাড়ী-অপাহাড়ী জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির। প্রকৃতপক্ষে সরকার এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ অতীতের তিক্ততা এবং পুরনো সঙ্কটের গণ্ডি ছেড়ে বর্তমান বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় এনে ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। অতীতে পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে বহু ঘটনা ঘটেছে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে নিয়ে নিকট অতীত পর্যন্ত পাহাড়ী জনগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি নিয়ে ঘৃণ্য রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক খেলা চলেছে। এমনকি বহির্শক্তির রেষারেষির ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে পাহাড়ী জনগণকে। শান্তি বিনষ্ট করা হয়েছে নানাভাবেই।

যে কোন অঞ্চলের ওপরই ভূমিপুত্রদের একটি আলাদা অধিকার থাকে, তার ওপর সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলে এবং উন্নয়নের জাতীয় ধারার থেকে কোন অঞ্চলের জনগণের বিচ্ছিন্ন করে রাখলে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। শুধুমাত্র অপাহাড়ীদের বসতি স্থাপনকে উৎসাহিত না করে তার সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হতো তাহলে সশস্ত্র রেষারেষিটা হয়ত এড়ানো যেত। কিন্তু এ দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি এতদিন। ফলে সাংস্কৃতিক দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দূরত্ব এবং অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে গেছে দিনে দিনে। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বে এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বইছে। যে কোন জাতি ও সংস্কৃতির লোকই চাইছে এই প্রবাহে শামিল হতে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল অবহেলিত এবং সমস্যা অঞ্চল হিসাবেই থেকে যাবে–এটা হতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্ডারফার্থসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সফর এবং তাঁদের কথাবার্তায়, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্যভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বহির্বিশ্বের অনেকেই এখন বাংলাদেশের উন্নতি এবং এ দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী। আমরাও চাই শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, বিশেষত দেশের নয়নাভিরাম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষরা জাতীয় উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত হোক ও অবদান রাখুক–এটাই কামনা। আশা করি আজ থেকে শুরু হওয়া ষষ্ঠ বৈঠক সফল হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

অক্টোবর থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মধ্য অক্টোবর থেকে আবার শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হচ্ছে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে এবার প্রত্যাবাসন শুরুর পর তা অব্যাহতগতিতে চলবে। কোন সমস্যা দেখা দিলে দু'পক্ষ বসে ত্বরিত তা সমাধান করা হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরায় এখনও ৪০ হাজারের বেশি শরণার্থী আছেন। সর্বশেষ সরকারী হিসাবের পর যে সংখ্যা নতুন জন্মের কারণে বেড়েছে তাদের নিয়ে নতুন একটি শুমারির জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

ভূমি সমস্যা, শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা

পার্বত্য সংলাপ শুরু

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : সন্তু লারমা অসুস্থ। সে জন্য ষষ্ঠ দফা শান্তি বৈঠকেব প্রথম দিনের আলোচনা বিস্তারিত পর্যায়ে চলেনি। তবে আজ সোমবার সকাল ১০টায় এই বৈঠক শুরু হয়ে দীর্ঘক্ষণ চলার সম্ভাবনা আছে। সরকারী একটি সূত্র গত রাতে এ খবর দিয়েছে। তবে সূত্রটি বলেছে, সন্তু লারমার অসুস্থতা গুরুতর কিছু নয়। তাঁর গায়ে কাল জ্বর ছিল। এ অবস্থায় তিনি সঙ্গীদের নিয়ে হেলিকপ্টারে ঢাকায় উড়ে আসেন। দুপুর ১২টা ৫৩-তে তিনি ঢোকেন রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মায়। লাঞ্চের পর বিকাল ৩টার দিকে বৈঠক শুরু হয়। হালকা মেজাজের প্রথম দিনের বৈঠকে মূলত ভূমি সমস্যা ও শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়েই আলোচনা সীমিত থাকে। পঞ্চম দফা বৈঠকের নানা প্রশ্নের উত্তর এবং নিজস্ব সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে লিখিত একটি বক্তব্য সন্তু দিয়েছেন সরকার পক্ষের মুখ্য আলোচক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ'র হাতে। চীফ হুইপ এরপর জনসংহতির সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ানকে নিয়ে একদফা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন। তবে এ পর্বটিও ছিল সংক্ষিপ্ত। চীফ হুইপের সাথে ছিলেন কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান কায়সার। উল্লেখ্য, এ দফার বৈঠক উপলক্ষে জনসংহতির সুধাসিন্ধু খীসা, রজোৎপল ত্রিপুরা এবং যোগাযোগ কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দলের পুরনো সদস্যরাও এসেছেন। জাতীয় কমিটির পক্ষে

চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, জাপার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী এমপি, বীর বাহাদুর ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন। ফজলে রাব্বী এরশাদের সাথে বগুড়ায় আর বীর বাহাদুর মিসর সফরে রয়েছেন।

ভূমির দাবিতে জনসংহতি গতকালও বলেছে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের কর্তৃত্বের কথা। তাদের বক্তব্য, এ সম্পর্কিত ভূমি কমিশন কাজ করবে আঞ্চলিক কাউন্সিলের পরামর্শে। আর বাঙালী সেটেলার সম্পর্কে তাঁদের দাবি হচ্ছে, এদেরকে সরিয়ে নিতে হবে পাহাড়ী বসতি থেকে দূরে সরকারী খাস জমিতে। অপাহাড়ীদের কাছে সেখানে জমি বিক্রির বিষয়েও তারা নিষেধাজ্ঞা জারি চায়। সরকার পক্ষ বলে আসছে এসব দাবি অসাংবিধানিক, কারণ জমির মালিক রাষ্ট্র। তবে ভূমি কমিশনই এসব সমস্যার সমাধানের রূপরেখা তৈরি করবে। এর আগে পার্বত্য এলাকায় নতুন একটি ভূমি জরিপের আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। সরকার পক্ষের গতকালেরও বক্তব্য ছিল, শরণার্থী প্রত্যাবাসন তাঁরা আগামী শীতের আগেই জোরেশোরে শুরু করতে চান। এ সম্পর্কে জনসংহতি নেতাদের উপেন চাকমার সাথে সরকারী তরফের আলোচনা বিস্তারিত জানানো হয়। তাঁদের কাছে চাওয়া হয় আন্তরিক সহযোগিতা। সূত্র বলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক পরিষদ যে দুটোর বিষয়ে উভয়পক্ষ অনেকটা ঐকমত্যে পৌঁছেছে তা একটি বড় অগ্রগতি। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। সে জন্য স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য মন্ত্রণালয়টি থাকবে একজন পূর্ণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে। জনসংহতি নেতারা এ পদেও একজন পাহাড়ীকে চান। এ বিষয়টি নিয়েও তাঁদের নমনীয় করার চেষ্টা হচ্ছে। কারণ মন্ত্রী কোন্ শ্রেণী, পেশার বা বর্ণের হবেন সেটাও আগেভাগে দাবি করাটা সংবিধানসম্মত নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পাহাড়ী শরণার্থী প্রত্যাবাসনে বিরোধিতা না করার আশ্বাস দিয়েছেন সন্তু লারমা ॥ বৈঠক চলছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : ত্রিপুরায় শিবিরবাসী পাহাড়ী শরণার্থী প্রত্যাবাসনে সরকারের উদ্যোগে বিরোধিতা না করার আশ্বাস দিয়েছেন সন্তু লারমা। জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা অবশ্য এই আশ্বাসটি দেন রবিবারের বৈঠকেই। এছাড়া সোমবারের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে আঞ্চলিক কাউন্সিল, ভূমি সমস্যা এবং ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে অনেক কিছুতেই ঐকমত্য হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের বৈঠকের বেশিরভাগ সময় কথাবার্তা হয় সেই পুরনো এবং জটিল ভূমি সমস্যা নিয়েই। ভূমির বিষয়ে চতুর্থ বৈঠকে উপস্থাপিত ৯ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছেই। সরকার প্রথমে চাইছিল শুধু শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান। জনসংহতি অবশ্য এ বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী সব পাহাড়ীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগের দাবিদার। দ্বিতীয় দিনের বৈঠক সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়ে প্রথম পর্বে দুপুর দুটো পর্যন্ত চলেছে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে বিকাল সাড়ে ৩টায়। সাড়ে ৭টায় শেষ হয় এই পর্ব। সাংবাদিকদের গতকাল সোমবারও কোন ব্রিফিং দেয়া হয়নি। এক লাইন খবরের আশায় সাংবাদিকদের বড়সড় একটি দল রাত পর্যন্ত অপেক্ষমাণ ছিলেন অতিথিশালা মেঘনার ফটকে। তাদের এড়াতে দায়িত্বশীলরা প্রতিবারই বেরিয়ে গেছেন পদ্মার ফটক পথে।

ওয়াকিবহাল একটি সূত্র বলেছে, চতুর্থ দফা বৈঠকে জনসংহতি ভূমি সমস্যার বিষয়ে যে ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করেছিল সেটিকে সূত্র ধরেই আলোচনা শুরু হয়। এই ভূমি সমস্যার সাথে জড়িত বাঙালী সেটেলার ইস্যুটিও। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫ হাজার ৯৩ বর্গমাইল আয়তনের চাষযোগ্য জমি ২৩ হাজার ২ একর। ৫৪ হাজার একর জমি ডুবে আছে কাপ্তাই বাঁধের কারণে। ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৪৪৭ জন পাহাড়ী, ৩ লাখ ১১ হাজার ২৬৭ জন অপাহাড়ীর বাস সেখানে। ৯ দফা দাবিতে ভূমি সম্পর্কিত সবধরনের কর্তৃত্ব জনসংহতি রাখতে চায় প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের হাতে। অপাহাড়ীদের কাছ থেকে ভূমির মালিকানা পুনরুদ্ধার, তাদের কাছে নতুন করে তা বিক্রি বা হস্তান্তরে স্থায়ী বিধিনিষেধ তারা চায়। সরকার পক্ষ থেকে এখনও বলা হচ্ছে এমন কোন দাবি মানা সম্ভব নয় যা দেশের সংবিধান অনুমোদন করে না। এসব খুঁটিনাটি বিষয়াদি তাঁদের বুঝানোর চেষ্টা হচ্ছে। জনসংহতি বাঙালী সেটেলারদের তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে তুলে নিয়ে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসনের পক্ষে। এটিও যে ঢালাও মানা সম্ভব নয় সেটিও তাদের বলা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে গতকালের বৈঠকেও বলা হয়–শরণার্থীদের কোন জমি অবৈধভাবে কারও জবরদখলে থাকলে সরকার তা পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত পাহাড়ী মালিকদের কাছে দখল বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত। পরবর্তী দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনকে সামনে রেখে সরকার যে এই বিষয়টির ফয়সালায় আগ্রহী সেটিও তাঁদেরকে বলা হয়েছে। সূত্র বলেছে, সরকার অক্টোবর মাসের মধ্যে পনেরো হাজারের বেশি শরণার্থীকে ফিরিয়ে আনতে চায়। আগের দফায় যাঁরা এসেছেন তাঁদের চেয়ে আগামীতে যাঁরা আসবেন তাঁদের জমি সমস্যা বেশি হবার সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই এই বিষয়টির ফয়সালায় জোর দেয়া হচ্ছে। সরকার পক্ষের সর্বশেষ অবস্থান ছিল–ভূমি কাউন্সিলের কাছে থাকলেও

সেটেলমেন্টের কর্তৃত্ব থাকতে হবে রাষ্ট্রের কাছে। একইভাবে ডিসি, এসপিদের এসিআর লেখার কর্তৃত্ব কাউন্সিলের হাতে থাকবে না। ভূমির বিষয়টি কতদূর এগোচ্ছে এটা জানতে চাইলে দায়িত্বশীল এক কর্মকতা বলেন, আইনগত খুঁটিনাটির বিষয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে–যাতে প্রত্যাশিত সমাধান পরে কোন মামলার ফাঁক-ফোকরে আটকে না যায় এটা আমরা যেমন ভাবছি তাদেরকেও (জনসংহতি) সেভাবেই বলছি–তাঁরাও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করছেন মনে হয়। ছোট্ট আরেকটি মন্তব্য করলেন এই কর্মকর্তা–'এই সমস্যার সমাধান হলেতো সবই হয়ে যায়।' শরণার্থীদের ভারত সরকার আর রাখতে চায় না–তাদের তাড়াতাড়ি আনতেই হবে অথবা তাদের আসতেই হবে, সেজন্য আমরা আগে তাদের জমির সমস্যার সমাধান করতে চাই যাতে এসে কোন বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি না হয়। গতকালের ভূমি সমস্যার আলোচনায় সরকারের তরফ থেকে এ কথাটি কয়েকবার আসে। জনসংহতির পক্ষে বলা হয়, সরকার শুধু তাদের সমস্যা দেখার চেষ্টা করছে–তারা জোর দিচ্ছেন ভবিষ্যতে যাতে নতুন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। সরকারের তরফ থেকে বলা হয় সরকার পাহাড়ীদের সব সমস্যার বিষয়েই সহানুভূতিশীল। তবে সরকারকে সব দিকও দেখতে হয়। এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেক সমস্যার সৃষ্টি যাতে না হয়–লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকেও। সূত্র বলেছে, চলতি দফা বৈঠক আরও দু'দিন চলার সম্ভাবনা বেশি। অতিথিশালা পদ্মায় অবশ্য ২০ তারিখ পর্যন্ত বৈঠকের প্রস্তুতি রাখা আছে। গতকালের বৈঠকও কখনও সম্মিলিত, কখনও আলাদা কথাবার্তা হয়।

মূল গ্রুপ–বৈঠকে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আতাউর রহমান কায়সার এবং অপর পক্ষে সন্তু লারমা, গৌতম চাকমা, রূপায়ণ দেওয়ান ছিলেন যথারীতি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য আলোচনা ॥ চুক্তির খসড়া
প্রণয়নের কাজ শুরু ॥ আজ
ষষ্ঠ দফা বৈঠক শেষ হচ্ছে

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি সংলাপের এযাবতকালের অগ্রগতি গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করা হয়েছে। জটিল ভূমি সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে ভূমি এবং আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র গতরাতে জনকণ্ঠকে বলেছে, আমরা একটি চুক্তির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। চেষ্টা করা হচ্ছে এই বৈঠকটিই যেন

শেষ বৈঠক হয়। সূত্রটি বলেছে, জনসংহতি সমিতির ইচ্ছা–চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানটি যাতে হয় পার্বত্য এলাকার কোন শহরে। ষষ্ঠ দফা বৈঠকের গতকাল ছিল তৃতীয় দিন। বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে আজই এই বৈঠক শেষ হবার কথা। ১৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী জনসংহতি নেতাদের ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। মেয়র মহিউদ্দিন নিজস্ব কাজে গতকাল চট্টগ্রাম গেছেন। আজ আবার তিনি সকালের ফ্লাইটে ঢাকা আসবেন। ওয়াকিফহাল সূত্রটি বলেছে, আজ বৈঠক শেষ হলেও জনসংহতি নেতাদের আজই দুদুকছড়ি ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম।

জটিল ভূমি সমস্যার কারণে চুক্তির খসড়াটি পরীক্ষার জন্য এ্যাটর্নি জেনারেলের সাহায্য নেয়া হতে পারে। আইন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাও এটি পরীক্ষা করে দেখবেন। জনসংহতির এখনও দাবি পার্বত্য এলাকার রিজার্ভ ফরেস্ট, কাপ্তাই বাঁধ এলাকা ছাড়া সব জমি থাকবে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের কর্তৃত্বে। সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার দিকটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। তৃতীয় দিনে সকাল সাড়ে ১০টায় বৈঠক শুরুর পর থেকেই এসব বিষয় নিয়েই খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে। দ্বিতীয় দফায় বৈঠক শুরু হয় বিকাল ৪টায়। সন্ধ্যায় সরকারপক্ষের মুখ্য আলোচক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি এবং আতাউর রহমান কায়সার প্রধানমন্ত্রীর সাথে শলাপরামর্শের জন্য যান। সূত্র বলেছে, একটি ডিনারের অনুষ্ঠানে তিন প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীকে সমঝোতা-মতপার্থক্যের সামগ্রিক বিষয়াদি অবহিত করেছেন। কিছু কিছু বিষয়ে তাঁর মতামতও নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারপক্ষের প্রতিনিধিরা এ দফায় সমঝোতার সবকিছু সহ জনসংহতি নেতারা থাকতে থাকতেই চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছেন। এজন্য আগের পাঁচটি বৈঠকের সমঝোতা যদ্দূর এগিয়ে ছিল তার বিশদও সমন্বয় করা হচ্ছে। আগের বৈঠকগুলোতে বিশেষত চতুর্থ বৈঠকেই আঞ্চলিক কাউন্সিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে প্রায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন হবে। তিনি হবেন একজন পাহাড়ী প্রতিনিধি। একজন পাহাড়ী কর্মকর্তাকেও এই কাউন্সিলের সচিব হিসাবে নিয়োগের চিন্তাভাবনা হচ্ছে। সূত্র বলেছে, চুক্তির খসড়ার আইনত খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে সংসদ এবং রাষ্ট্রপতিরও পরামর্শ চাইতে পারেন। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, অনেক কিছুর সাত-পাঁচ ভেবে দেখার চেষ্টা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে চুক্তির পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও। কারণ আইনে তা পরিণত হবার পর পার্বত্য এলাকার বাইরেও এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠনের পর তা দেশ জুড়ে বিভাগ আন্দোলনের মতো দাবিতে পরিণত হতে পারে কিনা তা নিয়েও ভাবা হচ্ছে। খাগড়াছড়ির একটি সূত্র বলেছে, জনসংহতি সমিতি ছাড়াও পাহাড়ী সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ চুক্তির অগ্রগতি জানার জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢাকার সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। খাগড়াছড়ির ওয়াকিফহাল সূত্রগুলোর কাছে মঙ্গলবার ঢাকা থেকে যেসব ফোন গেছে তাতে চুক্তির পক্ষে আশাবাদী অথবা হতাশাজনক দু'ধরনেরই খবর আসে। তবে দুদুকছড়িতে জনসংহতি, শান্তিবাহিনীর যেসব সমর্থক সদস্য আছেন তাঁরা একটি চুক্তির খবরের জন্যই অপেক্ষমাণ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তির খসড়া তৈরি শেষ
পাহাড়ীদিগন্তে নতুন
দিনের সুবর্ণ রেখা

ফজলুল বারী ॥ পাহাড়ের দিগন্তে এখন শান্তির সুবর্ণরেখা। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে সংঘাতমুখর পরিস্থিতির অবসানের প্রত্যাশায় শান্তি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন শেষ হয়েছে। ষষ্ঠ দফা বৈঠকের শেষ দিনে বুধবার রাতে এ ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন স্বয়ং সন্তু লারমা–যাঁর নেতৃত্বেই পাহাড়ী তিন জেলায় দীর্ঘদিন চলেছে সশস্ত্র সংগ্রাম। রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু সাংবাদিকদের বললেন–'আমরা একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেছি। আমাদের (জনসংহতির) সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। অস্ত্রবিরতির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।' সন্তুর এই বক্তব্যের সময়ে সরকার পক্ষের মুখ্য আলোচক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, জাতীয় এবং জনসংহতি সমিতির কয়েক সদস্য এবং কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কমিটির এক সদস্য বুধবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেন–সকল বিষয়েই ঐকমত্য হয়েছে। আশা করা হচ্ছে অক্টোবর মাসের মধ্যেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। উভয় পক্ষই এক মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী। এই সদস্য আরও যা বললেন তা হলো আমরা যা করছি তার সবকিছুই সংবিধানের মধ্যে হচ্ছে। সংবিধানের বাইরে কোন কিছুই হচ্ছে না। উভয় পক্ষই ছাড় দিয়েছে সেজন্য এটা সম্ভব হচ্ছে। জনসংহতি নেতারা আজ বৃহস্পতিবার সকালেই ঢাকা ছেড়ে যাবেন। পুরনো বিমানবন্দর থেকে সামরিক হেলিকপ্টার তাঁদের নিয়ে উড়ে যাবে খাগড়াছড়ির পানছড়ি থানার সীমান্তগ্রাম দুদুকছড়িতে। শান্তির আশাবাদের এই সময়ে আসন্ন চুক্তি সম্পর্কে সতর্ক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তিন পাহাড়ী সংগঠন। পাহাড়ী

গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এই তিন সংগঠনের পক্ষে প্রসিত বিকাশ খীসা বুধবার রাতে টেলিফোনে জনকণ্ঠকে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেন–আমরাও শান্তি চাই। এর জন্যই আমরা আন্দোলন করে আসছি। তবে এই শান্তি যেন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে আপোসের না হয়। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী যদি কোন প্রহসনের চুক্তি হয় তবে তা পাহাড়ী জনগণ মেনে নেবে না।

সূত্রগুলো বলেছে, সমঝোতা অনুসারে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য পরিষদ নামের একটি আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করা হবে। এই আঞ্চলিক কাউন্সিলের সদর দফতর হবার সম্ভাবনা রাঙ্গামাটিতে। প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার একজন পাহাড়ী আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তবে একই ব্যক্তিকে একই সাথে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান করারও একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সমঝোতা অনুসারে বাঙালী সেটেলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকবেন। তবে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভূমি কমিশন নামের যে প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হবে সেটির নতুন ভূমি জরিপের পর অপাহাড়ীদের অবৈধ দখলে থাকা জমি উদ্ধার করে পাহাড়ী প্রকৃত মালিকদের হাতে তা বুঝিয়ে দেয়া হবে। আইনী মীমাংসার জন্য জমিকে মালিকানা, বন্দোবস্ত, বন্ধকী, জুমচাষযোগ্য এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভারতে অবস্থানরত ৪৩ হাজার শরণার্থীর সবাইকে দেবার মতো খাসজমি পাহাড়ে নেই। সেজন্য ইউনিসেফ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে তাদের বাড়ি তৈরি করে দেয়া, কাজের ব্যবস্থার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। সমঝোতা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর নিয়মিত সেনানিবাসসমূহ থাকবে। অপ্রয়োজনীয় সব চৌকি প্রত্যাহার করা হবে। বিডিআর, আনসারের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, বড় নিবাসসমূহ থাকবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা দেয়া হবে শান্তি বাহিনী ভেঙ্গে দেবার। তাঁরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্রসমর্পণ করবেন। তাঁদেরকে নিয়ে গঠন করা হবে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী। সাবইন্সপেক্টর পদ পর্যন্ত পদে নিয়োগ দেবার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক পরিষদের। এ ছাড়া এই পরিষদ তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, তাদের বেতনেরও ব্যবস্থা করবে। আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাহী পদে একজন যুগ্ম সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হবে। তিনি পাহাড়ী হবার সম্ভাবনা বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে আসবে। আঞ্চলিক পরিষদ এবং স্থানীয় সরকার পরিষদের কার্যাদি সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ষষ্ঠ বৈঠকের শেষ দিনে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন স্থানীয় সরকার পরিষদ নিয়ে

ব্যাপক আলোচনা হয়। নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই তিন পরিষদের কাজ চালাতে সরকার পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির পরামর্শ, সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। ১৯৯৬ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈঠকটি হয়। এর আগে বিএনপি ও এরশাদ সরকারের সাথে মোট ১৩টি বৈঠক হয়েছিল। প্রথম বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ সরকার পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, আতাউর রহমান খান কায়সার, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচদফা দাবি ছিল আলোচনার ভিত্তি। এই পাঁচদফার মূল কথাগুলো হচ্ছে ঃ (১) পার্বত্য এলাকা থেকে সমস্ত সেটেলারদের প্রত্যাহার করতে হবে, (২) পাহাড়ীদের তাদের ভূমির অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, (৩) জুম্মু জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে, (৪) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। প্রথম দফা বৈঠকে অগ্রগতি ছিল সামান্য। সেটেলারদের যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় তা জানিয়ে দেয়া হয় প্রথম দফা বৈঠকেই। এছাড়া বলা হয়, সংবিধানের মৌলিক ঘটনার সংশোধনী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সংসদে সরকারী দলের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। ২৫ জানুয়ারি পরবর্তী বৈঠকের তারিখ এবং ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির মেয়াদ চূড়ান্ত হয় সেই বৈঠকে।

দ্বিতীয় বৈঠকটিই ছিল সবচেয়ে আলোচিত। কারণ সেই বৈঠক উপলক্ষেই জনসংহতি নেতারা প্রথম ঢাকা আসতে রাজি হন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বৈঠকটি হয় ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিন। দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি যে দাবিগুলো তোলে সেগুলো হলো (১) আঞ্চলিক পরিষদ পাহাড়ীদের জন্য নিজস্ব আইন তৈরির ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে, (২) পাহাড়ীরা মালিকানা পাবে ভূমির, (৩) পার্বত্য এলাকা থেকে সমস্ত সেটেলার প্রত্যাহার করতে হবে, (৪) সেনাবাহিনীমুক্ত করতে হবে পার্বত্য এলাকাকে, (৫) জনসংহতি ও শান্তি বাহিনীর আটক সদস্যদের মুক্তি দিতে হবে। সরকার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ ছিল: (১) ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে কাজ করবে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, (২) শুধুমাত্র সেটেলার স্বেচ্ছায় চলে যেতে চায় তাদেরকেই প্রত্যাহার করা হবে (৩) ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি কমিশন গঠন

করা হবে। কমিশন চিহ্নিত করবে প্রকৃত ভূমি মালিককে। তবে সরকার অপাহাড়ীদের জমি ক্রয় বিক্রয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না, (৪) সেনানিবাস থাকবে। অপ্রয়োজনীয় সব সেনা চৌকি প্রত্যাহার করা হবে, (৫) শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ী কোটা অব্যাহত থাকবে। পাহাড়ীদের বৃত্তি দেয়া হবে উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং (৬) চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন করা হবে। ১২-১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বৈঠকের ৪ এজেন্ডার মধ্যে ছিল (১) আঞ্চলিক পরিষদ, (২) ভূমি কমিশন, (৩) ভূমি অধিকার, (৪) পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন, (৫) আইন সংশোধন (৬) সেটেলার সমস্যা, (৭) সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, (৮) পাহাড়ী চাকরি কোটা, (৯) পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং (১০) শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন। জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিষদের দাবি তোলে বৈঠকে। সরকার পক্ষে একজন অপাহাড়ীকে পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগের কথা বললে জনসংহতির আপত্তির মুখে তা বাদ পড়ে যায়। ভূমি কমিশনের রূপরেখা কাজের ফিরিস্তি সম্পর্কেও জনসংহতি দাবি-দাওয়া দেয়। এতে অপাহাড়ীদের কাছে জমি বিক্রি হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছিল। সরকার এটিতে সম্মত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করবে এই দাবির বিপরীতে বলা হয় আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে মত দিতে হবে। আইন সংশোধন, আঞ্চলিক পরিষদের আইন তৈরির ক্ষমতা, সেটেলারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে খুঁটিনাটি আলোচনা হয়। সবচেয়ে অগ্রগতি হয় চতুর্থ বৈঠকে। ২৩ থেকে ২৬ মে পর্যন্ত এই বৈঠক হয়। পাঁচ বছর মেয়াদী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্পর্কে ঐকমত্য হয়। পার্বত্য এ্যাক্ট ১৯, ২০, ২১/১৯৮৯ সংশোধন করে গঠন করা হবে এই পরিষদ। এতে সদস্য থাকবেন ২১ জন। এ ছাড়া পার্বত্য পুলিশ বাহিনী, সরকারী চাকরিতে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত নিয়োগে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা এবং পূর্ণ একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় গঠন প্রশ্নে উভয় পক্ষে ঐকমত্য হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈঠকে পূর্ববর্তী অগ্রগতির সূত্র ধরেই মূল আলোচনা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সুচতুর গোপন আলোচনা সরকারের স্বচ্ছতার প্রমাণ নয় ॥ বেগম জিয়া

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'শান্তিবাহিনীর' সঙ্গে আলোচনা সুচতুর গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এটা শুভ নয়, সরকারের স্বচ্ছতারও প্রমাণ নয়। তিনি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করার বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, এই নাজুক অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কোন সিদ্ধান্ত দেশবাসী মেনে নেবে না। কারণ তার ফলে এই অঞ্চলের ওপর বাংলাদেশ তার নিয়ন্ত্রণ হারাবে।

বেগম জিয়া বলেন, বর্তমানে ঢাকায় সরকার ও তথাকথিত শান্তিবাহিনীর যে বৈঠক চলছে তাতে চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর সকল ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে সরকার রাজি হয়েছেন বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটি জনমনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য আরও দাবির মধ্যে 'শান্তি বাহিনী'র এই দাবিটি এদেশের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব এবং অস্তিত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করে না। এই এলাকা থেকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়বে। চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপনকারী অউপজাতীয় বাংলাদেশী নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। বেগম জিয়া বলেন, এ কথাটিও আমরা সরকারে থাকাকালে এবং পরবর্তী সময়ে একনিষ্ঠভাবে বলে এসেছি যে, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতির মীমাংসা বাংলাদেশের সংবিধানের আওতার মধ্যেই হতে হবে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে অথবা লঙ্ঘন করে কোন সমাধান চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস দেশের মানুষ মেনে নিতে পারে না। আমরা বার বার বলেছি যে, 'শান্তিবাহিনী'র কোন কোন দাবির কাছে নতি শিকার করলে দেশের ভূ-খণ্ডের এক-দশমাংশের অবসান ঘটবে। কিছু লোকের জন্য দেশের একটা অংশ চিহ্নিত করে দেয়া আমাদের সংবিধান অনুমোদন করে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পাহাড়ে আনন্দ, বিরোধিতায় বিএনপি জাপা

প্রসঙ্গ শান্তি চুক্তির খসড়া

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতায় খালেদা-এরশাদ আবার এক হয়ে গেলেন। বিরোধীদলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পর জাপার চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বৃহস্পতিবার বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে সেই এলাকাটি আর বাংলাদেশের থাকবে না। উল্লেখ্য, বুধবার রাতে খালেদা ঠিক এই কথাগুলোসহ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য। সংলাপের সাথে জড়িত জাতীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বললেন–এমন প্রতিক্রিয়াই তাদের কাছ থেকে স্বাভাবিক। তাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালাননি। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিতে আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ বিএনপি'র দু'জন, জাতীয় পার্টির একজন সাংসদকে সদস্য রাখা হয়েছিল। বিএনপি'র দুই সাংসদ আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম একদিনের জন্যও শান্তি বৈঠকে যাননি। জাপার এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী শেষের দিকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই সম্ভবত তাঁরা আগে ভাগেই বৈঠকে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন–বললেন জাতীয় কমিটির এই সদস্য। জাতীয় কমিটি এখন নীতিগতভাবে শান্তি সংলাপের খুঁটিনাটি প্রকাশ থেকে বিরত রয়েছে। সেজন্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সদস্য স্পষ্ট করে বললেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কোন বিষয়ই থাকছে না চুক্তিতে। এর প্রশ্নই ওঠে না। সংলাপে স্পষ্টভাবে সমঝোতা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান নিয়মিত তিনটি সেনানিবাসই থাকবে যথাস্থানে। বিডিআর-আনসারের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, নিয়মিত নিবাসসমূহও থাকবে। জরুরী অবস্থার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় যে অস্থায়ী চৌকিসমূহ ছিল চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রত্যাশিত অনুকূল পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সেগুলোই প্রত্যাহার করা হবে। জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা তদারকিতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের যেসব কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল অনুকূল গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে তারও এখন প্রয়োজন পড়ছে না। ভবিষ্যতে অনুকূল পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত হবে সর্বোচ্চ বেসামরিক প্রশাসনের নেতৃত্বে–শান্তি সংলাপে এই বিষয়টিতেই দুই পক্ষের সমঝোতা হয়েছে।

এদিকে জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা গতকাল দুদুকছড়ি ফিরে গিয়ে সমর্থক পাহাড়ী জনতার সমাবেশে বলেছেন, আগামী বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষরিত

হবে। উৎফুল্ল পাহাড়ী জনতার উদ্দেশে একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ১২ মিনিটের দীর্ঘ বক্তব্যে সন্তু বললেন, সরকার আন্তরিক থাকা সত্ত্বেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তারা আমাদের সব দাবি মেনে নিতে পারেনি। আঞ্চলিক কাউন্সিলের ক্ষমতা এবং ভূমি অধিকার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি হয়নি। আরও অনেক দ্বিমত আছে কিন্তু চুক্তির স্বার্থে সেগুলো এখন বলা উচিত হবে না। তারপরও তিনি অগ্রগতি হয়েছে, ঘোষণা দিয়ে বলেন, আশা করছি চুক্তি স্বাক্ষরের চূড়ান্ত বৈঠকে এসব বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে। সন্তু তাঁর সমর্থক জনতাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সজাগ থাকুন, কোন অবস্থাতে শান্তি চুক্তিকে নস্যাত করতে দেয়া হবে না। শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে যাতে কোন প্রতিক্রিয়া না হয় সে বিষয়েও তিনি সতর্ক থাকতে বলেন। সন্তু লারমা বলেন, সেটেলার বাঙালীদের প্রত্যাহারের দাবি সরকার মেনে নেয়নি। তিনি বাঙালী বসতিস্থাপনকারীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পরিবেশ গড়ে তুলুন। এমন কিছু করবেন না যাতে সহঅবস্থানের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। খাগড়াছড়ির একটি সূত্র থেকে পাওয়া গেছে সন্তুর বক্তব্যের এই অংশটি। এর আগে বৃহস্পতিবার দুদুকছড়ি যাত্রার আগে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মার গেটে সন্তু জনকণ্ঠকে বলেন, যথাসময়েই শান্তি চুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে। জটিল ভূমি সমস্যার সমাধান কিভাবে হয়েছে জানতে চাইলে সন্তু বলেন–সমাধান হয়েছে। এটিও জানতে পারবেন যথাসময়ে। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এ সময় সাথে ছিলেন তাঁর। পুরনো বিমানবন্দর থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ সমর্থকদের কাছে গিয়ে পৌঁছেন বেলা ১১টা ২০ মিনিটে। পার্বত্য শহরগুলো থেকে এখন এই খসড়া চুক্তির খবর নিয়ে পাহাড়ীদের মাঝে আনন্দ উল্লাসের খবর আসছে ঢাকায়। যোগাযোগ কমিটির সদস্য হংসধ্বজ চাকমা বললেন, সেখানে পাহাড়ী গ্রামগুলোতে পটকা ফুটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। রং খেলাও হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে শান্তির আনন্দে প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে হংসধ্বজ কাল দুদুকছড়িতে সন্তুর ফেরার অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি।

টেলিফোনে তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয়ে জনসংহতির দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক মতৈক্য হয়েছে। জনসংহতি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে জমি, রাজস্ব এবং পুলিশ বাহিনীর পুরো কর্তৃত্ব চেয়েছিল। সরকারপক্ষ থেকে এটি নাকচ করে দেয়া হয়। জনসংহতি সমিতির ঘনিষ্ঠ আরেক সূত্র বলেছে, এখন সরকারের তরফ থেকেই এসব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানজনক প্রস্তাব রাখা হবে আশা করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, সেটিই থাকবে স্বাক্ষরের জন্য তৈরি চুক্তিপত্রে। চুক্তি অনুমোদনের জন্য জনসংহতি

সমিতির বিশেষ একটি কাউন্সিল আহ্বান করা হচ্ছে শীঘ্রই। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, চুক্তি স্বাক্ষরের আগে দুই পক্ষের মাঝে আর দ্বিতীয় বৈঠকের সম্ভাবনা কম। জনসংহতির পক্ষেই একটি তারিখ প্রস্তাব করা হবে আশা করা হচ্ছে। সরকারের ইচ্ছা আগামী সংসদ অধিবেশনের আগেই চুক্তি স্বাক্ষরের। তবে এ বিষয়টিও যথেষ্ট দুরূহ। কারণ চুক্তির খসড়ার সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ মতামতের জন্য ভূমি, আইন, অর্থ এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। তাদের মতামত পাবার পরই চুক্তিটি তৈরি হবে স্বাক্ষরের জন্য।

ওয়াকিবহাল সূত্র বলেছে, সমঝোতা হয়েছে প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়ের নাম হবে 'ট্রাইবাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি'। একই সাথে বাংলাদেশের সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখা হবে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। বর্তমান স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন সংযুক্ত হবে মন্ত্রণালয়টির সাথে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাথে এর কাজের সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থাকবে নতুন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। বোর্ড উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং তা অনুমোদন করবে প্রস্তাবিত নতুন মন্ত্রণালয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ভূমি কমিশন নতুন ভূমি জরিপের কাজ শুরু করবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে। জমির প্রকৃত মালিকদের তখনই শনাক্ত সম্ভব হবে। উত্তরাধিকার ভিত্তিতে নির্ণীত হবে জমির মালিকানা। সমুদয় কাঁচা দলিল বাতিল করে প্রকৃত মালিকদের স্থায়ী পাকা দলিলের ব্যবস্থা করা হবে। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, চুক্তি স্বাক্ষরের অনুকূল পরিবেশ রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। সেখানকার বিশেষ একটি রিপোর্ট নিয়ে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার শীঘ্রই ঢাকা আসার কথা আছে। হংসধ্বজ চাকমার পারিবারিক সূত্র অবশ্য বলেছে, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাবার পথে তিনি ঢাকায় আসছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পাহাড়ে শান্তির সুবর্ণরেখা

দু'যুগের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তির সুবর্ণরেখা দেখা দিয়েছে পাহাড়ী দিগন্তে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির ষষ্ঠ দফা বৈঠকে ঐকমত্য হয়েছে সব বিষয়েই। সবকিছুই করা হচ্ছে সংবিধানের আওতায়। দু'পক্ষই এক মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী।

ষষ্ঠ দফায় টানা চতুর্থ দিনের বৈঠক শেষে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বুধবার সাংবাদিকদের সুখবরটি দেন। তিনি বলেন, খসড়া চুক্তি প্রণীত হয়েছে। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে আমরা চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছি। অবশ্য পরবর্তী বৈঠক কবে কোথায় হবে তা তিনি বলেননি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এ সময় সন্তু লারমার পাশেই হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্তু লারমা স্বশাসনের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনাকারী জনসংহতি সমিতির সামরিক অঙ্গ শান্তিবাহিনীর প্রধান।

খসড়া চুক্তির প্রধান বিষয়গুলোতে আছে–পার্বত্য পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় গঠিত হবে। সংবিধানবহির্ভূত কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে না। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার অথবা বাঙালী বহিষ্কার করা হবে না।

শেষ পর্যায়ে চার দিনের আলোচনায় স্পর্শকাতর প্রধান বিষয়গুলো ছিল–১. ভূমি ব্যবস্থাপনা; ২. বসতি স্থাপনকারীদের খাস জমিতে সরিয়ে নেয়া; ৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে ছড়িয়ে থাকা অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার।

খসড়া চুক্তি প্রণীত হওয়ার খবরে একদিকে পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও শঙ্কামুক্ত অবস্থা ফিরে আসে। পত্রিকান্তরে বলা হয়, দীর্ঘদিনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, রক্তক্ষয়, হিংসা-বিদ্বেষের অচিরেই অবসান হবে। এ আনন্দে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। আবার সরকার-জনসংহতি সমিতির বৈঠকে অভিবাসী বাঙালীদের বিষয়েও মতৈক্য হয়েছে শুনে স্থানীয় বাঙালীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান–পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাতেই একই অনুভূতির খবর পাওয়া গেছে।

বস্তুত আদি পাহাড়ী জনগণ এবং বসতি স্থাপনকারী অপাহাড়ী বাঙালী জনগণের মধ্যে ভূমির দখল কেন্দ্রিক সমস্যাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। দু'পক্ষেই আনন্দোচ্ছ্বাস ও শান্তি-স্বস্তির প্রকাশ সেই মূল সমস্যার সমাধানেরই ইঙ্গিত দেয়। উল্লিখিত তিন জেলায় বিভক্ত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট ভূমির পরিমাণ ৫ হাজার ৯৩ বর্গমাইল। তার মধ্যে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ খুবই সীমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ সাড়ে ৯৮ হাজার এবং অপাহাড়ী বাঙালী বসতি স্থাপনকারীর সংখ্যাও প্রায় ৪ লাখ ৬৯ হাজার। সীমিত পরিমাণ চাষের জমি নিয়েই তাই দু'পক্ষের মূল বিরোধ চলে আসছে।

এই ষষ্ঠ দফা বৈঠকে দু'পক্ষ প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যানের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, করারোপ, প্রশাসনের তদারকীর জন্য প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব সংক্রান্ত অমীমাংসিত বিষয়ও আলোচনা করে। খসড়া চুক্তি অনুযায়ী, সব জমিকে চারটি ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে কোন জমি ইজারা দেয়া হবে না। উল্লিখিত চারটি ক্যাটাগরি হচ্ছে–১. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি; ২. ইজারা দেয়া জমি; ৩. বন্ধকী জমি এবং ৪. জুম পদ্ধতির চাষের জমি। দু'পক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তির পর বন্ধকী জমি অধিগ্রহণ করবে ভূমি কমিশন। সরকারের প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির পথে এটাই ছিল একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। উপজাতীয়দের অভিযোগ ছিল তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে বসতি স্থাপনকারীরা জমি বন্ধক নিয়ে নিয়েছে।

যা হোক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বিরোধের কেন্দ্রে অবস্থিত ভূমি সমস্যারই যেখানে গ্রহণযোগ্য ও ন্যায়ভিত্তিক একটি সমাধান হতে চলেছে সেখানে আগামী বৈঠকে খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবশেষে স্থায়ী শান্তি কায়েমের ব্যবস্থা করা যাবে।

একটি দেশে যুগ যুগ ধরে এ রকম একটি বিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ অশান্ত পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে কিছুতেই স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী কুচক্রী মহল, ক্ষমতালিপ্সু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি এবং আমাদের দেশের বিশেষ প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাবিরোধী ও মৌলবাদী অপশক্তিগুলো দেশের একটি বড় অংশ জুড়ে ঐ বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতিকে তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করবেই। গত দুই দশক ধরে কার্যত তারা সে চেষ্টা করেও চলেছে।

আজ সমস্ত প্রতিকূলতাকে চূর্ণ করে রাজনৈতিকভাবে ঐ বিরোধের মীমাংসায় প্রায় সফল হওয়ার দরুণ আমরা ক্ষমতাসীন সরকার এবং একই সঙ্গে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের বিচক্ষণতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আন্তরিকভাবেই তাঁদের চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করছি। আমরা আশা করছি, সন্তু লারমার ঘোষণা অনুযায়ী অস্ত্র বিরতির বর্ধিত মেয়াদ অর্থাৎ আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই তাঁরা খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করতে সক্ষম হবেন।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সশস্ত্র বিরোধের ফলে সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বহু সাধারণ উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় জনগণকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। এবার বন্ধ হবে সমস্ত রক্তপাত এবং অন্যায় ও নিপীড়ন-নির্যাতন। ক্যাম্পগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হলেও সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হবে না, প্রধানমন্ত্রী তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। সুতরাং সশস্ত্র হানাহানি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

আশির দশকে তিনবার চাকমা উপজাতীয়রা পালিয়ে ভারতে চলে যায়। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, '৮৬ ও '৮৯ সালে চলে যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে এখন ৪০ হাজারেরও বেশি প্রত্যাবাসনের জন্য প্রহর গুনছে ত্রিপুরায়। গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার বৈঠকের পর চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথও প্রশস্ত হয়েছে। আগামী মাসের প্রথমদিকেই আবার প্রত্যাবাসন শুরু হতে পারে। শান্তি আসছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবদিক দিয়ে সব ক্ষেত্রেই। অতীতে এরশাদ সরকারের আমলে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর বৈঠক হয় ছয়টি, বিএনপি সরকারের আমলে মন্ত্রী অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন মূল কমিটি বৈঠক করে সাত বার এবং তৎকালীন সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন উপকমিটি আলোচনা চালায় ছয় বার।

কিন্তু যথাযথ প্রেক্ষিত থেকে আগে সমস্যার মূলে হাত দিতে পারা যায়নি বা আশানুরূপ কোন অগ্রগতিও হয়নি। গত বছর ডিসেম্বর মাসেই শান্তি কমিটির সঙ্গে বর্তমান সরকারের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটি প্রথম বৈঠক করে খাগড়াছড়িতে। এরপরই সরকার প্রথমবারের মতো শান্তিবাহিনী নেতাদের ঢাকায় নিয়ে আসে। ঢাকায় বিভিন্ন বিরতি দিয়ে অবশেষে এক বছরের মধ্যেই ষষ্ঠ দফা বৈঠকে দু'পক্ষের নিরলস প্রচেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির দিগন্তকে দৃশ্যমান করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

এ সাফল্য নিশ্চিতভাবেই অতীতের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে অর্জিত হয়নি। এ সাফল্যের কোনরকম যুক্তিহীন বিরোধিতাই উপজাতীয়সহ দেশের কল্যাণকামী ও শান্তিপ্রিয় কোন মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে গোপন আলোচনা কিংবা দেশের ভূখণ্ডের কোন অংশ বিসর্জন দেয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এ সাফল্যে বাগড়া দেয়া হবে আত্মঘাতী।
পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকে আমরা কায়মনোবাক্যেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সকলকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

খসড়া শান্তি চুক্তি হওয়ায় তিন পার্বত্য জেলার রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়

খাগড়াছড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–পার্বত্য অঞ্চলের বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে খসড়া শান্তি চুক্তি প্রণয়নের খবরে তিন পার্বত্য জেলাসমূহের স্থানীয় রাজনীতিতে নাটকীয় মোড় ঘুরে গেছে। এই

শান্তি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কোন কোন সংগঠন অবস্থান নিলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ শান্তিকামী জনগণ শান্তির স্বপক্ষেই চেয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা শুক্রবার জেলার সীমান্তবর্তী পানছড়ি থানার দুদুকছড়ায় সমাগত ক'জন পাহাড়ী পেশাজীবী বুদ্ধিজীবীর সাথে কথা বলেছেন। তিনি সকলকে জনসংহতির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে সন্তু লারমা শান্তি সংলাপবিরোধী পাহাড়ী ছাত্রদের বলেছেন, তোমরা এই মুহূর্তে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। অপেক্ষা কর আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হলে তখনি আন্দোলন করো।

এদিকে শনিবার জনসংহতি নেতাকর্মী এবং তাদের সশস্ত্র সদস্যরা শনিবার সকালে দুদুকছড়া ছেড়ে চলে যাবে গোপন আস্তানায় শুক্রবার সকাল থেকেই শত শত উপজাতীয় নারী-পুরুষ-শিশু ভিড় জমায় দুদুকছড়ায়, শান্তিবাহিনীতে থাকা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বহুলোক গেছেন সেখানে। কিন্তু দেখা করা বড় কঠিন। গহীন অরণ্যবেষ্টিত সীমান্তপল্লী দুদুকছড়ায় অভ্যাগত কৌতূহলী কেউ কিংবা নিকটাত্মীয় দেখা করতে গেলে স্লিপ পাঠাতে হয় ভিতরে। ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলেই শুধু দেখা করতে দেয়া হয়। যাবার সময় "বডি চেক" করে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়, কেউ আসে কেউ যায়। কিন্তু অনেকে দেখাও করতে পারেনি। বিফল হয়ে ফিরেছেন।

জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা কারও সঙ্গেই দেখা করেননি। তিনি বহুজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, হ্যান্ডশেক করেছেন আবার অনেকে গেছেন হাতে বানানো পাহাড়ী পিঠা, কিছু খাবার নিয়ে। অনুমতি পাবার পর প্রিয় স্বজনদের এসব পৌঁছে দিয়েছে। সন্তু লারমা কারও উদ্দেশে বক্তব্য না দিলেও দ্বিতীয় স্তরের শান্তি বাহিনীর নেতারা সমাগত জনতাকে বলেছে–ধৈর্য্য ধরুন। আমরা স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংলাপে একটি গ্রহণযোগ্য দিক বের করে এনেছি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া পণ্ড করার চেষ্টা!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া পণ্ড করার চেষ্টা চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক সদস্য মঙ্গলবার জনকণ্ঠকে বললেন, কে কোথায় কি করছে শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তার সব খবরই আছে

সরকারের কাছে। সব দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। যে কোন অবাঞ্ছিত বাড়াবাড়িকে দমন করা হবে কঠোর হাতে। এই সদস্য বললেন, এর আগে এরশাদ এবং খালেদার আমলে ৬ এবং ১৩ দফা মিলিয়ে যে মোট ১৯ দফা বৈঠক শান্তি বাহিনীর সাথে হয়েছিল, সেসব বৈঠকের কার্যবিবরণীও সরকারের হাতে আছে। বর্তমান সরকার হঠাৎ করেই শান্তি বাহিনীর সাথে কথা বলতে শুরু করেনি। আগের সরকারগুলো আলোচনা যত দূর পর্যন্ত এগিয়ে অথবা আটকে রেখেছিল নতুন পর্বের আলোচনা শুরু করা হয়েছিল সেখান থেকেই। তারপরও কেন বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তার কারণও স্পষ্ট সরকারের কাছে। তাই সরকার এখন সময় নষ্ট না করে দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী। আশা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ঘোষণা করা হবে। সূত্রটি বলেছে, ২২ অক্টোবর দিনটি সম্ভাব্য তারিখ হবার সম্ভাবনা বেশি। ২২ অক্টোবর না হলে ২৫ অক্টোবরের মধ্যে যে কোন একটি দিনকে এর জন্য বেছে নেয়া হতে পারে।

সূত্রটি বলেছে, খাগড়াছড়ি জেলা সদরেই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবার সম্ভাবনা বেশি। জনসংহতি সমিতির ইচ্ছাও তাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া ঢাকার কূটনৈতিক মিশনগুলোর প্রধান, দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী সাংবাদিককে এ উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানোরও চিন্তাভাবনা চলছে। এছাড়া আগামী দু'এক দিনের মধ্যে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের নতুন তারিখ ঘোষণারও কথা। সূত্র বলেছে, এবার শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হলে তা অব্যাহত গতিতে চলবে। শুক্র-শনি ছুটির দিনেও শরণার্থীরা আসবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র বাবুকে বলেছেন, আমি বার বার দফায় দফায় শরণার্থী প্রত্যাবাসন চাই না। এক তারিখেই সকল শরণার্থীর প্রত্যাবাসন শুরু হবে–তা চাই। উপেন বাবু প্রধানমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছেন। শরণার্থী প্রত্যাবাসনের দু'টি করিডোর সাব্রুম, কাঁঠালবাড়ি সীমান্তে (এপারের রামগড়, তবলছড়ি) সেজন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণও শুরু হয়ে গেছে। সেসব পয়েন্টে অভ্যর্থনা এবং ট্রানজিট ক্যাম্পে স্থাপন করা হবে সর্বক্ষণিক বিদ্যুত সরবরাহ এবং টেলিফোন সুবিধাদি। সরকারী পরিকল্পনা হচ্ছে প্রত্যাগত সব শরণার্থীকে ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে এসে তাদের স্ব স্ব গ্রামে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হবে। এজন্য তাদের জমিজমা বাড়িঘর কোথায় কার কি ছিল–সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া শুরু হয়েছে হেডম্যান, কারবারীদের মাধ্যমে। জাতীয় কমিটির তথ্যদাতা সদস্য বললেন, এসব কিছু এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে যাবে তা অনেকে কল্পনায়ও আনতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ আগ্রহেই

অসম্ভব অনেক কিছু সম্ভব হবার পথে। সেজন্যই মহল বিশেষের স্বার্থে বাগড়া দেবার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য সমস্যার সমাধানে সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (জাফর-মোয়াজ্জেম), জাগপাসহ দক্ষিণপন্থী বিভিন্ন দল। গত কয়েক বছরে সরকারী উদ্যোগে গড়ে তোলা বাঙালীদের বিভিন্ন সেটেলার সংগঠনও এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন নামের তিনটি সংগঠন বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী। তবে এদের বিরোধিতার সাথে বিএনপিসহ অন্য সংগঠনগুলোর বিরোধিতার মৌলিক পার্থক্য আছে। এই তিন সংগঠনের অভিযোগ হচ্ছে, সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি তাদের পাঁচ দফা দাবির প্রশ্নে বেশি ছাড় দিতে যাচ্ছে। আর বিএনপিসহ সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের ঢালাও আওয়াজ–পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের হাতে চলে গেল–ইত্যাদি, ইত্যাদি। বেগম খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিজামী, জাগপা ওয়ালাদের এ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলো হচ্ছে এ রকম–পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে হবে সংবিধানের মধ্যে, সেখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা যাবে না (ইদানীং বলা হচ্ছে কোন সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা যাবে না), গোপন আলোচনা করা যাবে না, আলোচনার বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে, সংসদে আলোচনা করতে হবে। সম্প্রতি আবার হঠাৎ মৌলবাদী বিএনপিপন্থী একটি দৈনিকে লেখা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের বিরুদ্ধে অবিচার করা হচ্ছে, পাহাড়ীদের হাতে এবার বাঙালীরা শোষিত, লাঞ্ছিত হবে ইত্যাদি। জাতীয় কমিটির তথ্যদাতা সদস্য এসব অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন। এ সদস্য সবার আগে বললেন, যারা নিজেদের বাঙালী না বলে বাংলাদেশী হিসাবে জাহির করতে পছন্দ করে তারাই পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিত্বের প্রশ্নে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেশি সোচ্চার। শরণার্থী সমস্যা এবং অন্য সব বিষয়ের সূত্রপাত প্রসঙ্গ এড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কাপ্তাই বাঁধ প্রতিষ্ঠার পর পাহাড়ীদের জমি পানির নিচে তলিয়ে যাবার পর প্রথম পর্যায়ে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে এই শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। পরে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার তাদেরকে পুনর্বাসিত করে মিজোরামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে পাহাড়ীরা আন্দোলন সংগঠিত করার সময়েই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। এরপর ক্ষমতাসীন জিয়া সরকার রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিভাবে মোকাবিলা না করে সামরিক পথে এগোয়। পাহাড়ে বাঙালী সেটেলার পুনর্বাসনের মাধ্যমে জিয়া সরকারের উদ্যোগে পাহাড়ীদের

আরও বিক্ষুব্ধ, বেপরোয়া করে তোলে। এরপর থেকে জিয়া, এরশাদ এবং সর্বশেষ খালেদা আমলে সেখানে দফায় দফায় রক্তপাত, সংঘর্ষই হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। জাতীয় কমিটি তথ্যদাতা সদস্য বলেন, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অব্যাহত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে পাহাড়ী জঙ্গীদের দমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সরকারগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরের কথা বরঞ্চ ওই এলাকাটিকে সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিমূলক বদলির স্থান হিসাবেই চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছে। পার্বত্য এলাকাটিকে একই সাথে ভিন দেশীয় সশস্ত্র বিভিন্ন গ্রুপ, অস্ত্র, মাদক ব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়েছিল। এরশাদ সরকার সামরিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জনসংহতি নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সামরিক কর্তাদের জড়িত করার সেই উদ্যোগটি স্বাভাবিকভাবে এগোয়নি। এরপর খালেদা আমলে প্রথমে কর্ণেল (অব) অলি আহমদ এবং পরে রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে আলোচনা চালানো হয়। আলোচনার উদ্দেশ্যে এই নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরায়ও যান একাধিক বার। এরশাদ আমলেই আলোচনার সময় দুদুকছড়ির ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহারের রেওয়াজ শুরু হয়। কিন্তু তথ্যদাতার জিজ্ঞাসা–এখন কেন ত্রিপুরায় গিয়ে আলোচনা, ক্যাম্প প্রত্যাহার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? তথ্যদাতা বলেন, সরকার তার পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া অগ্রগতির সূত্র ধরেই আলোচনা চালিয়েছে তারপরও সেই আলোচনার বিরোধিতার মাজেজা কি? তাহলে কি তারা সমস্যার সমাধান চায়নি? পার্বত্য এলাকাকে মাদক-অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্য রাখতেই কি তাদের তৎপরতা বেশি ছিল? তথ্যদাতা বলেন, সরকার প্রথম থেকেই যত্নবান ছিল সমস্যার সাংবিধানিক সমাধানের বিষয়ে। সমঝোতা যেভাবে হচ্ছে তাতে সংবিধানের বাইরে কিছুই হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকবে। শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় সেনা ক্যাম্পগুলো প্রত্যাহার করা হবে। গণতান্ত্রিক শাসনামলে যা বহাল রাখা যুক্তিহীনই শুধু নয়, অযথা ব্যয়বহুল। এছাড়া এখন যেসব বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছেন তাঁদের কাউকেই সেখান থেকে প্রত্যাহার করা হবে না। জোর করে যাঁদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মানববর্ম হিসাবে ব্যবহারের জন্য তাঁরা চলে যেতে চাইলে সরকারীভাবে সহযোগিতা করা হবে। আঞ্চলিক কাউন্সিল যেটি হচ্ছে তাও সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে। দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যা সমাধানের আলোচনা যাতে মাঝপথে সাবোটাজের শিকার না হয় সেজন্যই তা গোপন রাখা হচ্ছে। এটিই আন্তর্জাতিক নিয়ম। এরশাদ, খালেদা আমলের আলোচনার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম মানা হয়েছে। তারপরও আলোচনার অনেক কিছুই ইতোমধ্যে সংবাদপত্রগুলোতে বেরিয়েছে। তাই এটিকে গোপন আলোচনা বলা যাবে না। তথ্যদাতা বলেন, চলতি আলোচনা হচ্ছে সরকারের আন্তরিক

রাজনৈতিক উদ্যোগের সিদ্ধান্তে। চুক্তি স্বাক্ষরও হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। তবে চুক্তি কার্যকরের আগে সরকার অবশ্যই তা সংসদে উত্থাপন করবে। সাপটা চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তির উল্লেখ করে তথ্যদাতা বলেন, সেই চুক্তিসমূহও স্বাক্ষরের পরে সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল। তথ্যদাতা জানান, ইতোমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। কোন অপশক্তিই যাতে অবাঞ্ছিত কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য নজর রাখা হচ্ছে সর্বক্ষণিক। শান্তিপ্রিয় জনগণ ইতোমধ্যে এটিকে স্বাগত জানিয়েছে। এটি বানচালের চেষ্টা জনগণই রুখে দাঁড়াবে–বললেন তথ্যদাতা।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

আমরা শান্তি চাহি

মমতাজউদদীন আহমদ

যে কোনো কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই বলিবে শান্তি চাহি। যে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়া ফায়দা লুটিতে চাহে, সেও একান্তভাবে যখন নিজের সংগে বসিয়া থাকে, তখন শান্তির জন্য ক্রন্দন করে। যে ছিনতাইকারী পরের অলংকার লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে, সেও নিজের সন্তানের অকাল মৃত্যু চাহে না। যে দুর্ধর্ষ ডাকাত মানুষ হত্যা করিয়া একটি পরিবারকে বিষাদ সাগরে ভাসাইয়া দেয়, সেও নিজের মৃত্যুকে নিদারুণ ভয় পায়।

সকলেই শান্তি চাহে। বৃক্ষের পাখি শান্তি চাহে, গোয়ালের গরু শান্তি চাহে, কোলের শিশুও শান্তি চাহে। একটি পচা দুর্গন্ধ নর্দমার পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকাও সম্ভব নয়, কিন্তু একটি পুষ্প শোভিত উদ্যানে দিনের পর দিন শুইয়া বসিয়া থাকিতে পাইলে যে কোনো মানুষ ধন্য হইয়া যায়। সকলেই সুস্থ ও সুন্দরের পূজারী। সকলেই শান্তি চায়। সকলেই স্বস্তি চায়। অনেক অনেক যুদ্ধ হইয়া গেল। কোটি কোটি মানুষ মরিল। কিন্তু যুদ্ধ লইয়া মানুষ থাকিতে পারিল না। শান্তির জন্য লালায়িত মানুষ শান্তির সন্ধানেই ব্যাকুল হইল।

শান্তি ছাড়া পথ নাই, শান্তি ছাড়া বাঁচিয়া থাকিবার কোনো সার্থকতা নাই। শান্তি শান্তি করিয়া সর্বকালে সর্বদেশে মানুষ ডাওর করিতেছে। বাংলার মানুষও শান্তি চাহে। অশান্তির মধ্যে বাংলা দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না। বাঙালি বড় শান্তিপ্রিয় জাতি। আবেগে অধীর, অভিমানে অস্থির এবং পরশ্রীকাতরতায় যতই তুচ্ছ হোক না কেন, বাঙালি শেষ পর্যন্ত শান্তি চাহে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় প্রায় একুশ বছর ধরিয়া অশান্তি চলিতেছে। পাহাড়ি মানুষ আর সমতল ভূমির মানুষের মধ্যে কে বা কাহারা বিভেদ রচনা করিয়া দিয়াছে। সেই বিভেদের বীজ দিনে দিনে নানা ক্ষেত্র হইতে উস্কানি আর উপাদান লইয়া লতায় পাতায় বাড়িতে বাড়িতে একসময় মহাবৃক্ষে রূপান্তরিত হইয়াছে। আর সেই বৃক্ষ হইতে প্রতিদিন বিষাক্ত নিঃশ্বস ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষে মানুষে ভেদ বৃদ্ধি হইয়া তাহা অহিংসা ও অশান্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বাংলার মানুষে মানুষে যাহারা এমন বিষ ছড়াইয়াছে তাহারা মোটেও ভাল কাজ করে নাই। এই বিষ ছড়াইয়া তাহারা কিছু লাভবান হইয়াছে কিন্তু দেশ জুড়িয়া হিংসানল জ্বালাইয়াছে। এমনই হয়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতিপয় মানব অথবা মানবী নানা অজুহাতে চারিদিকের আবহাওয়া উত্তপ্ত করিয়া দেয়। সেই আগুনে সাধারণ মানুষের জীবন যায়। কিন্তু মতলববাজ মানব মানবী মহাসুখে ঠ্যাং নাচাইয়া নিজের এবং নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়িয়া লয়। সকলে এমন মতলববাজী করিতে পারে না। যাহারা পারে তাহারা ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী। কোথা হইতে গোপন আশীর্বাদ আসিয়া এইসব মতলববাজদের মদদ জোগাইয়া যায়। তাতেই কপর্দকশূন্য সেইসব মানুষ অলৌকিকভাবে প্রভূত বিত্তের মালিক হইয়া বসে। একবার যখন বিত্তবান হয়, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। নিজের বিত্ত ও শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তখন আইন শৃঙ্খলা সবকিছু ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া এমন নাচন নাচে যে দেখিলে ভয় হয়, আবার হাসিও পায়।

আমরা সাধারণ মানুষ, সেইসব শূন্যকুম্ভ আস্ফালন আর ছলনার শিকার হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে অগ্নিকাতর পতঙ্গের মতো ছুটিতে থাকি। তাহারা নিরাপদ দুর্গে বসিয়া কলকাঠি নাড়ে আর আমরা তাহাদের ইঙ্গিতে পুতুলের মতো উঠবস করি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিবাদের মধ্যে তেমনই কিছু অতি চতুর এবং পরিকল্পিত ছককাটা পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পিত ছকের মধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের কায়দা মতো ঢুকাইয়া দিয়া মতলববাজরা মজা লুটিয়া খাইতেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষে মানুষে এতকালের অহেতুক লড়াই-এর গূঢ় রহস্যটি বোধহয় করি এবারে উন্মোচিত হইয়া যাইতেছে। যে কারণ এবং আশঙ্কাকে প্রধান করিয়া উপজাতির মানুষরা কান্নাকাটি করিতেছে, তাহার গভীরতা কতখানি সত্য তাহাও বিবেচনা করিবার সময় হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় এক ডজন প্রকার উপজাতির বাস। সকলের আচরণ, ধর্ম, বিশ্বাস, ট্যাবু এবং জীবনাচরণ সমান নহে। এক এক উপজাতি এক এক

রকম। অরণ্য, পাহাড় এবং উপত্যকাবাসী এই উপজাতিদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সখ্যতা আছে, তাহাও বলা যাইবে না। সকলেই নিজ নিজ আচরণ ও ট্যাবু লইয়া আছে। চাকমাদের সঙ্গে ত্রিপুরিদের মিল নাই, মুরংদের সহিত পাংখোদের নানা ভেদ।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড জুড়িয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৮০ সাল হইতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হইয়াছে। এই তিনটি জেলার মধ্যে উপজাতিদের মধ্যে নানা ভেদ। কোথাও চাকমাদের প্রাধান্য কোথাও মুরং, কোথাও ত্রিপুরিদের প্রাধান্য। ভাই, কেহ যদি বলে চাকমাদের জাতিসত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানকার উপজাতিরা লড়াই করিতেছে, তবে সত্য বলা হইবে না। এক চাকমাদের জাতিসত্তা লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তা গড়িয়া ওঠে নাই। এক এক উপজাতির এক এক স্বরূপ। অতএব সমতলভূমির মানুষ সেখানে বসবাস করিতে গিয়া প্রায় বারটি উপজাতির জাতিসত্তার শিকড় ধরিয়া টান মারিয়াছে, তাহা বলা কিছুতেই ন্যায্য কথা নয়।

সমতলভূমি হইতে বাংলার মানুষ জীবিকা সন্ধানের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে গিয়াছে। যাহারা গিয়াছে, তাহারা কোনো বিত্তশালী, শিক্ষিত ও উন্নত মাপের যোগ্যতর মানুষ নয়। তাহারা দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং সহায়-সম্বলহীন। সেখানে গিয়াছে সরকারের অনুমতি পাইয়া এবং এক প্রকার বাধ্য হইয়া বাঁচিয় থাকিবার জন্যই মানুষ স্বভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারাও বাধ্য হইয়াছে। সমতল অঞ্চলে তাহাদের থাকিবার ক্ষেত্র নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। নতুন ক্ষেত্রে যাওয়া ছাড়া তাহাদের কোনো বিকল্প ছিল না। পার্বত্য অঞ্চলের উদ্বৃত্ত জমিতে চাষাবাদ করিয়াই তাহাদের বাঁচিতে হইবে। তাই এ যাওয়া।

যে জমি ও জুম চাষ লইয়া অধিবাসীরা বাস করিতেছে তাহা জোর করিয়া দখল করিয়াছে সমতল ভূমির মানুষ, তেমন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। যাহারা গিয়াছে, তাহাদের এমন কোনো যোগ্যতা নাই যে, যাইবা মাত্র তাহারা নিরীহ ও সহায়হীন উপজাতিদের মারিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, তেমন কোনো সাক্ষ্যও কেহ দিতে পারিবে না। যাহা রটনা হইয়াছে, তাহার বেশিরভাগই মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উপজাতিদের ওপর যে অন্যায় ও অত্যাচার করা হইযাছে তাহাও মিথ্যা নহে। উপজাতির সরল মানুষদের সারল্যের সুযোগ লইয়া ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগী মানুষ নানা উপদ্রব করিয়াছে তাহা বেঠিক নয়।

কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, উপজাতির বড় অংশ যে চাকমা তাহাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সামান্য নহে। তাহাদের শতকরা ষাটজনই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকের সন্তানসন্ততি দেশ-

বিদেশে আছে এবং চাকরি বাকরি করিয়া সুখেই আছে। রাজনৈতিক চেতনাও তাহাদের সামান্য নহে। সমতলভূমির সামান্য চাষীরা সেখানে গিয়া সহসা বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুটিয়া ফুটিয়া লইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণও নাই। শিক্ষিত এবং সচেতন চাকমারাই বরং অউপজাতি অভিভাসনকারী সমতলভূমির বাঙালিদের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইবার জন্য যথেষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে তাহাও হইয়াছে।

সমতলভূমির মানুষ গিয়া উপজাতিদের ধর্মনাশ করিয়াছে, তাহা ভাবিবার কারণ নাই। যাহারা ১৮৬০ সাল হইতে ব্রিটিশ রাজের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া পাহাড়ি সত্তা লইয়া ধীরে ধীরে নিজেদের মন্দির মঠ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা কতিপয় অতি দরিদ্র বাঙালি মুসলমানদের হাতের পুতুল হইবে তেমন কথা আহম্মকও বিশ্বাস করিবে না।

অথচ দেশে-বিদেশে বাঙালি ও বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে হাজারটা অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। বিদেশের সৌখিন সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ তথ্য না লইয়াই এক বিশেষ কোনো চক্রের মাধ্যমে সংবাদ লইয়া তাহাই প্রচার করিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের মদদ লইয়া পুলিশ সেনাবাহিনী আর সমতলের মানুষ পাহাড়িদের শেষ করিয়া দিতেছে। তেমন কিছু উদ্ভট ও বানোয়াট কল্পকথা দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত অরণ্য পর্বত ও উপত্যকায় এখন প্রায় দশ লক্ষ মানুষের বাস। আর সমতলের পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে বার কোটি মানুষের বাস। সেখানে উদ্বৃত্ত মেলা জায়গা আছে, আবাদের জন্য জমি আছে। তাই জীবিকার তাড়নায় বাংলার মানুষ বাংলার অন্য এক ভূখণ্ডে গিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক এবং এই তো প্রকৃতির নিয়ম। এখন সংখ্যায় পাঁচ লক্ষ উপজাতি এবং চার লক্ষ সমতলবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করিতেছে। একদিনেই সমতলবাসীদের সংখ্যা চার লক্ষ হয় নাই। দীর্ঘকাল হইতে সমতলবাসীরা সেখানে গিয়াছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। তখন কোনো বিবাদ হয় নাই। তখন উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। এখন বিষমভাব জাগিল কেন? কারণ আছে।

পিছনে স্বার্থভোগীর ইঙ্গিত আছে। সহজে ভোগ করিবার জন্য একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভোগকারী শ্রেণীর মধ্যে যেমন উপজাতীয় মাতব্বররা আছে, তেমনি আছে সমতলভূমি হইতে যাওয়া কিছু কিছু মতলববাজ। ইহারাই নিজেদের স্বার্থ ও লোভকে চরিতার্থ করার জন্য বিবাদ লাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারী ও আধাসরকারী বিচিত্র কলকব্জা সহায়ক হইয়াছে। জমি জেরাত বন্দোবস্তের কাজে অবিশ্বাস্যরকম দুর্নীতি ও অসাধুতা চলিতেছে। শাসনব্যবস্থা রক্ষাকারী

সংস্থাগুলোও সর্বাংশে সাধু নহে। সকলেই লুটিয়া পুটিয়া খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করিয়া দিয়াছে।

অর্থনৈতিক অব্যবস্থার যাঁতাকলে পড়িয়া আদিকাল হইতে সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হয়, এখনো হইতেছে। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থা, তাহার মধ্যে স্বার্থ শিকার করিবার জন্য তথাকথিত সাধু ব্যক্তিদের অভাব হয় নাই। স্থানীয় যুবক শ্রেণীকে আবেগে তাড়িত করিয়া নেশায় বিপথগামী করিয়া অস্ত্রের আভিযানে লোলুপ করিয়া দেশে-বিদেশে নানা ষড়যন্ত্র হইয়াছে। তাহা করিয়াছে এইসব সাধু সাজিয়া থাকা মতলববাজরা। আর তাহাদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়িয়াছে পাহাড় অঞ্চলের অসহায় দরিদ্র মানুষ। জাতিসত্তার অস্তিত রক্ষা, ধর্ম রক্ষা এবং অনুন্নত অবস্থা ইত্যাদি প্রচারগুলি আসল কথা নয়। মূলে আছে ভোগ-লালসা। সেই লালসা লইয়া রাজনীতি চলিতেছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা তাতেই বিষম হইয়াছে।

এখন সেখানে শান্তির আলোচনা চলিতেছে। শান্তির প্রস্তাবও হইয়াছে। আমরা শান্তিকামী মানুষ। শান্তির বিকল্প যুদ্ধ নয়। আমরা শান্তি চাহি। শান্তি না পাইলে বিপন্ন বোধ করি।

আশা করিব, পাহাড়ী ভূখণ্ডে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। জীবন সহজ ও নিরপদ্রব হইবে। সরকারের সততা এবং পার্বত্য অঞ্চলের শান্তিকামী নেতৃবর্গের উদ্যোগ সার্থক হোক। তবে দেশে-বিদেশে এই উদ্যোগের ব্যাপক প্রচার হওয়া দরকার। বিভিন্ন দেশ হইতে সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হোক। আমাদের অন্যতম সম্পদশালী অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। বিশ্বময় মানুষ জানুক বাংলাদেশের মানুষ শান্তি চাহে। শান্তির জন্য এদেশের মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। মিথ্যা ও ভণ্ডামি দূর করিয়া সত্য প্রকাশ পাইলে জগৎবাসী আমাদের অভিনন্দন জানাইবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের খসড়া প্রকাশের দাবি

চুক্তির পক্ষে কাজ করছে জনসংহতি সমিতি ॥ ৮ অক্টোবর কংগ্রেস

জীতেন বড়ুয়া ॥ খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তি সংলাপের প্রক্রিয়ায় খসড়া চুক্তি বিষয়ে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে তোলার জন্য তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে) জনসংহতি সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রুপ জনমত গড়ে

তুলছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীরাও গ্রামে গ্রামে সভা করছে। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি আগামী ৮ অক্টোবর কংগ্রেস আহ্বান করেছে। শান্তিবাহিনীর একটি সূত্র জানায়, স্থায়ী ও চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির এ প্রক্রিয়া যেন কোনভাবে ব্যাহত না হয় তার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এদিকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার প্রণীত খসড়া চুক্তি ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ।

বুধবার স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ শাহাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় এ আহ্বান জানানো হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সাংসদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া অদুদ। সভায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উক্ত চুক্তির খসড়া প্রকাশিত না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

অপরদিকে, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি বলেন, শান্তি চুক্তিকে ভণ্ডুল করার জন্য জনমনে বিভ্রান্তি ও অহেতুক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস মেনে নেয়া যায় না।

তিনি বুধবার জেলা ছাত্রলীগের এক কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, খসড়া চুক্তিতে পাহাড়ী-বাঙালী কারোরই উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকলের জন্যই স্থায়ী শান্তি বয়ে আনবে।

তিনি আরও বলেন, চুক্তি প্রকাশিত হবার আগেই এর বিপক্ষে বিভিন্ন অপপ্রচার অসুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক।

সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় দীর্ঘ পুঞ্জীভূত পার্বত্য সমস্যা রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ায় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সাধারণ সদস্যদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এদিকে শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স বিষয়ক চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি ও স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন। এবং নির্মাণাধীন এই স্টেডিয়াম চলতি বছরের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব ঘটনাকে ঘিরে বলাবলি হচ্ছে, শান্তি চুক্তি সহসা সম্পাদন হতে পারে এবং সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সংবরণ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে হতে পারে।

খসড়া শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, স্থানীয় একটি বাঙালী সংগঠন ও পাহাড়ী ছাত্র নেতৃবৃন্দ নানাভাবে বিরোধিতা করে প্রচারণা চালাচ্ছে। এছাড়া সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের

উপজাতীয়দের মনে খুশি ও আনন্দ যেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি সন্দেহ পোষণ করছে কেউ কেউ। প্রত্যন্ত পাড়া গ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি শহরে আসা কয়েকজন পাহাড়ীর সাথে শান্তি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন প্রসঙ্গে কথা হলে প্রভাত চাকমা ও কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা জনকণ্ঠকে বলেন, শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে এই খবরে আমরা এবং আমাদের পাড়া পড়শীরা সকলেই খুশি। জনসংহতি সমিতির যে কোন পদক্ষেপের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

অন্যদিকে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ প্রসীদ গ্রুপের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই জন উপজাতীয় ছাত্র। তাঁরা বলেন, আমরা শান্তি চাই, তবে শান্তি চুক্তিতে উপজাতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার রক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে কিনা তা দেখা উচিত। তাঁরা চুক্তির বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশের অভিমত ব্যক্ত করেন। শান্তি সংলাপের প্রক্রিয়ায় খসড়া চুক্তি প্রণয়নের বিষয়কে খাগড়াছড়ি অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় পেশাজীবী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সমর্থন জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, বহু বছরের অশান্তি, অস্থিতি, সংঘাতের অবসান হয়ে যাবে এবং পার্বত্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে উন্নয়ন ঘটবে। মঙ্গলবার খাগড়াছড়ি পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের এক সভা বিশিষ্ট উপজাতীয় নেতা নবীন কুমার ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্বত্য উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ শান্তি চুক্তির সপক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলার জন্য পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শান্তি চুক্তির যাঁরা বিরোধিতা করছেন সেসব পাহাড়ী ছাত্র নেতার প্রতি উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বাস্তব অবস্থানকে মেনে নিয়ে জটিলতা থেকে দূরে সরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিভ্রান্তি না ছাড়ানোর পরামর্শ দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১লা অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রামে শীঘ্রই শান্তি ফিরে আসবে ॥ অশুভ চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকুন ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেছেন যে, শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। আর শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদারেও সহায়ক হবে। তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাত করতে এলে তিনি একথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে ইস্যুটি হাতে নিয়েছে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য শান্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। খবর ইউএনবি'র।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ অঞ্চলের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নয়নের জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। তিনি বলেন, শান্তি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ শান্তি চায়। শেখ হাসিনা বলেন, কোন কোন মহল পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে। প্রধানমন্ত্রী এ অঞ্চলে চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে কোন অশুভ চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ বলেন, তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে এ অঞ্চলের একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। তাঁরা কয়েকটি স্থানীয় সমস্যার আশু সমাধান সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চিং কুই রোয়াজা এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থোয়াইং চাও প্রু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমু, আবদুল জলিল এবং তিন পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার এবং বীর বাহাদুর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র
চলমান শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাত করতে
একটি মহল উঠেপড়ে লেগেছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সরকারের সাথে চলমান শান্তি প্রক্রিয়া চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে যাতে স্থায়ী রূপ নিতে না পারে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে ষড়যন্ত্র। মৌলবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল এর নেপথ্যে রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ এখন চলছে। বলা হচ্ছে–শান্তি চুক্তি মানে আরেক 'গোলামী চুক্তি'। বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে গত ২১ বছর ধরে কথিত গোলামী চুক্তি এক রাজনৈতিক পরিভাষা হিসাবে বহুল পরিচিত। বঙ্গবন্ধু সরকার এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকারের

মধ্যে সম্পাদিত ওই চুক্তির মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সেই সাথে পরিসমাপ্তিও ঘটে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক একটি স্লোগানের।

এ কারণে গোলামী চুক্তি বলে সাম্প্রদায়িক, ধর্মভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক স্পর্শকাতর নতুন করে একটি চুক্তি খুঁজে বের করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে পড়ে। সরকারবিরোধী ওই রাজনৈতিক গোষ্ঠী বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হতে চলেছে তাকেই আরেক 'গোলামী চুক্তি' আখ্যায়িত করে এখন মাঠে নেমেছে।

কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার সীমানা নিয়েই বিস্তৃত তিন পার্বত্য জেলা। এ কারণে এ দু'জেলার রাজনৈতিক নেতারাই শান্তি চুক্তি বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশ্যে জনসভা তাঁরা খুব কমই করছেন। এতে ঝুঁকি থাকে। গোপন রিপোর্ট থেকে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট হয় জনসভার। এ রকম প্রচারণায় নিজের এলাকার লোকজনও বিগড়ে যেতে পারে। তাই তাঁরা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব বাঙালী সেটেলার রয়েছে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বুঝানো হচ্ছে-এ চুক্তিতে শান্তি আসবে না; আসবে নতুন করে অশান্তি। পরিণত হবে অন্য দেশের করদ রাজ্যে। এমনকি ধর্ম এবং জাতিগত নানা অপপ্রচারও চালানো হচ্ছে। চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত না হয় সেজন্য সেটেলারদের ক্ষুব্ধ করে তোলার যত প্রক্রিয়া আছে তা-ই করা হচ্ছে। মৌলবাদী একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সরকার বিরোধী অন্যতম রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই শান্তি চুক্তিকে নব্য গোলামী চুক্তি হিসাবে বিশ্বাস স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার প্রতিটি থানা ও গ্রাম পর্যায়ের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্বত্য তিন জেলার অনুরূপ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা সমানে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন বলে জানা গেছে। কক্সবাজার এবং চট্টগ্রমের বিভিন এলাকায় প্রচুর সংখ্যক লোক পার্বত্য এলাকার ভূ-সম্পদের মালিক অপপ্রচারকারীরা তাদের ভূ-সম্পদ হারিয়ে ফেলবেন যদি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাদের নিকট থেকে এ সুযোগে হাতিয়েও নিচ্ছে বিপুল অঙ্কের চাঁদা। ভূ-সম্পদের মালিকগণও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছেন চুক্তি বিরোধী আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্কে।

ওদিকে অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল কর্তৃক গত সোমবার রাতে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি সদরের বাজারে হামলা চালিয়ে অজস্র গুলিবর্ষণের ঘটনাটিও অশান্তি সৃষ্টির একটি পরিকল্পিত ঘটনা বলে অনেকেই মনে করুন। এ সব সন্ত্রাসীদের ভয়ে বর্তমানে বোয়াংছড়ি সদরের বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত দিন অতিবাহিত করছেন বিভিন্ন থানা সদরের সূত্রে জানা গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৫ই অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে জনমত গঠনে
গ্রামে গ্রামে সভা

খাগড়াছড়ি, ৪ অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে শান্তিকামী পাহাড়ী জনগণ এখন গ্রামে গ্রামে জনমত গড়ে তুলতে সভা-সমাবেশ করছে। চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে পাহাড়ীরা স্বাগত জানাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তব অবস্থার নিরিখে শান্তি চুক্তির সপক্ষে কাজ করার জন্য জনসংহতি সমিতির সদস্যরা গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

পার্বত্য মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি গত শুক্রবার জেলা সদরের নারাইন খাইয়া গ্রামের পাইওনিয়র ক্লাবে উপজাতীয় পেশাজীবী ঐক্য পরিষদ এক জনমত সভার আয়োজন করেছে। বিশিষ্ট উপজাতীয় নেতা নবীন কুমার ত্রিপুরা এ সভার সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে বক্তারা পাহাড়ী নেতৃবৃন্দকে শান্তির উদ্যোগকে সফলকাম করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৯ই অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তির পরই
শুরু হবে শরণার্থী
প্রত্যাবাসন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির পরেই শুরু হবে শরণার্থী প্রত্যাবাসন কার্যক্রম। সরকার এবং জনসংহতি সমিতির যোগাযোগের মাধ্যমে মোটামুটি এই পদ্ধতিটি চূড়ান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সরকারী সূত্র বুধবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেছে এই পদ্ধতি মাফিকই তারা কাজকর্ম এগিয়ে রাখছেন। যোগাযোগ কমিটির একাধিক সদস্য সর্বশেষ ঢাকা ঘুরে যাবার পর পদ্ধতিটি চূড়ান্ত হয়।

ওয়াকিফহাল অপর একটি সূত্র বলেছে এখন চুক্তির দিনক্ষণ ঘোষণার পুরো বিষয়টিই নির্ভর করছে জনসংহতি সমিতির ওপর। তাদের কেন্দ্রীয় ১৫ নেতা মিলে খসড়া চুক্তিটি অনুমোদনের পর দিনক্ষণ তারাই জানাবার কথা। আগে জানা গিয়েছিল ৮ অক্টোবর থেকে জনসংহতির নেতাদের বিশেষ একটি

বৈঠকে এটি অনুমোদন করা হবে। কিন্তু গতকাল ৮ অক্টোবর বৈঠকটি শুরু হয়েছে কিনা বা তা কোথায় হচ্ছে এ বিষয়ে ঢাকা-খাগড়াছড়ির কোন সূত্রই নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। পরবর্তী প্রত্যাবাসনকে সামনে রেখে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তারা খাগড়াছড়ি গেয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে তারা ঢাকায় ফিরে এসেছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১১ই অক্টোবর ১৯৯৭
জনসংহতি কংগ্রেসে
শান্তিচুক্তির পক্ষে
মতামত গ্রহণ শুরু

ফজলুল বারী ॥ জনসংহতি সমিতির বিশেষ কংগ্রেসে আগামী ১০ নবেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে মতামত সংগ্রহ শুরু হয়েছে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে, ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী রইস্যাবাড়ি এলাকার বটতলা গ্রামে বুধবার শুরু হয়েছে বিশেষ কংগ্রেস। স্থানটি দুদুকছড়ির সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে। সাতদিন এই কংগ্রেস চলার কথা।

সূত্র বলেছে, মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যুবার্ষিকীর দিন হিসাবে জনসংহতি নেতৃবৃন্দ ১০ নবেম্বর দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র ১৯৮৩ সালের এই দিনটিতে ত্রিপুরার গোপন শিবিরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন। মানবেন্দ্র লারমাকে জুম্ম জাতির পিতা হিসাবে সম্মান করা হয়। এখন যেখানে সমিতির বিশেষ কংগ্রেস চলছে তার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামেই নিহত হন তিনি। সূত্রমতে, কংগ্রেসে শান্তিবাহিনীর মাঠ পর্যায়ের কয়েক শ' কর্মী অংশ নিচ্ছেন। তবে মূল সিদ্ধান্ত আসবে কেন্দ্রীয় ১৫ নেতার অনুমোদনে। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা সভাপতিত্ব করছেন কংগ্রেসে। কেন্দ্রীয় নেতা রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমা, সুধাসিন্ধু খিসা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে সহযোগিতা করছেন। উল্লেখ্য, এই নেতারাই সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশ নেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ দফা ঢাকা বৈঠকের পর সন্তু লারমা একটি খসড়া চুক্তিতে উপনীত হবার ঘোষণা দেন।

জনসংহতি সমিতির বিশেষ কংগ্রেস সম্পর্কে গতরাতে ঢাকার সরকারী একটি সূত্রের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা কিছু অবগত নন বলেছেন। তবে সূত্র বলেছে, ১৭/১৮ অক্টোবর নাগাদ তাঁরা সবকিছু অবগত হবেন বলে আশা করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এখন দেশের বাইরে আছেন। তিনি ফিরলে বিশেষ

কিছু পদক্ষেপ নেবার কথা আছে। বহুল প্রত্যাশিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান খাগড়াছড়িতে হবার সম্ভাবনা বেশি। জনসংহতি সমিতি এ উপলক্ষে সেখানে আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠানে আগ্রহী। উল্লেখ্য, দুই যুগের বেশি দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংঘাতে সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে কুড়ি সহস্রাধিক মানুষ নিহত হন। সরকারী পক্ষগুলো এখন সতর্ক নজর রাখছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির ওপর। সেখানে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা কঠোর হস্তে দমনের সিদ্ধান্ত দেয়া আছে। উল্লেখ্য–বিএনপি, জামায়াত সমর্থনপুষ্ট কিছু সংগঠন এই চুক্তির বিরোধিতা করে যাচ্ছে। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, বিরোধিতায় কোন বিশেষ গ্রুপের ইন্ধন আছে কিনা খোঁজখবর রাখা হচ্ছে সে বিষয়েও। চুক্তি স্বাক্ষরের পরপর ত্রিপুরা থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের নতুন তারিখ ঘোষণার কথা আছে। ত্রিপুরার ৬টি শিবিরে এখনও ৪৩ হাজারের বেশি শরণার্থী আছে। এবারে প্রত্যাবাসন শুরুর পর একনাগাড়ে সব শরণার্থীকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে সরকারীভাবে। এজন্য দু'টো স্বয়ংসম্পূর্ণ অভ্যর্থনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে রামগড় এবং তবলছড়ি সীমান্তে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ই অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন বাঙালীকে
সরিয়ে নেয়া হবে না ॥
সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা

খাগড়াছড়ি, ১১ অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির প্রাক্কালে সকল ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়কে পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তিনি হিংসা, হানাহানি নয় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পুঞ্জিভূত পার্বত্য সমস্যা সমাধানের গৌরবকে ভাগাভাগি করে নেয়ার আহ্বান জানান।

তিনি গত শুক্রবার খাগড়াছড়ি পৌর মিলনায়তনে জেলার হেডম্যান কার্বারী, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন শান্তি চুক্তির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার বিষয়ক এ সমাবেশের আয়োজন করে। কল্পরঞ্জন চাকমা আরও বলেন, এ অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালীদের বাদ দিয়ে শান্তি আসবে না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন বাঙালীকেও সরিয়ে নেয়া হবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ই অক্টোবর ১৯৯৭

চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই পার্বত্য এলাকায় বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে বিশেষ মহল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতায় বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার পাশাপাশি অতঃপর মাঠে নামছেন জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আযম। সোমবার ১৩ অক্টোবর দিনটিকে জামায়াত পার্বত্য চট্টগ্রাম দিবস ঘোষণা করেছে। এ উপলক্ষে সেদিন বিকালে মহানগরী জামায়াতের পল্টন অফিস চত্বরে এক সমাবেশের কর্মসূচী দেয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে, গোলাম আযম সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। উল্লেখ্য, বিএনপি-জামায়াত এই দুই সংগঠন আগে থেকেই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। পার্বত্য এলাকায় এই সমঝোতা চুক্তি বিরোধী যেসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা হচ্ছে তার সব কিছুই বিএনপি-জামায়াতের সমর্থন পুষ্ট।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক সদস্য শনিবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেন, দেশের সব মানুষ যেখানে একটি সমঝোতার প্রশ্নে আশাবাদী তখন বিরোধী দলের নেত্রী এমন সব বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্পষ্ট করছে। এই সদস্য গোপন আলোচনা শিরোনামে বিরোধী দলের নেত্রীর অভিযোগের জবাবে বলেন, তিনি পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অথচ এখন এমন সব বক্তব্য দিচ্ছেন যা অন্তত তাঁর মুখে বেমানান। কারণ বর্তমান সরকার বিএনপি আমলে অসমাপ্ত আলোচনার সূত্র ধরেই জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়েছে। এ ধরনের আলোচনায় সাফল্যের স্বার্থেই যে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয় তা অবশ্যই অন্তত তাঁর জানা থাকার কথা। এই সদস্য বলেন, জাতীয় কমিটিতে বিএনপি'র দুই সাংসদকে সদস্য রাখা হয়েছিল। বিএনপি দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের দুই সদস্যকে আলোচনায় উপস্থিত হতে দেয়নি। তাঁরা যদি আলোচনা পর্বে থাকতেন তবে অবশ্যই সবকিছুই তাঁদের উপস্থিতিতে করা সম্ভব হতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তির আগে গণভোটের দাবি বিষয়ক বিরোধী দলের নেত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে এই সদস্য বলেন, এটি অবাস্তব দাবি। সরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সমঝোতার আলোচনা চালিয়েছে। চুক্তিও হবে একটি রাজনৈতিক চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা সংসদে উপস্থাপন করা হবে। কাজেই এটি নিয়ে বিতর্ক-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হলে বুঝতে হবে তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে।

গতকাল শনিবার রাতে খাগড়াছড়ির একটি ওয়াকিবহাল সূত্র জনকণ্ঠকে জানিয়েছে, চুক্তির বিপক্ষে সেখানে বাঙালী পাড়ায় পাড়ায় নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াতের কিছু মুখ চেনা সদস্য অংশ নিচ্ছেন এসব গুজব শিল্পের প্রসারে। সেনাবাহিনীর অমুক ক্যাম্প উঠে গেছে, সেখানে অবস্থান নিয়েছে শান্তিবাহিনীর ক্যাডারবা, বাঙালী পাড়াগুলো যে কোন সময় গুঁড়িয়ে দেয়া হবে, যে কোন মুহূর্তে বাঙালীদের উচ্ছেদ শুরু হবে এমন গুজবও ছড়ানো হচ্ছে। এই সূত্র অভিযোগ করে বলেছে, এসব গুজব-প্রচারণার সাথে সেখানকার কোন দায়িত্বশীল পক্ষ জড়িত কিনা সে ব্যাপারেও সরকারের তদন্ত করে দেখা উচিত। কারণ বাঙালী পাড়ায় আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টার পাশাপাশি পাহাড়ীদের মধ্যেও নানা গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। বান্দরবানে বৃহস্পতিবার রাতে একটি পাহাড়ী গ্রামে এমন উস্কানিমূলক উৎপরতা চালানো হয়। সূত্রটি বলেছে, আসন্ন চুক্তিকে সামনে রেখে সেখানকার বাঙালীদের স্বার্থ রক্ষার দাবিদার যেসব সংগঠন তৎপরতা চালাচ্ছে এদেরকে পূর্ববর্তীতে বিশেষ বাহিনীর অর্থ এবং মদদেই গড়া হয়েছিল। সূত্রটি বলেছে, উদ্যোক্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নও সেখানে আছে। সূত্র মতে, জনসংহতি সমিতির বিশেষ কংগ্রেস এখন পার্বত্য এলাকার বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সব মহলই এখন এর সর্বশেষ খবরাখবর জানতে উদগ্রীব। এই কংগ্রেস শেষ হবে ১৪ অক্টোবর। তারপর চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ঘোষণা হবে। সেই তারিখ ঘোষণার পরপরই পাহাড়ে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা সম্পর্কে সূত্রটি দায়িত্বশীলদের সতর্ক করে দিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই অক্টোবর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম ॥ ২১ নবেম্বর থেকে পাহাড়ী শরণার্থী প্রত্যাবাসন

ফজলুল বারী ॥ আগামী ২১ নবেম্বর শুক্রবার থেকে আবার পাহাড়ী শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা গতকাল রবিবার এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর সর্বশেষ বৈঠকের ভিত্তিতে তিনি এই তারিখটি চূড়ান্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব 'কঠিন চিবর দান' পরবর্তী নিকটবর্তী সুবিধাজনক দিন হিসাবেই তারিখটি বেছে নেয়া হয়েছে। উপেন্দ্র আশা করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হবে। পরিবেশ সৃষ্টি হবে সব শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের। তবে

প্রত্যাবাসনের প্রচ্ছন্ন শর্তে বলা হয়েছে, 'যতক্ষণ সকল ধরনের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তাসহ প্রত্যাবর্তনকারীদের যথাযথ পুনর্বাসন চলবে ততক্ষণ অব্যাহত থাকবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া।' এ ছাড়া শরণার্থী নেতৃবৃন্দ শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটি এবং প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ২০ দফা বাস্তবায়ন কমিটির সাথে বৈঠকের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ত্রিপুরা থেকে পাঠানো বক্তব্যে উপেন্দ্র লাল গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের দলের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, মার্চের ২৯ তারিখ থেকে শুরু হওয়া সর্বশেষ প্রত্যাবাসন পর্বে ৭ দিন শরণার্থীরা দেশে ফেরেন। এর আগে ১৯৯৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ও ২১ জুনের দুই দফা প্রত্যাবাসন মিলিয়ে তিন দফায় দেশে ফিরে এসেছেন মোট ১২ হাজার ৩শ' শরণার্থী। মার্চের প্রথম সপ্তাহে আগরতলায় চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ পক্ষ থেকে ২০ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষণার পর সর্বশেষ দফা প্রত্যাবাসন শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সময়কার মতো যথাযথ পুনর্বাসন না হবার অভিযোগে প্রত্যাবাসন বন্ধ করে দেয়া হয়। এর মাঝে শরণার্থী নেতারা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনকেও সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে নাটকীয় বৈঠকটির পর তাঁরা সেই দাবি থেকে সরে আসেন। সেই বৈঠক উপলক্ষে উপেন্দ্রলাল চাকমাসহ ৪ জন ১২ সেপ্টেম্বর সকালে আগরতলা থেকে ঢাকা আসেন। সেদিনই ঢাকা ছেড়ে গেলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রাত কাটিয়ে আগরতলা ফিরে যান পরদিন সকালে।

উপেন্দ্রলাল চাকমা তাঁর পাঠানো বক্তব্যে জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সরকার ঘোষিত ২০ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া আশ্বাসের মধ্যে আরও রয়েছে, প্রত্যাবর্তনকারীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিনামূল্যে রেশন এক বছর সময় পর্যন্ত দেয়া হবে, যেসব শরণার্থী পরিবারের সদস্য সংঘাতে নিহত হয়েছেন তাঁদের শেষকৃত্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য দেয়া হবে ১০ হাজার টাকা। ১৯৯৪ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই মঞ্জুরি প্রযোজ্য হবে। এছাড়া প্রত্যাবর্তনকারী প্রতিটি পরিবারকে এককালীন মঞ্জুরি হিসাবে ১৫ হাজার টাকা, ভূমিহীনদের দুধেল গাভি কেনার জন্য দেয়া হবে ৩ হাজার টাকা। উপেন্দ্র জানান, প্রধানমন্ত্রী সেই বৈঠকে যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাবাসন শুরুর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আর আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় কোন সমস্যা দেখা দিলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার সমাধান করা হবে।

উল্লেখ্য, শরণার্থী প্রত্যাবাসনের এই চতুর্থ দফা প্রক্রিয়া শুরুর পর তা এক নাগাড়ে চালানোর ইচ্ছা বাংলাদেশ সরকারের। এর জন্য রামগড় ও

তবলছড়ি সীমান্তে শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। ত্রিপুরার ৬টি শিবিরে এখনও ৪৩ হাজারের বেশি শরণার্থী আছে বলে বাংলাদেশ পক্ষের ধারণা। সর্বশেষ জন্মগ্রহণকারীদের হিসাব নথিভুক্ত না হওয়ায় এই হিসাব চূড়ান্ত করা যায়নি। সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গত রাতে জনকণ্ঠকে জানান, তাঁরা এখন ত্রিপুরা থেকে চূড়ান্ত তালিকা পাবার অপেক্ষায় আছেন। ত্রিপুরার একটি সূত্র জানিয়েছে, শিবিরে শিবিরে এখন চলছে তালিকায় নাম আগে অন্তর্ভুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূজা উপলক্ষে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শিবিরবাসীদের নতুন জামা-কাপড় দিয়েছে। দেশে ফেরার আগে নতুন কাপড় পেয়ে শরণার্থীরা খুশি। দেশে ফেরার আগে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে শরণার্থীদের নগদ টাকাপয়সাও বোনাস হিসাবে দেবার কথা আছে। খাগড়াছড়ি থেকে জিতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, চলমান শান্তি প্রক্রিয়ায় পার্বত্যবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেখানে একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এ ব্যাপারে অনুষ্ঠিত সভায় সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা সভাপতিত্ব করেন। যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরাকে আহ্বায়ক, হাজী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও পুরুষোত্তম চাকমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং জায়েদুল আলমকে সদস্যসচিব করে গঠন করা হয় ২১ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি। সভায় পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানানো হয়। শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থনে মানিকছড়ি থানা সদরে শনিবার এক শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে। সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, পরিষদ সদস্য জাহেদুল আলম, খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগ সদস্য নূরন্নবী চৌধুরী প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৫ই অক্টোবর ১৯৯৭

চক্রান্তের মাধ্যমে যারা ক্ষমতা দখল করতে চায় তারাই পার্বত্য সংঘাত জিইয়ে রাখতে তৎপর ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান শান্তিপ্রক্রিয়া নস্যাত করতে ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, যারা চায় আমাদের দেশের মানুষ অন্য দেশে থাকুক, যারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়, তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত জিইয়ে রাখার পক্ষে। তিনি বলেন, জনগণ ভাল করে জানে, এরা কারা এবং তাদের এই ষড়যন্ত্রে কাদের স্বার্থ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। বুধবার প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এ প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করে আসে। খবর ইউএনবি'র।

শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাঁর দল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সকল ধর্মের অনুসারীদের অবদান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুখী ও সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা হলে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে সফল হব।

বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাখাল চন্দ্র বড়ুয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন কমলকান্তি বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল বড়ুয়া, কিশোর কুমার বড়ুয়া, ধর্ম রক্ষিত মহাস্থবির ও স্বপন কান্তি বড়ুয়া। এই প্রতিনিধি দল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কয়েকটি সমস্যা সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে।

ডি-৮ দেশসমূহের সচিবালয়ের সফররত নির্বাহী পরিচালক আইহেন কামেল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন। আগামী বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি সকল সদস্য দেশ সফর করছেন। বাংলাদেশ ডি-৮ জোটের অন্যতম সদস্য। গত জুনে ইস্তাম্বুলে ৮ ওআইসি দেশের শীর্ষসম্মেলনে এই অর্থনৈতিক ব্লক আত্মপ্রকাশ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই অক্টোবর ১৯৯৭
১৬ নবেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বৈঠক

শান্তি চুক্তির আগেই বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে ॥ হরতালসহ কর্মসূচী ঘোষণা

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আগামী ১৬ নবেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে আবার বৈঠক হচ্ছে ঢাকায়। শীর্ষস্থানীয় একটি সরকারী সূত্র থেকে খবরটি জানা গেছে। চুক্তির খসড়াও ইতোমধ্যে অনুমোদন করেছে জনসংহতি সমিতির হাইকমান্ড।

এদিকে এই চুক্তিকে সামনে রেখে বিএনপি-জামায়াত যৌথ উদ্যোগে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। বুধবার খাগড়াছড়িতে

তাদের একটি সমাবেশ থেকে আগামী ২৯ অক্টোবর তিন পার্বত্য জেলায় হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। আরও একটি হুমকি দেয়া হয়েছে সমাবেশটি থেকে। বলা হয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন তারা অচল করে দেবে পুরো বাংলাদেশ। চুক্তির পক্ষে পাল্টা তৎপরতাও জোরেশোরে চলছে পার্বত্য এলাকায়। ১৮ অক্টোবর খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বরে শান্তি সমাবেশ, সেখান থেকে শান্তি র‍্যালি বের করা হবে নাগরিক কমিটি এবং পেশাজীবী ঐক্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে। আজ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে এ ব্যাপারে একটি সংবাদ সম্মেলনও হবার কথা আছে।

ঢাকায় একটি সূত্র বলেছে, চুক্তি অনুমোদনের জন্য জনসংহতি সমিতির বিশেষ বৈঠকটি ১৪ অক্টোবর শেষ হয়। গত ৮ অক্টোবর এটি শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা সীমান্তের রইস্যাবাড়ি এলাকার বটতলা গ্রামে। এলাকাটি দুদুকছড়ি সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে। বটতলার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামেই ১৯৮৩ সালের ১০ নবেম্বর জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান মানবেন্দ্র লারমা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রীতি চাকমার নেতৃত্বাধীন গ্রুপের হাতে নিহত হন। জনসংহতির শীর্ষ বৈঠকটি তাদের কংগ্রেস কিনা এ নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী বিশ্বজিৎ চাকমা বলেছেন, আসলে জনসংহতিতে এখন কংগ্রেস নামের কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই। শীর্ষ নেতারা বসে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এই শীর্ষ কমিটির সদস্যসংখ্যা কারও মতে ৮, কারও মতে ১৩। তবে বটতলার বৈঠকটিতে শান্তি বাহিনীর সব আঞ্চলিক কমান্ডারকে ডাকা হয়েছিল। পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের মত হচ্ছে, সেই শীর্ষ বৈঠকে চুক্তির খসড়া অনুমোদন হলো কি হলো না সেটি বিবেচ্য নয়। কারণ এটি অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কোন কথা সন্তু লারমা বা জনসংহতির কোন নেতা বলেননি। উল্লেখ্য, গত ১৭ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ দফা ঢাকা বৈঠকের পর সন্তু লারমাই ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁরা একটি খসড়া চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন।

'এখন আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন ঠিক করা হবে'–এই কথাটিও বলেছিলেন সন্তু। পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ সৌখিন চাকমা, বিশ্বজিৎ চাকমা বলেছেন, ঢাকায় ঘোষণা দিয়ে আসার পর থেকেই জনসংহতির উদ্যোগে চুক্তির পক্ষে মতামত সংগঠন শুরু হয়ে যায়। এতেই বোঝা যায় তারা কোন শীর্ষ বৈঠকের অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিলেন না। তবে শীর্ষ পর্যায়ের অনুমোদনের বিষয়টি কিভাবে হয়েছে তা জানার কৌতূহল পাহাড়ীদের মধ্যে আছে। কারণ সন্তু লারমা ঢাকা থেকে দুদুকছড়ি ফিরে সমাবেশের বক্তৃতায় বলেছিলেন, সরকার সেটেলারসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁদের দাবি মেনে নেয়নি, তারপরও তাঁরা শান্তির স্বার্থে খসড়া চুক্তি করেছেন।

খাগড়াছড়ি থেকে জীতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বৈষম্যমূলক খসড়া চুক্তি বাতিল, সমঅধিকারের দাবিতে গতকাল বুধবার সেখানকার শাপলা চত্বরে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত মহাসমাবেশে আসলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি, জামায়াত–এই দুই দলের নেতৃবৃন্দ। গাড়িতে করে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আনা হলেও সেখানে কোন পাহাড়ীকে দেখা যায়নি। মোঃ শাহাবউদ্দিনের সভাপতিত্বে বিএনপি'র সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি, জামায়াতের শামসুর রহমান এমপি, কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লা, মোমিনুল হক চৌধুরী, আব্দুল ওয়াদুদ ভূইঞা, একেএম আলীম উল্লাহ, আবুল কাশেম, রফিকুল ইসলাম খোকন, বেলায়েত হোসেন ভূইঞা প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, কেবলমাত্র পাহাড়ীদের স্বার্থ রক্ষাকারী, বাঙ্গালীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন চুক্তি হলে জাতি তা বরদাশত করবে না। বাঙ্গালীদের আবেগ উপেক্ষা করে শান্তি চুক্তি করা হলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় সমগ্র বাংলাদেশ অচল করে দেয়া হবে। চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের সীমানার ভিতর রাখার জন্য প্রয়োজনে আমরা জেহাদ করব। তিনি অভিযোগ করে বলেন, সব রাজনৈতিক দলকে এড়িয়ে একতরফা চুক্তির নামে সরকার পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের একটি সংঘাতে জড়িত করতে চাইছে। পাহাড়ীদের তিনি ভারতের হাতিয়ার না হতে পরামর্শ দেন।

জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, শান্তি চুক্তি স্বাধীনতাবিরোধী। জনগণকে অন্ধকারে রেখে কোন চুক্তি হলে সরকারকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭ই অক্টোবর ১৯৯৭

৩১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়া চুক্তি করতে জনসংহতির আহ্বান ॥ সন্তু লারমাকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অনুষ্ঠিতব্য ৭ম বৈঠকের পূর্বে আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। এদিকে ত্রিপুরায় জনসংহতি সমিতির বিশেষ বৈঠকে শান্তি চুক্তির ব্যাপারে সন্তু লারমাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

এদিকে আগামী ১৬ নবেম্বর ৭ম বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাছে এখনও খসড়া চুক্তি না পৌঁছায় এবারের বৈঠকে সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন নাও হতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার শাখার উর্ধতন নেতা উষাতন তালুকদার একপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে সরকারের কাছে এই আহ্বান জানান। বৃহস্পতিবার সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগ কমিটি এই পত্র সরকারের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের কাছে পাঠিয়েছে।

জনসংহতির পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো জনসংহতি সমিতি কর্তৃক উত্থাপিত দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিধায় সরকারের সাথে আগামী ১৬ নবেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ৭ম বৈঠকে চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। গত ৬ষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে অভিমত জ্ঞাপন করা হয়েছিল যে, যদি জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের নিকট অমীমাংসিত বিষয়াদির ওপর সরকারের দেয়া প্রস্তাবলী গ্রহণ যোগ্য না হয় তাহলে এর ওপর আরও আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হবে।

জনসংহতি সমিতির এই পত্রে আরও উল্লেখ করা হয়, বর্তমান সরকারের আমলে ৬ষ্ঠ বৈঠকে প্রস্তাবিত ও আলোচিত প্রস্তাবসমূহ এ যাবত মীমাংসিত ও অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উভয় পক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে খসড়া চুক্তি প্রণয়ন একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য। তাই খসড়া চুক্তির বিষয়াদি নিয়ে জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির এই প্রস্তাবে সরকার সম্মত আছে কিনা তা ৩১ অক্টোবরের মধ্যে তাদের কাছে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে সীমান্তের ওপার থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিশেষ অধিবেশন গত ১৪ অক্টোবর ত্রিপুরা রইস্যাবাড়ীর বটতলায় সমাপ্ত হয়েছে। সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের একমাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক দলভুক্ত করে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসংবরণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা শান্তিবাহিনী সদস্যের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পর পরবর্তী দল অস্ত্রসংবরণ

করবে। এসব শান্তিবাহিনী সদস্য খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী দুদুকছড়ি জঙ্গল থেকে ফিরে আসবে। এছাড়া সরকারের সঙ্গে চুক্তি করার ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবে সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমাকে দেয়া হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৭ই অক্টোবর ১৯৯৭
প্রসঙ্গ ॥ পার্বত্য
চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের অনুযোগসমূহ

ঢাকার একটি দৈনিকের জনৈক সাংবাদিক সেদিন (শুক্রবার, ১৮ আশ্বিন ১৪০৪ বঙ্গাব্দ) জানালেন, বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সপ্তম বৈঠক হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই, সম্ভবত আগামী মাসে। প্রতিবেদক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাতকারও প্রকাশ করেছেন। সাক্ষাতকারে হংসধ্বজ চাকমা জানিয়েছেন, অনেক কথা, যা অনেকেরই ভাসাভাসা জানার কথা; কিন্তু প্রমাণভিত্তিক ছিল না। যেমন, হংসধ্বজ চাকমা বলেছেন, "অনাদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী ছিল, বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। পাহাড়ে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত ছিল না। যখন জিয়াউর রহমান সাহেব মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সমতল থেকে বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ে আসেন, তখনই বিরোধ দেখা দিল।" হংসধ্বজ জানালেন, "সেটা ১৯৯২ সালের কথা। খাগড়াছড়ি থেকে তৎকালীন জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে যায়। আমিও সে দলের একজন সদস্য ছিলাম।" তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, "এখানে সবাই সংবিধানের ভিতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। আজকের বিরোধীদলীয় নেত্রীও সেটা বলেন। কিন্তু আমাকে বলুন, সংবিধানের কোথায় আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে সেনাবাহিনী থাকবে? এমনকি যখন জরুরী অবস্থা থাকবে না তখনও গোটা পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেনাবাহিনী থাকবে? বাংলাদেশের আর কোথায় এভাবে সেনাবাহিনী আছে? অথচ দেশের অন্য অনেক স্থানেই নানা সমস্যা-সন্ত্রাস আছে। এক নেত্রী, যিনি এখন বিরোধীদলীয় নেত্রী, ক'দিন আগেও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি যদি এভাবে কথা বলেন, তা হলে আমরা কোথায় যাব? দেশটা কিভাবে চলবে!"

হংসধ্বজ চাকমার আকুতি-মিনতির জবাবেই যেন মাদাম খালেদা জিয়া হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে, বিদ্রোহী শান্তি বাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হলে তিনি মামলা করবেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, "অন্য একটি দেশের কাছে চট্টগ্রাম বন্দর, ফেনীসহ পার্বত্য অঞ্চল হস্তান্তরের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে।" (দি বাংলাদেশ অবজারভার, বুধবার, ৩০ আশ্বিন ১৪০৪ বঙ্গাব্দ)। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে চলেছে" (ঐ একই দিনের বাংলাদেশ অবজারভার)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে আমার অনুযোগ, আওয়ামী লীগ নামক এত বড় একটি রাজনৈতিক দলে এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কি নেই, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যার পটভূমি এবং এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত নানান জটিল ইস্যুগুলো বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে সম্যক অবগত রাখতে পারেন।

আমার জানামতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান অশান্তি এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফসল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশাল হৃদয়ের মানুষ। তিনি মানুষের ক্ষুদ্রতাকে আমল দিতেন না। দি হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়াবাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি রূপক ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে থেকে যাওয়া মানুষদের 'সাড়ে ছয় কোটি কোলাবোরেটর' আখ্যায়িত করেছিলেন এবং প্রতিশোধের রাজনীতির বদলে বোধগম্যতার রাজনীতির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। ঐ প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে স্বাধীনতাবিরোধীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী স্বাধীনতাবিরোধীরা বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমা করতে পারেনি। চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর ভাষায়, "তুই আমাকে বন্ধু ভাবতে পারিস; কিন্তু আমি তোকে বন্ধু নাও ভাবতে পারি।" বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পাকিস্তানপন্থীরা প্রমাণ করেছে, তারা বঙ্গবন্ধুকে, আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করেনি। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইস্যু করে স্বাধীনতার শত্রুরা তাদের চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অশান্তির নায়ক সাবেক পাকিস্তানী সামরিক কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধুর হত্যার কিছু দিন পর প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসাবে নিজেকে নিজে নিয়োগ করে তিনি কতিপয় রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল গ্রহণ করেন তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে। প্রথমত, তিনি আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে এক সামিয়ানার নিচে জমায়েত করেন। এঁদের মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াত, আলবদর, আলশামস, রাজাকার, ভাসানী ন্যাপ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক

কর্মকর্তা, দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা তথাকথিত খান্দানী পরিবারের সন্তানবর্গ, মস্তান-সন্ত্রাসী প্রভৃতি। এক শ' তেত্রিশটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টি ছিল রাজনীতিবিদদের জনসমক্ষে হেয় করার একটি কৌশল। সশস্ত্র বাহিনীর লোকজনকে বাগ মানাতে তিনি কৌশল প্রয়োগ করেছেন একাধিক। যেমন, বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া (দৈনিক ভোরের কাগজ, ২১ আশ্বিন, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ), প্রহসন বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে রাষ্ট্রীয়ভাবে খুন (কর্নেল তাহের গং) বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ (জেনারেল শফিউল্লাহ, মেজর ডালিম গং) সিভিল ও পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ (কয়েক শ') সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি (বিশ হাজার থেকে প্রায় দুই লাখ), নতুন নতুন সেনা ছাউনি নির্মাণ, দুস্থ দেনা-দায়গ্রস্তদের বিডিআর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, জিয়া যাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়োগ করতেন তাঁরা যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা ও অন্য সুবিধাদি লাভ করতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল জিয়ার দৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে যুদ্ধক্ষেত্র ঘোষণার সুযোগ কে দিয়েছিল? তারও পটভূমি আছে। স্বাধীনতার পূর্বপর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের পাসপোর্টে লেখা থাকত যে তারা পাকিস্তানী। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জাতীয়তা চিহ্নিত করলেন, "বাঙালী" বলে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বোম রাজারা ও উপজাতীয় হেডম্যানেরা মেনে নিতে চাননি। তাঁরা ''বাঙালী'' এবং উপজাতীয়দের মধ্যে পৃথক সত্তার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর পর্যটনমন্ত্রী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। পাকিস্তানীরা ত্রিদিব রায়ের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করে মানবেন্দ্রনাথ লারমাকে শান্তিবাহিনী সৃষ্টি এবং এখানে-ওখানে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে একটি ইস্যু তৈরি করতে উৎসাহিত করত। এই উৎসাহ সৃষ্টিরও পটভূমি আছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতেই ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরকে হেনস্তা করতে ভালবাসত। এই হেনস্তার কৌশল হিসাবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা, আইএসআই, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে উপজাতীয়দের অস্ত্র-অর্থ, প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণায় প্ররোচিত করত। এমনকি ত্রিদিব রায়ের সহায়তায় চাকমা, ত্রিপুরা, বোম, প্রভৃতি উপজাতীয়দের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ত্রিপুরা-আসাম, মিজোরাম-নাগাল্যান্ডে যুদ্ধ করতে পাঠাত। নাগাদের নেতা ফিজো ঢাকায় বসবাস করতেন পাকিস্তান সরকারের অতিথি হিসাবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় উপজাতীয়দের বিদ্রোহ তৎপরতা বা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা এবং হেড ম্যানদের আর্থিক সুবিধা বন্ধ

হয়ে যায়। তখন চাকমারা বাঙালী কিনা সে প্রশ্ন বিশাল সমস্যা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান উপজাতিসমূহের কর্তাব্যক্তিদের অসুবিধা কাজে লাগান অনেকভাবে। প্রথমত, তিনি পাকিস্তান সরকারকে মিজোরাম-নাগাল্যান্ড-আসাম-ত্রিপুরার বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ দানের সুযোগ পুনর্সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সমাজের উঁচুতলার অবস্থানরত বিশেষ করে ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবী শাসকদের অনুগত বক্তিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাবার বাগান, আনারস বাগান বা অন্যান্য কাজের জন্য ভূমি ইজারা দান শুরু করেন। তৃতীয়ত, কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশীদের মতো সামরিক অফিসারদের মাধ্যমে লিবিয়া ও পাকিস্তানের অস্ত্র পূর্ব-ভারতীয় বিদ্রোহী ও শান্তিবাহিনীর মানুষদের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। চতুর্থত, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তিনি ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ কাজ শুরু করেন বাংলার মাটিতে। পঞ্চমত, তিনি বাঙালীদের পুনর্বাসন শুরু করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, যেন তারা সহজেই শান্তিবাহিনীর টার্গেট হয়। বাঙালীদের পাহাড়ীরা মেরে ফেলছে এ অজুহাতে জেনারেল জিয়া তখন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন গ্রামে-গ্রামে, টিলায়-টিলায়, পাহাড়ে-পাহাড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সৈন্যদের ওয়ার-এলাউন্স বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকাকালীন ভাতা ও সুবিধাদি প্রদান করা হলো। ষষ্ঠত, সেনা কর্মকর্তাদের জঙ্গল পরিষ্কার করার অনুমতি দেয়া হলো নিরাপত্তার নামে। সেনা কর্মকর্তারা পাহাড়ের পর পাহাড়ের গাছ কেটে কোটি কোটি টাকার মালিক হলেন শান্তি বাহিনীকে দমনের নামে।

ভাল হতো, যদি কাহিনী এখানে শেষ হতো। যে কোন দেশে গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত থাকে চোরাচালান। চোরাচালান হয় অস্ত্র, চোরাচালান হয় মাদকদ্রব্য, স্বর্ণ, দুস্প্রাপ্য পণ্য। থাইল্যান্ড-মিয়ানমার-পূর্ব ভারত-চীনের অংশ বিশেষ মিলিয়ে ছড়িয়ে আছে "দি গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল"। এ অঞ্চল থেকে মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে আসে উপজাতি বিদ্রোহীদের মাধ্যমে। আসে অস্ত্র, মাদকদ্রব্য এবং অস্ত্র কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ডে আটকে থাকে না। চলে আসে বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে। আজ বাংলাদেশের সর্বত্র নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জের সন্ত্রাসীদের অস্ত্র যোগান দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি স্থাপনের বিরোধীপক্ষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন মানে (১) অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হবে, (২) মাদকদ্রব্য চোরাচালান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, (৩) পাহাড়ের পর পাহাড়ের বনভূমি কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের আয়ের উৎস হবে না, (৪) বাংলাদেশের সন্ত্রাসীদের হাতে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম আসবে না; ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাত করা যাবে না, (৫) ছিনতাই বন্ধ হবে, চাঁদাবাজি বন্ধ হবে।

এমতাবস্থায়, মাদাম জিয়ার মানসিক যন্ত্রণা আমরা উপলব্ধি করছি। তাঁর প্রতি আমাদের নিবেদন, তিনি যেন আমাদের একটু শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ দেন। জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ এবং মাদাম জিয়া নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে অনেক ব্যবহার করেছেন। তাতে সামরিক বাহিনীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল। এখন সামরিক বাহিনীর মানুষজনকে জনসাধারণ হেয় চোখে দেখে না। এনাফ ইজ এনাফ! অনেক হয়েছে! সামরিক বাহিনীর জন্য মায়াকান্নার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পাকিস্তানে যত সফরই করুন না কেন, কোন মাদাম জিয়া আর কোন দিন কোন পাকিস্তানী সৈন্যকে বাংলাদেশের মাটিতে আসতে দিতে পারবেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ই অক্টোবর ১৯৯৭

সম্পাদকীয়

শান্তি প্রক্রিয়া জোরদার হোক

একটি জটিল এবং কঠিন সমস্যা সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। পাহাড়ী দিগন্তে দু'টি যুগের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে দেখা দিয়েছে শান্তির আলোকরেখা। এতদিন পরিস্থিতি সেখানে ছিল অস্বাভাবিক। বিরাজ করেছে অশান্তি। বিরাজ করেছে হিংসা-বিদ্বেষের আবহাওয়া। এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাম্প্রতিক ষষ্ঠ দফা বৈঠকে সব বিষয়েই মতৈক্য হয়েছে। দু'পক্ষই এক মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা গিয়েছিল। ষষ্ঠ দফার চতুর্থ দিনের বৈঠকের পর জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিন্দ্রিয় বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) জানিয়েছিলেন, খসড়া চুক্তি তৈরি হয়েছে। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সম্পাদন করবেন বলে তিনি সে সময় জানিয়েছিলেন। পার্বত্য সমস্যা সমধানে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বয়ে গেছে আনন্দের স্রোত। তাঁদের মধ্যে শান্তির ব্যাপারে একটা দৃঢ় প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে। মনে ফিরে এসেছে স্বস্তি। মানুষ আনন্দ প্রকাশ করেছে দীর্ঘদিনের অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হবে এই প্রত্যাশায়। এই আনন্দের খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে স্থানীয় বাঙালীরাও। বাঙালী পাহাড়ী সকলেই আনন্দিত। সকলেই চায় শান্তি, স্বস্তি। আদি পাহাড়ী জনগণ এবং বসতি স্থাপনকারী অপাহাড়ী বাঙালী জনগণের মধ্যে ভূমির দখলকেন্দ্রিক সমস্যাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরোধের মূলে রয়েছে।

এখন যেহেতু বিরোধের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত ভূমি সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তাই আগামী বৈঠকে এই খসড়া চুক্তিকে চূড়ান্ত করার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানেরও অত্যন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকেরও খুব বেশি দেরি নেই। জানা গেছে, পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আগামী ১৬ নবেম্বর ঢাকায় আবার বৈঠক হবে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে। চুক্তির খসড়া জনসংহতি সমিতির হাইকমান্ড ইতোমধ্যে অনুমোদনও করেছে। এখন নির্ধারিত সময়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে–এটাই প্রত্যাশিত।

তবে এরই মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, চুক্তি সম্পাদনের আগেই একটি বিশেষ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। এই চুক্তিকে সামনে রেখে বিএনপি এবং জামায়াত বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করেছে, প্রকাশিত খবর থেকে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গত বুধবার খাগড়াছড়িতে তাদের একটি সমাবেশ থেকে আগামী ২৯ অক্টোবর তিন পার্বত্য জেলায় হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া চুক্তি প্রণয়নের পর পরই বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী দল প্রকাশ করে সতর্ক প্রতিক্রিয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমস্যার সমাধান হোক এটা বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী দু'টি–এরশাদ সরকার এবং বিএনপি সরকারও চেয়েছে। তাদের আমলে উভয়পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠক। সাবেক দু'টি সরকারের আমলের চালু প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা হচ্ছে সম্ভাব্য চুক্তিটি–একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে যে ঐতিহাসিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাকে সংহত করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এখন এই মুহূর্তে পরিবেশকে ঘোলা করে তার থেকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের কোন চেষ্টা কোন মহলেরই করা উচিত নয়। খসড়া চুক্তির যেসব বিষয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে জানা যায়, এগুলোর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ দেশের সংবিধানের আওতার মধ্যে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের নিরস্ত্রীকরণ এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসন, পাহাড়ীদের ভূমির অধিকার রক্ষা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী বাঙালীদের সেখান থেকে প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানা গেছে। আরও জানা গেছে স্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলোও সেখানে থাকবে। এরপরও সরকারের তরফ থেকে নিশ্চিত করতে হবে পূর্ণ স্বচ্ছতা। চুক্তির সবকিছু জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত। আর একই সঙ্গে শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা নয়, বিরোধী দলেরও উচিত এ-ব্যাপারে

বাস্তবসম্মত পন্থায় সাড়া দেয়া। কোন দেশে বছরের পর বছর কোন এলাকায় সংঘাতের পরিস্থিতি জিইয়ে রেখে স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন কিছুতেই নিশ্চিত করা যায় না। দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই সশস্ত্র বিরোধের কারণে সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বহু সাধারণ উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এখন রক্তপাত বন্ধ হওয়ার, সংঘাতের পরিবেশ দূর হওয়ার সত্যিকার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে নস্যাত করার বা তাকে বিকৃত করার চেষ্টা নয়, তাকে সত্যিকার চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সকলেরই সহযোগিতা করা উচিত।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৯শে অক্টোবর ১৯৯৭
খাগড়াছড়িতে শান্তি সমাবেশ ॥ পাহাড়ী বাঙালী বর্ণাঢ্য র‍্যালি

খাগড়াছড়ি, ১৮ অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। শনিবার বিকালে খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বরে এক বিশাল শান্তি সমাবেশে মন্ত্রী বলেন, শান্তি বাহিনীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না।

খাগড়াছড়ি পেশাজীবী ঐক্য কমিটি ও নাগরিক কমিটি আয়োজিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটির সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, নূরুন্নবী চৌধুরী, হাজী দোস্ত মোহাম্মদ, উলাহ প্রু চৌধুরী, জাহেদুল আলম, নবীন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ নবীন কুমার ত্রিপুরা। শান্তি সমাবেশের আগে সমীরণ দেওয়ান ও দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বে পাহাড়ী ও বাঙালীদের একটি মিলিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৯শে অক্টোবর ১৯৯৭
২১ নবেম্বর থেকে ফের শরণার্থী প্রত্যাবাসন ॥ সরকারের কাছে উপেন্দ্র চাকমার চিঠি

খাগড়াছড়ি, ১৮ অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফেরত

পাঠানোর ব্যাপারে জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। ২১ নবেম্বর থেকে চতুর্থ দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর ব্যাপারে সম্মতি জানিয়ে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছেন।

শরণার্থীদের সংগঠন 'জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি'র নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জুম্ম শরণার্থী নেতাদের সমঝোতা সংলাপে ফলপ্রসূ আলোচনার ভিত্তিতেই শরণার্থীদের টানা দেশে ফেরা শুরু হবে। এ জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করছেন। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত সিডিউল তৈরি হতে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৩শে অক্টোবর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি ॥ খসড়া চুক্তির কপি জনসংহতি পায়নি ॥ ১৬ নবেম্বর চুক্তি সই অনিশ্চিত

ফজলুল বারী, আগরতলা থেকে: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বলেছে, তাঁরা কোন খসড়া শান্তিচুক্তি অনুমোদন করেননি কংগ্রেসে। আগামী বৈঠকেই শান্তিচুক্তি হবে এমন কোন কথাও তাঁরা বলতে পারেন না। জনসংহতি সমিতির এই বক্তব্য গতকাল বুধবার আগরতলায় প্রকাশ করা হয়। তাবা এই দু'টো বিষয়ে প্রকাশিত সব খবরের প্রতিবাদ করেছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৬ নবেম্বর থেকে ঢাকায় সপ্তম দফা শান্তি বৈঠক হবে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে।

জনসংহতি সমিতির এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বুধবার জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা খসড়া চুক্তির কোন কপিই এখন পর্যন্ত পাইনি। অনুমোদন করব কিভাবে? এই নেতা সরকারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহেলার অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, ষষ্ঠ দফা বৈঠকের শেষ দিনে শীর্ষ পর্যায়ের লিখিত স্লিপের অনুরোধে তাঁদের নেতা জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা খসড়া চুক্তিতে উপনীত হবার ... দিয়েছিলেন। কথা ছিল আইন মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে খসড়া চুক্তিটি সমিতির কাছে পাঠানো হবে। তারা এটি পর্যালোচনা করবেন। কিন্তু তাঁদের দেয়া কথা রাখা হয়নি। এ জন্য ৮ অক্টোবরের বিশেষ বৈঠকে তাঁরা খসড়াটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেননি। সমিতি সূত্র বলছে অক্টোবরের বিশেষ বৈঠকে তাদের কংগ্রেস ছিল না। ছিল শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক। এটি ত্রিপুরার রইস্যাবাড়ি এলাকার বটতলা গ্রামে হবার বিষয়টি তাঁরা স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই করেননি।

জনসংহতি সমিতি সূত্র আশা করে বলেছে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়াটি তাদের হাতে এসে পৌঁছবে। তাঁদের কথা হলো ষষ্ঠ বৈঠক পর্যন্ত অবশ্য আলোচনা আনেক দূর এগিয়েছে। অনেক কিছুরই মীমাংসা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের স্থানীয় প্রশাসন কিভাবে চলবে, অস্ত্র সমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে সমঝোতা উল্লেখ্যযোগ্য। সমিতি অবশ্য মনে করিয়ে দিয়ে বলেছে, যত শীঘ্র সম্ভব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান প্রশ্নে তাঁরা আন্তরিক। তাঁরা আশা করছে, আগামী বৈঠকেই সব বিষয়ের সমাধান বেরিয়ে আসবে। অমীমাংসিত বিষয়ের মধ্যে ভূমি বিরোধের বিষয়টিকেই মুখ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে সূত্রটি। ত্রিপুরার ওয়াকিফহাল সূত্রগুলো সন্দিহান আগামী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হবে কিনা। তবে এই সূত্রগুলো মনে করে নানাবিধ কারণে আর কালক্ষেপণের মতো সময় কোন পক্ষের হাতেই নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৫শে অক্টোবর ১৯৯৭
রাঙ্গামাটির পাহাড়ে নতুন দিনের
চাঁদ দেখতে চায় দেশের মানুষ
হাবিবুর রহমান মিলন

কৈশোরের শেষ দিকে ও যৌবনের শুরুতে রাঙ্গামাটি ও নাইক্ষ্যংছড়িতে গিয়েছি বেশ ক'বার। নাইক্ষ্যং মানে বিষধর সাপ। আর ছড়ি অর্থ পাহাড়ী জলধারা। আঁকাবাঁকা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী দিয়ে অসংখ্য সাপ আসত। তাই নাম করা হয়েছিল নাইক্ষ্যংছড়ি। এখন অবশ্য সেই জলধারা নেই। পরিবেশ অনেকটা শহুরে। যাতায়াত পথ আগের তুলনায় অনেক সুগম। রাঙ্গামাটির অবস্থা এর চেয়েও ভাল। এখানকার পাহাড়ী পথ সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত বলা যায় না। ক্ষণিকের অসাবধানতায় যানবাহন হাজার হাজার ফুট নিচে গভীর খাদে পড়ে যেতে পারে। আগে পরিচয় ছিল অনেকের সঙ্গে। বিভিন্ন সময় পাহাড়ীদের নাচ-গানের আসরে শরিক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের গানের অর্থ বেশিরভাগ সময়ই বোধগম্য হয় না। একটি বাংলা গান সব সময় হৃদয় বীণায় ঝঙ্কার হত। পুরো গানটি এখন মনে নেই, কেবল দু'একটি লাইন মনে আছে। সে লাইনগুলো হচ্ছে–

রাঙ্গামাটির পাহাড়ে,
চাঁদ উঠেছে আহারে–
চাঁদ উঠেছে
না জানি কার ঐ কপালে।

অজ্ঞাত পরিচয় গানের লেখক কার কপালে চাঁদ উঠেছে বলতে পারেননি, আমার তো প্রশ্নই ওঠে না। মহাজাতক, মাধবাচার্য ও জি কিবরিয়া প্রমুখ জ্যোতিষ ভাস্করদের ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নিলে আমি একটি ... মাত্র। মই বেয়ে কেউ সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে আবার কেউ পা ফসকে বা বৈরী শক্তির ধাক্কা খেয়ে ধপাস করে নিচে পড়ে যায়। পাহাড়ী সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সরকারের অবস্থা অবিকল উপরোক্ত রূপ। কোন কোন সময় মনে হয়েছে বুঝি শীর্ষে উঠতে পারবে। নতুন চাঁদের আলোয় স্নাত হবে রাঙ্গামাটির পাহাড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই হয়েছে নিষ্ফল। অতীত দুই সরকার মোট ১৫ বার চেষ্টা করেও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এবার কি হবে সময়ই কেবল তা বলতে পারে। তবে আপাতত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাহাড়ে নতুন দিনের চাঁদ ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বিষয়টি কে কিভাবে দেখছেন জানি না। ব্যক্তিভেদে মতভেদ খুবই স্বভাবিক। তবে আমি দেখছি ঘটনাটি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস বর্তমান বিশ্বে সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন দেশই এখন আর আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ বিরোধ জিইয়ে রাখার পক্ষপাতী নয়। আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকাসহ যে কোন দিকে তাকালে এই যুগবৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। মধ্যপ্রাচ্য এক সময় ছিল বারুদাগার। ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে ভূমধ্যসাগরে নিক্ষেপ করার এমন ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা ছিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর যে, জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট প্রমাদ গুনেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ঘটনাপ্রবাহ বিশ্বকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। সেই যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি এখন বিগত দিনের স্মৃতি। ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম জাহানের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্ক উন্নতির দিকে। ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত পারস্পরিক সহযোগিতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। আয়ারল্যান্ড ও বসনিয়ার জাতিগত দাঙ্গা এবং ইসরাইল ও লেবানন পরিস্থিতি পূর্ববৎ নয়। অনেক সৌহার্দ্যপূর্ণ। বৈরুতকেও রক্তস্নাত দুঃস্বপ্নের নগরী বলা যায় না। অন্যদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে জাতিগত, গোষ্ঠীগত ও গোত্রগত দাঙ্গা ছিল এখন তা বিদায়ের পথে। লিবিয়ার নেতা গাদ্দাফী ক'বছর আগের মতো কারও বিরুদ্ধে হুংকার দিচ্ছেন না। সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্ত শান্ত। যুগের পর যুগ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতশাসকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কালোদের শাসনের নামে শোষণ ও নির্বিচার-নির্দয়-নির্যাতন করেছে। এখন কৃষ্ণকায় নেতার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা যা জাতিগত-বর্ণগত বিভেদ ও রক্তারক্তি নেই। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ফকল্যান্ড দ্বীপ দখলে রাখার জন্য ব্রিটেন সেনা অভিযান পরিচালনা করেছিল। সেই ব্রিটেনই চীনের

কাছে হংকং হস্তান্তর করেছে নিঃশব্দে। এমনকি মিয়ানমারের স্বৈরশাসকরাও অভ্যন্তরীণ শান্তির অন্বেষায় ব্যস্ত। এই লক্ষ্যে গণতন্ত্রের নেত্রী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আউন সান সুচিকে সীমিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। চেষ্টা চলছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের।

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের এই ঢেউ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা। একসময় বিশ্ব ছিল শিবিরবিভক্ত। আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস হতে স্নায়ুযুদ্ধ পীড়িত। দুই শিবিরের যুদ্ধের মনোভাব এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে, ধরণীর বুক ছেড়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি উঠে গিয়েছিল তারকালোকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই জড়িয়ে পড়েছিল 'ষ্টার ওয়ারে'। কত রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছিল এর ইয়ত্তা নেই। অন্যদিকে মেধাশক্তির অপচয় হচ্ছিল প্রচুর। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্যে বলা হয়েছিল যে, বিশ্বের শতকরা ৭০ জন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী কোন না কোনভাবে সামরিক গবেষণায় নিয়োজিত। বর্তমান বিশ্ব সে অবস্থা থেকে অনেকখানি মুক্ত। প্রত্যক্ষ আধিপত্য বিস্তার ও যুদ্ধপ্রস্তুতি এখন নেই। নেই স্নায়ুযুদ্ধ ও স্বৈরশাসনের প্রতি উদার মনোভাব। এই যুগে আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস যদি কিছু থাকে তা অর্থনৈতিক। ইউরোপীয় ইকোনমিক ইউনিয়ন, গ্যাট, আসিয়ান প্রভৃতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোটের লক্ষ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চিন্তাধারা কতটা ব্যাপ্তি লাভ করেছে প্রস্তাবিত পাক-ভারত-বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠক তার সর্বশেষ নজির। মালেতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ বৈঠকে এ রকম একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খুব সম্ভব তা এ উপলব্ধি থেকে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয় দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার ভিত গড়ে তোলা জরুরী। তা করা গেলে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করা সহজ হবে। পাশাপাশি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ হ্রাস পাওয়ায় ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটি দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা পাবে। এতে গণতন্ত্রের বিকাশ হবে সহজতর। মানুষের 'ভাতের অধিকার' প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব হবে না। নানা কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মাবধি যে বৈরী ভাব তাতে এইরূপ একটি প্রস্তাবে তাদের রাজি হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু উপলব্ধি যখন গভীর হয় তখন অসম্ভবও বুঝি সম্ভব হয়ে ওঠে। আর ওঠে বলেই উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মতি জানান। এই মনোভাবেরই বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে আগামী মাসে ঢাকায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি আশাপ্রদ ঘটনা। প্রথম বৈঠকই সৌহার্দ্যের রাখিবন্ধন ঘটাবে, হয়তো তা নয়। তবে উপমহাদেশকে শান্তির আলয়ে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ মাইলফলক হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে যখন মৈত্রী ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার হাওয়া বহমান তখন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস লঘুচিত্তে গৃহীত হতে পারে না। বিশেষ করে যে রকম সমস্যা যা শান্তি বিনাশী ও উন্নতির পথে বাধা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সেদিক থেকে বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

পাহাড়ী তিনটি জেলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও রয়েছে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও কৃষিজাত দ্রব্য চাষের সম্ভাবনা প্রচুর। কমলা লেবু, আনারস, পেঁপে ইত্যাদির পাশাপাশি রাবার চাষ এবং চা বাগান তৈরির বিপুল সম্ভাবনা সেখানে বিদ্যমান। কয়েকটি জুস প্লান্ট তৈরি করা হলে জুস আমদানির চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। পাহাড়ী জেলাগুলো বিভিন্ন তরিতরকারি ও মসলার চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম। ছয়-সাত বছর আগে বান্দরবানে আদা ও রসুনের পরিকল্পিত চাষাবাদ করা হয়েছিল। প্রথম বছরই এত উৎপন্ন হয় যে কেনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য পাহাড়ী জেলাগুলোতে আরও বহু কিছুর চাষাবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু অশান্ত পরিবেশের জন্য গত দুই-আড়াই যুগে এর কিছুই করা যায়নি।

অশান্তির সূচনা সাবেক পাকিস্তান আমলে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করার ফলে আদি রাঙ্গামাটি শহর ও সর্বাধিক উর্বরা জমি হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়। এর প্রতিকারের দাবি পূরণ না করে উল্টো নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় পাহাড়ীদের ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে বিষয়টির প্রতি নানা কারণে উপযুক্ত দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি। পরিণামে '৭৪ সালে স্বতন্ত্র সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গঠন করেন শান্তি বাহিনী। মানবেন্দ্র নিহত হলে তাঁর ছোট ভাই সন্তু যার আসল নাম জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, তাঁর স্থান পূরণ করেন। সন্তু একজন শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত সন্তুর স্বপ্ন ছিল স্বজাতিকে শিক্ষিত করে তোলার। তাই স্ত্রী মাধুরীকে নিয়ে স্বগ্রাম গুইমারায় গড়ে তুলেছিলেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সত্তরের দশকের শেষ দিকে তাকে কারারুদ্ধ করে চরম নিগ্রহ করা হয়। বলা যেতে পারে যে, এই নিগ্রহই তাকে রূপান্তরিত করে লৌহকঠিন মানবে। আশির দশক থেকে শুরু হয় শান্তি প্রয়াস। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং বেগম জিয়ার আমলে আগেই বলেছি, মোট ১৫ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন সুফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকারের আমলেই প্রথম ধ্বনিত হয় আশার বাণী। পাহাড়ী নেতারা অকপটে স্বীকার করে যে, 'সমস্যা সমাধানে বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশি আন্তরিক'।

উক্তিটিতে ছিল আস্থার বহিঃপ্রকাশ। আস্থা সমস্যা সমাধানে মস্তবড় সহায়। তাই বোধ হয় কয়েক দফা আলোচনার পর বিগত বৈঠকে স্বাক্ষরিত

হয় খসড়া চুক্তি। ইতোমধ্যেই পাহাড়ী পরিষদের বৈঠকে খসড়া চুক্তির সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সন্তুর ওপর। এটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোনিকস মিডিয়ার সংবাদ। গত ক'দিনে এ সংবাদ একাধিকবার প্রচার করা হয়। মাঝখানে গত ১৭ তারিখ ঢাকার একটি দৈনিক ভিন্ন ধরনের খবর পরিবেশন করে। বলা হয় যে, 'পাহাড়ী পরিষদ খসড়া চুক্তির কোন কপিই পায়নি।' খবরটি ছিল বিভ্রান্তিকর। কারণ প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, খসড়া সই হওয়ার পর একটি করে কপি উভয় পক্ষকে দেয়া হয় দেখে-শুনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। যা হোক, পরবর্তী খবরাখবরে সে বিভ্রান্তি কেটে যায়। চুক্তি সই করা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যুগ যুগ শান্তিবিনাশী একটি সমস্যার সমাধান আনন্দের বিষয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি এখনও প্রাণখোলা হাসি হাসা সম্ভব হচ্ছে না। এই না হওয়ার হেতু প্রধান বিরোধী দলসহ কোন কোন মহলের তৎপরতা। চুক্তির কোন অংশ যদি তাদের বিবেচনায় গ্রহণ করার মতো না হয় তাহলে যুক্তিসহ নিশ্চয় তা তুলে ধরা যেতে পারে। সে অধিকার অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু শান্তি চুক্তি সই করার পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন যে কোন কাজ দুঃখজনক।

এ মহল থেকে এতদিন দাবি করা হচ্ছিল যে, 'পাহাড়ী জেলাগুলো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা যাবে না।' আসলে এ ছিল মতলবী বা অজ্ঞতাপ্রসূত দাবি। ক্যান্টনমেন্ট প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন বক্তব্য খসড়া চুক্তিতে নেই। সরকারের পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য কোন সময় দেয়া হয়নি, বরং বহুবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সৈন্য প্রত্যাহার করার প্রশ্ন ওঠে না।' এরপর এই বক্তব্যে কিছুটা ভাটা পড়ে ঠিক। কিন্তু উঠতে থাকে অন্য বক্তব্য। যেমন, সংবিধান লঙ্ঘন ও দেশের অখণ্ডতা ইত্যাদি। এক সেমিনারে বিরোধী দলের কোন কোন বক্তা এমনও বলেন যে, 'শান্তি চুক্তি' সই করলে পাহাড়ী জেলাগুলো নাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেমিনারের বক্তারা অবশ্যি 'পণ্ডিত'। 'পণ্ডিতী' বক্তব্যের কি জবাব দেয়া যায় বুঝতে পারছি না। আক্ষেপ শুধু এই যে, সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ চিন্তাকে তাঁরা জাতীয় স্বার্থের ওপর স্থান দিতে পারেননি। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি কেবল তাঁদেরও দরদ আছে এমন মনে করার কিছু নেই। এখানেই শেষ নয়। তিনটি পাহাড়ী জেলায় আগামী ২৬ তারিখ ঘেরাও ও ২৯ তারিখ হরতাল ডাকা হয়েছে, অথচ তাঁরাই বলছেন যে, খসড়ায় কি আছে তাঁদের তা জানা নেই। যদি এটাই হয় তাহলে ভাল-মন্দ না জেনে ঘেরাও এবং হরতাল কেন? কেউ যদি একে শান্তি চুক্তি সই করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি কিংবা "আমরা যখন সফল হতে পারিনি, তোমাদেরও সফল হতে দেব না"–এই অসুস্থ মানসিকতা দূর হবে কবে?

দেশ আমার-আপনার তথা ১২ কোটি মানুষের। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষক ১২ কোটি মানুষ। দলবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষ নয়। আগেই বলেছি, হাওয়ায় গদা না ঘুরিয়ে যুক্তি সহকারে যে কোন বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে। কোন কারণে সরকার যদি কান না দেয়, জনগণ কান দিতে বাধ্য করাবে। তা না করে গরজী পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না।

বিশ্বের প্রবহমান স্রোতের বিপরীতে চলা নিজেরই ক্ষতি। মুক্ত অর্থনীতির এই দুনিয়ায় সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রাধান্য। ঘরে প্রতিকূল পরিবেশ রেখে বাইরের প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে না।

আশার কথা যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের চেতনা এ ক্ষেত্রে শানিত। 'শান্তি মিছিল' এবং 'চুক্তির' পক্ষে সভা-সেমিনার আয়োজন এর নজির। 'শান্তি মিছিলে' প্রধান স্লোগান ছিল, "পাহাড়ী-বাঙালী ভাই-ভাই, এক সঙ্গে বাঁচতে চাই" নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক স্লোগান। এই স্লোগান আরও সোচ্চার হোক, কারণ দেশের মানুষ রাঙ্গামাটির পাহাড়ে নতুন দিনের চাঁদ দেখতে চায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬শে অক্টোবর ১৯৯৭
ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীরা একনাগাড়ে দেশে ফিরতে পারছে না ॥ ফের দফাওয়ারী প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ

ফজলুল বারী, টাকুমবাড়ি (ত্রিপুরা) থেকে ফিরে: প্রত্যাশামাফিক শরণার্থীদের একনাগাড়ে দেশে ফিরতে দেয়া হচ্ছে না। অন্তত এখন পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের সেটাই পরিকল্পনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি, উপেন্দ্রলাল চাকমার ঘোষণা সত্ত্বেও আবার দফাওয়ারী প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ তাদের। সে হিসাবে আগামী ২১ নবেম্বর থেকে পরবর্তী দফায় ৫ থেকে ৬ হাজার শরণার্থীকে দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এই প্রস্তুতিপর্বটিতেও ঢিমেতালে ভাব। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি সূত্র জনকণ্ঠকে বলেছে, ডিসেম্বরের ৫ তারিখে পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সাথে একটি বৈঠকের আশা করছেন। পরবর্তী প্রত্যাবাসন নির্ভর করবে সেই বৈঠকের ফলাফলের ওপর।

গত বুধবার (২২ অক্টোবর) ত্রিপুরার টাকুমবাড়ি শিবিরে শরণার্থী নেতাদের সাথে কথাবার্তায় এসব তথ্যাদি বেরিয়ে আসে। রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে দুর্গম পাহাড়ী পথে এই শিবিরের দূরত্ব ১শ' কিলোমিটারের বেশি। ত্রিপুরার যে ৬টি শিবিরে বাংলাদেশের পাহাড়ী শরণার্থীদের মানবেতর বসবাস টাকুমবাড়িরটিই এর মাঝে সবচেয়ে বড়। উদয়পুর জেলার অমরপুর

মহকুমার অধীন শিবিরটায় এখন মোট শরণার্থী আছেন ২০২৮ পরিবারের ১১,৮১৬ জন। এর মাঝে ১৮১৬টি চাকমা পরিবার। ২০২টি ত্রিপুরা এবং ১০টি মারমা পরিবার। ১৯৮৬ সালে শিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে জন্ম নিয়েছে ৪৮০২টি শরণার্থী শিশু। মারা গেছে ১৫৮০ জন। আর শিবির অফিসের বোর্ডের হিসাবমাফিক মিসিং ৫১৫১ জন। মিসিং অর্থাৎ যারা পালিয়ে অথবা স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেছেন।

এই প্রতিনিধির শিবিরটি ঘুরে দেখার দিনটায় জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা সেখানে ছিলেন না। সংগঠনের সহসভাপতি রঞ্জিত নারায়ণ ত্রিপুরা তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করেন। শিবিরের এলাকায় আমাদের গাড়ি থামতেই শীর্ণ শরীরের শতাধিক শিশু ঘিরে দাঁড়ায়। বয়স্কও কয়েকজন এগিয়ে আসেন। পথের দু'ধারে, পাশের পাহাড়ের চূড়ায় ছনের ছাউনি দেয়া কয়েক সহস্র শরণার্থী ঘর। এগুলোর অবস্থাও জীর্ণ-পর্ণ কুটির। বড় রাস্তার ডানপাশ ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি বৌদ্ধ মন্দির। সেখানেই পৃথক একটি বাড়িতে শরণার্থী নেতা উপেন বাবু সপত্নীক থাকেন। তবে তাঁর বাড়ির কিশোর কাজের ছেলেটি বললো সে শরণার্থী নয়, স্থানীয় চাকমা। কয়েকজন বয়স্ক শরণার্থী পুরুষকে দেশে কবে যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে জবাব আসে–কিভাবে যাই। কেন তালিকায় নাম লেখাননি? মাথা নেড়ে 'না' জবাব দেয়া হয়। একজন বলেন, দেশে ফিরতে চাই। এভাবে আর ভাল লাগে না। কিন্তু নাম যে উঠাতে পারছি না। তালিকা কিভাবে হচ্ছে জানি না। কল্যাণ সমিতির সদস্য জীবন কৃষ্ণ চাকমা বললেন, তালিকা হচ্ছে। কোথায় কিভাবে হচ্ছে দেখতে পারি? জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এখন, আজ হচ্ছে না। তালিকার কাজটি আজ শুরু করা যায় না? একটু দেখা যেত কিভাবে তালিকা করেন...জবাব আসে–আজ তালিকা হবে না। কারণ আজ লোক আসেনি। এই মোটামুটি প্রধান শরণার্থী শিবির টাকুমবাড়ি শিবিরের প্রস্তুতির অবস্থা।

শরণার্থী নেতারা দাবি করেছেন, তালিকা তৈরিতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। কেউ আগ বাড়িয়ে নাম নাকি দিতে চাইছে না। ইতঃস্তত বোধ করছে। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাঁরা যা বললেন–তাহলো ৬ শিবিরেই তালিকা তৈরির কাজ চলছে। এ দফায় পাঠানো হবে ৫ থেকে ৬ হাজারকে। এবারও বেশি যাবে ত্রিপুরা ও মারমা পরিবার। ত্রিপুরার সরকারী সূত্রের খবর হচ্ছে–তালিকাটি শরণার্থী নেতারা ইচ্ছামাফিক, বেছে বেছে নিজেরাই ঠিক করছেন কাদের এখন পাঠাবেন, কাদের পাঠাবেন পরে। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে তালিকাটি তৈরি করে অমরপুর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে দেয়া হবে উদয়পুরের জেলা শাসককে। এই দুই হাত ঘুরে এটি যাবে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকের কাছে। এভাবে ২১

নবেম্বর থেকে যাঁরা দেশে ফিরবেন তাঁদের তালিকা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছতে নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ লেগে যাবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭শে অক্টোবর ১৯৯৭

অশান্ত পার্বত্যাঞ্চলে শান্তির শ্বেত কপোত

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী

দুই যুগেরও বেশি সময়ের সংঘাত-সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় প্রাণহানি, দেশত্যাগ ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানির অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে শান্তিবাহিনী সরকারী আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। প্রায় এক বছরের কূটনৈতিক উদ্যোগ, আলাপ-আলোচনার পর সরকার ও শান্তিবাহিনী পার্বত্য শান্তি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করেছে বলে খবরে প্রকাশ। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর লোকের যেমন অভাব নেই, তেমনি শান্তি উদ্যোগকে বানচাল করার লোকের কমতিও বাংলাদেশে নেই। যারা শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানাচ্ছে তাদের সাধারণ পরিচয় তারা বাঙালী আর যারা শান্তি চুক্তিকে বিভিন্ন কারণে স্বাগত জানাতে পারেনি কিংবা শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল প্রয়াসী তাদের সাধারণ পরিচয় বাংলাদেশী। বাংলাদেশীদের অভিযোগ যে, বাঙালীরাই তাঁদের শাসনামলে এই পার্বত্য সমস্যার স্রষ্টা। তারা বলছে যে, বাংলাদেশের সব মানুষকে বাঙালী হয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েই এই সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সমস্যার অন্যতম সমাধান হিসাবে তারা বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি মানুষের পরিচিতি বিলুপ্ত করে মাত্র এক ভাগ লোকের স্বার্থে দেশবাসীকে বাংলাদেশী বানিয়ে ছেড়েছে। এটাই ছিল তাদের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করার কৌশল। কালে এই কৌশলটা 'মুখের কথায় চিড়া ভিজে না' বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে সত্য নয় এবং বাঙালী হয়ে যাবার আহ্বানে যে সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়নি, তা প্রমাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের অভাব হবে না। তবে প্রত্যক্ষ এবং অতিনির্ভরযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচনের ফলাফল। ১৯৭৫ সালে মূলত বাঙালীদের শাসনের অবসান ঘটেছে। এরপর থেকে বাঙালী নাম মুছে ফেলতে হবে হেন কাজটি নেই যা করা হয়নি। তারপরও ১৯৯১ সালে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বচনে পার্বত্য এলাকার মানুষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকেই ভোট দিয়েছে। তারপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি এমপি আওয়ামী লীগের ব্যানারেই নির্বাচিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের কোন আচরণে তারা বিক্ষুব্ধ হলে বরং ব্যালটেই তার জবাব দিতে পারত। এর বিপক্ষে কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে, আওয়ামী

লীগের আচরণে বিক্ষুব্ধরা তাদের ইচ্ছা বা অভিলাষের প্রকাশ ঘটাতে পারেনি। কেননা তারা সীমান্তের ওপারে থেকে ব্যালটযুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে তা সত্যি বলে ধরে নিতে দ্বিধান্বিত না হলেও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তাকে সত্যি বলে ধরে নিতে সত্যিই দ্বিধান্বিত। আসলে পাহাড়ী জনগণ জাতি কি উপজাতি, বাঙালী কি চাকমা ইত্যাদি পরিচয়ে সংঘাতের যতটা উৎপত্তি তার চেয়ে বেশিভাবে সংঘাতের কারণ হচ্ছে আর্থিক। সব সমস্যার মূল সমস্যা হচ্ছে এই আর্থিক সমস্যা। তাই পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালীদের বসতিস্থাপন, ভূমির দখল এবং ক্রমাগত পাহাড়ীদের সংস্কৃতিকে আগ্রাসন প্রয়াসই সংঘাতের সামগ্রিক বিস্তৃতি ঘটিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

অবস্থাই প্রমাণ করেছে যে, মুখের কথায় নয় পানি দিয়েই চিড়া ভিজাতে হয়। এই পানি দিয়ে চিড়া ভিজাবার উদ্যোগ জিয়া ও এরশাদ আমলে গৃহীত না হলেও খালেদা জিয়ার আমলে সে চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সরকার ও বিরোধী দল যৌথভাবে কয়েক দফা সীমান্ত অতিক্রম করেও আলাপ-আলোচনায় মিলিত হয়েছিল। কিন্তু পানি না থাকায় চিড়া ভিজেনি। চিড়া ভিজাতে ব্যর্থ হয়ে এসব বাংলাদেশী সারা বাংলাদেশে কোথাও বাঙ্গালী খুঁজে না পেলেও শুধু পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালী খুঁজে পেয়েছে এবং অতি সম্প্রতি বাঙালীদের জন্য অতি ব্যতিব্যস্ততা প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে বাঙালীরাই এখন মুষ্টিমেয় বাংলাদেশীর স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে দুই যুগের বেশি সময়ের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজছেন। এই সমাধান খুঁজতে গিয়ে তাদের সামনে win-win, win-loose, Loose-win কিংবা loose-loose কৌশল রয়েছে। এ যাবত win-loose কৌশলকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বিধায় শান্তি প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সংঘাতময় কোন পরিস্থিতির সম্মানজনক সমাধানের জন্য win win কৌশলের বিকল্প নেই। নিকট অতীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে win-win কৌশলের প্রয়াস দেখেছি। আওয়ামী লীগ বলেছে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদায় করে ছেড়েছে আর বিএনপি বলেছে যে, তারা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় দেশবাসীকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপহার দিয়েছে। শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারের চুক্তির শর্তগুলো সব অজ্ঞাত নয়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এবারে একটা win-win কৌশল কাজ করছে। সরকার এগিয়ে যাওয়ায় শান্তিবাহিনী পিছিয়ে যায়নি। বাঁকা আঙ্গুলে ঘি তোলার কৌশল বিসর্জন দিয়ে বরং উভয় পক্ষই পানি দিয়ে চিড়া ভিজানোর উদগ্রীব বলেই খসড়া শান্তি চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে। এই উদ্যোগ যাঁরা পছন্দ করছেন না, তাঁদের কেউ কেউ শান্তি চান ঠিকই, কিন্তু নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে হয়ত পরাজয়ের মনস্তাত্ত্বিক গ্লানি এড়াতে তাঁরা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছেন। আর এক জোট আছে যারা বৈষয়িক কারণে

অশান্ত পার্বত্যাঞ্চল দেখতে চায়। আর এক শ্রেণী আছে, যারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব মেনে নিলেও আদর্শিক ভিত্তিকে বুড়ো আঙ্গুল এখনও দেখাচ্ছে, তারাও শান্তির বিপক্ষে। আর একটা শ্রেণী আছে যারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও আদর্শিক অস্তিত্ব ও ভিত্তি কোনটাই স্বীকার করে না। তাদের সকলেরই বাংলাদেশী ছাড়াও আর একটা সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্র হলো অন্ধ আওয়ামী লীগ বিরোধিতা। তাই আওয়ামী লীগ যা করবে, কারণে-অকারণে তারা তার বিরোধিতা করবেই। এই বিরোধিতাকে জুতসই করতে বাংলাদেশের 'সঙ্কটাপন্ন' স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গ প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কোন একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলে কিংবা দেশত্যাগীরা দেশে ফিরে এসে নিজ মাতৃভূমিতে পুনর্বাসিত হলে কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট বা খর্বিত হবে তা আমার মতো অনেকেরই বোধগম্য নয়। ঐসবের স্পষ্ট ব্যাখ্যা যেমন তারা দিচ্ছে না, তেমনি পার্বত্য এলাকায় কিভাবে চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখাও আওয়ামী লীগ দেয়নি বলে অনেকের অভিযোগ। এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে সচেষ্টরা অবশ্যই দেখবেন যে, অভিযোগের জবাব দিতে দিতে সরকার শান্তিচুক্তিতে কি লিপিবদ্ধ আছে তার সবটা না হলেও অধিকাংশ বিষয়ই ফাঁস করে দিয়েছে। সর্বশেষে সরকার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্রপ্রহরী সেনাবাহিনীকে পার্বত্য এলাকা থেকে সরিয়ে আনা হবে না। এর ব্যাখ্যা হিসাবে প্রতিপক্ষ বলছে যে, সেনাবাহিনী পার্বত্য এলাকার সেনানিবাসে ঠিকই রাখা হবে, তবে আগের মতো সব জায়গায় রাখা হবে না, তাতে শান্তিবাহিনীর যথেচ্ছাচার বৃদ্ধি পাবে। এমনকি চুক্তির কারণে এই শান্তিবাহিনীসহ দেশত্যাগীদের পুনর্বাসনে বাঙালী অভিবাসীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। শান্তিচুক্তি সাংবিধানিক কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় নেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ নেবে বলে মনে হচ্ছে না। এটা একটা আস্থার বিষয়ও বটে। এই আস্থার প্রশ্নেই শান্তিচুক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যে সব স্বতন্ত্র গোষ্ঠী কিংবা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিবর্গ যেভাবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কথা বলছেন, তাতে বলতেই ইচ্ছে করে 'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।' এই গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ এমন সব ব্যক্তি রয়েছে, যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ভ্রূণেই বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়ে ত্রিশ লাখ বাঙ্গালী হত্যা, প্রায় তিন লাখ নারী ধর্ষণের সহযোগী হয়েছে এবং বিশাল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রত্যক্ষ ঘাতক হিসাবে নিজেদের

চিহ্নিত করেছে। তাদের মুখে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কথা শুনলে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে 'তারা কোন্ দেশের কথা বলছেন। গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, সাঈদী, কাদের মোল্লা, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মুখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সঙ্কটের কথা শোনা আর ভূতের মুখে রাম রাম জপমালা সমার্থক নয় কি? আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী অশান্তি জিইয়ে রাখায় তাদের মতলব ভিন্নতর। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে অস্ত্রের ব্যবসায় রমরমা ভাবটা কমে যাবে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ খর্বিত হবে, পার্বত্যাঞ্চলকে অভয়ারণ্য হিসাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের ঘৃণ্য উদ্যোগ ও প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে, অস্ত্রপাচার ও চোরাচালান কমে যাবে, বাংলাদেশ ও রেঙ্গুনের মাঝামাঝি বাফার স্টেট সৃষ্টির স্বপ্ন ধূলিস্মাত হবে, জিহাদের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

মোট কথা বাঙ্গালীদের স্বার্থের কথা বলে আর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জুজুর ভয় দেখিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থোদ্ধারের পথটিকে জিইয়ে রাখতে চায় বলেই এখন শান্তি উদ্যোগ বানচালের পায়তারা হচ্ছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই অপতৎপরতা বেড়ে যাচ্ছে। আগামী ২৯ অক্টোবর পার্বত্য জেলায় হরতালের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের দিনে সারা দেশ অচল করে দেবার হুমকি দেয়া হয়েছে। যে হরতাল দিয়ে সারা দেশ অচল করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে সে হরতালের বিপক্ষে এখন দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। হরতালকে তারা বাড়তি উৎপাত মনে করছে, শান্তি, স্থিতি ও প্রগতির শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছে। এ থেকেও বোঝা যায় যে, পার্বত্যাঞ্চলে হরতালের চেয়ে নিকৃষ্ট সশস্ত্র উৎপাত ও অশান্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে সাধারণ মানুষ কতটা উদগ্রীব হবে। তাই শান্তি উদ্যোগকে ভুণ্ডুলকারীদের হয়ত অনেকে টেরা চোখে দেখবে। নিরপেক্ষ অথচ মানবতাবাদী ও কল্যাণকামীরা বরং বিক্ষুব্ধই হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সকল দলমতের বাংলাদেশীদের এক চোখে দেখা আর এক পাল্লায় মাপার প্রবণতাও সঠিক প্রবণতা নয়। শান্তিবাহিনী তার আদি অবস্থান থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন বিরোধীদের প্রবল চাপ না থাকলে সরকারকে হয়ত একটা অসম চুক্তিতেই উপনীত হতে হোত। আশা করি এই নিরপেক্ষ মধ্যম গোত্রীয় বিরুদ্ধবাদীগণ শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নেও সহায়তা করবেন। অচিরে পার্বত্য এলাকায় শান্তির শ্বেত কপোত উড়তে দেখব।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮শে অক্টোবর ১৯৯৭

আসন্ন শান্তি চুক্তি সমর্থন করেন ৯০ শতাংশ পার্বত্যবাসী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসকারীদের ৮৯.৭৩ শতাংশ নাগরিক সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আসন্ন শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করেন। এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৪.৩৪ শতাংশ। সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট কমিউনিকেশন (সিডেক) নামের একটি সংস্থার জরিপে এই উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আসন্ন শান্তি চুক্তিকে সামনে রেখে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় গত ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই জরিপ চালানো হয়। উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মোট ৭৫০ জন নাগরিকের মতামত নেয়া হয় জরিপে।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগ বলেছেন–যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ শান্তি চুক্তির পক্ষে থাকবে। বাংলা ভাষাভাষী অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন–সম্পাদিত শান্তি চুক্তি তাদের স্বার্থহানির কারণ হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, শান্তি চুক্তিতে কি কি শর্ত থাকবে, খসড়া চুক্তিতে কি আছে এসব বিষয়ে নজিরবিহীন গোপনীয়তা রক্ষা করায় পার্বত্য এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বান্দরবান এলাকায় চারপুরুষ ধরে বসবাস করছেন এমন একজন বাংলাভাষী শিক্ষক বলেছেন–খসড়া শান্তি চুক্তির ষিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে জাতীয় স্বার্থেই। রাঙ্গামাটির ৮৯.৪৯ শতাংশ, খাগড়াছড়ির ৯২.৪৩ শতাংশ, বান্দরবানের ৮৭.৩৪ শতাংশ শান্তি চুক্তির পক্ষে মত দেন। ৮৯.২৮ শতাংশ নাগরিক বলেছেন, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। এক সময় শান্তিবাহিনীর সদস্য ছিলেন, বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে ঠিকাদারী করছেন এমন একজন চাকমা উপজাতি বলেন–শান্তি চাওয়ার প্রশ্নে যুক্তি খোঁজা একটি অবান্তর প্রসঙ্গ। পার্বত্য এলাকায় উপজাতি ও বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আমরা হাজার বছর ধরে একত্রে বসবাস করে আসছি। তাদের সাথে আমাদের কোন সংঘাত ছিল না। এখনও নেই। সংঘাতের প্রশ্নটি এসেছে যখন পুনর্বাসনের নামে বাংলা ভাষাভাষী লোকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

খাগড়াছড়ির একজন শীর্ষস্থানীয় পৌর কর্মকর্তা জরিপকারীদের বলেন–আমরা শান্তি চাই না–এমন একটি অভিযোগ একতরফাভাবে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাস্তব পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে

এখানে বাংলা ভাষাভাষী লোকজনই বেশি অবহেলিত এবং অনগ্রসর। অথচ যে কোন চুক্তি করতে গিয়ে আমাদেরকে কোন হিসাবেই ধরা হচ্ছে না। সব কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে উৎকণ্ঠা বাড়ছে। এ ব্যাপারে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা খুবই জরুরী। জরিপে ৮২.৫০ শতাংশ নাগরিক চুক্তির ... করে ২৯ অক্টোবরের হরতালের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। ১০.০৫ শতাংশ হরতাল সমর্থন করেছেন। হরতাল বিরোধিতাকারী অনেক বাংলা ভাষাভাষী বলেছেন–নেতিবাচক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এই হরতাল ঢাকা থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। রাঙ্গামাটির একজন মার্মা উপজাতীয় শিক্ষক বলেন–পার্বত্য এলাকায় শান্তির বিপক্ষে জামায়াতের ভূমিকায় আমরা বিস্মিত নই। বিস্মিত বিএনপি'র ভূমিকায়। কারণ এ দলটি ক্ষমতায় থাকতে জনসংহতি সমিতির সাথে শান্তি সংলাপ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিল। এখন তারাই এর বিরোধিতা করছে। অনেকে বলেন, সম্ভাব্য চুক্তির কোন খসড়াই এখন পর্যন্ত বেরোয়নি। তাই এটা সংবিধানবিরোধী, বাংলা ভাষাভাষীদের স্বার্থবিরোধী এসব অনুমাননির্ভর কথা বলে হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দেবার যুক্তি থাকতে পারে না। রাঙ্গামাটির এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বলেন, এ হরতাল হচ্ছে সুবিধাবাদী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানির ফসল। ৮১.৩৯ ভাগ মতামতদানকারী বলেছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরে আসার ব্যাপারে আশাবাদী। অনেকে বলেছেন, শুধুমাত্র শান্তি চুক্তিই পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে পারে না। চুক্তির শর্তসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। রাঙ্গামাটির পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক নেতা বলেন–উপজাতীয়দের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভূমির অধিকারের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি না হলে এলাকায় স্থিতিশীল অবস্থা ফিরবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭

খালেদা জিয়া-গোলাম আযম বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া বুধবার রাতে জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারী বাসভবনে এক ঘণ্টা স্থায়ী এ বৈঠকে উভয় দলের নেতৃবৃন্দ অভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যুগপৎ ধারায় সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে সম্মত হন। উভয় দল বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খালেদা জিয়া ও গোলাম আযমের মধ্যে বুধবারই প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হলো।

বৈঠক শেষে গোলাম আযম সাংবাদিকদের বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আমরা পেরেশানে আছি। বিএনপি'র সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, অভিন্ন কর্মসূচীতে যুগপৎ আন্দোলন আমাদের বহুদিনের ট্রাডিশন। বিএনপি চেয়ারপার্সনের তথ্য উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ বলেন, বর্তমান অবস্থা মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলাম-পছন্দ ছোট বড় সমমনা সকল দলের সমন্বিত কর্মসূচী উদ্ভাবন ও লালন-পালন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বৈঠকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিএনপি নেতাদের মধ্যে ছিলেন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম এবং আনোয়ার জাহিদ। অপরদিকে গোলাম আযমের সঙ্গে ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা ও মহানগরী শাখার আমীর এটিএম আজহারুল ইসলাম।

বৈঠকের সময় নির্ধারিত ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া সাতটায় মিন্টো রোডে তাঁর সরকারী বাসভবনে পৌঁছেন। মান্নান ভূঁইয়া, শামসুল ইসলাম ও আনোয়ার জাহিদ আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ ও বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত থাকলেও গোলাম আযমের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেননি।

রাত সাতটা ৩৮ মিনিটে গোলাম আযম দলীয় কর্মীদের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মিন্টো রোডে আসেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাদের মোল্লা ও আজহারুল ইসলাম। মোঃ কামারুজ্জামান পৃথক গাড়িতে কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হন। জামায়াতের কর্মীদের ৩/৪টি গাড়ি গোলাম আযমের গাড়ি অনুসরণ করে। এর আগেই জামায়াতের কিছু কর্মী বিরোধীদলীয় নেত্রীর বাসভবনে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। গোলাম আযম গাড়ি থেকে নেমেই সরাসরি বিএনপি চেয়ারপার্সনের কক্ষে চলে যান। এখানেই বিএনপি ও জামায়াত নেতাদের মধ্যে এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে গোলাম আযম বলেন, আমরা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ওপর জোর দিয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে দেশের অখণ্ডতা থাকবে না। জোটভিত্তিতে আন্দোলন হবে কিনা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অভিন্ন কর্মসূচীতে যুগপৎ ধারায় আন্দোলন হবে, যা আমাদের বহু দিনের ট্রাডিশন। সাংবাদিকদের আরও কিছু প্রশ্নের মুখে গোলাম আযম দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে যান।

পরে বিএনপি নেতা আনোয়ার জাহিদ সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে তাতে দেশের অখণ্ডতা, জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় সত্তা সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার। বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি বিশেষভাবে স্থান পায়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, উভয় দল মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চট্টগ্রাম বন্দর, রাউজান বিদ্যুত কেন্দ্র, ফেনী নদী পর্যন্ত সব হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে চুক্তি হতে যাচ্ছে তাকে সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। জনাব জাহিদ জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সমমনা সকল দলের সঙ্গে মিলিতভাবে সমন্বিত রক্তব্য ও কর্মসূচী প্রণয়নে বৈঠকে একমত হয়েছে। এ সময় জামায়াত নেতা মোঃ কামারুজ্জামান ও কাদের মোল্লা উপস্থিত ছিলেন। মোঃ কামারুজ্জামান বলেন, এ সরকারের ১৬ মাসে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে।

মঙ্গলবার এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বুধবার স্থানান্তর করা হয়। বৈঠক চলাকালে বৈঠক কক্ষের বাইরে সতর্ক প্রহরা ছিল। ফটো সাংবাদিকদের বৈঠক কক্ষের কাছে যেতে দেয়া হয়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি উদ্যোগ বানচালের জন্য খালেদা জিয়া অসত্য বক্তব্য দিচ্ছেন ॥ আওয়ামী লীগ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের বৈঠকে অভিযোগ করা হয়, বিরোধী দল বিএনপি দেশের গণতন্ত্র নস্যাতের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি উদ্যোগকে বানচাল করার লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দিয়ে চলেছেন অসত্য বক্তব্য। বিএনপি'র নেতৃত্ব "অশান্তি বাহিনী" সৃষ্টির নামে দেশকে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন সংঘাতের দিকে। উস্কানি দিয়ে চলেছেন দাঙ্গা-হাঙ্গামার। সরকারের সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে বিএনপি এবং তাদের সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সংবিধান ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আইন নিজ হাতে তুলে নেয়ার আস্ফালন চালাচ্ছে। এজন্যই তারা পরিকল্পিতভাবে সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিত থেকে অযৌক্তিক ও অবান্তর দাবি উত্থাপন করছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য বৈঠকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বুধবার রাতে ধানমণ্ডি আওয়ামী

ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন এবং বিএনপি'র সম্ভাব্য ভূমিকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে বিরোধী দলের ভূমিকা এবং সচিবালয়ের বিক্ষোভ সম্পর্কে বৈঠক-আলোচনা হয়। এসব ইস্যু সম্পর্কে জনমনে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য বৈঠকে দলীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকের প্রস্তাবে বলা হয়, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বিনিয়োগের পরিবেশ। দেশের এই উন্নয়নের ধারা ও বিনিয়োগের পরিবেশ নস্যাত করার জন্য একটি মহল সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে কাজ করছে। জিয়াউর রহমান সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যার যখন শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছে, দেশবাসী যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে ঠিক তখন খালেদা জিয়া এই উদ্যোগ বানচালের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। দেশবাসী তাদের এই অশুভ চক্রান্ত বরদাশত করবে না।

বৈঠকে আগামী ৩ নবেম্বর জেলহত্যা দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়। দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছাড়াও সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান খান, প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং চট্টগ্রাম সিটির মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০শে অক্টোবর ১৯৯৭

তিন পার্বত্য জেলায় শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে হরতাল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে গতকাল বুধবার হরতাল করা হয়েছে। বিএনপি, জামায়াত সমর্থনপুষ্ট পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের ডাকা এই সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচী কেটেছে শান্তিপূর্ণভাবেই। রাঙ্গামাটিতে জামায়াত কর্মীদের সাথে পুলিশের ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়। সেখানে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে দেশব্যাপী তিন দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। ১১ নবেম্বর চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়ামের সমাবেশ থেকে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

বান্দরবান থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, হরতাল চলাকালে যানবাহন দোকানপাট বন্ধ থাকলেও অফিস-আদালত, কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে পুলিশ পিকেটারদের বাধা দেয়নি। নিজস্ব সংবাদদাতা রাঙ্গামাটি থেকে জানান, যানবাহন-লঞ্চ চলাচল বন্ধ ছিল। জেলার সর্বত্র দোকানপাটও ছিল বন্ধ। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নিজস্ব সংবাদদাতা খাগড়াছড়ি থেকে জানান, হরতাল চলাকালে জেলার ৭ থানার অফিস-আদালতে কাজকর্ম, ব্যাংকে লেনদেন হয়েছে। তবে দোকানপাট, স্কুল-কলেজ এবং যানবাহন বন্ধ ছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩১শে অক্টোবর ১৯৯৭

মেয়র মহিউদ্দিনের বিবৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা জনগণ প্রতিহত করবে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন যখন আসন্ন ঠিক তখন বিএনপি এবং এ দেশের কতিপয় সাম্প্রদায়িক শক্তি তা নস্যাত করার জন্য তৎপর হয়েছে। এই অপশক্তি তিন পার্বত্য জেলায় হরতাল-সমাবেশ থেকে উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তাঁদের এ অপচেষ্টা জনগণ অবশ্যই প্রতিহত করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বৃহস্পতিবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ মন্তব্য করেন। মেয়র বলেন, গোটা জাতি যখন শান্তির হাতছানিতে উন্মুখ, ঠিক সে সময় নিজেদের ব্যর্থতার জ্বালা মিটাতে বিএনপি কয়েকটি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সাথে নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। তিনি উল্লেখ করেন, তাঁদের এক নেতা হুমকি দিচ্ছেন তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রক্রিয়া ঠেকাতে অশান্তি বাহিনী গঠন করবেন। আরেক নেতা বলেছেন, চুক্তি করলে ভারতের সাথে করতে হবে। আর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে।

মহিউদ্দিন চৌধুরী বিবৃতিতে বলেন, কারও বাড়াভাতে ছাই দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু অতীতে রোপণ করা বিষবৃক্ষ উপড়ে

ফেলে মধুর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই, যাতে বাঙালী-পাহাড়ী নির্বিশেষে সবাই নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায় এবং সমমর্যাদার অধিকারী হয়ে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারে।

তিনি বলেন, নানা কারণে পার্বত্যাঞ্চলে দীর্ঘ সময় জুড়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও হানাহানির যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তা অবসানের পরিবেশ সৃষ্টি করা গেছে। এ মুহূর্তে সেখানে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত উত্তেজনার বিষ ছড়িয়ে যারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইছে তারা বাঙালী-পাহাড়ী কারও বন্ধু নয়। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। ইনশাল্লাহ তা বাস্তবায়ন হবেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১লা নভেম্বর ১৯৯৭

প্রত্যাবাসন পণ্ড হয়েছিল বিএনপি'র হিপোক্রেসির কারণে ॥ উপেন্দ্র চাকমা

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি থেকে : জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেছেন, আগের দফায় বিএনপি সরকারের হিপোক্রেসির কারণে শরণার্থী প্রত্যাবাসন পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। বিএনপি সরকার শরণার্থীদের জন্য প্রতিশ্রুত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব তো বাস্তবায়ন করেইনি বরঞ্চ তা হিমাগারে পাঠিয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সমস্যার সমাধানে খুবই আন্তরিক। তাছাড়া গত দু'দফার সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে এই দলটির সাথে একাকার হয়ে গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ। তাই এবারে পুনর্বাসন যথাযথ হবার বিষয়ে আমি আশাবাদী। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যথাযথ পুনর্বাসন না হলে তারা আবার প্রত্যাবাসন বন্ধ করে দেবেন। শরণার্থী নেতা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সেটেলার সমস্যার সমাধান না হলে সেখানে শান্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। উপেন্দ্র লাল চাকমা শুক্রবার সকালে সাব্রুমের মন্দির ঘাট এলাকায় জনকণ্ঠসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথাগুলো বলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার প্রতি জনসংহতি সমিতির সমর্থন আছে কি?

উত্তর ঃ জনসংহতি সমিতি আলাদা সংগঠন। এই প্রত্যাবাসনের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, সেটেলার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের সাথে আলোচনা করছে। আমরা তাদের আলোচনার দিকেই চেয়ে আছি।

প্রশ্ন ঃ এখন নাকি দেশে ফেরার জন্য শরণার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে?
উত্তর ঃ প্রতিযোগিতা হচ্ছে ঠিক নয়। যারা এখনই যেতে চায় তাদের পক্ষে আমরা নাম আহ্বান করেছিলাম। সেভাবেই তারা যাচ্ছে।
প্রশ্ন ঃ শরণার্থীদের কাউকে জোর করে পাঠানো হচ্ছে কি?
উত্তর ঃ না, কাউকে জোর করে পাঠানো হচ্ছে না আমরা কারও গিনিপিগ নই।
প্রশ্ন ঃ যারা যাচ্ছে তারা আবার ফিরে আসতে পারে কি?
উত্তর ঃ না, এবার তেমন প্রবণতা দেখছি না। তাছাড়া সরকারেরও সদিচ্ছা আছে সমস্যা সমাধানের। সেজন্য আমরা প্রথম দফায় ৬৭২০ জনকে ফেরত পাঠাচ্ছি, শরণার্থীদের জমি-বাড়ি অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। ২০ দফা প্রস্তাব পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। এক মাস পর আমাদের দল যাবে এসব দেখতে। পুনর্বাসন যথাযথ না হলে প্রত্যাবাসনও বন্ধ হয়ে যাবে।
প্রশ্ন ঃ আপনি কি এই দলের সাথে পুনর্বাসন দেখতে যাবেন?
উত্তর ঃ শরীর ভাল থাকলে যাব।
প্রশ্ন ঃ আপনি কবে ফিরে যাবেন দেশে?
উত্তর ঃ সব শরণার্থী ফেরার পরেই আমি যাব।
প্রশ্ন ঃ প্রত্যাবাসনের বিনিময়ে আপনাকে নাকি মন্ত্রিত্বের অফার দেয়া হয়েছে?
উত্তর ঃ এটা আজগুবি খবর। এই প্রথম শুনলাম।
প্রশ্ন ঃ প্রত্যাবাসন সম্পূর্ণ শেষ হতে কতদিন লাগতে পারে।
উত্তর ঃ এটা পুনর্বাসন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ওপর নির্ভরশীল। পুনর্বাসন যথাযথ হলে, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হলে এখানে কোন শরণার্থী থাকবে না।
প্রশ্ন ঃ আপনি এবারে এতটা আশাবাদী হবার কারণ কি?
উত্তর ঃ সরকার সমাধান চাচ্ছে, সেজন্য আমি আশাবাদী। সরকার এখন বুঝতে পারছে রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২রা নভেম্বর ১৯৯৭
পাহাড়ী-বাঙালী সবাই শান্তি চুক্তির পক্ষে ॥ সকলের দৃষ্টি এখন ১৬ নবেম্বরের দিকে

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: পাহাড়ে এখন শান্তির জোর প্রবাহ। সাধারণ পাহাড়ী-বাঙালী সবাই চাইছে শান্তি। বিরোধীরাও বলছেন,

তারা প্রকৃত তথ্যের অভাবে অনেকটা বিভ্রান্ত। শান্তি চুক্তিতে যদি বাঙালী, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না হয় তাহলে তারাও শান্তি চুক্তির পক্ষে। একটি বিষয়ে সবাই একমত–ঢাকা থেকে যে যেভাবে যত কথাই বলুক শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া কারও জীবনই এখানে নিরাপদ, স্বাভাবিক হবার নয়। কারণ তাদেরকে এখানেই থাকতে হবে মিলেমিশে। এখন তাই সবার দৃষ্টি ১৬ নবেম্বরের দিকে। সেদিন ঢাকায় শুরু হবে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সপ্তম দফা শান্তি সংলাপ। এবারের সেই দিনটিতে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাঙালী নেতৃবৃন্দের বৈঠকও হবে। খাগড়াছড়ির সাবেক সাংসদ আলীম উল্লাহর নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের বাঙালী প্রতিনিধি দলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের সিডিউল আছে দুপুর ১২টায়। ২১ নবেম্বর থেকে শরণার্থীরা আসতে শুরু করবেন ত্রিপুরা থেকে। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা গত ২৫ অক্টোবর লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছেন, তারা এবার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া একনাগাড়ে চালাতে চান। শান্তি আলোচনা, শরণার্থী প্রত্যাবাসন এসব প্রক্রিয়ার বাইরে পুরো পার্বত্য এলাকায় এখন ইউপি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদেরও ভোটার করা হবে ইউপি নির্বাচনে। সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দৃষ্টিও শরণার্থী ভোটারদের দিকে। অনেক প্রার্থী নিজের পক্ষে জনসংহতি সমিতি অথবা শান্তিবাহিনীর একটি চিঠি সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। তাঁদের ধারণা, এমন একটি চিঠিই তাঁদের নির্বাচনী বৈতরণী পার করিয়ে দেবে। জনসংহতি সমিতিও প্রার্থী নির্বাচনে ভূমিকা রাখছে।

জনসংহতি সমিতির কাছে শান্তি চুক্তির খসড়া না পৌঁছতে কেউ কেউ সন্দিহান–আগামী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কিনা। তবে পাহাড়ীরা তাঁদের গ্রামে গ্রামে চুক্তির পক্ষে জনমত গঠন অব্যাহত রেখেছেন। খাগড়াছড়িতে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে শান্তি র‍্যালি। ৮ নবেম্বর রাঙ্গামাটিতে এমন আরেকটি র‍্যালি হবে। শনিবার সেখানে সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার এ ব্যাপারে একটি প্রস্তুতি বৈঠক করেন। খাগড়াছড়িতে চুক্তির বিরুদ্ধে যাঁরা তৎপর, তাঁরা পুনর্বাসিত বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামকেই শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। ১৫ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে বিএনপি, জামায়াতের উদ্যোগে যে সমাবেশ করা হয়েছিল সেখানেও গুচ্ছগ্রামগুলো থেকে লোকজনকে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়। খাগড়াছড়িতে এমন ৮৮টি গুচ্ছগ্রামে প্রায় দেড় লাখ বাঙালী আছেন। ২৬ হাজার পরিবারের রেশন কার্ড আছে। পরবর্তীতে নতুন সৃষ্ট পরিবার মিলিয়ে এই সংখ্যা এখন ৩৪ হাজার। ১৯৮৬ সালের দিকে পাহাড়ে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টির পর সমতল ভূমিতে পুনর্বাসিত বাঙালীদেরও রক্ষার জন্য গুচ্ছগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। নিরাপত্তার

কারণে তাদেরকে সকাল ৯টার আগে, বিকাল ৩টার পর গ্রাম থেকে বেরুতে দেয়া হতো না। দেশ ছেড়ে যাওয়া শরণার্থীদের মতো তাদের বাড়ি, জমিও পরিত্যক্ত-অব্যবহৃত থেকে যায়। এখন পর্যন্ত এসব প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৮৪ কেজি গম রেশনে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরাও পার্বত্য এলাকার স্ব-স্ব বাড়িঘরে ফিরে যেতে পারবেন। তখন সরকারকেও এই অনির্দিষ্টকাল রেশনের বোঝা বইতে হবে না।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল ইতোমধ্যে গুচ্ছগ্রামগুলোর চেয়ারম্যান, মেম্বার, পাহাড়ী হেডম্যানদের সাথে শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে বৈঠক করেছেন। জেলা প্রশাসক শনিবার জনকণ্ঠকে বলেন, তাঁর যা উপলব্ধি সাধারণ বাঙালীরাও এ ব্যাপারে কনভিন্সড, শান্তি প্রক্রিয়ার সাফল্য ছাড়া কারোরই গত্যন্তর নেই। বিএনপি'র সমাবেশের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের কয়েকজন তাঁকে গিয়ে বলেছেন, তাঁরাও শান্তি চান। বাঙালীদের সমস্যা সৃষ্টি না করলে তারাও এর বিরোধিতা করবেন না। জেলা প্রশাসন এখন শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২১ নবেম্বর থেকে যারা আসবেন তাঁদের তালিকা এখনও এসে পৌঁছেনি। শীঘ্রই পৌঁছে যাবে আশা করা হচ্ছে। সরকারী অনুমতি পাওয়া গেলে অপর পক্ষের প্রস্তুতি দেখতে জেলা প্রশাসক ২১ তারিখে সাব্রুম যেতে পারেন। জেলা প্রশাসনের ইচ্ছা, এ দফায় আগে ত্রিপুরার কাঁঠালছড়ি শিবিরের সব শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনা। রামগড়ের অপর প্রান্তে এক কিলোমিটার সীমার মধ্যে অবস্থিত এই শিবিরে এখন ১৯১০ পরিবারের প্রায় ১০ হাজার শরণার্থী আছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২রা নভেম্বর ১৯৯৭
রাঙ্গামাটিতে
শান্তি চুক্তির সপক্ষে
সমাবেশ ৮ নবেম্বর

রাঙ্গামাটি, ১ নবেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–আসন্ন পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষে শুক্রবার বিকালে রাঙ্গামাটি শিশু একাডেমী মিলনায়তনে রাঙ্গামাটির নাগরিক কমিটির এক মতবিনিময় সভা করে। সাবেক রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান স্থানীয় সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদার, সুনিল কান্তি দে ও পৌর চেয়ারম্যান মনি স্বপন দেওয়ান প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য এলাকায় এসব কি ঘটছে?

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: শান্তিচুক্তি পণ্ড করতে পাহাড়ে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা কেন এত তৎপর? ঢাকা থেকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এনে বস্তুত শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে 'মটিভেশন কর্মসূচী' রাখার আসল উদ্দেশ্যটাই কি? অথবা উদ্দেশ্য কি তাদের, যারা শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ পরিকল্পনায় বাধার সৃষ্টি করতে চাইছে? পার্বত্য এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মাঝে এসব প্রশ্ন আছে। অনেক বিষয়-আশয়ই তাঁদের জানা। কিন্তু এখন তাঁরা মুখ খুলতে পারছেন না।

ওয়াকিফহাল একটি সূত্র জনকণ্ঠকে বলেছে, ওই বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এ ব্যাপারে ঢাকা এবং পার্বত্য এলাকায় বিশেষ একটি পরিস্থিতি তৈরির প্যাকেজ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ১৫ অক্টোবর খাগড়াছড়ির একটি সমাবেশের সমুদয় টাকা-পয়সা পাঠানো হয়েছে ঢাকা থেকে। গুচ্ছগ্রামগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল এই সমাবেশের মূল সংগ্রহ। তাদের গাড়িতে বোঝাই করে সমাবেশে নিয়ে আসা হয়। রাঙ্গামাটি, বান্দরবানেও একই ধরনের সমাবেশ হয়েছিল। বিএনপি, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন সেখানে। বিশেষ করে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন সব সমাবেশে। ১১ নবেম্বর চট্টগ্রামে এমন আরেকটি মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে, যেটিতে উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ঢাকায় বেশকিছু কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। সেমিনার, পোস্টার, সঙ্কলন, লিফলেট প্রকাশ, বিভিন্নভাবে মটিভেশন কর্মসূচী আসে এর নির্দেশনাসূচীতে। সূত্রটি বলেছে, সরকার এর অনেক কিছুর বিষয়েই ওয়াকিফহাল। বিরোধিতায় না গিয়ে সরকারের লক্ষ্য যত শীঘ্র সম্ভব চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদন করা। আর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে যাতে তিন পার্বত্য জেলার পরিস্থিতিকে বিশেষ মহল খারাপের দিকে নিয়ে যেতে না পারে। এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সূত্রটি প্রশ্ন রেখে বলেছে, বাংলাদেশ এক-দশমাংশের ইমার্জেন্সি গ্রুপ হিসাবে পরিচিত শান্তিবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইছে। তাদের লোকজন পাহাড়ী গ্রামে এসে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করছে চুক্তির পক্ষে। চুক্তি হলেই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এখন তাদের এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি যারা করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্য কি? একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মটিভেশন কর্মসূচী নিয়েও প্রশ্ন চলছে। তারা ঢাকা থেকে বিশেষ লেখক, সাংবাদিকদের পার্বত্য এলাকায় নিয়ে আসে। আগে তাদের যেখানে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হতো, বুঝানোর ব্যবস্থা ছিল–পাহাড়ের অশান্ত পরিস্থিতি

সামাল দিতে, অখণ্ডতা রক্ষা করতে তাদের এখানে থাকা প্রয়োজন। বিশেষ ব্যবস্থায় বাঙালী-পাহাড়ীদের হাজির করা হতো একই বৈঠকে। পাহাড়ীরা বাঙালীদের বিপক্ষে, বাঙালীরা পাহাড়ীদের বিপক্ষে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিয়ে সেখানেই উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন। সব কিছুর লক্ষ্য ছিল সেখানে যে কোন মুহূর্তে এসব নিয়ে হানাহানি হতে পারে। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যই তাদের দরকার। এখন যাদের আনা হচ্ছে তাদের দেখানো হচ্ছে কিভাবে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের খবরে বাঙালীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কিভাবে পাহাড়ীদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেয়া হচ্ছে এসব কিছু। এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব জনকণ্ঠের কাছে স্বীকার করে বলেন, সরকার সমাধানের বিষয়টি যেভাবে ভাবছে এই পক্ষ সেভাবে ভাবছে না।

এসব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বাস্তবতা পাহাড়ে এখন উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে বাঙালীদের গুচ্ছগ্রামগুলোতে। বিএনপি আমলে যাঁদেরকে গুচ্ছগ্রাম প্রজেক্ট চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাঁরা এখনও স্বপদে বহাল আছেন। তাঁদের মাধ্যমে রেশন বিতরণ করা হয়। তাই তাঁরা সহজেই এই গ্রামবাসী দরিদ্র মানুষজনকে প্রভাবিত করতে পারেন।

পরিস্থিতি সম্পর্কে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান রবিবার জনকণ্ঠকে বলেন, '৯০ সালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বলেছিলাম–এখানে বাঙালীরাও অবশ্যই থাকবে। এখন সেভাবেই চুক্তির প্রক্রিয়া এগোচ্ছে শুনে আমি খুশি। সমীরণ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের চেয়ে এর বাস্তবায়নের বিষয়কেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ এই পার্বত্য এলাকায় এক সময় সর্বহারা পার্টির অবস্থান সৃষ্টিরও চেষ্টা হয়েছিল। এখন এক পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আরেক পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গুচ্ছগ্রামের বাঙালীদের অস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র করার কারও কারও প্রবণতার বিষয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন। অপাহাড়ীদের স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান রাখার বিষয়কে 'সাইকোলজিক্যাল' আখ্যা দিয়ে সমীরণ বলেন, একদিন হয়ত এসব বিষয়ও বিবেচ্য থাকবে না।

দীঘিনালায় পাবলাখালি ত্রিবাপুর গ্রামে পুনর্বাসিত বেশ কিছু শরণার্থী বললেন–পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় তারা খুশি। তবে অনেকের জমি সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় তারা হতাশ। রবিবার ঢাকা থেকে যাওয়া এক দল সাংবাদিক গ্রামটি ঘুরে দেখেন। টিএনও শফিকউদদৌলা জানান, মামলার কারণে অনেকের জমির সমস্যা সুরাহার সময় লাগছে। শরণার্থী নেতা অক্ষয় মনি চাকমা জনকণ্ঠকে বলেন, সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিক। তবে শান্তিচুক্তি না হলে ভবিষ্যতে প্রত্যাবাসন নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা নভেম্বর ১৯৯৭

প্রসঙ্গ প্রস্তাবিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি

স্বাধীনতার বিরোধীরাই শান্তি চুক্তির বিরোধী ॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' শীর্ষক মুক্ত আলোচনার বক্তারা বলেছেন, একাত্তরে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল আজ তারাই আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে। রবিবার বিকালে জাতীয় যাদুঘর শিশু মিলনায়তনে এ মুক্ত আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়। স্থপতি মাজাহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ আতিউর রহমান, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, কাজী আরেফ আহমেদ, শাহরিয়ার কবির, ডঃ শওকত আরা হোসেন, আঃ কাইয়ুম প্রমুখ।

আলোচনায় অধিকাংশ বক্তাই বলেন, কোন শান্তি চুক্তির মাধ্যমে কোন দিন দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়া যায় না। আজ যারা এ ধরনের অবাস্তব ও মনগড়া কথা বলছে, তারাই '৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা রেখেছে।

অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিগত সরকারগুলোর গৃহীত নীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'সেখানকার খালি জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের বসিয়ে দিয়ে এত দিন এক ধরনের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে।' তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির বিরোধিতাকারীরা এক ধরনের রাজনৈতিক মূর্খতায় আক্রান্ত। যারা সেখানে সেনাবাহিনীকে রাখতে চাচ্ছে তারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বিপক্ষেই কাজ করছে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি হলে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া সবাই খুশি হবে। এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কারণ পাহাড়ী মশার কামড়ে প্রতি বছর সেখানে অনেক সেনা সদস্য মারা যান। তিনি আরও বলেন, কোন রাজনৈতিক সমস্যায় সামরিক সমাধান হয় না। তাই এই সমস্যাটিকেও রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসা করতে হবে।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, পার্বত্য এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষই শান্তি চুক্তির পক্ষে। এতে প্রমাণিত হয়, গত নির্বাচনে যারা বিএনপি'র পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারাও এ চুক্তি চায়।

বক্তারা শান্তি চুক্তিতে যে সকল রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করছে, তাদের আন্তরিকতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা বলেন, শান্তি চুক্তির বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে, দেশে সার্বক্ষণিক একটা যুদ্ধাবস্থা কামনা করা। বক্তারা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পাশাপাশি যথাযথভাবে তা বাস্তবায়নের জন্যও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা নভেম্বর ১৯৯৭
চুক্তির বিরুদ্ধে
ঝাঁপিয়ে পড়ুন ॥ শত
নাগরিক কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শত নাগরিক কমিটি আয়োজিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ঃ সমাধান ও শান্তি কোন্ পথে?" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চায়। কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যদি দেশের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তবে তা সমাধান হবে না, হবে নতুন করে সমস্যা আরও জটিল করা। কাজেই এই মুহূর্তে সম্ভাব্য চুক্তির বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রবিবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শত নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আফতাব আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক এম শহীদুজ্জামান, অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, সাদেক খান, এমকে আনোয়ার এমপি, মোহাম্মদ আবু হেনা এমপি, মোবায়দুর রহমান প্রমুখ।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, একটি জাতীয় জনগুরুত্বসম্পন্ন চুক্তির বিষয়টি সংগোপনে ঘটছে। এত গোপনীয়তার কি আছে? অধ্যাপক আফতাব আহমদ বলেন, জিয়া যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন শুরু করেন তাহলে '৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি কেন শান্তিবাহিনী গঠিত হলো? কেন '৭৩ সালেই তিনটি পার্বত্য জেলায় গ্যারিসন বসাতে হলো। তিনি বলেন, এ অঞ্চলে ১৫০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ও তেল মজুদ রয়েছে। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। ১২ কোটি দেশপ্রেমিক জনগণকে এ ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে।

এমকে আনোয়ার বলেন, বর্তমান সরকারের কোন চুক্তিই জনগণের পক্ষে যায়নি। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে যে চুক্তি হচ্ছে–তাও জনগণের পক্ষে যাবে

না। সাদেক খান বলেন, এ চুক্তির অর্থ হবে দেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে তুলে দেয়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৭
প্রচারপত্রও বিলি হচ্ছে!
রাঙ্গামাটিতে শান্তিচুক্তি
বিরোধীরা আমল পাচ্ছে কম

ফজলুল বারী/মোহাম্মদ আলী, রাঙ্গামাটি থেকে : রাঙ্গামাটিতে শান্তিচুক্তির বিরোধীরা আমল পাচ্ছে কম। স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধীরা সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হয়ে যাবে এমন প্রচারণার পাশাপাশি ভূমি বিষয়ক বাঙালী বিতাড়ন ভীতি ছড়াবার চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা পাচ্ছে না। কারণ রাঙ্গামাটি জেলায় শরণার্থী সমস্যা খুবই সামান্য। বেশিরভাগ বাঙালী এখানে বংশপরম্পরায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। জিয়া আমলে পুনর্বাসিতদের মধ্যে নিরক্ষর আমজনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বিএনপি-জামায়াতপন্থীরা। কিন্তু তারপরও সংখ্যা স্বল্পতায় সুবিধা না করতে পারায় ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত তাদের সমাবেশে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে আনতে হয়েছে। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়সহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা চুক্তির পক্ষে থাকায় বিরোধীরা সুবিধা করতে পারছে না। নানাভাবে প্রচারপ্রপাগাণ্ডা চলছে চুক্তির পক্ষে। একটি গোষ্ঠীর সদস্যরাও বিশেষ একটি লিফলেট বিলি করেছে নিজেদের মধ্যে। সেখানে তারা বলেছে বিশেষ এক নেত্রী কেন তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল দুর্গম অঞ্চলে ফেলে রাখতে চাইছেন তার রহস্য কথা। রাঙ্গামাটির ব্যবসায়ী সমাজের বক্তব্য হচ্ছে, চুক্তি হলে এলাকাটি আমূল পাল্টে যাবে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হলে চাকরি হবে হাজার হাজার মানুষের।

একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাদের এলাকায় প্রচারিত লিফলেটে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছে। 'দেশপ্রেমিক...ভাইদের খোলা চিঠি' শিরোনামে এই প্রচারপত্রে বলা হয়, 'বর্তমান এক নেত্রী আমাদের বাড়াভাতে ছাই দিচ্ছেন। বর্তমান সরকার যখন সৃষ্ট সমস্যাকে সমাধানের দিকে নিতে চাইছে তখন এই নেত্রী দেশের অখণ্ডতা ধ্বংসের ধুয়া তুলে অপচেষ্টা চালাচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। আমাদের প্রধান আমাদের স্বস্থানে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবেই সমাধান হওয়া উচিত। বছরের পর বছর পাহাড়ীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে আমরা কি পেয়েছি? কিছুই পাইনি। শুধুমাত্র পাহাড়ী, বাঙালী এবং আমাদের রক্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি রঞ্জিত হয়েছে।'

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় সোমবার রাঙ্গামাটিতে তাঁর রাজবাড়িতে জনকণ্ঠকে বলেন, কোন পাহাড়ী শরণার্থী শিবিরে থাকবে এটা আমি চাই না। শান্তি চুক্তি যত তাড়াতাড়ি হবে তত তাড়াতাড়ি দেশে তারা ফিরতে পারবে। দেবাশীষ বলেন, চাকমা রাজা হিসাবে আমার কাজ মূলত সরকারকে পরামর্শ দেয়া। এই সরকারকে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর চাইতে সমস্যার সমাধানে তুলনামূলক বেশি আন্তরিক মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী খুব আন্তরিকভাবেই সমস্যার সমাধানে আমার মতামত চেয়েছিলেন। আমি আমার কথা তাঁকে বলেছি। সবাই আশা করছে চুক্তি হবে। শান্তি আসবে। পাহাড়ে পাহাড়ী-বাঙালীরা মিলেমিশে আগেও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে। ১৯৭৯ সালের পর পরিকল্পিতভাবে একটি উদ্যোগের পর যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল চুক্তির মাধ্যমে তার স্থায়ী অবসানের পথ সুগম হবে বলেই আমার আশা। রাজা দেবাশীষ অভ্যন্তরীণ শরণার্থী সমস্যার বিষয়েও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।

রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা বললেন, এত কাছাকাছি আসার পর চুক্তি মানি না যারা বলছে, তা খুবই দুঃখজনক। কারণ এরাই শান্তি সংলাপ করে সমাধানের চেষ্টা করেছিল। রোয়াজা প্রশ্ন রেখে বলেন, সমস্যা মিটলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে যাবে আর সমস্যা থাকলে তা থাকবে–এটা কেমন কথা বলুন? চেয়ারম্যান স্বীকার করে বলেন, গুচ্ছগ্রামের পুরনো আমলের চেয়ারম্যানরা স্বপদে বলবত থাকায় তাঁরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছেন। সরকারের এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। রাঙ্গামাটির ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, এডিএম আবদুর রাজ্জাক বললেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে রাঙ্গামাটি সিংগাপুর-ব্যাংককের চাইতেও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী হবে। তেল-গ্যাসের অনুসন্ধান পর্বে কাজ পাবে হাজার হাজার মানুষ। রাঙ্গামাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান, শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্য মণি স্বপন দেওয়ান বললেন, অশান্তির কারণে পার্বত্য এলাকার লোকজন শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জনসংহতি সমিতি এবারকার সরকারকে তুলনামূলক বেশি আন্তরিক, আস্থাশীল মনে করেছে বলেই এতটা এগিয়ে এসেছে। মণি স্বপন বলেন, শান্তিবাহিনীর যেসব সদস্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাদেরকেও প্রতিযোগিতা আর নিজস্ব যোগ্যতার মাধ্যমে সমাজে টিকে থাকতে হবে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ বড়ুয়া অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের ভিতর থেকেও কোন কোন ব্যক্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে। তারা এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অবহিত করেছেন। জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা জে এফ আনোয়ার চিনু বললেন–কোন কোন বিশেষ এজেন্সি চুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

চুক্তির বিপক্ষে পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদের সভাপতি, জেলা জামায়াতের আমীর এএসএম শহীদুল্লাহ বললেন, চুক্তিতে কি আছে তা আমরা জানি না। পত্রপত্রিকায় যা রিপোর্ট দেখছি তাতেই মনে হচ্ছে, এটা বাঙালীর স্বার্থবিরোধী। উপজাতীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিষদ গঠনকে তিনি বাঙালী স্বার্থবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন, ৮ বছর তাঁর পরিষদের সদস্য থাকার কথা। জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক এম জহির আহমদ বলেন, দেশকে অন্ধকারে রেখে চুক্তি করা হচ্ছে। বাঙালীদের স্বার্থরক্ষা করা হবে না বলেই তাঁরা চুক্তির বিরোধিতা করছেন। রাঙ্গামাটি চেম্বারের সভাপতি সাবেক পৌর চেয়ারম্যান কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় লাভবান হবে। বিএনপি'র দুই সদস্য জাতীয় কমিটিতে ছিলেন। তাঁরা সদস্য হিসাবে বৈঠকে থাকলে আজকের বিভ্রান্তি থাকত না। রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান বলেন, '৭৫-এর পর থেকেই বাঙালী-পাহাড়ী সম্প্রীতি ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাবেক মহিলা সাংসদ, আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভানেত্রী সুদীপ্তা দেওয়ান বলেন, যাদের হাতে এখন কোন ইস্যু নেই–তারা বাঙালী বিতাড়নের ধুয়া তুলে একটি ইস্যু সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তিনি স্বীকার করে বলেন, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে তাঁরা কিছু দেরি করে ফেলেছেন। এখন সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে এই বিভ্রান্তি দূর করতে মাঠে নেমে ভাল সাড়া পাচ্ছেন। কারণ সবাই-ই জানেন শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়া কারওই গত্যন্তর নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৫ই নভেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির অন্তরায়

আগামী ১৬ নবেম্বর ঢাকায় সপ্তম দফা শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে পার্বত্যবিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে। আশা করা হচ্ছে এই বৈঠকেই শান্তি চুক্তি সই হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই শান্তি চুক্তির জন্য। ১৬ নবেম্বর থেকে শুরু হওয়া বৈঠকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের ইতিহাসে তা একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। কিন্তু যে কোন মাইলফলক স্থাপনেই বাধাবিঘ্ন থাকে, এ ক্ষেত্রেও আছে, বরং স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। সম্প্রতি পাওয়া খবরে জানা গেছে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে পাহাড়ে একটি বিদেশী সংস্থা অত্যন্ত তৎপর। ঢাকা থেকে

লোক নিয়ে গিয়ে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে 'মটিভেশন কর্মসূচী' অব্যাহত রাখা হচ্ছে। কোন কোন মহল আবার শান্তি বাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ পরিকল্পনায় বাধার সৃষ্টিও করতে চাচ্ছে। পার্বত্য এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, অনেক কিছু তাঁরা জানেন কিন্তু মুখ খুলতে পারছেন না।

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, শান্তি চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বিদেশী চিহ্নিত গোয়েন্দা সংস্থাটি ঢাকা এবং পার্বত্য এলাকায় বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির প্যাকেজ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ১৫ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে যে সমাবেশ হয়েছে তার সমুদয় খরচপত্রের টাকার যোগান দেয়া হয়েছে ঢাকা থেকে। গুচ্ছগ্রামগুলো থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বস্তুত টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়েছিল এবং তাদেরকে গাড়ি বোঝাই করে সমাবেশে নেয়া হয়েছিল। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানেও একইভাবে সমাবেশ করা হয়েছিল। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন ঐসব সমাবেশে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত, কিছুদিন আগে মাত্র বিএনপিতে যোগাদানকারী একজন নেতা সব সমাবেশেই উপস্থিত ছিলেন। আগামী ১১ নবেম্বর চট্টগ্রামে যে মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে তাতে বক্তব্য রাখবেন বিরোধীদলীয় নেত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। ঢাকাতেও মটিভেশন কর্মসূচী চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ করে শান্তি চুক্তিকে ইস্যু করে বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো যে সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাচ্ছে সে বিষয়টি এখন বেশ খোলসা হয়ে গেছে। কিন্তু যে অঞ্চল নিয়ে সমস্যা সেই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মনোভাব অন্যরকম। সম্প্রতি এক সংস্থার জরিপের খবর থেকে দেখা যায়, তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসকারীদের ৮৯.৭৩ শতাংশ নাগরিক সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আসন্ন শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করে। বিপক্ষে মত দিয়েছে মাত্র ৪.৩৪ শতাংশ। তিন পার্বত্য জেলাতেই জরিপ চালানো হয়েছে এবং বেশিরভাগ নাগরিকই বলেছেন, শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার কোন কারণ নেই। সাধারণ বাঙালী বা উপজাতীয় পার্বত্য অধিবাসীরা সংঘাতের বিরুদ্ধে খোলাখুলি এও বলেছেন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাদেরকে সংঘাতে জড়ানো হয়েছে। এখন আবার যে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার উস্কানি দেয়া হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা দীর্ঘদিনের, এর মূলে পূর্ববর্তী বিভিন্ন সরকারের ভ্রান্ত নীতি যেমন কাজ করেছে তেমনি এক শ্রেণীর পাহাড়ি নেতার অপরিণামদর্শীতা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ছিল। আর তাতে ইন্ধন দিয়েছে

একাধিক বিদেশী। সত্যি যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চেয়েছে, বর্তমান বিশ্বরাজনীতি এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটায় অনেকের শুভবুদ্ধির উদয় হলেও কতিপয় মহলকে এখনও সমস্যা জীইয়ে রাখার উস্কানি দিতে দেখা যাচ্ছে। এ কারণেই পাহাড়ি-বাঙালী বিভেদকে ইন্ধন দেয়া হচ্ছে।

শান্তি চুক্তি না হলে দেশের একটি বিরাট অঞ্চল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে না, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও ব্যাহত হবে এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে। বিএনপি এবং তার সঙ্গে যেসব দল জোটবদ্ধ হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করছে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্র ইতোমধ্যে প্রমাণিত। এ ছাড়া বিদেশী যে সংস্থার কথা বলা হয়েছে সেই সংস্থাটি যে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বহুদিন ধরে সে কথা সচেতন মহলের অবিদিত নয়। এখন পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। বিভিন্নভাবে তাদের দিয়ে বলিয়ে নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে বাঙালীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে–সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টাও চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এদিক থেকে সাফল্য আসেনি। এটা এখন বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, শান্তি বাহিনী বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেছে এবং অস্ত্র সমর্পণ করতে চাচ্ছে। ঐ অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালীরাও আর 'বিশেষ নিরাপত্তা পরিস্থিতি'র মধ্যে থাকতে চাইছে না। সবাই চাচ্ছে মিলেমিশে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে। এ কারণেই উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা যতটা জোরদার ততটা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারছে না। সম্প্রতি প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে রেশন বণ্টনের বিষয়টি নিয়েও উত্তেজনার সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সোমবার প্রকাশিত খবরে খাগড়াছড়ির স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, চুক্তি স্বাক্ষরের চেয়ে এর বাস্তবায়নের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ এক সময় এই পার্বত্য এলাকায় সর্বহারা পার্টির অবস্থান সৃষ্টিরও চেষ্টা হয়েছিল। এখন এক পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আর এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার কথা বলেছেন সমীরণ দেওয়ান। অভিজ্ঞ এ ব্যক্তিত্বের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এ ছাড়া যতদূর জানা গেছে, শান্তি চুক্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্ত সম্বন্ধে সরকার ওয়াকিফহাল। তবে এ মুহূর্তে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা আশা করব এসব বাধা-বিঘ্ন ও চক্রান্তকে নস্যাত করে দিয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে নির্ধারিত সময়ে এবং দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ও বাঙালী জনগণ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৯ই নভেম্বর ১৯৯৭

চাকমা শরণার্থী ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি সম্পন্ন ॥ সবকিছু নির্ভর করছে শান্তি চুক্তির ওপর

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৪৩ হাজার উপজাতীয় শরণার্থী ফিরিয়ে আনার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২১ নবেম্বর থেকে প্রত্যাবাসন কাজ পুনরায় শুরু করার দিনক্ষণ নির্ধারিত রয়েছে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আগামী ১৬ নবেম্বর সরকার ও জনসংহতির মধ্যে নির্ধারিত বৈঠকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর।

শনিবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত উপজাতি শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন টাস্ক ফোর্সের সভা শেষে কমিটি সদস্য চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য প্রকাশ করেন। টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা জানান, গত মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রত্যাবাসনকৃত ৬,৭০৩ জনের সকলকে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুনর্বাসন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী জানান, উপজাতি শরণার্থীরা ফিরে এলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীদের স্বার্থের কোন ক্ষতি হবে না। টাস্কফোর্স সদস্য মনি শংকর রায় জানান, গতবার যারা ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে মামলার কারণে ৯ পরিবারকে ভিটামাটিতে পুনর্বাসন করা যায়নি। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার শাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের জানান, শরণার্থীদের তালিকা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত উভয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রত্যাবাসন পর্ব শুরু হলে প্রতিদিন ২শ' পরিবারের ১ হাজার শরণার্থীকে স্ব স্ব স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে এবং এ পর্বেই ৪৩ হাজার শরণার্থীর প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করা হবে। জেলা প্রশাসক জানান, প্রত্যাবাসিত প্রতিটি পরিবারকে নগদ ১৫ হাজার টাকা, ৯ মাসের রেশন, ২ বান্ডিল ঢেউটিন, হালের গরু কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা এবং যাদের জমি নেই তাদের দেয়া হবে ৩ হাজার ঢাকা করে। এছাড়া ২০ দফা প্রতিশ্রুতির সব ক'টি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাংসদ কাল্পরঞ্জন চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে সাংসদ মোশাররফ হোসেন, বীর বাহাদুর, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমিরন দেওয়ান, সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার

আশফাক আহমেদ, উপজাতীয় নেতা সমির কান্তি দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের মহাপরিচালক মোবাইদুল ইসলাম, চট্টগ্রামের ডিসি কেএম হাবিবুল্লাহ এবং খাগড়াছড়ি জেলার ৫ টিএনও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আজ রবিবার রাঙ্গামাটিতে শান্তি চুক্তির সপক্ষে একটি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে ১১ নবেম্বর চট্টগ্রামে বিএনপিসহ সর্বদলীয় কমিটির ব্যানারে এ চুক্তির বিপক্ষে মহাসমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ই নভেম্বর ১৯৯৭

রাঙ্গামাটির বিশাল 'বাঙালী-পাহাড়ী মিলনমেলা' থেকে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার আহ্বান

ওবায়দুল কবির, রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে : পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে এক বিশাল শান্তি সমাবেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার জন্য বিএনপি'র প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাহাড়ী বাঙালীদের এই মিলনমেলায় বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার উদ্দেশে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে আপনাদেরও সদস্য আছে। আপনারা চাইলে কালই কমিটির বৈঠক হতে পারে। বৈঠকে বসেই জেনে নিন শান্তি চুক্তিতে কি রয়েছে। এছাড়া সংসদে এসে প্রশ্ন করলেও কমিটির সদস্যরা জবাব দিবে। জবাব দেয়ার মতো সৎসাহস আমাদের রয়েছে। রবিবার বিকালে রাঙ্গামাটি পুরনো কোর্ট ময়দানের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীও বক্তৃতা করেন। শান্তি সমাবেশ উপলক্ষে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে এক উৎসবমুখর পরিবেশে আরও বক্তৃতা করেন শরণার্থী প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, রাঙ্গামাটি স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান চিং কিউ রোয়াজা, খাগড়াছড়ির সমীরন দেওয়ান, বান্দরবনের মং থোয়াই চ প্রু, বীর বাহাদুর এমপি, এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, জাতীয় পার্টি নেতা মওলানা শাহজাহান, স্থানীয় পরিষদ সদস্য আবদুর রহিম চৌধুরী, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম, বোরহান উদ্দিন, রুহুল আমিন, মাহমুদুর রহমান, শাখাওয়াত হোসেন রুবেল প্রমুখ। শান্তি চুক্তি সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে নাগরিক কমিটি এই সমাবেশের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক গৌতম দেওয়ান।

বিপুল সংখ্যক বাঙালী পাহাড়ী নারী-পুরুষের এই সমাবেশে প্রধান স্লোগান ছিল–"বাঙালী-পাহাড়ী ভাই ভাই, এই এলাকায় শান্তি চাই"। দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অস্থিরতার সহিংসতা এবং অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাব্য নিষ্পত্তি এবং শান্তির উদ্যোগে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে সারাদিন ধরে বিরাজ করছিল আনন্দময় উৎসবমুখর এক পরিবেশ। সকাল থেকেই গোটা শহরে মানুষের মধ্যে অনুষ্ঠানের আমেজ। বেলা একটায় সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয় এবং এই সময় থেকেই কাপ্তাই হ্রদের উপচানো পানিতে ভরা খাসলং নদীর পাড়ে মুক্তমঞ্চের মাঠে লোক সমাগম হতে থাকে। রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি থানা এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলা থেকে বাস, ট্রাক, ট্রলারে করে বিপুলসংখ্যক লোক সমাবেশে যোগদান করে। পাহাড়ের পাশ কেটে তৈরি পুরনো স্টেডিয়ামের মাঠটি ব্যানারে ফ্যাস্টুনে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে। প্রচণ্ড রোদ থেকে রক্ষার জন্য টানানো হয় শামিয়ানা। মাঠের আশপাশে বসে যায় ছোট ছোট দোকানির পসরা।

সমাবেশে উপস্থিত বাঙালী এবং পাহাড়ী অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, গত ২৭ অক্টোবর এই মাঠে অনুষ্ঠিত বিএনপি-জামায়াতের যৌথ বৈঠকে এলাকার বাঙালীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তারা আতঙ্কিত, শান্তি চুক্তি হলে এসব এলাকায় পাহাড়ীদের আধিপত্য সৃষ্টি হবে। তারা হবে নির্যাতিত। বিএনপি-জামায়াত নেতারা এই কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন। তবে ঐ সমাবেশে বাঙালীদের উপস্থিতিই ছিল বেশি। রবিবারের এই শান্তি সমাবেশে বাঙালী-পাহাড়ীদের উপস্থিতি ছিল প্রায় সমান সমান। আমাদের রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী জানান, শান্তি সমাবেশ উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন ধরেই গোটা পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া দেখা গেছে। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। যদিও বিএনপি-জামায়াত সমর্থকরা বাঙালীদের মনে এই বলে ভীতি সৃষ্টি করতে চাইছে যে, এই চুক্তি হলে বাঙালীদের ওপর নেমে আসবে সীমাহীন দুর্দশা। এ কারণেই সরকার গোপনে এক তরফাভাবে চুক্তি করছে। মোহাম্মদ নাসিম এসব প্রশ্ন এবং সংশয়ের জবাব দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ এই দেশের স্বাধীনতা এনেছে। আমাদের সরকার স্বাধীনতা বিক্রি করতে পারে না। আজ যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী-মতিউর রহমান নিজামী হাত ধরাধরি করে এখানে কথা বলছে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। পাক হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার ভাইয়ের বুকের রক্ত নিয়েছে। ইজ্জত লুটেছে মা-বোনের। তাদের মুখে স্বাধীনতার কথা শোভা পায় না। তিনি বলেন, আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী। বিরোধী দলে থাকার সময়ও শান্তি চেয়েছি, তৎকালীন জাতীয় পার্টি বা বিএনপি'র উদ্যোগে সহায়তা করেছি। এখন ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনার

সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। বিএনপি এই প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে। সমাবেশে পাহাড়ী-বাঙালীর বিশাল মিলন মেলার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি খালেদা জিয়ার উদ্দেশে বলেন, দেখে যান এই মিলনমেলা। যত চক্রান্তই করেন আমাদের শান্তি প্রক্রিয়ায় আপনারা বাধা দিতে পারবেন না।

নাসিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার রয়েছে তাতে এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে গোটা বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হতে সময় লাগবে না। শান্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, বিএনপিও এ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা। আমরা উদ্যোগ নিয়ে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। বিএনপি এই প্রক্রিয়া বানচালের চক্রান্ত চালাচ্ছে। তিনি এই বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে বলেন, এখান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার বা বাঙালীদের উচ্ছেদ করার প্রশ্নই আসে না।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য শান্তি প্রক্রিয়ায় তাঁর দলের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে বলেন, আমরা কমিটিতে রয়েছি। এবং বৈঠকে যোগদান করছি। চুক্তিতে এমন কোন কথা নেই যাতে শান্তি বিনষ্ট বা দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে। সংবিধানের ভিত্তিতেই এই চুক্তি সম্পাদন হবে। পৃথিবীর এমন কোন চুক্তি নেই যা সম্পাদনের আগে প্রকাশ বা সংসদে আলোচনা হয়েছে।

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় প্রথমবারের মতো এ ধরনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, এই শান্তি প্রক্রিয়া আজ শুরু হয়নি। এরশাদের শাসনামলে শুরু হয়ে খালেদা জিয়ার সময়ও তা চলেছে। চুক্তির ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ই নভেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ॥ সংবিধানের আওতায়ই সবকিছু হচ্ছে

সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই পার্বত্য চুক্তি হবে

চট্টগ্রাম, ১০ নবেম্বর (ইউএনবি)। –প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে উপজাতীয় দলগুলোর সঙ্গে শীঘ্রই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে।

সোমবার সকালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসারদের সম্মেলনে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি)-এর রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসারগণ ও অন্য উর্ধ্বতন সেনা অফিসাররা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী একটি বিশেষ মহলকে অভিযুক্ত করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রক্তপাতের পর যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তখন তারা চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে নস্যাতের চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা তারা চায় না। তারা শান্তি প্রক্রিয়াকে বানচাল করার জন্য অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় যে, কেন তারা শান্তি চুক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নই আসে না। শান্তি পুনরুদ্ধারের পর সেখানে উপজাতি, অ-উপজাতি, বাঙালী ও পাহাড়ী বাঙালী এবং সেনাবাহিনী একত্রে শান্তিতে বাস করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধীরা এ অঞ্চলে স্থায়ী সমস্যা বিরাজ করুক সেটাই চায়, যা জাতির কাম্য নয়। তিনি বলেন, জনগণ শান্তি, স্থিতিশীলতা, সংঘাত, হত্যা ও ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বের অবসান চায়। শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিরোধীদলকে অজ্ঞাত রাখার অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রধান বিরোধী দলের দুই জন সদস্যকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা বলেন, তারা যদি প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কে কিছু জানতে চায় তাহলে তারা তাদের সদস্যদের কাছ থেকে ভালভাবে তা জেনে নিতে পারে...। তারা যদি আপত্তিকর কোন কিছু দেখতে পায় তাহলে বিরোধী সদস্যরা কমিটির বৈঠকে তার প্রতিবাদ জানাতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শান্তি প্রক্রিয়ার সফলতার জন্য চুক্তির বিষয়াবলী চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে তা পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতি যদি চুক্তিটিকে সংসদে পাঠানোর নির্দেশ দেন তাহলে তা সংসদে উত্থাপন করা হবে।

তিনি বলেন, শান্তি পুনর্প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই এ অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ কর্মকাণ্ড শুরু হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এখন যেহেতু সেখানে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তাই তাঁরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করবে।

পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ অঞ্চলে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাজে ব্যবহার করা উচিত।

তিনি সেনা অফিসারদের কোন অপপ্রচারে কান না দেয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি রক্ষায় আপনারা যে অবদান রেখেছেন সেজন্য জাতি আপনাদের চিরকাল স্মরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে চায়। সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্ক, গ্রুপিং ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে রাখা হবে। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি এমন পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে যার ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার রক্তাক্ত সংঘাত ঘটেছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেনাবাহিনীর রক্তে কাদের হাত রঞ্জিত হয়েছে এবং কোন কারণ ছাড়াই তাদের কতজন চাকরি হারিয়েছে তা জনগণ জানে। তিনি বলেন, ক্ষমতায় যাবার জন্য কারা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে সেটাও জনগণ জানে।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য সরকার তার সকল কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সামরিক মেডিক্যাল কলেজ ও সামরিক প্রকৌশল কলেজও দেশে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১১ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি চুক্তির চূড়ান্ত প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে সংশ্লিষ্টরা এখন ব্যস্ত। তবে চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে কোন প্রস্তুতিই এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। সংশ্লিষ্টরা একই সাথে ব্যস্ত আছেন শরণার্থী প্রত্যাবাসনের খুঁটিনাটি বিষয়েও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার শরণার্থীদের জন্য বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধাদি অনুমোদন করেছেন। রেশন বাদে এসব দাবি বাস্তবায়নে প্রায় ৩০ কোটি টাকা লাগবে। শরণার্থীদের তালিকা আনতে একটি সরকারী দল আগামী ১৩ নবেম্বর ত্রিপুরা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, পরবর্তী দফা প্রত্যাবাসন শুরু হবে ২১ নবেম্বর থেকে। ১৬ নবেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে সপ্তম দফা শান্তি সংলাপ। আশা করা হচ্ছে, এই বৈঠকেই স্বাক্ষরিত হবে বহুল প্রত্যাশিত, আলোচিত শান্তিচুক্তি।

ওয়াকিফহাল একটি সূত্র সোমবার জনকণ্ঠকে বলেছে–কাছাকাছি সময়ে শান্তি বৈঠক, শরণার্থী প্রত্যাবাসনের তারিখ পড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা কাজের চাপের মধ্যে আছেন। তাছাড়া অনেক কিছুতেই সমঝোতা এগিয়ে যাওয়ায় ১৬ তারিখের বৈঠকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ ষষ্ঠ দফা

বৈঠকে আঞ্চলিক পরিষদ, ভূমি সমস্যা, সেনাবাহিনীসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয়ে সমঝোতা এগোয়। আগামী বৈঠকে যে দুটো বিষয় নিয়ে বেশি দরকষাকষির সম্ভাবনা তা হলো স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ভূমিকা আর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের কার্যক্রম প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। বর্তমান সরকারের সাথে প্রথম দফা বৈঠক থেকেই তারা এ ব্যাপারে জোর দিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার তাতে রাজি হয়নি। ওয়াকিফহাল সূত্রটি বলেছে, আগামী বৈঠকে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সর্বশেষ দফা বৈঠকে শান্তিবাহিনীর অস্ত্রসমর্পণকারী সদস্যদের পার্বত্য এলাকার পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। জনসংহতি সমিতি এ বিষয়ে আরও বেশি সুবিধা চায়। বাহিনীর সদস্যদের তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের অগ্রাধিকার ছাড়াও তাদের দাবি আরও বেশি। সর্বশেষ তাদের একটি লিখিত বক্তব্যেও তারা এ বিষয়গুলোর পুনরুল্লেখ করেছে। সরকারী মহলের আশা এসব বিষয়েও সমাধান অসম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে আশা করা হচ্ছে আসন্ন বৈঠকের চুক্তি স্বাক্ষর না হবার তেমন কারণ নেই। সূত্রটি বলেছে, সরকারের কাছেও তথ্য আছে জনসংহতি সমিতিও আসন্ন বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে চায়। কিন্তু একাধিক সূত্রের বক্তব্য চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে এখনও কোন প্রস্তুতি শুরু হয়নি। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয়নি কোন দিকনির্দেশনাও। এই সূত্রগুলোর বক্তব্য চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমসমূহ এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। এ ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রতা শুরু হলে 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' বিষয়টিই নিশ্চিত করা জটিল হতে পারে। পরবর্তী দফা শান্তি বৈঠক উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বিকাল থেকেই দুদুকছড়ি এলাকার ৫টি সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, ৮টি নিষ্ক্রিয় করার কথা। সোমবার রাতে খাগড়াছড়ির একটি সূত্র জনকণ্ঠকে বলেছে, আগামীকাল বুধবার বিকালেই জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যরা দুদুকছড়ি পৌছুবার পরিকল্পনা আছে।

পাহাড়ী শরণার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সোমবার অতিরিক্ত সুবিধাদি অনুমোদন করেন। অনুমোদন অনুসারে দেয়া হবে প্রত্যাবাসিত শরণার্থীদের বিনামূল্যে এক বছর রেশন, নিহতদের শেষকৃত্যের জন্য ১০ হাজার টাকা অনুদানসহ ২০ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবের অন্যসব সুযোগ সুবিধাদি। এর মাঝে আছে পরিবারপিছু নগদ ১৫ হাজার টাকা, জমির মালিকদের হালের বলদ কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা, ভূমিহীনদের দুধের গাভীর জন্য ৩ হাজার টাকা, গৃহনির্মাণের কাঠ কেনার জন্য ৩ হাজার টাকা

এবং পরিবারপিছু দুই বান্ডিল সিআইসিটি টিন। ১৯৯৪ সাল থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় এবং বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছায় যেসব শরণার্থী এসেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এই সুবিধাদি কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, আগে শরণার্থীদের এককালীন ১০ হাজার টাকা এবং নয় মাসের রেশন দেয়ার ঘোষণা ছিল। গত ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা সাক্ষাত করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বছরের রেশন এবং মৃতের শেষকৃত্যের অনুদান প্রশ্নে সম্মত হন। শরণার্থী নেতারা ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে একটি তালিকা দিয়েছেন সরকারের কাছে। সূত্র বলেছে, বিভিন্ন ঘটনায় নিহত এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা এক শ'র বেশি হবে না। এছাড়া পাহাড়ীদের মন্দির সংস্কারের জন্যও দেয়া হবে বিশেষ অনুদান। এ ব্যাপারে শনাক্তকৃত ৭৪টি মন্দিরের প্রত্যেকটির জন্য ১০ হাজার টাকা হারে দেয়া হবে। শরণার্থী নেতারা আগামী ৫ ডিসেম্বর পুনর্বাসন বিষয়ক টাক ফোর্স এবং ২০ দফা বাস্তবায়ন কমিটির সাথে বৈঠকে বসতে চেয়েছেন। তাদের অনুরোধ হচ্ছে সেই বৈঠকে যাতে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকেন। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, ১৬ তারিখের বৈঠকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলে এই বৈঠকের প্রয়োজন থাকবে না।

এদিকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ক খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করার জন্য খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আগামী বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা যাচ্ছে। শনিবার পর্যন্ত দলটির সেখানে থাকার কথা। দলের অন্য সদস্যরা হলেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, এডিএম লেহাজ উদ্দিন চৌধুরী, মাটিরাঙ্গার টিএনও মীর আহমদ এবং রামগড়ের টিএনও জামাল আল নাসের চৌধুরী। প্রতিনিধি দলটি ১৩ নবেম্বর গিয়ে থাকবেন সাব্রুমে। ১৪ তারিখ উদয়পুরের জেলা প্রশাসক লোকরঞ্জনসহ কর্মকর্তাদের সাথে তাঁদের বৈঠকের কথা আছে। ২১ নবেম্বর থেকে যাঁরা দেশে ফিরে আসবেন তাঁদের তালিকাও নিয়ে আসবে এই দলটি। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল সোমবার রাতে এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে জানান, প্রথম দফায় কাঁঠালছড়ি শিবিরের সব শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তাদের থাকবে। এই শিবিরটি রামগড় সীমান্তের ওপারে এক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। জেলা প্রশাসক জানান, তাঁরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। রামগড় এবং তবলছড়িতে দুই সীমান্তের মাঝে সংযোগ সেতু নির্মাণসহ সবধরনের অবকাঠামোগত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এদিকে প্রস্তাবিত চুক্তির বিষয়ে পাহাড়ী সংগঠনসমূহের মধ্যেও অভ্যন্তরীণ সংঘাত বাড়ছে। রবিবার রাঙ্গামাটির ট্রাইবাল আদাম এলাকা থেকে পাহাড়ী গণপরিষদ নেতা সচিব চাকমা অপহৃত হন। সংগঠনের পক্ষে

অভিযোগে বলা হয়েছে, তাঁকে অপহরণ করেছে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা। উল্লেখ্য, পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের একাংশ প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

চট্টগ্রাম অফিস থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছেন, শান্তিচুক্তির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছে সেখানকার তৃণমূল জনসংগঠন ও নাগরিক সমাজ। চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিওসমূহের সহযোগিতায় ৫ দিনব্যাপী উৎসব মেলার শেষ দিনে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়ে বলেন, শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ী সম্প্রদায়সমূহের জীবনে শান্তি-প্রগতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল মান্নান, অধ্যাপক জিয়া হায়দার, ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ই নভেম্বর ১৯৯৭

চট্টগ্রামে বিশাল জনসভায় বেগম জিয়া

সার্বভৌমত্ববিরোধী শান্তিচুক্তি সরকার যে দিনই করবে সে দিনেই সারা দেশে পূর্ণ হরতাল হবে

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস : সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার যে চুক্তি করতে যাচ্ছে তা সংবিধানবিরোধী। এ চুক্তি হলে দেশের এক-দশমাংশ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবে। জাতি হারাবে কাপ্তাই জল বিদ্যুত প্রকল্প, কর্ণফুলী পেপার মিল, রাউজান তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র। এমনকি চট্টগ্রাম বন্দরকেও হারাতে হতে পারে। সুতরাং সরকার যেদিন শান্তিচুক্তি করবে সেদিনে সারা দেশে সকাল সন্ধ্যা হরতাল হবে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, যদি ১৬ নবেম্বর এ চুক্তি হয় তবে সেদিন, আর যদি এ দিন না হয়ে অন্য যেদিনে হবে সেদিন হরতাল হবে। এরপর দেয়া হবে আরও কঠিন কর্মসূচী।

মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সম্মিলিত বিরোধী দল আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে খালেদা জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, শান্তিবাহিনীর সাথে যে চুক্তি হতে যাচ্ছে তা সংবিধান পরিপন্থী। এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামকে রক্ষার জন্য নয়, তা হবে সন্ত্রাসীদের পক্ষে এবং এতে দেশের ভূখণ্ডের এক-দশমাংশ ভারতের হাতেই চলে যাবে। সুতরাং দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি কোনক্রমে এটা মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ শহীদ জিয়ার

নেতৃত্বে স্বাধীনতা এনেছে রক্ত দিয়ে এবার পার্বত্য ভূখণ্ড রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আবারও রক্ত দিতে প্রস্তুত।

চট্টগ্রাম মহানগরী বিএনপির সভাপতি সাবেক মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম এ সমাবেশে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, জাতীয় পার্টির (জা-মো) কো চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ, এনডিএ চেয়ারম্যান এএসএম সোলায়মান, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, পিএনপি সভাপতি শেখ শওকত হোসেন নীলু, বিএনপি সাংসদ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, বরকত উল্লাহ ভুলু, মশিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন ফারুক, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, আমির খসরু মাহমুদ, জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, সারওয়ার জামাল নিজাম, জামায়াত নেতা শেখ আনসার আলী, মাওলানা মোমিনুল হক এবং সাতদলীয় অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা বক্তৃতা করেন।

খালেদা জিয়া বলেন, শান্তিচুক্তির নামে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা শান্তি চাই। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি করছে কে? স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে এ দলের সরকার আবার অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

বিএনপি নেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের সবকিছু ভারতের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। তাদের ক্ষমতার ১৬ মাসে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বাজার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। অপরদিকে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, গার্মেন্টস, চামড়া, চিংড়ি, ওষুধ, প্যাকেজিংসহ সবকিছু এখন ভারতের হাতে। ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ সবকিছু সুকৌশলে ভারতকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন রাখেন–এ যদি অবস্থা হয় তাহলে নামমাত্র স্বাধীনতা দিয়ে আমরা কি করব? বেগম জিয়া বলেন, নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ ভারতকে ওয়াদা দিয়েছে বাংলাদেশকে সে দেশের প্রদেশে পরিণত করাব। সে অনুসারে বর্তমানে ভারতীয় প্রভুদের নির্দেশে এ সরকার দেশ চালাচ্ছে। যার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি এখন সম্পূর্ণভাবে ভারতের ওপর নির্ভরশীল। বিএনপি নেত্রী জনতার উদ্দেশে দেশ রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাতে দেয়া হবে না। এ সরকারের সাথে জনগণ নেই। জনগণ রয়েছে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির সাথে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন আমাদের

আমলে আওয়ামী লীগ কোন কারণ ছাড়াই ১৭৩ দফায় হরতাল করেছে। আমরা এ পর্যন্ত যে ৪ বার হরতাল করেছি তার প্রত্যেকটির পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে এবং তা হচ্ছে দেশ এবং জনগণের সমস্যা নিয়ে।

জামায়াত নেতা মাওলানা নিজামী বলেন, শান্তিচুক্তির নামে সংবিধান বিরোধী কোন চুক্তি জনগণ মেনে নেবে না। সন্তু লারমার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তুলে দেয়া যায় না। কাজী জাফর আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি হলে প্রতিষ্ঠা হবে প্রথমে শান্তি বাহিনীর কর্তৃত্ব। পরে হবে জুমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, ভারতীয় সেবাদাস এ সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়। বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা তা রুখে দেবে। শফিউল আলম প্রধান বলেন, বাংলার মাটি থেকে হিন্দুস্থানের দালাল এ সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১২ই নভেম্বর ১৯৯৭
শান্তিচুক্তি মানে দেশ বিক্রি নয় ॥ দিনাজপুরে এরশাদ

দিনাজপুর, ১১ নবেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, ভারতকে ট্রানজিট প্রদানের বিরোধিতা করা বিএনপি'র শোভা পায় না। কারণ তাদের শাসনামলেই 'সাপটা' চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশকে ভারতের পণ্যের বাজারে পরিণত করা হয়েছিল। খুলে দেয়া হয়েছিল দেশের সব ক'টি সীমান্ত। পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে।

মঙ্গলবার বিকালে দিনাজপুরের খানসামা থানার পাকেরহাট খেলার মাঠে এক বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এরশাদ এ কথা বলেন। খানসামা থানা জাতীয় পার্টি আয়োজিত এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আকবর আলী শাহ্। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু, এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি, সরদার আমজাদ হোসেন, জেলা জাপা আহ্বায়ক মোকলেসুর রহমান, মকবুল হোসেন, আহমেদ শফি রুবেল, উছমান আলী প্রমুখ। জনসভায় এরশাদ বলেন, বর্তমান সংসদে বিরোধী দল না থাকায় তা এখন প্রাণহীন ও ঝুলন্ত সংসদে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের ভোট নিয়ে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি আজ জনগণের কথা বলছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭
বান্দরবানের পাহাড়ী-বাঙালী বিশাল সমাবেশে নাসিম
যতই হরতাল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হোক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবেই

মনিরুল ইসলাম মনু, বান্দরবান থেকে : ডাক, তার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোঃ নাসিম বলেছেন, যত ধরনের হরতাল, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হোক না কেন পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হবেই। তিনি বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংসদের চলতি অধিবেশনে আলোচনার জন্য চুক্তির দলিল উত্থাপন করা হবে। জনাব নাসিম বলেন, চুক্তিতে কি কি শর্ত রয়েছে তা এখনও কেউ জানে না। তবে আওয়ামী লীগ এবং সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলতে চাই এই অঞ্চল থেকে একজন বাঙালীকেও যেতে হবে না। সেনাবাহিনীর কোন সদস্যকেও প্রত্যাহার করা হবে না। বুধবার ১২ নবেম্বর বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশের জনসমুদ্রে মোঃ নাসিম প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রসন্ন কান্তি এতে সভাপতিত্ব করেন। কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিটির চেয়ারম্যান ও সংলাপ কমিটির সদস্য সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, বান্দরবানের সাংসদ এবং সংলাপ কমিটির সদস্য বীর বাহাদুর, রাঙ্গামাটি নাগরিক কমিটি নেতা গৌতম দেওয়ান, জাতীয় পার্টি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মোঃ শাহজাহান, খাগড়াছড়ি পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জাহেদুল আলম, বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম চৌধুরী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, রাঙ্গামাটির সাংসদ ও সংলাপ কমিটির সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী নাসিম বলেন, বিগত দু'টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙালী কেউই বিএনপিকে ভোট দেয়নি। তাই পার্বত্যবাসীর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই খালেদা জিয়া শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছেন। তিনি বলেন, পাহাড়ীর গুলিতে বাঙালী মারা যাক কিংবা বাঙালীর গুলিতে পাহাড়ীর মৃত্যু ঘটুক আমরা এ দৃশ্য আর দেখতে চাই না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ ভূমি আবারও রক্তে লাল হয়ে উঠুক, আমরা তা চাই না বলেই পার্বত্য শান্তি চুক্তি করতে যাচ্ছি। সমাবেশে হাজার হাজার পাহাড়ী বাঙালী নারী-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা পাহাড়ী বাঙালী একসাথে সুখে-দুঃখে থাকতে চায়, শান্তি চুক্তির আশায় তারা রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে এখানে এসেছে। তিনি বলেন, সাধারণ ও নিষ্পাপ এসব

মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই আমরা নির্বাচনের পূর্বে ওয়াদা দিয়েছিলাম যে কোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সেতুবন্ধন রক্ষা করব। তিনি বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙালী সবাই আমাদের শান্তি চুক্তির পক্ষে ছিল বলেই বিগত দু'টি নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সব ক'টি আসনে আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে।

মতিউর রহমান নিজামী, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীদের নিয়ে বর্তমানে খালেদা জিয়ার ঐক্যকে কটাক্ষ করে মোঃ নাসিম বলেন, আজ তাদের দরদ উথলে উঠেছে অথচ '৭১ সালে যদি তারা জয়লাভ করত তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বিশাল ভূখণ্ডে পাহাড়ী বাঙালী কেউই থাকতে পারতেন না। লাহোর-পেশোয়ার থেকে খান সেনারা এসে এখানে বসতি গড়ে তুলত।

মন্ত্রী নাসিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সবুজ অরণ্যে যে সৌন্দর্য আছে তাকে আরও সাজানো হলে তা হবে বিশ্বের সেরা পর্যটন এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পবিত্র ভূমির নিচে লুকিয়ে আছে খনিজ সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। আওয়ামী লীগ সরকার সে কারণে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সন্ত্রাস ও অস্ত্র ব্যবসার ঘাঁটি গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করে মোঃ নাসিম বলেন, শান্তি চুক্তি হলে অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ হবে, স্বর্ণ, হেরোইন স্মাগলিং বন্ধ হবে। এ কারণেই সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরীরা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। চট্টগ্রামে গত ১১ নবেম্বর চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে খালেদা জিয়ার সমাবেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে পুলিশ খুন করা এবং পরবর্তীতে হরতাল ডেকে পরিস্থিতিকে নাজুক করা হচ্ছে–এ অভিযোগ করে মোঃ নাসিম বলেন, আমরা কোন হুমকির ভয় করি না। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে এটি হবেই। এর বিপক্ষে কোন বাধা আসলে সারা দেশের শান্তিকামী জনগণ এর মোকাবেলা করবে। তিনি বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই জাতীয় সংসদে চুক্তি উপস্থাপন করে আলোচনা করা হবে। চুক্তি যদি জনস্বার্থ বিরোধী হয়, জনগণই এর বিচার করবে। তিনি বলেন, আমরা কোন গোপন কাজে বিশ্বাস করি না। কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষির বিপুল সম্ভাবনা আছে। সরকার কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যই ১শ' কোটি টাকা কৃষি খাতে বরাদ্দ রেখেছে। শান্তি চুক্তি হলে জনকল্যাণে এ অর্থ ব্যয় করা হবে।

শান্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করে মতিয়া চৌধুরী বলেন, এই অঞ্চলে বাঙালী থাকবে, পাহাড়ী থাকবে, শান্তি-সম্প্রীতি থাকবে। কেবল থাকবে না হানাহানি, রক্তপাত, হিংসা-বিদ্বেষ। তিনি বলেন, কর্নেল অলি বলেছেন, চুক্তি

করতে হলে ভারতের সাথে করতে হবে, শান্তিবাহিনীর সাথে নয়। আমরা মনে করি, পার্বত্য সমস্যা আমাদের নিজেদের সমস্যা। আমরা নিজেরাই এর সমাধান করব। মতিয়া চৌধুরী বলেন, তারাই ভারতের মাটিতে বসে শান্তি আলোচনা করেছেন। অপরদিকে আমরা আমাদের দেশের মাটিতে এমনকি রাজধানীতে বসে শান্তি আলোচনা করছি। মহাসমাবেশকে সামনে রেখে গত কয়েকদিন ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিভিন্ন থানা থেকে দলীয় কর্মী এবং পাহাড়ী বাঙালীদের সমাবেশ ঘটতে থাকে দুপুরের আগেই সমাবেশ চলাকালে পাহাড়ী বাঙালী নারী-পুরুষ স্লোগান দেয় 'পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই এক সাথে থাকতে চাই'।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য এলাকায় চুক্তি পরবর্তী শান্তি রক্ষায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে সরকারী প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উর্ধ্বতন একটি সূত্র মঙ্গলবার জনকণ্ঠকে বলেছে, চুক্তি পরবর্তী শান্তি রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন ম্যজিস্ট্রেটসহ লোকবল চাওয়া হয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কাছে। সূত্র বলেছে, শান্তি রক্ষায় প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনকে সহায়তা করবে। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরা রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে প্রস্তুত থাকবে। এদিকে সপ্তম দফা শান্তি বৈঠককে সামনে রেখে শান্তি বাহিনী সদস্যরা মঙ্গলবার দুদুকছড়িতে অবস্থান নিতে শুরু করে। ওই এলাকার ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ৮টি নিষ্ক্রিয় করার পর পরই তাদের অবস্থান গ্রহণ শুরু হয়। শান্তি সংলাপের সব বৈঠকের প্রস্তুতি পর্বে এমন ক্যাম্প প্রত্যাহারের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। খাগড়াছড়ির একটি সূত্র বলেছে, শুক্রবারের মধ্যেই জনসংহতির সন্তু লারমাসহ সিনিয়ন নেতৃবৃন্দ দুদুকছড়ি এসে পৌঁছবেন। ঢাকা আসার আগে তাঁদের সেখানে স্থানীয় পাহাড়ীদের সাথে বিশেষ কয়েকটি বৈঠক হবার সম্ভাবনা আছে। উল্লেখ্য, সপ্তম দফা বৈঠক ১৬ নবেম্বর শুরু হবে ঢাকায়। সূত্রটি বলেছে, এই বৈঠক বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হতে পারে। প্রথম তিন/চারদিন অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে।

উর্ধতন সূত্রটি বলেছে, বহুপ্রত্যাশিত শান্তি চুক্তির আগ মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির যে অপচেষ্টা চলছে সে ব্যাপারে সরকার সজাগ। কেউ যাতে বিশৃঙ্খল কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য

নেয়া হয়েছে সব ধরনের ব্যবস্থা। শরণার্থী প্রত্যাবাসনসহ তিন জেলায় যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যই লোকবল বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শরণার্থী প্রত্যাবাসনের সাথে সাথে গুচ্ছ গ্রামের বাসিন্দা সেটেলার বাঙালীদেরও তাদের স্ব স্ব ভূমিতে যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে তত্ত্বাবধান করা হবে। ২১ নবেম্বর থেকে শরণার্থীদের যারা দেশে ফিরে আসছেন তাদের তালিকা গ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে একটি দল আজ ত্রিপুরা যাচ্ছে। প্রত্যাবাসনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দলটি শরণার্থী নেতাদের সাথেও কথা বলবে। শুক্রবার রাতেই দলটির দেশে ফিরে আসার কথা।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে শরণার্থীদের এটি দ্বিতীয় দফা প্রত্যাবাসন। এর আগে গত মার্চ মাসে, একদফা প্রত্যাবাসন হলেও যথাযথ পুনর্বাসন না হবার অভিযোগে তা স্থগিত হয়ে যায়। এরপর গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার ঢাকা বৈঠকের পর সৃষ্ট জটিলতা দূর হয়। সরকারের এ দফায় একনাগাড়ে সব শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁরা প্রতিদিন ২০০ শরণার্থী গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছেন। প্রয়োজনে আরও বেশি পরিবারকে গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার ৬টি শিবিরে এখনও ৪৩ হাজারের বেশি পাহাড়ী শরণার্থী আছেন। যাঁদের বেশিরভাগ দেশ ছেড়েছিলেন ১৯৮৬ সালে পাহাড়ে বিশেষ অশান্তি সৃষ্টির পর। সরকারী সূত্র বলেছে, এই শরণার্থী পুনর্বাসন ছাড়াও গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দাদের স্ব-ভূমিতে পুনর্বাসনের বিষয়কেও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পাহাড়ের অশান্তির পর সেটেলার বাঙালীদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের এসব গুচ্ছগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে করে তাদের জমি, বাড়িও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর এদেরকে আবার স্ব-স্ব জমি, বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৩ই নভেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কিছুটা বিতর্ক এরই মধ্যে জমে উঠেছে। ঐ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি চুক্তি করতে যাচ্ছে। আসন্ন সেই চুক্তিকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গন যথেষ্ট সরগরম হয়ে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু ব্যাপার এরই মধ্যে খানিকটা

ঘটেও গেছে। যেমন–এই চুক্তির বিরোধিতার বিভিন্ন বক্তব্য শোনা গেছে। কিছু দিন আগে হরতাল হয়ে গেল এ ব্যাপারে। তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ।

এখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধছে যে বিষয়টি নিয়ে সেটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি। এ মাসের মাঝামাঝি এ চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। শান্তি চুক্তির একটা খসড়াও তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে খসড়ায় কি আছে তা প্রকাশ করা হয়নি। খসড়া চুক্তির কোন কপি কাউকে অর্থাৎ জনসংহতি সমিতিকেও দেয়া হয়নি, পত্রপত্রিকায়ও পাঠানো হয়নি। কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে অনেক কিছুই অনুমাননির্ভর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। যে চুক্তির বিষয়াবলী প্রকাশ করা হয়নি সে চুক্তি সম্বন্ধে নানা ধরনের সংশয় সৃষ্টির উপযোগী কথাবার্তাই এখন প্রবল।

অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের সম্মেলন কেন্দ্রে রেজিমেন্টাল কমান্ডিং অফিসারদের এক সম্মেলনে ভাষণদানকালে এই চুক্তির ব্যাপারে বলেছেন, খুব শীঘ্রই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি চুক্তি হবে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই। দীর্ঘসময় ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ওই অঞ্চলে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তখন একটি চিহ্নিত মহল তা নস্যাতের চেষ্টা করছে–এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি চুক্তি করার জন্য আগের সরকার ভারতে উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে ১৩ বার বৈঠক করেছিল। কমিটিতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেননি। বর্তমান কমিটিতে বিরোধী দলের দু'জন সদস্য আছেন এবং বিরোধী দলের নেতারা তাঁদের দলের সদস্যদের কাছ থেকে চুক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন। ওদিকে গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামে এক জনসভায় বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আগামী ১৬ নবেম্বর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান বিরোধী চুক্তি হলে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, ১৬ তারিখে না হয়ে অন্য যে কোন দিন কথিত শান্তি চুক্তি হবে সেই দিনই হরতালসহ আরও কঠিন ও বৃহত্তম কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। জনগণ সংবিধানবিরোধী কোন চুক্তি মানবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এতকাল যা ঘটেছে তা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অবিশ্বাস, সন্দেহ, পারস্পরিক শত্রুতা কোন দেশের কোন এলাকায় অব্যাহত রাখা যায় না। রাখলে তার পরিণতি এমন হয় যা জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়। পার্বত্য এলাকায় এতকাল তাই ঘটেছে। সেখানে বিরাজ করেছে হিংসা,

শত্রুতা, হানাহানি। মূল্যবান জীবনও অনেক নষ্ট হয়েছে। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা জরুরী। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক–দেশের জনগণ এটা চায়। ঐ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হয় বিগত সরকারের আমলে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এখন সেই উদ্যোগেরই ফল ফলতে চলেছে। সম্পাদিত হতে চলেছে শান্তি চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদিত হলে তা হবে পূর্ববর্তী সরকারের এ ব্যাপারে গৃহীত উদ্যোগেরই ধারাবাহিকতার ফল। বর্তমানে সরকার যে শান্তি চুক্তি করতে যাচ্ছে তা সংবিধানের আওতা-বহির্ভূত বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতার উৎসে অর্থাৎ সূচনা পর্যায়ে বিগত সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা সংবিধান-বহির্ভূত পন্থায় নাকি সংবিধান সম্মত পন্থায় নেয়া হয়েছিল সে প্রশ্ন কি এখন ওঠে না? তাছাড়া পূর্বের সরকারের আমলে আলোচনার জন্য গঠিত কমিটির অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন বিরোধী আওয়ামী লীগ সদস্যরা সেসময়ে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিলেও এবার গঠিত কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিরোধী বিএনপি সদস্যরা একটি আলোচনা বৈঠকেও কেন যোগদান করলেন না, সে প্রশ্নও নিঃসন্দেহে তোলা যায়। আলোচনা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিংসার মাধ্যমে শান্তি আসে না। খসড়া শান্তি চুক্তির ধারাগুলোতে কি আছে তা অবশ্যই জানানো উচিত। এ জন্য আছে জাতীয় সংসদ। বিস্তারিত আলোচনা সেখানেই হতে পারে। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে সরকারকে ষোলোআনা স্বচ্ছতা দেখাতে হবে কাজে-কর্মে। আগামীতে চুক্তিটি সংসদে ওঠানো হোক। সকল সদস্য এর আলোচনায় যোগদান করুন। এভাবেই দেশবাসী জানতে পারবে এর ধারাগুলো সম্পর্কে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় এখন প্রয়োজন সহযোগিতা, অন্য কিছু নয়। এ শান্তি বড় মূল্যবান। কয়েকদিন আগে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন নামক একটি সংগঠন এক জরিপ চালিয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, পার্বত্য এলাকায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ শান্তি চায়। এর বিপক্ষে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। জরিপ থেকে জানা যায়, কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, যেকোন সুস্থ মানুষ শান্তি চুক্তি সম্পাদনকে সমর্থন করবেন। এর বিরোধিতা করার মধ্যে যুক্তি থাকতে পারে না। জরিপে উত্তরদাতাদের শতকরা ৮২ জন পূর্বোক্ত হরতালের বিপক্ষে।

দেশের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, হানাহানি বন্ধের স্বার্থে পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকল দলের, সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই নভেম্বর ১৯৯৭
৭০ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করে যারা অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের প্রতিহত করুন

সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমসহ ৭০ জন বুদ্ধিজীবী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই এ উদ্যোগকে বানচাল করার জন্য প্রধান বিরোধীদল বিএনপি তাদের সহযোগী একাত্তরের ঘাতক দালালদের দল জামায়াতে ইসলামী এবং সহযোগী অন্য সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দলগুলো দেশে ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে নেমেছে।

তাঁরা বলেন, গত ১১ নবেম্বর চট্টগ্রামে জনসভায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, এই চুক্তি হলে নাকি দেশের এক-দশমাংশ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাপ্তাই জল বিদ্যুত প্রকল্প, কর্ণফুলী পেপার মিল, রাউজান তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরও নাকি হাতছাড়া হয়ে যাবে। বেগম খালেদা জিয়া কোন গোপন সূত্রে এই তথ্য জেনেছেন আমরা জানি না।

তাঁরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের কোন ইস্যু না পেয়ে বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে উৎখাত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের সাথে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য যে বিপুল বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেখানে অশান্তি জিইয়ে রাখতে চাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ এসব অপশক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বিজ্ঞপ্তি'র।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি সংলাপ রবিবার হচ্ছে না, বৈঠকের তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে

ফজলুল বারী ॥ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে রবিবারের শান্তি বৈঠক হচ্ছে না। সরকারী একটি সূত্র শুক্রবার রাতে জনকণ্ঠকে এই খবর দিয়েছে। সূত্র বলেছে, জনসংহতি সমিতির একটি চিঠির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার মাধ্যমে সমিতি সরকারকে জানিয়েছে, তাদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা অসুস্থ। তাই তিনি ১৬ নবেম্বরের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। সন্তু লারমা একই কারণে শুক্রবার পর্যন্ত দুদুকছড়িও এসে পৌঁছাননি। জনসংহতি সমিতি নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে বৈঠকের একটি তারিখ প্রস্তাব করেছে। তবে সরকারী সূত্র বলেছে, টেকনিক্যাল কারণে ওই তারিখে বৈঠকের আয়োজন করা সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়। পরবর্তীতে দুই পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন তারিখ ঠিক করা হবে।

উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পরবর্তী বৈঠকটি হবে সপ্তম দফার। ৬ষ্ঠ দফা বৈঠকের শেষে সন্তু লারমার খসড়া চুক্তিতে উপনীত হবার ঘোষণা আগামী বৈঠকেই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হবার কথা আছে। জনসংহতি সমিতি ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত তাঁদের এক বক্তব্যে বলেছে, স্থানীয় প্রশাসন এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন প্রশ্নে সরকারের সাথে তাঁদের এখনও দ্বিমত আছে। ভূমির ওপর অধিকারের বিষয়েও তারা দর কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে। সপ্তম দফা বৈঠকের তারিখ পিছিয়ে গেলেও ২১ নবেম্বর থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন আবার শুরু হচ্ছে। এবারে ৬০৬৩ জন শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি স্থির হয়েছে বাংলাদেশ সফরকারী দলের ত্রিপুরা বৈঠকে। বৃহস্পতিবার এই দলটি সেখানে গেছে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে। পাঁচ সদস্যের দলটির আজ শনিবার দেশে ফেরার কথা। উল্লেখ্য, এবার শরণার্থীরা আসবেন দক্ষিণ ত্রিপুরার পঞ্চরামপাড়া, লেবাছড়া, শিলাছড়ি এবং কাঁঠালছড়ি শিবির থেকে। ত্রিপুরার ৬ শিবিরে এখনও ৪৩ হাজারের বেশি শরণার্থী আছেন। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য এলাকায় বিশেষ অশান্তি সৃষ্টির পর তারা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। এর আগে বিএনপি আমলে ২ দফায়, বর্তমান সরকারের আমলে একদফায় শরণার্থী প্রত্যাবাসন হলেও পরে নানা অভিযোগে এসব প্রত্যাবাসন বন্ধ হয়ে যায়। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার বৈঠকে প্রত্যাবাসনের নতুন সিদ্ধান্ত হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য সমস্যা ॥ বিশেষ
মহলের অপচেষ্টার
বিরুদ্ধে গণফোরাম

গণফোরাম নেতিবাচক এবং কল্পিত অভিযোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে জাতীয় সমস্যাটিকে দীর্ঘায়িত ও জটিলতর করার মহল

বিশেষের অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়েছে। একই সঙ্গে গণফোরাম জনগণকে আস্থায় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাধান করার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে সরকারকে শান্তিচুক্তির কাঠামো জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। শুক্রবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ঢাকাস্থ সদস্যবৃন্দ ও ঢাকা মহানগরী নেতাদের এক যৌথসভার প্রস্তাবে এ দাবি জানানো হয়। এ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার অপর এক প্রস্তাবে বিদ্যমান রাজনৈতিক জেদাজেদি ও সংঘাতময় অবনতিশীল পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, অসহিষ্ণুতা, দলবাজি, নেতিবাচক বিরোধিতা এবং সন্ত্রাসনির্ভর বিরাজমান রাজনৈতিক কালচারের প্রতি দেশবাসীর ক্ষোভ ও অনাস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রস্তাবে সম্প্রতি চট্টগ্রামে সংঘটিত ঘটনার নিন্দা জানিয়ে এর বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হয়। খবর বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৫ই নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তিচুক্তি জনসমক্ষে
তুলে ধরা হবে

নিউজ মিডিয়া ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সকল বিষয়বস্তু সংসদ এবং জনগণের সামনে প্রচার করা হবে। জানা গেছে, সরকার এ বিষয়ে কোন রাখঢাক রাখবে না। এ নিয়ে গোপনীয় রাখার মতো কোন কিছু নেই বলে দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। সূত্রমতে, চুক্তি হবার পর প্রথমেই বিষয়টি জাতীয় সংসদে তুলে ধরা হবে। সংসদ সদস্যরা চাইলে এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনাও হবে। সংসদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে রাখঢাকের কিছুই নেই। বিএনপি সর্বপ্রথম এই শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে ভারতে গিয়ে। তৎকালীন মন্ত্রী অলি আহমদ ভারতের ত্রিপুরা গিয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা করতেন। অলি আহমদ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক ছাড় দিতে যতটা সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন বর্তমান সরকার তাও দিচ্ছে না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই সরকার শান্তি আলোচনা করেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কারণে পাহাড়ী বাঙালীদের অধিকার উভয় থাকছে। এতদিন বাঙালীরা পার্বত্য এলাকার অধিবাসী হিসাবে পাহাড়ীদের কাছ থেকে কোন স্বীকৃতি পায়নি। এ চুক্তির কারণে পাহাড়ীদের কাছে তারা বৈধতা পাবে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর দফতরসমূহ স্বাভাবিক থাকবে। দেশের অন্য এলাকার মতোই সেনা দফতরসমূহ একইভাবে পার্বত্য এলাকায় কাজ করবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়
প্রসঙ্গ পার্বত্য শান্তি বৈঠক

আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকলেও জনসংহতি সমিতির একটি চিঠির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আজ ঢাকায় পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে সপ্তম দফা শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে না। জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা অসুস্থ। দু'পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যমে পরে নতুন তারিখ ঠিক হবে। ফলে, বহু প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখও পিছিয়ে গেল। সরকারী সূত্রও অবশ্য বলেছে, টেকনিক্যাল কারণে ঐ তারিখে বৈঠকের আয়োজন করা সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়।

জানা যাচ্ছে, বৈঠক আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত ও ২৬-২৭ তারিখের মধ্যে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব মহলই চাইছেন, যথাশীঘ্র এ বৈঠক হতে হবে। দেশের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও সমৃদ্ধির স্বার্থে দীর্ঘ দু'যুগ ধরে বিরাজমান দেশের তিনটি পার্বত্য জেলায়–রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে উপজাতীয়-অউপজাতীয় বিরোধের চির অবসান গণতন্ত্র ও শান্তিকামী প্রত্যেকটি মানুষেরই একান্ত কাম্য। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক জরিপের ফলও সে কথাই বলছে। সেখানে আছে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসকারীদের ৮৯.৭৩ শতাংশ নাগরিক সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে আসন্ন শান্তিচুক্তিকে সমর্থন করে। বিপক্ষে মত দিয়েছে মাত্র ৪.৩৪ শতাংশ। এ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য অধিবাসীদের অবস্থা। আর সমতল ভূমিতে তথা দেশের বাকি অংশে বসবাসকারী প্রায় সব মানুষই তো এ রক্তক্ষয়ী বিরোধের অবসান চাইবে অন্তত এ কারণে যে, দেশের রাজনীতি যেন শুধু বিরোধের পাঁকে জড়িয়ে না থাকে, যেন ঐ বিরোধকে কেন্দ্র করে দেশ আরও রক্তারক্তি-হানাহানি সংঘাতের দিকে এগিয়ে না যায়, যেন দেশের অনুন্নত ঐ খনিজ ও বনসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল যথাশীঘ্র উন্নয়ন ও সভ্যতার আলোর মুখ দেখতে পারে। ইতোমধ্যে এমন খবরও বেরিয়েছে, একটি পার্বত্য জেলায় তেল-গ্যাসসহ খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য বিদেশী একটি কোম্পানি কাজও শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া, ঐ এলাকায় বসবাসকারী অন্তত ১৩টি উপজাতীয়ের বর্ণিল সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ আমাদের সমতলের বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার অবাধ সুযোগ পেলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের দেশ একদিকে হয়ে উঠবে আরও বৈচিত্র্যময়, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উন্নয়নের সম্মিলিত দেশ হয়ে উঠবে আরও বলবন্ত, আরও প্রাণোচ্ছল, হবে সুসমৃদ্ধির অঙ্গীকারবহ।

এদিকে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুশকিল হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আমলে এ রকম জটিল দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাণসংহারী একটি সমস্যার প্রায় দুরূহ সমাধানও নিশ্চিতভাবে সমাধানের উদ্যোগ একেবারে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে চলে আসায়। মুখর হয়ে উঠছে তারা সরকারের সমস্ত শুভ উদ্যোগের বিরূপ সমালোচনায়, এমনকি নিজেদের আমলে তারা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল গঙ্গার পানি বণ্টন, পার্বত্য সমস্যার নিষ্পত্তি কিংবা বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ অথবা সুপ্রতিবেশীসুলত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে, এখন অনুরূপ পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখে যেন আক্রোশমূলকভাবেই সেসবের বিরোধিতা করতে তারা উঠেপড়ে লেগেছে। অবশ্য আশার কথা, দেশের সাধারণ মানুষ তাদের ঐ নেতিবাচক রাজনীতির পক্ষে এখন পর্যন্ত তেমন কোন সমর্থন যোগায়নি, অনেক ক্ষেত্রে তা দেশবাসীর নিন্দা ও প্রত্যাখ্যানই কুড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত সম্ভাব্য পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রাক্কালে সাতটি মূল্যবান প্রাণহানি ঘটিয়ে চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর গত শুক্রবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত দেশের প্রধান দু'টি দলের দু'টি সভা-সমাবেশের উল্লেখ করা যায়। একটি হচ্ছে কুষ্টিয়ার জনসভায় বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার জনসমাবেশ। বৃহস্পতিবার বিকালে কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে বিএনপি আয়োজিত সে সমাবেশে খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির ভাষণে এ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ এক ঝুড়ি অভিযোগ করেন। তার মধ্যে আছে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ থেকে শুরু করে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে নানান কাল্পনিক সব অভিযোগও।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারেই ঢাকায় পল্টন ময়দানে মহানগর আওয়ামী লীগ চট্টগ্রামে সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে। সেখানে বেগম জিয়ার উপরোক্ত 'জাতীয়তাবাদী শক্তির' মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "বিএনপি পরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। '৭৫-এর পর থেকেই তারা হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি শুরু করেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায় না। বিএনপি বার বার চেষ্টা করেও চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা শান্তি চাই বলে চুক্তি করছি," ইত্যাদি। বস্তুত সরকারী দলের বক্তব্যও দেশবাসীর সমস্তই জানা।

এখন বাস্তব অবস্থা এটাই যে, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা জাতির স্বার্থেই একান্ত জরুরী। তাদের পরস্পরবিরোধী অবস্থান ও বক্তব্য, বিরোধ-বিসম্বাদ আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও সে চুক্তির বাস্তবায়ন পদে পদে বিঘ্নিত হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যাবে এবং ক্রমে তা দেশব্যাপী একটা অসন্তোষ সৃষ্টির নার্ভসেন্টার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দেশের ৭০ জন বুদ্ধিজীবী ইতোমধ্যে এক বিবৃতি দিয়ে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বানচালের অপপ্রয়াস ও ঐ শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে, আবার দেশের ১০১ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে চুক্তির ব্যাপারে গোপনীয়তার কাল্পনিক অভিযোগ তুলছেন।

আমরা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করার আহ্বানের পিছনে শান্তিকামী দেশবাসীকে লৌহদৃঢ় ঐক্য নিয়ে সমবেত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে বিএনপিসহ এ চুক্তির বিরোধিতাকারী সকল শক্তিকে অবিলম্বে দেশের বাস্তবতা উপলব্ধি করে হরতাল-বিক্ষোভ ধরনের সব রকম বিশৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে দেশ ও জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক সহযোগিতাদানের মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের পথ বাধামুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। যে কোন মূল্যে সরকারকে উৎখাত নয় এবং যে কোন মূল্যে পার্বত্য শান্তি বৈঠককে সফল করাই হোক তাঁদেরও দায়িত্ব। অন্যথায় নিজেদের জন্য হয় তাঁরা ডেকে আনবেন চূড়ান্ত জনবিচ্ছিন্নতা অথবা দেশের জন্য নৈরাজ্য ও সংঘাতময় একটি পরিস্থিতি, যা সংসদীয় গণতন্ত্র এবং এ দেশের সুস্থ ও বিবেকবান কোন নাগরিকের জন্যই আদৌ কাম্য হতে পারে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭
শান্তির পথে ছড়ানো কাঁটা
নাসির আহমেদ

বাংলাদেশের নিসর্গ সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিদেশী পর্যটকদের উচ্ছ্বাস শত-সহস্র বছর ধরে প্রবাহিত ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এ দেশের কবি, সাহিত্যিক আর শিল্পীদের কলম আর তুলিও চিরকালই এঁকেছে এই সবুজ-শ্যামল, সুন্দর ভূ-খণ্ডের নান্দনিক চিত্র। কেউবা 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমানো'র দৃশ্য কল্পনা করে 'ওই পাহাড়েরই' ঝর্ণা হয়ে বয়ে চলার আকুতি প্রকাশ করেছেন। চিরায়ত বাংলার নিসর্গ বন্দনার এই ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলই সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। বাইরে যার এত শান্ত-স্নিগ্ধ, শ্যামল শোভা, তারই ভিতরে জ্বলছে অশান্তির দাবানল। গত ২৫ বছরে ওই জনপদে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে প্রায় ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে এই সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বার্ষিক ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মতো।

বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এই বাড়তি অঙ্কের অর্থ ব্যয় এবং বিশাল সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলকে যুগ যুগ ধরে অশান্ত-অগ্নিগর্ভ করে রাখার কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারপরও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি আসেনি। শান্তির পথ অন্বেষণে প্রকৃত আন্তরিকতাও দেখায়নি কোন সরকার। পার্বত্য আদিবাসীদের সঙ্গে সমতলবাসী মানুষের দূরত্ব কেবল দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই নির্মম বাস্তবতায় যদি পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির কোন পদক্ষেপ কোন সরকার গ্রহণ করে, তাহলে রাজনৈতিকভাবে যত মতভিন্নতাই থাকুক না কেন, দেশের স্বার্থে তা সমর্থন দাবি করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগকেও নস্যাত করে দেবার প্রক্রিয়ায় এখন দৃশ্যমান। বিরোধীদলের এই চুক্তির বিরোধিতার কারণ যতটা না সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, তার চেয়ে বেশি অন্য উদ্দেশ্যে। শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি বা শান্তি চুক্তির প্রক্রিয়াটা এবারই প্রথম নয়। দীর্ঘকালের এই সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে এরশাদ শাসন আমলেই প্রথমবারের মত সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধির সঙ্গে পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের আনুষ্ঠানিক আলোচনা বৈঠক হয়। এরশাদ শাসন আমলে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ছয় দফা বৈঠক হয় সরকারের। পাস হয় 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার আইন'। এতে আদিবাসীদের দাবিসমূহের আংশিক স্বীকৃতি মিললেও তাদের স্বকীয় জাতিসত্তা ও ভূমি সংক্রান্ত অমীমাংসিত দাবি অবহেলিতই থেকে যায়।

১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রচারাভিযানকালে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করলেও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর শাসনামলের পাঁচ বছরে কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং নির্বাচনে তাঁর দলের পার্বত্য অঞ্চলে ভরাডুবির প্রতিশোধের মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে সামরিক অভিযান তীব্রতর করার বাস্তবতায়। দাতাগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে থাকলে '৯২ সাল থেকে খালেদা সরকার তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রীর মাধ্যমে পাহাড়ী বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের সূত্রপাত করে। দফায় দফায় বৈঠক বসে সরকারের প্রতিনিধি ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। কিন্তু আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো বৈঠক কখনও স্থায়ী কোন সমাধানের পথ নির্মাণ করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামে এক জনসভায় মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন কতিপয় পাহাড়ী নেতার বিরোধিতার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ইমোশনাল একটি উক্তির মধ্য দিয়ে যে অসন্তোষের সূচনা করেছিলেন, সেই অসন্তোষকে বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর জেনারেল জিয়া শতগুণে বাড়িয়ে দেন সামরিক এ্যাকশন এবং পাহাড়ী এলাকায় বাঙালী মুসলমানদের দলে দলে পুনর্বাসনের মতো সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে। জিয়া চেয়েছিলেন বাঙালী মুসলমানদের সেখানে পুনর্বাসনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাহাড়ী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করতে। ফলে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র অভিযান আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী আমলের মতো জিয়া সরকারও ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে শুরু করলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে শান্তিবাহিনী আশ্রয় এবং সামরিক প্রশিক্ষণসহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার সুযোগ পায়। যার বিষময় ফল জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে প্রাণ হারায় উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক। এদের মধ্যে বহু অসামরিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে বিগত প্রতিটি সরকার সামরিক অভিযানকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে শান্তি তো সূচিত হয়ইনি, বরং পার্বত্য অঞ্চল কেবলই সংঘাতে আর রক্তপাতে অগ্নিগর্ভ হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের এ সত্যটা আমরা কেন বিস্মৃত হব যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই পাহাড়ী সম্প্রদায়গুলো তাদের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি নিয়ে ঐ জনপদে জীবনযাপন করেছে। তারা অনেকটা আদিমগোছের জীবনযাপন করেছে। স্বভাবের দিক থেকে এরা সরলও। ফলে ব্রিটিশ শাসকরা 'হিল ম্যানুয়েল' তৈরি করেই এদের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে এরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানী উপজাতীয়দের স্বায়ত্তশাসন দেয়নি। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতিদেরকে। এক দেশে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ঐ দ্বৈত নীতিই দিনে দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষুব্ধ করছিল। জেনারেল জিয়া সেই আগুনেই আবার ঘি ঢেলেছিলেন।

বর্তমান সরকার পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে যখন পার্বত্য আদিবাসীদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মতো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, তখন পাকিস্তানী স্বার্থের তল্পিবাহক জামায়াতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিরোধী দল বিএনপি এ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ

বুঝতে পেরেছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দেশের একটি বিশাল অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান রাখা আর যা-ই হোক দেশপ্রেমের পরিচয় যে বহন করে না, এটা স্পষ্টত বর্তমান সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে শান্তিবাহিনীও এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাদের প্রতি ভারতীয় সমর্থন আর আগের মতো নেই। তারাও যুদ্ধ নয়, শান্তি চায়। এর কারণও স্পষ্ট। আইকে গুজরাল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি ও সম্পর্কের উন্নয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর সেই সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ফলে দুই দেশ পরস্পরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় যেমন বন্ধ করেছে, তেমনি সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। কারণ আজকের পৃথিবীতে সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করে বাণিজ্য। আজ কেউ কারও দেশ দখল করে না–দখল করে বাজার। সুতরাং ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারত চাইছে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজ দেশের অর্থনৈতিক বাজার সম্প্রসারণ করতে। এই বাস্তবতা ভুলে গিয়ে কোন মহল যদি মনে করে যে, ভারত পার্বত্য অঞ্চল দখল করবে–তা হলে তারা যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এ সকল বাস্তবতা ভুলে গিয়ে বিরোধী দল পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপকে বানচাল করার জন্য কেন অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে তা কারও অবোধ্য নয়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে আর একটা ৭ নবেম্বর সৃষ্টির হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে তারা। লক্ষ্য একটাই ভারত দেশ নিয়ে যাচ্ছে–সুতরাং এই সরকারকে হটাও। সরকার হটানো গেলে শান্তিচুক্তি হবে না। অশান্ত থাকবে পার্বত্য অঞ্চল। বিদেশী প্রভুদের মাধ্যমে অস্ত্র আর মাদক ব্যবসার স্থায়ী ঘাঁটি থাকবে পার্বত্য অঞ্চল। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এখানে সামরিক ট্রেনিং ও আশ্রয় থাকবে অব্যাহত। ভারতকে অস্থির রাখা যাবে। জান যদি যায় যাবে সেনাবাহিনী আর পার্বত্য অঞ্চলের নিরীহ জনসাধারণের। ক্ষমতায় যারা থাকার তারা টিকে থাকবেন পতাকাবাহী গাড়ি নিয়ে শান্তিপূর্ণ মূল ভূখণ্ডে। এ কারণে আজ এই চুক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হচ্ছে ভারতের স্থায়ী বলে কথিত শত্রু একটি দেশ এবং তাদের এদেশীয় দোসররা। কারণ পার্বত্য অঞ্চল শান্ত হলে তাদের কালো অর্থ উপার্জনের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে, বাংলাদেশের বাড়তি সামরিক ব্যয় সঙ্কুচিত হবে, পার্বত্য অঞ্চলে শুরু হবে অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহ। এ অঞ্চলে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির যে বিরাট সম্ভাবনা–সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে তাদের মাথায় বাজ পড়বে।

যতই অপ্রিয় শোনাক না কেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত রাখার জন্য সুদূরপ্রসারী আন্তর্জাতিক চক্রান্তেরই জের চলমান ঘটনাবলী। কিন্তু এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৯ ভাগই চাইবেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক তৎপরতা বন্ধ হোক, বন্ধ হোক হানাহানি আর রক্তপাত। পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি শান্তি বিঘ্নিত হয়, তা হলে লাভ বাংলাদেশের না অন্য কোন দেশের–সেই সরল সত্যটা এ দেশের যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–শান্তিচুক্তিতে কি আছে? চুক্তিতে যদি এমন থাকে যে, যেসব পাহাড়ী আদিবাসী শরণার্থী হয়ে তাদের জমিজমা-ঘরবাড়ি ফেলে গেছেন, তাদের তা ফেরত দেয়া হবে, যদি তা কেউ অবৈধভাবে দখল করে থাকে তা উদ্ধার করে দেয়া হবে, তাতে দেশের সার্বভৌমত্বটা কিভাবে বিনষ্ট হবে? যদি হিল ম্যানুয়াল বাস্তবায়ন না করেও তাদের স্বকীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়, যদি তাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী সৃষ্টিও করা হয়, তা হলেও সিদ্ধান্ত তো সরকার তথা কেন্দ্রের হাতেই। বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় নিজস্ব জাতিসত্তার পরিচয় এবং স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা বাংলাদেশের নাগরিক।

আজ যাঁরা শান্তিচুক্তিকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাবার কথা বলেন, দেশের এক-দশমাংশ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবে বলেন–তাঁরাও তো শান্তিচুক্তি করার জন্য বার বার বৈঠকে বসেছেন ক্ষমতাসীনকালে এই জনসংহতি সমিতির নেতাদের সঙ্গেই। এমনকি দেশ ছেড়ে ভারতের মাটিতে গিয়েও বৈঠক করেছেন। যদিও স্থায়ী শান্তি চাননি বলেই লোক দেখানো ওই সব আলোচনা বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার আন্তরিকতার সঙ্গেই শান্তি চাইছে বলে মনে হয়। সে কারণে অতীতের যে কোন সরকার এর চেয়ে বর্তমান সরকারের প্রতি জনসংহতির নেতৃবৃন্দ যে অধিক আস্থাশীল তা ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই শান্তি উদ্যোগ বা বৈঠক যদি সংবিধানবিরোধী হয়–তাহলে তারা যে অতীতে বার বার বৈঠক করেছেন ওই সব বৈঠক সংবিধানবিরোধী হবে না কেন?

ওই যে কথায় বলে না–'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। আসলে বৈরিতার জন্য বৈরিতা কখনও জাতীয় ইস্যুতে কাম্য হতে পারে না। দীর্ঘকালের অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলে এ চুক্তির মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। শান্তি আরো বহুদূর। সুতরাং শান্তির এ যাত্রাপথে অশান্তির বিষাক্ত কাঁটা যারা ছড়াচ্ছেন–তাঁদের বিবেক একবার অন্তত জাগ্রত হোক–সেটাই জাতির প্রত্যাশা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

শান্তির পথে
অশান্ত
পার্বত্য চট্টগ্রাম

-শাহরিয়ার কবির

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কারও মতে অর্থনৈতিক, কারও মতে রাজনৈতিক, কেউ মনে করেন এই দুটোই সমস্যার কারণ। প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হলেও এই সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও এই সমস্যার রয়েছে প্রশাসনিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, কূটনৈতিক ও মানবিক দিক এবং এর একটি অপরটির সঙ্গে এতই নিবিড়ভাবে যুক্ত যে, কোনটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং তাদের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসনলাভকারী বাঙালী সম্প্রদায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী সম্প্রদায়-যাদের ভিতর রয়েছে দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার তেরটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, তারা সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয়, সরল এবং এদের অনেকেই আদিম সমাজ জীবনে অভ্যস্ত। নৃতত্ত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীদের সঙ্গে তাদের যত না মিল, তার চেয়ে বেশি রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মঙ্গোলীয় গোত্রের বিভিন্ন জাতিসত্তার সঙ্গে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিল বলেই ১৯০০ সালে হিল ম্যানুয়েলের দ্বারা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং জমির ওপর তাদের একান্ত অধিকার বজায় রাখার জন্য বহিরাগতদের জমিক্রয় রহিত করা হয়েছিল।

'৪৭-এ ইংরেজরা বিদায় নেয়ার আগে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান নামক রাষ্টের জন্ম দেয়, যার ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষেও মুসলমান প্রধান অঞ্চলসমূহ। পাকিস্তানের ইসলামিক পরিচয়কে নিরঙ্কুশ করার জন্য ব্রিটিশরা পাঞ্জাব ও বঙ্গ ভাগ করেছিল এই যুক্তিতে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজধানী কলকাতার জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু এবং লাহোরসহ পূর্ব পাঞ্জাবের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যদিও সমগ্র বঙ্গে মুসলিম লীগের সরকার ছিল তারপরও পাকিস্তানের ভাগ্যে কলকাতা জোটেনি। পাকিস্তানীদের মন থেকে কলকাতার বিচ্ছেদ বেদনা দূর করার জন্য শতকরা তিন ভাগেরও কম মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলকাতা বন্দর

হাতছাড়ার মাশুল হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দর পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল এবং এই চট্টগ্রামকে নিরাপদ রাখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছিল ।

অন্যথায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ ভাগেরও বেশি অমুসলিম হওয়ার কারণে তা পাকিস্তানের ভাগে পড়ার কথা ছিল না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সেই সময়কার পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী '৪৭-এর ১৫ আগস্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতের পতাকা এবং বান্দরবানে বার্মার পাতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পর পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ জানতে পারেন যে, এতে তাদের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হয়নি। ২১ আগস্ট পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে ভারত ও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা তোলে। এই পতাকা উত্তোলনের বিষয়টি পার্বত্য জেলার সমতলের বাসিন্দারা সহজভাবে মেনে নেয়নি। বাঙালী মুসলমানরা সব সময় পাহাড়ীদের সন্দেহ করেছে এই ভেবে যে, তারা পাকিস্তানের প্রতি যথেষ্ট অনুগত নয়। আবার '৭১-এর দেখা গেছে এর বিপরীত দৃশ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাহাড়ী নেতৃত্বের একটি অংশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, যদিও পাহাড়ী সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তারপরও রাজা ত্রিদিব রায় এবং আরও কয়েকজন নেতা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন করার কারণে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর মুক্তিযোদ্ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে হামলা করে বেশ কিছু পাহাড়ীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক করে দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত ছিল উপজাতি

একনজরে

অবস্থান ঃ উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে মিজোরামের লুসাই পাহাড় ও মিয়ানমার, দক্ষিণে মিয়ানমার ও পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা।
আয়তন ঃ আনুমানিক ১৩০০০ বর্গ কিঃমিঃ।
জেলা ঃ ৩টি। যথা ঃ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান, থানা ঃ ২৫টি। তন্মধ্যে খাগড়াছড়িতে ৮টি, রাঙ্গামাটিতে ১০টি এবং বান্দরবানে ৭টি।
খাগড়াছড়ির থানাগুলো হচ্ছে ঃ খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি।

রাঙ্গামাটি থানাগুলো হচ্ছে ঃ রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগুদু, বরকল, নানিয়ারচর, কাউখালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি, বিলাইছড়ি।
বান্দরবানে থানাগুলো হচ্ছে ঃ বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম, নাইক্ষংছড়ি।
নদনদী ঃ চেংগি, মায়ানি, কাসালাং, কর্ণফুলী, রাইনখিয়াং, সাংগু, মাতামুহুরি।
হ্রদ ঃ কাপ্তাই (কৃত্রিম হ্রদ), রাইনখিয়ানকাইন ও বোগাকাইন (প্রাকৃতিক হ্রদ)।
উপজাতি ঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চগ্যা, বৌম, পাংখু, খুমি, উসাই, খিয়াং, ছক, সুলাই, রিয়াং।
গোত্র ঃ প্রতিটি উপজাতি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। মোংদের ৫টি, মগদের ২১টি ও চাকমাদের ২৪টি।
ভাষা ঃ প্রতিটি উপজাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে নিজস্ব ভাষা।
সংস্কৃতি ঃ বাংলা বর্ষের শেষে চাকমা ও মগ উপজাতিদের প্রধান বার্ষিক উৎসব মহামনি মেলা।

অধ্যুষিত, যারা ব্রিটিশ আমলে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। পাকিস্তান হওয়ার পর সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসন বহাল রেখেছিল কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ উত্তর-পশ্চিমের বাসিন্দারা উপজাতি হলেও তারা ধর্মীয় পরিচয়ে ছিল মুসলিম আর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দারা ছিল অমুসলিম। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিফলন এভাবেই ঘটেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অমুসলিম জনসংখ্যার অস্বাভাবিক স্ফীত অনুপাত পাকিস্তান সরকারের জন্য প্রথম থেকেই মাথা ব্যথার কারণ ছিল। তারা জানত পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নেতারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি সহজভাবে গ্রহণ করেননি। ষাটের দশকে উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে পাকিস্তান প্রথম থেকেই বৈরী নাগা মিজোদের সমর্থন দিয়ে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চীন ভারত যুদ্ধের পর ভারতকে জব্দ করার জন্য চীনও এদের সমর্থন দেয় এবং পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। একই সময়ে আসামের 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলনের ফলে বিতাড়িত অনেক বাঙালী। যারা তিরিশ ও চল্লিশের দশকে পূর্ববাংলা থেকে সেখানে গিয়েছিল, তাদের একটি বড় অংশ ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ষাটের দশকের শুরুতে এদের অনেককে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এটি ছিল পার্বত্য

চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। '৪৭-এ পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র তিন ভাগ, '৭০-এ তা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা পনেরো ভাগে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক ছাউনি স্থাপনের কাজও ষাটের দশকের প্রথম ভাগে আরম্ভ হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। ক) পূর্ব ভারতের বিদ্রোহী নাগা মিজোদের সামরিক প্রশিক্ষণ, খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ভিতর যাতে অনুরূপ বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং গ) সদ্য বসতি স্থাপনকারী বাঙালী মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান।

ষাটের দশকের শুরুতে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের ভিতর আরেক বিক্ষোভের জন্ম দেয় কাপ্তাই বাঁধ। এই বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আবাদী জমির ৪৫ ভাগ কাপ্তাই হ্রদের নিচে তলিয়ে যায় এবং পাহাড়ী সম্প্রদায়ের ১ লাখ মানুষকে ভিটেহারা হতে হয়। চাকমা রাজার প্রাসাদও তলিয়ে গিয়েছিল কাপ্তাই হ্রদের গভীরে। জমিজমা ও ভিটেমাটি হারা প্রায় ৪০ হাজার চাকমা ভারতে চলে যায়। এখনও তারা অরুণাচল প্রদেশে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে, তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। প্রায় ২০ হাজার চাকমা তখন আশ্রয়ের জন্য বার্মা চলে গিয়েছিল। বাকিরা সরে গিয়েছিল আরও দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়। কাপ্তাই বাঁধ এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্টি করেছে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা।

পাকিস্তান সরকার ভারতকে সব সময় গণ্য করেছে শত্রু রাষ্ট্র হিসাবে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের জন্য অসীম প্রাপ্তি হলেও পাকিস্তান ও পাকিস্তানপ্রেমীদের জন্য তা ছিল পাকিস্তানের প্রতি চরম শত্রুতামূলক আচরণ। মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, ভারত পরিগণিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রধান মিত্র হিসাবে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈরী নাগা মিজোদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন স্বতন্ত্র জাতিসত্তা তাদের স্বীকৃতি এবং স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু তা উপেক্ষিত হলে নতুন পর্যায়ে বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। আওয়ামী লীগের শাসনকালেই গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, যার নেতৃত্বে ছিলেন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

'৭৫-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে পাকিস্তানপন্থীরা ক্ষমতা দখল করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার গুরুতর অবনতি ঘটে।

জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসেই পূর্ব ভারতের বৈরীদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার নদীভাঙ্গা, ভিটাহারা সাধারণ মানুষদের এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজ আরম্ভ করেন সুপরিকল্পিতভাবে। জিয়ার এই পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানী শাসকদের সাম্প্রদায়িক নীতির অন্ধ অনুসরণ, কারণ দুস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের কথা বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে কোনও দুঃস্থ হিন্দু, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ বাঙালী-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যারা গেছে তারা সবাই ছিল মুসলমান। কারণ মুসলমানদের দ্বারা যত সহজে পাহাড়ীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

জেনারেল জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে বাংলাভাষী মুসলমানের স্বার্থরক্ষা, চূড়ান্ত পর্যায়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং তা নিছক সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, যার সঙ্গে দরিদ্র মেহনতি মুসলমানদের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। জেনারেল জিয়ার সরকার ও প্রশাসনের নীল নকশা অনুযায়ী সমতল থেকে আসা দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানরা সহজেই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার শিকার হয়েছে এবং পাহাড়ী সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর হামলা করেছে।

সরকারী নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে শান্তি বাহিনীর জন্ম হয় জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা হিসাবে। তারা সরকারী বাহিনী ও বহিরাগত বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করে। অত্যাচারিত ও বিক্ষুব্ধ পাহাড়ী তরুণরা দলে দলে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ভারতও জেনারেল জিয়ার পাকিস্তানী নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সামরিক সাহায্য ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। শান্তিবাহিনীর একটি অংশের নেতা প্রীতিকুমার চাকমা '৮৩ সালে জনসংহতির নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বাঙালী বিরোধ ও সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে। সরকারী বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সদস্য ছাড়াও প্রচুর নিরীহ পাহাড়ী ও বাঙালী এর ফলে প্রাণ হারিয়েছে, যাদের ভিতর শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর সংখ্যাও কম নয়। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালী, সামরিক-বেসামরিক সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জিয়াউর রহমান পাকিস্তানী জেনারেলদের মতো বিশ্বাস করতেন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায়। এই ধারণা থেকেই পাকিস্তানের মূর্খ

জেনারেলরা বাংলাদেশে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাত করে দিতে চেয়েছিল। জেনারেল জিয়া একই ধারণা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে লক্ষাধিক সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করেও পাঁচ/সাত হাজার শান্তি বাহিনীর তৎপরতা এতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সৈন্যরা রাতের বেলা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে বেরোতে পারেনি, দিনের বেলায়ও নির্দিষ্ট এলাকার ভিতর চলাফেরা করতে হয়েছে।

বলতে গেলে ক্যান্টনমেন্ট ও সামরিক ক্যাম্পগুলোর কাছাকাছি এলাকার বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ দুর্গম বনাঞ্চল ছিল শান্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। বনে যারা কাঠ কাটতে গেছে, তাদের নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতে হয়েছে শান্তিবাহিনীকে। এমনকি শহরের বসিন্দাদেরও আয় ও পেশা অনুযায়ী শান্তিবাহিনীকে চাঁদা দেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও এর বাইরে ছিলেন না। জেনারেল জিয়ার পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে একই নীতি অব্যাহত রেখেছেন বরং তাঁর সময়ে নির্যাতন ও সংঘর্ষের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সামরিক বাহিনী ও বহিরাগত বাঙালীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে '৭৯ সাল থেকে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর ফলে জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবলী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণের সুযোগ লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব বেসরকারী সাহায্য সংস্থা কাজ করত তারাও পাহাড়ীদের ওপর সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিষয়ে দাতা দেশসমূহের কাছে রিপোর্ট করে। এর ফলে ১৯৮৩ সাল থেকেই 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল', 'এন্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল', নেদারল্যান্ডের অর্গানাইজিং কমিটি 'চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস ক্যাম্পেইন', ডেনমার্কের 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস এ্যাফেয়ার্স', 'পার্লামেন্টারি হিউম্যান রাইটস গ্রুপ', ইংল্যান্ডের 'সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল'সহ বহু প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামরিক নির্যাতনের বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং বিপন্ন উপজাতীয়দের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের কাছে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর নিয়মিত তথ্য ও প্রতিবেদন পাঠানো আরম্ভ করে। সেই সময় আইএলও এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য বাংলাদেশে

এসেছিলেন কিন্তু সরকারের অসহযোগিতার ফলে তাঁরা কোন তদন্ত করতে পারেননি। এর ফলে আন্তর্জাতিক ফোরামে এবং দাতা দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়।

মূলত দাতা দেশসমূহের চাপে এরশাদ সরকার এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। '৮৫ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কোপেনহেগেনে ডেনিশ পার্লামেন্টের এক বৈঠকে বলেন, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মিশনকে স্বাগত জানাবে। দশ মাস পর আমস্টার্ডামে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেখানকার ঘটনাবলী তদন্ত করে দেখার জন্য একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর চার বছর পর 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস' গঠন করা হয়, যার যুগ্ম চেয়ারপার্সন ছিলেন কানাডার অধ্যাপক ডগলাস স্যান্ডার্স এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলফ্রেড টেলকেম্পার। এছাড়া এই কমিশনে অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্কের অধ্যাপক, আইনজীবী, সমাজকর্মী ও সংসদ সদস্যবৃন্দ ছিলেন। এই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। '৯০-এর ১৫ নবেম্বর থেকে '৯১-এর ২ জানুয়ারি পর্যন্ত কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির এবং তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁরা প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সফরের আয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী তাঁদের যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করলেও নিজেদের কার্যকলাপের পক্ষে সন্তোষজনক যুক্তি বা তথ্য তারা প্রদান করতে পারেননি। ফলে কমিশনের রিপোর্ট সাধারণভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে গেছে।

আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক এবং জনসংহতি সমিতির ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। জনসংহতির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাকে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে সহজেই বোঝাতে পেরেছিলেন '৪৭-এর পর থেকে তাঁরা কিভাবে সরকারের বৈরী আচরণের শিকার হয়েছেন, কিভাবে ধাপে ধাপে তাঁদের ওপর শোষণ-পীড়নের মাত্রা বেড়েছে। শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যক্রম, নিরীহ বাঙালীদের ওপর হামলা, হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে দেখা হয়েছে সরকারী হামলা ও ধারাবাহিক নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের হত্যার বিষয়টিও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের সহানুভূতি লাভ করেনি।

আন্তর্জাতিক চাপ ছাড়াও জেনারেল এরশাদের সরকার এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া জেনারেল জিয়ার অপর যে নীতিনিষ্ঠার সঙ্গে এরশাদ অনুসরণ করছিলেন–পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী মুসলমান জনসংখ্যার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি তাও মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে। জিয়া ও এরশাদের আমলে এই জনসংখ্যার হার ১৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২-এ উপনীত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই দখল করেছিল শরণার্থী হয়ে ভারতের চলে যাওয়া পাহাড়ীদের জমি। অনুপস্থিত পাহাড়ীদের জমি দখল করা বহিরাগত বাঙালীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল প্রশাসনিক সহযোগিতার কারণে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী সম্প্রদায়ের ব্যাপক অভিপ্রয়াণ শুরু হয়েছিল '৭৬ সাল থেকে এবং এরপরই পরিকল্পিত অভিবাসন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এরপর যখনই ভূমি জরিপ হয়েছে তখনই অনুপস্থিত পাহাড়ীদের জমি সরকারের খাস হয়ে গেছে এবং বাঙালীদের নামমাত্র মূল্যে এই জমির বন্দোবস্ত দিয়েছে।

জেনারেল আইয়ুর থেকে আরম্ভ করে জেনারেল এরশাদ পর্যন্ত চার জেনারেলের ২৬ বছরের রাজত্বকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ ও ঔপনিবেশিকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার পক্ষে সরকারের বিবেচনা ও যুক্তি হচ্ছে–ক) এই অঞ্চলে অমুসলিম জনসংখ্যার বিপুল উপস্থিতি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামী পরিচয় ও সংহতির জন্য বিপজ্জনক, খ) ভারত যে কোন অজুহাতে এই অঞ্চল দখল করে নিতে পারে, গ) সরকারের প্রতি উপজাতীয় নেতাদের মনোভাব নেতিবাচক, ঘ) সমতলের বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য তুলনামূলকভাবে জনবিরল পার্বত্য এলাকায় জনসংখ্যা স্থানান্তর প্রয়োজন, ঙ) যে কোন রকম বিদ্রোহী ধারণা বা কর্মকাণ্ড দমন, চ) সমতলের কোন বিপ্লবী বা বাম কর্মকাণ্ড পার্বত্য এলাকাকে পশ্চাৎভূমি হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে তা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি। এইসব বিবেচনার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন ছিল, যার জন্য সরকারকে এই অঞ্চলের প্রতি ঔপনিবেশিক আচরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। সরকারের এই নীতি যে মোটেই কার্যকর ছিল না তার প্রতিফলন ঘটেছে এরশাদ আমলে সূচিত শান্তি আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণের ভিতর। '৮৫ সালে জনসংহতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রথমে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধির আলোচনা হয়। পরে '৮৭ সাল থেকে এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের নেতৃত্বে সরকারের সঙ্গে জনসংহতির নেতৃবৃন্দের ছয় দফা বৈঠক হয়। এই বৈঠকের ফলশ্রুতি হিসাবে '৮৯ সালের ২ মার্চ 'পার্বত্য জেলাসমূহ আইন ১৯৮৯' এবং ৬ মার্চ 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন' ১৯৮৯ পাস হয়।

এতে সীমিত পরিমাণে হলেও পাহাড়ী উপজাতিসমূহের স্বীকৃতি, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ, তাদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান এবং বহিরাগতদের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট এলাকায় জমি ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবেই পাহাড়ী সম্প্রদায়ের দাবিসমূহ আংশিকভাবে হলেও সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে।

এই আইন ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাছাড়া আলোচনার সময় সরকারী প্রতিনিধিরা বলেছিলেন পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী সামরিক ক্যাম্প তুলে নেয়া হবে। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ফলে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ এই আইনকে 'লোক দেখানো' ও 'ধাপ্পাবাজি' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের আরও কারণ ছিল যখন সরকারের সঙ্গে তাদের আলোচনা চলছে তখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন না কোন এলাকায় সামরিক হামলা হয়েছে। যার ফলে সবার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এরশাদ সরকার মুখে আলোচনার কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে তার উল্টোটি করেছে।

এরশাদ সরকারের এই দ্বিমুখী নীতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে '৯১-এর নির্বাচনে বিজয়ী খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার। '৯০ তেও নির্বাচনী প্রচারণার সময় চট্টগ্রামের জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করবে। তাঁর দলের অতীত আচরণ ও সাম্প্রদায়িক চরিত্রের কথা পাহাড়ী নির্বাচকমণ্ডলীর অজানা ছিল না। '৯১-এর নির্বাচনে তারা বিএনপিকে ভোট না দিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে এবং তিনটি পার্বত্য জেলাতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়কে খালেদা জিয়া সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। ক্ষমতায় গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্তি প্রয়োগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু জিয়ার আমলে যা সম্ভব ছিল পরে যে তা সম্ভব নয়–এই সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। এরশাদের আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক নির্যাতনের বিষয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার উদ্বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খালেদা জিয়ার পক্ষে এই জনমত ও চাপ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁর সরকারকেও জনসংহতির সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়েছে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্ত করার কথা বলে। '৯২-এর অক্টোবর থেকে যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অব) অলি

আহমেদের নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি জনসংহতির সঙ্গে ছয় দফা বৈঠক করে এবং এরপর সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে গঠিত উপকমিটির সঙ্গে জনসংহতির সাত দফা বৈঠক হয়। শরণার্থীদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী সামরিক ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের প্রশাসনিক স্বীকৃতি পর্যন্ত সরকারপক্ষ সম্মত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা জমির উপর পাহাড়ী আদিবাসীদের দাবি সংবিধানের দোহাই দিয়ে উপেক্ষা করা হয়।

এরশাদের মতো খালেদা জিয়ার সরকারেরও এই আলোচনা প্রয়াস ছিল লোক দেখানো, কারণ আগের মতোই আলোচনা চলাকালীন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের ওপর হামলা হয়েছে। হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, গ্রেফতার ও নারী-ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটেছে। এরশাদের মতো খালেদা জিয়ার সরকারও আলোচনা করেছিল পশ্চিমের দাতা দেশ ও সংস্থাদের সন্তোষ লাভের জন্য–প্রকৃত অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।

'৯১-এর মতো '৯৬-এর নির্বাচনে পাহাড়ী নির্বাচকমণ্ডলী আবারও আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে একই আশায়–আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। অতীতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমস্যা উপেক্ষিত হয়েছে এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বিক্ষোভ দমনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতার কারণে আওয়ামী লীগকে এবার শান্তি আলোচনায় অধিকতর সতর্কতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে, যাতে এই আলোচনা অতীতের মতো ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। পাহাড়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দও উপলব্ধি করেছেন বিএনপি ও জাতীয় পার্টির তুলনায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা অধিকতর ফলদায়ক হবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে সামরিক বাহিনীর ভিতরও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর যে সব জেনারেল এতকাল মনে করতেন সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামকে শান্ত বা পাহাড়ীদের শায়েস্তা করা সম্ভব তাঁরাও পরিবর্তিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করছেন যে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার বর্তমান উদ্যোগ আরও সহজ হয়েছে–যখন আইকে গুজরাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখনই বলেছিলেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে ভারতকেই উদ্যোগী এবং নমনীয় হতে হবে; প্রয়োজন হলে কিছু ছাড়ও দিতে হবে। গুজরালের এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে এবং তার এই অবস্থানকে

বিশেষভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'গুজরাল ডকট্রিন' হিসাবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারত ও বাংলাদেশের শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে–এই দুই বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। এর ফলে বাংলাদেশে নাগা মিজোদের যেমন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে, ভারতেও শান্তিবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে জনসংহতি ও শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দও এবার শান্তির আলোচনা সম্পর্কে প্রথম থেকেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটলে ১৩ নবেম্বর '৯৭ তারিখে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে অশান্তির আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনে একাত্তরে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার দালাল জামায়াতে ইসলামী ও অপরাপর পাকিস্তানপন্থী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দলগুলোকে বিএনপি সঙ্গে নিয়েছে। বিএনপি এবং তাদের সহযোগীদের বক্তব্য–পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলটি ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে। ভারত পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেবে এই যুক্তিতে তারা সেখান থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে।

জামায়াত-বিএনপি'র এই বক্তব্য যে নির্জলা মিথ্যাচার–এটা যে কোন যুক্তিসম্পন্ন মানুষ অনুধাবন করতে পারবেন। প্রথমত, আজকের বিশ্বপরিস্থিতিতে পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই–হোক না তা চরম শক্তিধর, অন্য কোন দেশ বা দেশের অংশ দখল করা সম্ভব নয়। তাই যদি সম্ভব হতো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরদিন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা তার চরম শত্রু, নিতান্ত দুর্বল কিউবা নামক দেশটিকে কয়েক ঘণ্টার ভিতর দখল করে ফেলতে পারত। দেশ দখল করে রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জমানা বহু আগেই গত হয়েছে। এখন উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে তাদের পণ্যের বাজার খোঁজে। রাজনৈতিক উপনিবেশ নয়, অর্থনৈতিক উপনিবেশ স্থাপন হচ্ছে এখনকার শক্তিধর দেশগুলোর প্রধান প্রবণতা। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি গোটা বাংলাদেশ থেকে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে বিদেশে জাতিসংঘ মিশনে পাঠিয়ে দেয়া হয় তারপরও ভারত বা অন্য কোন দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ওপর হামলার সম্ভাবনা নেই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দু'টি দেশ আজ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বা সমচরিত্রের এক দেশ অপর দেশ দখল করেছে-সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার নজির নেই। বাংলাদেশে ভারতের পণ্যের বাজার নির্বিঘ্ন থাকলে ভারত অন্য কিছু চাইবে না। এই বাজার স্বাধীনতা লাভের পরপরই তৈরি হয়েছে এবং ক্রমশ তা আরও বিস্তৃত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধেও জামায়াত-বিএনপি সোচ্চার। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর বর্তমান ভূমিকায় অবস্থান ও কর্তৃত্ব অটুট থাকলে এই অঞ্চলে কোন দিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যও অনেকের জন্য উদ্বেগজনক। পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধকালীন পরিবেশ নিশ্চয় শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বজায় থাকবে না। যুদ্ধাবস্থা না থাকলে এখন যেভাবে সামরিক বাহিনী সেখানে অবস্থান করছে তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। অথচ বিরোধী দলের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গত সোমবারও (১০ নবেম্বর '৯৭) চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বলেছেন, 'পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রশ্নই আসে না'।

প্রধানমন্ত্রী জানেন কি না জানি না, অতীতে জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকার যখন জনসংহতির সঙ্গে আলোচনা করেছে তখন দুই সরকারই এটা মেনে নিয়েছিল যে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পর্যায়ক্রমে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। এ বিষয়ে জনসংহতির মত ছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস 'তুলিয়া লওয়া'-এর জবাবে বিএনপি সরকারের বক্তব্য ছিল 'এ অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসিলে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আবশ্যক সামরিক ক্যাম্পগুলো ব্যতীত অন্যান্য অস্থায়ী ক্যাম্পগুলি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার হইবে। (আলোচনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের প্রতিবেদন দেখুন, জনকণ্ঠ, ৪ নবেম্বর '৯৭)

একটি দেশে বহির্শত্রুর আক্রমণ, জরুরী অবস্থা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া ক্যান্টনমেন্টের বাইরে সেনাবাহিনীর কোন কাজ থাকতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম বনাঞ্চলে অবশ্য সামরিক বাহিনীকে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের কাজ করতে হয়েছে। কারণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাদের রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে যেভাবে শত শত ক্যাম্প স্থাপন করে সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করছে, নির্বিচারে ম্যালেরিয়া ও সাপের কামড়সহ নানাবিধ রোগের শিকার হচ্ছে, যেভাবে বাজেটের একটি বড় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান দমনের নামে সামরিক কার্যক্রম জারি রাখার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে তা কোন ক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এ বিষয়টি জনসংহতির নেতৃবৃন্দ এবং সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরী হয়ে পড়েছে, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না হলে যা সম্ভব নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির আন্দোলন জারি রাখা একটি সুদূরপ্রসারী রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের অন্তর্গত। এই চক্রান্তে জামায়াত প্রথম থেকে

নিয়োজিত ছিল। এখন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিএনপি ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থী দল। সামগ্রিক পরিস্থিতি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে অনিবার্য করে তুললেও বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীদের তা কোন ক্রমেই কাম্য নয়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে তাদের নৈতিক ও আদর্শিক পরাজয়। এ ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জামায়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানে একটি 'ইসলামিক' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে প্রথম থেকেই তাদের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে চট্টগ্রাম বিভাগকে বেছে নিয়েছে। জামায়াতের অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য ব্যবসার ঘাঁটি হিসাবে এই অঞ্চলটি তাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু জায়গায় যে জামাতের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে বিভিন্ন সময়ে তার বিবরণ জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া, পূর্বে ভারতের বিচ্ছিন্নতাকামীদের সামরিক সহযোগিতা প্রদান বন্ধ হওয়া, যা পাকিস্তানের কাম্য নয় এবং তাদের এদেশীয় সহযোগী জামায়াতেরও কাম্য নয়। এই কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির আন্দোলনে তারা বিএনপি'র কাঁধে ভর করেছে। সম্প্রতি খালেদা জিয়ার সঙ্গে গোলাম আযমের বৈঠকের ফলে বিএনপি'র মুক্তিযোদ্ধারা বুঝে ফেলেছেন জামায়াত আর বিএনপি'র স্বার্থ কিভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে জনমত জরিপেও দেখা গেছে, প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ শান্তি চুক্তির পক্ষে এবং জামায়াত বিএনপি'র অশান্তির আন্দোলনের বিরুদ্ধে। যারা চুক্তির পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আওয়ামী লীগের সমর্থক ভাবার কোন কারণ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সমর্থক নয় এমন নিরীহ বাঙালীও শান্তিচুক্তির পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ অশান্তি অব্যাহত থাকলে শান্তিবাহিনীর হামলায় জামায়াত বা বিএনপি'র কোন নেতা মারা গেছেন এমন তথ্য কারও জানা নেই, প্রাণ দিতে হয় সাধারণ বাঙালি ও পাহাড়ীদের।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখার জন্য আরও হাজার হাজার নিরীহ বাঙালী পাহাড়ীর রক্তের প্রয়োজন হয় জামায়াত-বিএনপি এর সবকিছু করতে প্রস্তুত। স্থানীয় বাঙালীদের তারা প্ররোচিত করেছে এই বলে যে, 'শান্তি চুক্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ীরা তাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা সব দখল করে নেবে', 'এখানে থাকতে হলে পাহাড়ীদের গোলামী করতে হবে', 'সামরিক বাহিনী চলে গেলে শান্তিবাহিনী তাদের কচুকাটা করবে', 'পার্বত্য

চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হয়ে যাবে' ইত্যাদি। এ রকম কথা '৯৬-এর নির্বাচনে জামায়াত ও বিএনপি বলেছিল আওয়ামী লীগ সম্পর্কে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ভারতের '৫৬ লাখ' হিন্দু পরিবার ফিরে এসে তাদের ফেলে যাওয়া ঘরবাড়ি সব দখল করবে এবং বাংলাদেশ ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হবে'।

ভারত হচ্ছে জামায়াত-বিএনপি'র সেই জুজু যা পাকিস্তান আমলে সব সময় দেখানো হতো। বিএনপি'র হাতে এখন অন্য কোন ইস্যু না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির আন্দোলনে জোরে-শোরে নেমেছে। দেশের জাতীয় পরিস্থিতি কিংবা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সবই যে তাদের প্রতিকূলে এটি তারা বিবেচনায় আনছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির এবং এক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটিকে নস্যাত করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত সব সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায় ভবিষ্যতে বিএনপি এবং তাদের সহযোগীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাও তাদের রয়েছে। অতএব একের পর এক জঙ্গী কর্মসূচী দিয়ে যে কোন মূল্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি বজায় রাখার জন্য বিএনপি ও তাদের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী দোসররা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

অন্ধ আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ থেকে জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিএনপি যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেছে, একইভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক জনমতের বিরুদ্ধে। এই আত্মঘাতী রাজনীতির মাসুল বিএনপিকেই দিতে হবে।

সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির একটি গ্রুপও যথেষ্ট সোচ্চার। 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ', 'পাহাড়ী গণপরিষদ' ও 'হিল উইমেন্স ফেডারেশন' মনে করে, সম্ভাব্য শান্তিচুক্তিতে জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। তাদের বক্তব্য–প্রাপ্ত তথ্য মতে জনসংহতি সমিতি তাদের পাঁচ দফা মূল দাবি থেকে অনেক বড় ছাড় দিয়েছে। বাস্তবিক যদি সরকার ও JSS-এর চুক্তি সম্পাদনের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা মানুষের JSS-কে কিছু বলার আছে। নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানার ও প্রশ্ন করার আছে। এভাবে যদি মূল দাবি ছাড় দিয়ে চুক্তি হয়, তাহলে হতভাগ্য পার্বত্যবাসীদের অধিকার কি তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে? মূল দাবি ছাড় দিতেই যদি হবে তাহলে এত বছর এত লোকক্ষয়, এত ধন-সম্পদ ক্ষয় করে কি দরকার ছিল দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম চালানোর? এভাবে যদি চুক্তিই হবে, তাহলে কেন মরীচিকার (?) পিছনে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করে এতগুলো সম্ভাবনাময় তরুণের

ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে তোলা হলো? '৮৯-এর জুনে স্বৈরাচারী এরশাদের প্রবর্তিত "জেলা পরিষদ" ব্যবস্থা থেকে আসন্ন চুক্তি কোন্ দিকেই বা উন্নত? ভূমি অধিকার এবং নিরাপত্তাই যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে অর্ধলক্ষাধিক কি ভরসায় দীর্ঘ এক যুগ বিদেশ বিভুইয়ে মানবেতর জীবন কাটালো? এসব প্রশ্নের উত্তর সরকারের সাথে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠাকারী JSS নেতৃবৃন্দকে দিতে হবে'। (স্বাধিকার, পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপত্র, ১০ জুন, '৯৭) তিন পাহাড়ী পরিষদ যেভাবে চুক্তির শর্তাবলী না জেনে আলোচনাকারী জনসংহতির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং বলছে–জনসংহতি জুম্ম জাতির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চুক্তি করতে যাচ্ছে, একইভাবে বিএনপিও বলছে–এই চুক্তির দ্বারা বাঙালীদের স্বার্থ এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। দুই পক্ষই চুক্তির বিরুদ্ধে, তবে অবস্থান অবশ্যই ভিন্ন। তিন পাহাড়ী সংগঠন জুম্ম জাতির পক্ষে এবং জামায়াত-বিএনপি পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালীদের পক্ষে কথা বলছে বলে দাবি করছে। পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে যে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার সেটি হচ্ছে–এই চুক্তি না হলে কে বা কারা লাভবান হচ্ছে। প্রথমত, শান্তিচুক্তি বা সমঝোতা না হলে গত ২০/২১ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে যুদ্ধাবস্থা জারি রয়েছে তা আগামীতে জারি থাকবে, যার ফলে বিবদমান দুই পক্ষ ছাড়াও পাহাড়ী-বাঙালী নির্বিশেষে নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাবে, ঘরবাড়ি-ভিটামাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হবে। দ্বিতীয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তিকে পুঁজি করে জামায়াত ও তাদের মৌলবাদী সহযোগীরা সেখানে একদিকে যেমন অস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য তৈরি করেছে তা নিরাপদ রাখতে পারবে, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তাদের তালেবানী বিপ্লব ঘটানোর চক্রান্ত অব্যাহত রাখতে পারবে এবং তৃতীয়ত, দুই গণতান্ত্রিক প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকলে শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের কার্যকলাপের ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে যাবে এবং অন্য কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহযোগিতা না পেলে তাদের বিদ্রোহ জারি রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এইসব বিবেচনা থেকে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও শান্তিচুক্তিকে এ কারণেই মেনে নেয়া উচিত যে, এর ফলে ভবিষ্যতে বিরাজমান সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির আন্দোলনে সমতলের মানুষদের সম্পৃক্ত করতে হবে, তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জন করতে হবে–যা যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকলে সম্ভব হবে না। এই চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অপসারণের সুযোগ ঘটবে।

শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। বলা যেতে পারে, এই চুক্তি অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক দূর যেতে হবে, শান্ত পরিবেশেই যা সম্ভব। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যই নয়, বাংলাদেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তা যাতে নিজস্ব পরিচয় ও মর্যাদাসহকারে সমান অধিকার নিয়ে বাস করতে পারে তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অবশ্যই প্রয়োজন। তার জন্য জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনও প্রযোজন। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য শান্তি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার সমাজ গঠন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রয়োজন

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

ক'দিন আগে পাহাড়ী গণপরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত বিকাশ খীসা আসন্ন পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত অসম ও চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনার মধ্যে দিয়ে চুক্তির প্রতি তার সংগঠনেরও সমর্থকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত হয়নি বরং নেতিবাচক আগামীরও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কারণ স্মর্তব্য, জার্মানরা ভার্সাই চুক্তিকে diktat-চাপিয়ে দেয়া চুক্তি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল। অবশ্য শক্তির ভারসাম্যের বিচারে দুর্বল হওয়ার কারণে তাদেরকে এই dictated peace মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে জার্মানদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পিছনে এই চুক্তির অসঙ্গত ধারাসমূহের অবদান ছিল।

কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রসিত বিকাশ খীসার এই তুলনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একাধিক। এক. ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছিল জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করেই। পূর্বনির্ধারিত খসড়া চুক্তি জার্মানির কাছে গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। উত্তর দেয়ার জন্য সময় দেয়া হয়েছিল এক সপ্তাহ, যা বর্ধিত হয়ে তিন সপ্তাহ হয়েছিল। চুক্তি গ্রহণ না করলে জার্মানির বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক আগ্রাসন শুরু করার হুমকি দেয়া হয়েছিল। সুতরাং জার্মানিকে চুক্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল রীতিমতো বাধ্য হয়েই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভার্সাই চুক্তির প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতির সঙ্গে পার্বত্য শান্তি চুক্তির কোন মিল নেই। সেই ১৯৮৫ থেকে পাহাড়ীদের প্রতিনিধি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শান্তি ও চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। বর্তমানে যে

শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে উভয় পক্ষেরই অবদান আছে। চুক্তির খসড়াও উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমেই চূড়ান্ত হয়েছে। কাজেই সম্ভাব্য পার্বত্য চুক্তি ভার্সাই চুক্তির মতো চাপিয়ে দেয়া কোন চুক্তি হচ্ছে না। উপরন্তু ভার্সাই চুক্তি ও চুক্তির মাধ্যমে কার্যকর অবমাননাকর শান্তি মিত্র পক্ষের কাম্য হলেও তা জার্মানির জন্য কাম্য ছিল না। কিন্তু পার্বত্য শান্তি উভয় পক্ষের জন্য প্রচণ্ডভাবে কাঙ্ক্ষিত।

তবে প্রসিত বিকাশ খীসার তুলনামূলক বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, ভার্সাই চুক্তির মতো এই চুক্তিতেও ভবিষ্যত অশান্তির বীজ লুকিয়ে থাকার কথা। ইতিহাসে বলা হয় যে, ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল। বক্তব্যটি অনেকাংশেই সত্য। পার্বত্য চুক্তির বেলায়ও এটা বলা যায় যে, যথার্থ শান্তি চুক্তি না হলেও শান্তির সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি না হলে, ভবিষ্যতে গুরুতর অশান্তির আশঙ্কা থাকবে। অর্থাৎ প্রসিত বিকাশ খীসা এদেশের সিংহভাগ মানুষের মতো যথার্থ শান্তির প্রত্যাশা করছেন। রাজনৈতিক কারণে বিরোধী হওয়া ব্যতিরেকে পার্বত্য শান্তির সপক্ষে এদেশের সব মানুষই।

কেন শান্তি? শান্তির সপক্ষে হাজির করার মতো যুক্তি একাধিক। এক. বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের এই এক-দশমাংশ এলাকা ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকা অনির্দিষ্টকাল অশান্ত থাকলে তা দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। লক্ষণীয় প্রান্তিক এই এলাকাটি ভারত ও মিয়ানমারের অশান্ত সীমান্ত এলাকাসমূহের সন্নিকটবর্তী। বান্দরবান পার্বত্য জেলার কিছু কিছু এলাকায় মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা থেকে অনুপ্রবেশকারী সশস্ত্র হামলাকারীদের তৎপরতা বিগত কিছু দিনে লক্ষ্য করা গেছে। এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে এমনি নাশকতামূলক তৎপরতা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। উপরন্তু এলাকার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে।

দুই. বিগত আড়াই দশকে খুব কম করে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কুড়ি হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। অপরদিকে কাউন্টার ইনসারজেন্সির বর্তমান ব্যয় প্রায় পাঁচ শ' কোটি টাকার মতো। উপরন্তু উন্নয়ন ব্যয় তো আছেই। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে এমনি ক্রমবর্ধমান ব্যয় কত দিন মেটানো সম্ভব? লক্ষণীয়–এই এলাকায় সার্বিক মাথাপিছু ব্যয় বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। এলাকাভিত্তিক এই ব্যয়-বৈষম্য উন্নয়নের জন্য আগামীতে সমস্যার সৃষ্টি করবে, যা থেকে সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিরও আশঙ্কা থাকে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

তিন. অশান্ত পরিস্থিতির আড়ালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান চক্রের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

চার. দেশের সেনাবাহিনী একটি এলাকায় অনির্দিষ্টকাল যুদ্ধাবস্থায় কর্তব্যরত থাকলে প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেনাবাহিনীর ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। ম্যালেরিয়াসঙ্কুল এই এলাকায় সেনাবাহিনীকে ইতোমধ্যেই বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তবে শান্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, শান্তির যে সম্ভাবনা এখন সৃষ্টি হয়েছে তা অতীতে ছিল না বা ভবিষ্যতে হবে কি না সন্দেহ। ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সুতরাং ভারতের সহযোগিতা ও ইতিবাচক ভূমিকা ছাড়া বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে কোন দিনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না বা হবে না। সে কারণেই অতীতে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান ভারত পরিপূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছে। ভারতে সরকার পরিবর্তন হলে, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এবং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হলে শান্তির সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে তা নিয়ে সংশয় আছে। সুতরাং সার্বিক বিচারে শান্তির জন্য এখনই সময়।

ধারণাগত একটি ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এমন ভাবা ভুল। যা ঠিক তা হলো, চুক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়ার সূচনা হবে মাত্র। উভয় পক্ষের সদিচ্ছা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তির প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং তাহলেই ক্রমাগতভাবে শান্তির অন্তরায়সমূহ এক এক করে দূর করে পূর্ণাঙ্গ শান্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। লক্ষণীয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বহুমাত্রিক ও জটিল, যা একটি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে রাতারাতি সমাধান করার আশঙ্কা বাস্তবসম্মত নয়। সুতরাং সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে তাদের মনে রাখা উচিত যে, ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। উপরন্তু এটাও মনে রাখতে হবে–এই চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী মানুষদের জন্য যে অর্জন নিশ্চিত হচ্ছে তা নিয়ে যতই বিতর্ক থাক না কেন, তা যে সশস্ত্র সংগ্রাম সত্ত্বেও অতীতে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই বর্তমানের অর্জনের (বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সামান্য হলেও) ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে অর্জনের ব্যাপ্তি ঘটানো সম্ভব হবে।

কিন্তু বর্তমানের শান্তিকে প্রত্যাখ্যান করলে ভবিষ্যতে শান্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত হবে। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি কোন কিছু অর্জনের পরিবর্তে হারিয়েছিল অনেক কিছু।

এমনকি ১৮৭০-এ একত্রীকরণের মাধ্যমে বিসমার্ক যে বিশাল জার্মান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিলেন তাও ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ছোট করে ফেলা হয়েছিল। অর্থাৎ জার্মানির ভূখণ্ড কেড়ে নিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। অপরদিকে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ী মানুষ হারাচ্ছে না কিছু। শুধু কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির তালিকা থেকে সাময়িকভাবে কিছু বাদ পড়ছে, কিন্তু ভবিষ্যত প্রাপ্তির সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় থাকছে। যেমন ভার্সাই চুক্তির অনেক অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য দূর করা হয়েছিল ১৯২৫-এ জার্মানির চ্যান্সেলর গুস্তাভ স্ট্রেসেম্যানের প্রস্তাব অনুযায়ী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সম্মতিসাপেক্ষে স্বাক্ষরিত লুকানো চুক্তিসমূহের (একাধিক চুক্তি ছিল) মাধ্যমে। কিন্তু পরিপূর্ণ লক্ষ্য আগ্রাসী পন্থায় অর্জন করতে গিয়ে হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিলেন।

সুতরাং এমন শান্তির সম্ভাবনাকে দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও রাজনীতিনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খালেদা জিয়া

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

আদিবাসী কৃষকদের সঙ্গে জমির সম্পর্ক, জমির ওপর অধিকারের সম্পর্ক, জমি ব্যবহারের সম্পর্ক পাকিস্তানের কলোনীকাল থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালী জনসমষ্টির মধ্যে এবং বাঙালী জনসমষ্টির পরপারে আদিবাসীদের বসত আছে। গারো পাহাড় এলাকায় হাজং, মধুপুর এলাকায় বুনো, উত্তরবঙ্গ এলাকায় সাঁওতাল ও রাজবংশী, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় চাকমা, ত্রিপুরা, মুরুং ও অন্যান্য জনসমষ্টি। এ সকল জনসমষ্টি জমির সঙ্গে যে সম্পর্ক তৈরি করেছে, জমির ওপর নিজেদের অধিকারের যে ধারণা তাদের আছে, জমি ব্যবহারের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, এ সকল সম্পর্ক ও ধারণা কলোনীর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও কলোনীউত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়নি। যেক্ষেত্রে কলোনী ও কলোনীউত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থায় কৃষক জনসমষ্টির সঙ্গে জমির সম্পর্ক একমাত্রিক, সেক্ষেত্রে কলোনী ও কলোনীউত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টির সঙ্গে জমির সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা তৈরি করেছে। কলোনীকালে হাজং বিদ্রোহ, জিরাতিয়া প্রজা বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনের অন্তর্গত সাঁওতাল বিদ্রোহ জমি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের একমাত্রিক ধারণার সঙ্গে আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টির বহুমাত্রিক ধারণার সংঘাতের বিভিন্ন নজির। কলোনীউত্তর কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টির জমি সম্বন্ধে বহুমাত্রিক ধারণার

সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। এ দ্বন্দ্ব উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতির দ্বন্দ্ব। কলোনীকাল ও কলোনীউত্তর রাষ্ট্র উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন পদ্ধতিকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করেছে, সে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা কলোনীকালের আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় ও কলোনীউত্তর আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি। কলোনীয়াল ও কলোনীউত্তর রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎপাদন সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করেছে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির সঙ্গে রাষ্ট্রের খাজনা আদায়কারী ব্যবস্থার সম্পর্কের মধ্যে এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করেছে লাঙ্গল কিংবা যান্ত্রিক চাষাবাদ ও শ্রম ব্যবহারের সঙ্গে। কলোনীয়াল ও কলোনীউত্তর সময়ে আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টি জমির ওপর ব্যক্তির চূড়ান্ত মালিকানার ধারণা গ্রহণ করেনি, জমির ওপর কমিউনিটির অধিকার এবং একই সঙ্গে ব্যক্তির অধিকার পরস্পর প্রবিষ্ট ঃ এই ধারণার মধ্যে জীবনযাপন করেছে, জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের পাশাপাশি জমিতে সৃষ্ট অরণ্যের ওপর ভোগ দখলের ধারণার মধ্যে বসবাস করেছে এবং লাঙ্গল পদ্ধতির পাশাপাশি জুম পদ্ধতি, শিকার পদ্ধতি ও আরণ্যক জীবন পদ্ধতি জমির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ সকল ধারণা ও উৎপাদন পদ্ধতি স্বীকার করেনি কিংবা উপেক্ষা করেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রবণ জনসমষ্টি আদিবাসী কৃষকদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে অধস্তন অবস্থানের সুযোগ নিয়েছে, প্রবঞ্চনা করেছে ও শোষণ করেছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে প্রবল জনসমষ্টির সঙ্গে আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টির বৈরিতার সম্পর্ক, কোন কোন ক্ষেত্রে এই বৈরিতা সশস্ত্র সংঘাতের আকার নিয়েছে। প্রবল জনসমষ্টির অন্য নাম বাঙালি জনসমষ্টি, অধস্তন জনসমষ্টির নাম অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ঃ হাজং, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পাহাড়ী।

২

কলোনীকালের সাবেক পূর্ববাংলা থেকে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত ভূমিস্বত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হচ্ছে জমিদারী উচ্ছেদ আইন। এই আইনের ফলে ঃ ১. রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির জমি সম্পর্কিত মালিকানা নির্দিষ্ট হয়, ২. ব্যক্তির নির্দিষ্ট অংকের খাজনার বিনিময়ে জমির ওপর ভোগদখলের স্বত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ৩. রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যকার মধ্যস্বত্ব লুপ্ত হয় এবং ৪. জমির ওপর ব্যক্তির চূড়ান্ত মালিকানা স্থিরীকৃত হয়। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে আদিবাসী কৃষকদের জমি সম্পর্কে ধারণা ঃ জমিতে একই সঙ্গে কমিউনিটির অধিকার ও ব্যক্তির অধিকার পরস্পর প্রবিষ্ট, এই ধারণার নিষ্পত্তি হয়নি। সেজন্য জমিদারী উচ্ছেদ আইনের মাধ্যমে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করেছে আদিবাসী কৃষক সম্প্রদায়।

৩

সাবেক পূর্ববাংলার সর্বত্র জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা এই উচ্ছেদ আইনের আওতার বাইরে রেখে দেয়া হয়। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জমিদারী প্রথা থেকে যায় (রাজারা জমিদারই), রাজারা ট্যাক্স আদায় করেন ও ট্যাক্সের একটা অংশ নিজেদের কাছে রেখে বাকি অংশ রাষ্ট্রকে দিয়ে থাকেন। অন্যপক্ষে ১৯১৯ ভারত শাসন আইন মোতাবেক জমিদার ও গ্রাম সমাজের ওপর অর্পিত প্রথাগত বিচার ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমিস্বত্ব ও প্রশাসনিক ভুবনে কিছু সমস্যার নিষ্পত্তি না করে রেখে দেয়া হয়। প্রথম সমস্যা হচ্ছে ঃ জমি একই সঙ্গে কমিউনিটির অধিকার ও ব্যক্তির অধিকারের পাশাপাশি জমিতে ব্যক্তিক মালিকানাবোধ; দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক উপস্থিতির মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেসী ও পুলিশের অধিকতর আধিপত্যর পাশাপাশি জমিদারদের/গ্রাম সমাজের দুর্বল বিচার ব্যবস্থা; তৃতীয়ত সিভিল শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিপরীতে গ্রামাঞ্চলে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার উপস্থিতি কাঠামোগতভাবে দুর্বল; এবং চতুর্থত এই সিভিল শাসন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত অর্থে শাস্তিদাতা হচ্ছে রাষ্ট্রের ম্যাজিস্ট্রেসী ও পুলিশ বিভাগ ও এই শাসন ব্যবস্থায় জমিদার কিংবা রাজারা হচ্ছেন একটি মধ্যবর্তী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা মূলত ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এই ব্যবস্থায় রাজা কিংবা জমিদারদের ওপর অর্পিত বিচার বিভাগের কাজ ন্যূনতম ও ভূমিস্বত্ব ক্ষেত্রে আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যার ক্ষমতা দারুণভাবে সীমাবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে জমিদার কর্তৃত্বের বিচারমূলক ভূমিকা ও সাধারণভাবে সামাজিক বিবাদ ও বিশেষ ভূমি ও ভূমি খাজনা সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা ক্রমাগত গৌণ হয়ে যায় এবং এই কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা। সেজন্য ভূমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিগুলোর ব্যাখ্যা, সতর্কীকরণ এবং কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলী উৎসে পরিণত হয় ম্যাজিস্ট্রেসী ও জমিদার কিংবা রাজাদের বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব কার্যত হ্রাস পেয়ে যায়। এর অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে জমিদার কিংবা রাজাদের বিচার ব্যবস্থার স্তর প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন হওয়া। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলার প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে জমিদার কিংবা রাজাদের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম ভারসাম্য রক্ষাকারী ক্রিয়াকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। অন্যপক্ষে এইসব সংস্থায় নির্বাচনমূলক নীতির প্রসারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহারিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এভাবেই স্থানীয় সরকারের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ একটি বিতর্কে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে।

৪

পাকিস্তানের কলোনীকাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'টি বড় পপুলেশন মুভমেন্ট ঘটে। প্রথমটির সূত্রপাত হয় ষাটের দশকে। ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বঙ্গালখেদা আন্দোলনের ফলে বিপুল সংখ্যক বাঙালি কৃষককে আসাম রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কৃষক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা থেকে আসামে চলে যায় জমির সন্ধানে। সাবেক পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তান সরকার আসাম থেকে বহিষ্কৃত এসব কৃষককে বসতের অনুমতি দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়। এসব কৃষক দক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনসমষ্টি এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছনে হটে যায়। এসব কৃষক, প্রধানত রাষ্ট্রের সাহায্যে জমির ওপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। জমির ক্ষেত্রে কমিউনিটির অধিকার ও ব্যক্তির অধিকার একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ঃ এই বোধ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত না হওয়ার দরুন ও জমির স্বত্ব ব্যাখ্যা করার অধিকার ম্যাজিস্ট্রেসীর ওপর অর্পিত হওয়ার দরুন বাঙালি কৃষক অধিকতর সুবিধা পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ী জনসমষ্টির আবাদযোগ্য জমি হ্রদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং পাহাড়ী জনসমষ্টি অ-আবাদযোগ্য জমিতে বসত নির্মাণে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় পপুলেশন মুভমেন্ট ঘটে ১৯৭৫ পরবর্তী জিয়াউর রহমানের প্রথম সামরিক আমলে। প্রধানত ফেনী অঞ্চলের কৃষকরা সরকারের সাহায্যে খাগড়াছড়ি এলাকায় বসত স্থাপন শুরু করে। এর ফলে শুরু হয় জমির অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের তীব্রতা। এই লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধির দরুন জিয়াউর রহমানের সামরিক ব্যবস্থা তিনটি স্ট্র্যাটেজী গ্রহণ করে। প্রথম হচ্ছে ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সামরিকীকরণ, দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ বাঙালি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বসতি বৃদ্ধি, তৃতীয় হচ্ছে ঃ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট করা, অর্থাৎ বাঙালিদের তুলনামূলকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তোলা।

৫

ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর সামরিক শাসককালে এই স্ট্র্যাটেজী পার্বত্য চট্টগ্রামে তৈরি করে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে ও বিপরীতে মতাদর্শগত লড়াইয়ের ভিত্তি তৈরি করেছে। সেজন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদ পরস্পরবিরোধী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল দু'টি উপাদান। প্রথমটি হচ্ছে ঃ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী এক মতাদর্শ। দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ বাঙালি

জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য বহুত্ববাদী এক সমাজ নির্মাণ। বহুত্ববাদী সমাজ সংখ্যালঘিষ্ট জনসমষ্টির সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী। সে জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য একপক্ষে বহুত্ববাদী সমাজ নির্মাণ ও অন্যপক্ষের সংখ্যালঘু বিভিন্ন আদিবাসী কৃষকদের জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৬

জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের আগ্রাসন ও সামরিকতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ তৈরি করেছেন এবং অন্যপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। পাহাড়ী জনসমষ্টি কিংবা আদিবাসী কৃষক, জনসমষ্টি যে অঞ্চলের বাসিন্দা সেই অঞ্চলে তাদের জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী এবং ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত যে এক রৈখিক আইন জমিদারী উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে, সে আইনের সংশোধন করে আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টির সমস্যার সমাধান করা দরকার। এ দু'টি প্রয়োজনীয় উপাদান বাঙালিদের আগ্রাসন উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদে কার্যকর নয়, বরং শোষণ শক্তিশালী। এই ফ্রেমের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সামরিক সমাধানের অর্থ ঃ ১. সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, ২. এই বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় ঃ দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় এবং ৩. সিভিল সমাজের বিপরীতে সামরিক সমাজের প্রভাব বৃদ্ধির পরোক্ষ কৌশল।

৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ বাংলাদেশের সর্বত্র শান্তির প্রসারণ। দেশের এক অংশে যুদ্ধাবস্থা টিকিয়ে রেখে দেশের বাকি অংশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার অর্থ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডে ১. এথনিক সমস্যা সমাধানের পথে পদক্ষেপ নেয়া, ২. উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তি প্রসারিত করা, ৩. সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির বদলে মানবসম্পদ উন্নয়নের খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব করে তোলা, ৪. উন্নয়নকে এই অঞ্চলের প্রধান এজেন্ডায় পরিণত করা এবং ৫. এথনিসিটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা।

৮

বিএনপির স্ট্র্যাটেজী এ ক্ষেত্রে আত্মঘাতী, বৈরী ও জঙ্গী। বিএনপির স্ট্র্যাটেজীর অর্থ হচ্ছে ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে সামরিকতার ফ্রেমের মধ্যে রেখে দেয়া, ২. বাঙালি আগ্রাসনকে শক্তিশালী করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী কৃষক জনসমষ্টিকে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু করা, ৩. সামরিকতা ও বাঙালি আগ্রাসনকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে সামরিক খাতে স্থায়ীভাবে

বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা, ৪. সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে একপক্ষে জনসাধারণের জীবনের মান অনবরত নিচু করে আনা ও অন্যপক্ষে সামরিক সমাজকে তুলনামূলকভাবে সিভিল সমাজের বিপরীতে শক্তিশালী করা এবং ৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃত্ব ও অংশীদারিত্বের বদলে 'অদৃশ্য' ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রাধান্য দেয়া। বিএনপির এই স্ট্র্যাটেজীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে যুক্ত এখন জামায়াত।

৯

খালেদা জিয়া এই মৈত্রীর পক্ষ থেকে এই স্ট্র্যাটেজীর মুখপাত্র হিসাবে চট্টগ্রামে এক ঘোষণা দিয়েছেন (দৈনিক জনকণ্ঠ-১২.১১.৯৭)। তিনি বলেছেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকার যে চুক্তি করতে যাচ্ছে তা সংবিধানবিরোধী। চুক্তি হলে দেশের এক-দশমাংশ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

জাতি হারাবে কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প, কর্ণফুলী পেপার মিল, রাউজান তাপকেন্দ্র। এর আগে তিনি বলেছেন, এই চুক্তি হলে ফেনী পর্যন্ত ভূভাগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একই দিনে ১২.১১.৯৭ তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের এক জবাবে বলেছেন, চুক্তি তিনি পড়েননি। চুক্তির মধ্যে কি আছে তিনি জানেন না। না জানার ভিত্তিতে তিনি খালেদা জিয়া, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন এক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি রক্ত চান, বুঝি, কিন্তু কার রক্ত? তিনি যুদ্ধ চান, বুঝি, কিন্তু শান্তি নয় কেন? চারটি জন্ম তারিখ নিয়ে তিনি চারবার জন্মেছেন, এই অর্থে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে উঁচু। সাধারণ মানুষ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বোঝে। খালেদা জিয়া কি জানাবেন তিনি কখন সত্য বলেন এবং কখন সত্য বলেন না।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭
শান্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রথম শান্তিচুক্তি
সম্পাদিত হয় ১২ বছর আগে

মনিরুল ইসলাম মনু, বান্দরবান থেকে : পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'যুগ স্থায়ী সশস্ত্র উপজাতীয় আন্দোলন নিরসনকল্পে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে, শান্তিবাহিনীর সাথে স্বাক্ষরিত এটি প্রথম শান্তি চুক্তি নয়। এক যুগ আগে এ ধরনেরই একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এরই ভিত্তিতে বিদ্রোহ নিরসনের প্রতীকী প্রকাশ হিসাবে শান্তিবাহিনীর ২৩৩ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। ঐ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক একযুগ পরে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল ঐ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সরকার পক্ষে 'গ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক ও তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি মে. জেনারেল নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে আরও ১১ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে হরিকৃষ্ট চাকমা বা মেজর বিদ্যুতের নেতৃত্বে শান্তিবাহিনী প্রীতি গ্রুপের জন্য ৫ জন কর্মকর্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বর্তমানে প্রয়াত বোমাং রাজা (বান্দরবান) মংশৈ প্রু চৌধুরী, প্রাক্তন পানিমন্ত্রী অং শৈ প্রু চৌধুরী, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, রবি ভূষণ চাকমা, তিলক চন্দ্র চাকমা এবং বর্তমানে প্রয়াত শান্তিময় চাকমার স্বাক্ষরও নেয়া হয়েছিল ঐ চুক্তিতে। তিন পৃষ্ঠার টাইপ করা দলিলটি দীর্ঘদিন যাবত এই প্রতিনিধির কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

বেশকিছু দিন যাবত অতি গোপনে সরকারী প্রতিনিধিদল আলোচনা চালানোর পর অজ্ঞাত কারণে আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ঐ সময়। এ অবস্থায় ১২ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে শান্তিবাহিনী প্রীতি গ্রুপের পক্ষ থেকে মেজর পিয়র স্বাক্ষরিত এক পত্রে সংলাপ চালানোর জন্য ৬ সদস্যের কমিটি এবং যোগাযোগ ও মধ্যস্থতার জন্য ৬ জনের তালিকা পাঠানো হয়। ঐ দিনই তৎকালীন জিওসি ও বর্তমানে জ্বালানি মন্ত্রী নুরুদ্দিন খান এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। মূল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৮ ও ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। চুক্তি স্বাক্ষর হয় বৈঠকের শেষ দিন ১৯ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখে। প্রথম দফায় অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান হয় ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে। ঐ অনুষ্ঠানে শান্তিবাহিনীর ২শ' ৩৩ জন সশস্ত্র সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন।

১৮ এপ্রিলের বৈঠকে শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে ১১ দফা সংবলিত দাবিনামা পেশ করা হয়। ঐ দাবিনামার প্রথম দফায় ১৯৭২ সালের পর সকল বাঙালী অনুপ্রবেশকারীকে প্রত্যাহারের শর্ত আরোপ করা হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় এলাকা (Tribal area) ঘোষণা দিতে হবে (৫ম দফা), উপজাতীয়দের বন্দোবস্তীকৃত অথবা দখলকৃত জমিজমা, বাগান বহিরাগতদের দখলে থাকলে তা উদ্ধার করে উপজাতীয়দের ফেরত দান (৩নং দফা), পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা-উপজেলায় ভাগ করা হলেও যেহেতু শান্তিবাহিনী এই অঞ্চলকে একটি একক ইউনিট মনে করে, সে কারণে এ অঞ্চলের জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতায় Regional advisory council বা আঞ্চলিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে। এর প্রধানের পদমর্যাদা হবে মন্ত্রী সমমানের। এই পরিষদের অধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খনিজ সম্পদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ অন্য সকল বিষয় ন্যস্ত করতে হবে (৬নং দফা) এবং গ্রেফতারকৃত শান্তিবাহিনী সদস্যদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

১৯ এপ্রিল যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তাতে সরকার অঙ্গীকার করে যে ১৯৮৪ সালের ২০ এপ্রিলের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল বহিরাগত পুনর্বাসন বন্ধ রাখা হবে এবং অনুপ্রবেশরোধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। উপজাতীয়দের বেদখলকৃত ভূমি একটি শক্তিশালী কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে, শান্তিবাহিনী সদস্যদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে পুনর্বাসিত করা হবে। অন্যান্য বিষয় উচ্চ পর্যায়ে আলোচিত হবে।

২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণকালে শান্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে যে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় "আপনাদের এবং সর্বস্তরের উপজাতীয় জনগণের জানা থাকা উচিত যে স্মারকপত্রের (চুক্তিপত্র) বিতর্কিত বহু প্রশ্নের সমাধান এখনও হয়নি। আমরা আমাদের আন্দোলন বন্ধ করিনি। আন্দোলনের পথ বদলিয়েছি মাত্র।"

বর্তমানে শান্তি চুক্তির বিষয়ে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে, এক যুগ আগে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সাথে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। তবে ঐ সময়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল সেনাবাহিনী। বর্তমানে সরকারের এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। অপরদিকে শান্তিবাহিনীর প্রীতিগ্রুপ এবং বর্তমানে সন্তু বা লারমা গ্রুপ।

শান্তি চুক্তিতে যাঁরা
স্বাক্ষর করেছিলেন

ক। সরকারের পক্ষে

(১) মেজর জেনারেল এম নুরউদ্দীন খান, পিএসসি
(২) ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বিপি, পিএসসি
(৩) কর্নেল দানিয়াল ইসলাম, পিএসসি
(৪) কর্নেল গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান, বিবি, পিএসসি
(৫) জনাব আলি হায়দার খান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার
(৬) লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীর কবির, পিএসসি
(৭) লেঃ কর্নেল মুহাম্মদ ফারুক খান, পিএসসি
(৮) লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ ফজলুল হক
(৯) মেজর এ কাদের
(১০) মেজর শফি মোহাম্মদ মেহবুব,
(১১) মেজর আহমেদ ইমরুল কায়েস
(১২) মেজর মুহাম্মদ শামসুল মাওলা

খ। শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ

(১) মিঃ হরিকৃষ্ট চাকমা (বিদ্যুৎ)
(২) মিঃ নিলিয়ন চাকমা (মেজর পিয়ন্ন)
(৩) মিঃ শান্তিময় চাকমা (মেজর জয়েস)
(৪) মিঃ প্রসন্নকান্তি অংচংখা (মেজর দুর্জয়)
(৫) মিঃ অতুলকল্প তালুকদার (ক্যাঃ রোমেল।
(৬) মিঃ সুখেন্দু বিকাশ চাকমা (ক্যাঃ এলিন)

উপস্থিত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ

(১) মিঃ মং শু চৌধুরী, বোমাং রাজা, বান্দরবান
(২) মিঃ অং শু প্রু চৌধুরী, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী
(৩) মিঃ কল্প চক্র ত্রিপুরা, রামগড়
(৪) মিঃ মনিভূষণ চাকমা, নাইক্ষংছড়ি
(৫) মিঃ তিলকচক্র চাকমা, নানিয়ার চর
(৬) শান্তিময় দেওয়ান, রাঙ্গামাটি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ॥ ঘটনাপঞ্জি
১৯৪৭-১৯৯৭

- ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৮৮১" বাতিল করে।
- ১৯৫৬ সালে অনন্ত বিহারী খীসা ও মৃণালকান্তি চাকমার নেতৃত্বে হিল স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।
- ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৯৯ হাজার ৯শ' ৭৭ জন লোক বাস্তুহারা হয়ে যায়। এতে তলিয়ে যায় চাষযোগ্য জমির ৫৪%।
- ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য এলাকার বিশেষ মর্যাদা বাতিল ও উপজাতি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে।
- ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সরকারের আচরণের কারণে ৫০ হাজার নর-নারী ভারতে ও ৩০ হাজার বর্মায় চলে যায়।
- ১৯৬৫ সালের ১৮ জুন রাঙ্গামাটিতে এমএন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য ছাত্র সমিতি গঠিত হয়।

- ১৯৬৬ সালে অনন্তবিহারী খীসা ও জে, বি লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি কল্যাণ সমিতি।
- ১৯৭০ সালে রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এমএন লারমা আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এমএন লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"।
- ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এমএন লামার নেতৃত্বে জনসংহতির একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে।
- ১৯৭২ সালের ২০ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে ১৪টি গ্রাম লুট হয়।
- ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত হয় শান্তিবাহিনী।
- ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটির জনসভায় চাকমা রাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতায় জড়িত থাকার অভিযোগ এনে পাহাড়ীদের বাঙালী হওয়ার পরামর্শ দেন।
- ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে এমএন লারমা ও চানখোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও জাসদকে পরাজিত করে সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর চারুবিকাশ চাকমা, অনন্তবিহারী বিকাশ চাকমা ও এমএন লারমা বাকশালে যোগ দেন।
- ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্প ও বেতছড়িতে হামলা হয়।
- ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।
- ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই জিয়া সরকার ট্রাইবাল কনভেনশন গঠন করে।
- ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাসদ প্রার্থী উপেন্দ্রলাল চাকমা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অং শোয়ে প্রু চৌধুরী জয়লাভ করেন। উপেন্দ্রলাল চাকমা বর্তমানে শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রধান আর মিঃ চৌধুরী পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন।
- ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক হারে বাঙালী পুনর্বাসন শুরু করে।
- ১৯৮০ সালে সংসদে পার্বত্য এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষণার বিল বাতিল হয়ে যায়।
- ১৯৮০ সালে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করেন। একই বছরের ২৫ মার্চ বাঙালী পাহাড়ী দাঙ্গায় বহু হতাহত হয়।

- ১৯৮১ সালে পুনর্বাসিত বাঙালীদের পাহাড়ে জমি ও টাকা দেয়া শুরু হয়।
- ১৯৮২ সালের ৯ জানুয়ারি ট্রাইবাল কনভেনশন বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে জনসংহতি সমিতির ৮ দিনব্যাপী দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে পার্টি মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
- ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন থেকে শান্তি বাহিনীর অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। একই বছরের ১ অক্টোবর এরশাদ সরকার শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। ১০ নবেম্বর প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হন এমএন লারমা।
- ১৯৮৪ সালের ১৯ জানুয়ারি রাঙ্গামাটির মারিশ্যা এলাকায় শেলওয়েল কোম্পানির ৫ জন বিশেষজ্ঞকে শান্তিবাহিনী অপহরণ করে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের মুক্তি দেয়।
- ১৯৮৪ সালের ১০ মে পার্বত্য এলাকার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৮৪ সালের ৩১ মে বরকলে ১০০ জন অ-উপজাতিকে শান্তিবাহিনী হত্যা করে।
- ১৯৮৪ সালের ২৮ নবেম্বর ২ জন উন্নয়ন বোর্ডের সদস্যকে অপহরণ করে শান্তিবাহিনী।
- ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল প্রীতি গ্রুপ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে।
- ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে পুজগাং-সর্বপ্রথম সরকার ও জনসংহতি বৈঠকে বসে।
- ১৯৮৬ সালের ২৪ মে সরকার সর্বপ্রথম ১ মাসের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে।
- ১৯৮৭ সালের ৫ জুন যোগাযোগের কারণে শরণার্থী প্রত্যাবাসন পণ্ড হয়ে যায়।
- ১৯৮৭ সালের ১৭ আগস্ট পার্বত্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে আসেন।
- ১৯৮৭ সালের ২৯ আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে জেলা পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৈঠক।

- ১৯৮৮ সালের ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি সরকার ও জনসংহতির মধ্যে তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৮ সালের ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বৈঠক হয়।
- ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে খুন হয় ৪২ জন বাঙালী।
- ১৯৮৮ সালের ১০ জুন দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ঈশ্বরী গুপ্তের সাথে আগরতলায় বৈঠকে বসেন।
- ১৯৮৮ সালের ১৯ জুন জনসংহতির সাথে সরকারের পঞ্চম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৮ সালের ৯ জুলাই রাষ্ট্রদূত ফারুক আহমেদ চৌধুরীর নেতৃতে ১৪ সদস্যের একটি দল ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানান।
- ১৯৮৮ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতির ষষ্ঠ বৈঠক বসে।
- ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান শান্তিময় দেওয়ান নিহত হন।
- ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংসদে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস হয়।
- ১৯৮৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় শান্তি চুক্তি।
- ১৯৮৯ সালের ১৪ মার্চ সর্বপ্রথম পার্বত্য সমস্যা নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে বঙ্গভবনে।
- ১৯৮৯ সালের ১৬ মার্চ সামরিক বাহিনী উপজাতীয় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে।
- ১৯৮৯ সালের ২৩ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মে পর্যন্ত সাধারাণ ক্ষমার সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়।
- ১৯৮৯ সালের ২৪ এপ্রিল তিন পার্বত্য এলাকায় নির্বাচন ঘোষণা করা হয়।
- ১৯৮৯ সালের ৩১ মে উপেন্দ্রলাল চাকমা শরণার্থী হিসাবে ত্রিপুরায় চলে যান।
- ১৯৮৯ সালের ২৫ জুন স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৯ সালের ৪ মে লঙ্গদুতে হামলায় নিহত হয় ২৫ জন।
- ১৯৯০ সালের ২৫ জুলাই শান্তিবাহিনী রাঙ্গামাটির রেডিওস্টেশন দখল করে।
- ১৯৯০ সালে রাঙ্গামাটিতে ধর্ষিত হয় ১৪ জন কিশোরী। ২৩ মার্চ শান্তিবাহিনীর হামলায় লঙ্গদুতে ৩ জন হতাহত হয়।

- ১৯৯১ সালের মে মাসে সিএইচটির 'লাইফ ইজ নট আওয়ার্স' রিপোর্ট প্রকাশ। এ সময় বিভিন্ন স্থানে শান্তিবাহিনীর হামলায় প্রায় ২শ' জন নিহত হয়। ৯ জুন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে পার্বত্য কাউন্সিল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় সরকার পরিষদের আইন ১৯৮৯ মোতাবেক যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ২৩ অক্টোবর শান্তিবাহিনীর প্রতি সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। শান্তি বাহিনী সাধারণ ক্ষমা প্রত্যাখ্যান করে ২৪ অক্টোবর।
- ১৯৯২ ॥ শান্তিবাহিনীর গুচ্ছগ্রামে হামলা। ১৪ জন নিহত হয়। ১২ এপ্রিল লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোক মিছিল হয়। ২৭ এপ্রিল তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনাও লোগাং পরিদর্শন করেন। প্যারিস কনসোর্টিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মে মাসে খালেদা জিয়া ভারত সফরের সময় নরসীমার সাথে শরণার্থী নিয়ে আলোচনা করেন। ৩০ জুলাই সেনাবাহিনী সংবাদ সম্মেলন করে পরিস্থিতির বিষয়ে। ১০ আগস্ট জনসংহতি সমিতি কর্তৃক তিন মাসের জন্য অস্ত্র বিরতি ঘোষণা। ১৩ অক্টোবর কার্ফ্যু জারি হয় কয়েকটি এলাকায়। ৫ নবেম্বর সরকার ও জনসংহতির মধ্যে বৈঠক হয়। ২৬ ডিসেম্বর হয় দ্বিতীয় বৈঠক।
- ১৯৯৩ ॥ শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। ২২ মে সরকার ও জনসংহতির তৃতীয় বৈঠকে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয় ৩১ আগস্ট '৯৩ পর্যন্ত। ১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে বৈঠকে শরণার্থীদের আংশিক দাবীনামা পূরণ করা হয়। ১৩ জুলাই ত্রিপুরা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে সরকারী দল। ১৪ জুলাই সরকার ও জনসংহতির চতুর্থ বৈঠক হয়। অস্ত্র বিরতি বর্ধিত হয় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৮ সেপ্টেম্বর জনসংহতি ও সরকারের মধ্যে পঞ্চম বৈঠক বসে। ১৯ সেপ্টেম্বর উপেন্দ্রলালের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল শরণার্থী পুনর্বাসন পরিদর্শন করে। ১৭ নবেম্বর নানিয়ার চরে গণহত্যায় নিহত হয় ৩০ জন। ১৬০ জন আহত হয়। অস্ত্র বিরতি ৩১ জানুয়ারি '৯৪ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।
- ১৯৯৪ ॥ ১৬ জানুয়ারি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয় ত্রিপুরায়। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়। ৫ মে '৯৪ সরকার ও জনসংহতির সপ্তম বৈঠক শুরু হয়। ১৫ জুলাই পর্যন্ত বাড়ে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ। নতুন একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ৪ জুন সরকার ও জনসংহতির সাব-কমিটির মধ্যে প্রথম বৈঠক শুরু হয়। ১ জুলাই হয় সাব-কমিটি ও শরণার্থী কল্যাণ কমিটির বৈঠক। ১০ জুলাই সাব-কমিটি ও জনসংহতির

দ্বিতীয় বৈঠক হয়। ২৮ আগস্ট সাব-কমিটি ও জনসংহতির তৃতীয় বৈঠক। ২৬ ডিসেম্বর সাব-কমিটি ও জনসংহতির মধ্যে চতুর্থ বৈঠকে ৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়। আবার ৩১ মার্চ পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ে অস্ত্র বিরতির।

- ১৯৯৫ ॥ উপেন্দ্রলাল চাকমা ও ভারতীয় কর্মকর্তারা খাগড়াছড়ি সফর করেন। ১৫ মার্চ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের জেলা সম্মেলন নিয়ে হরতাল হয় পার্বত্য তিন জেলায়। ১৭ মার্চ ত্রিপুরা শিবিরে বৈঠক শুরু হয়। দাবি না মানা হলে শরণার্থীরা ফিরবে না বলে ঘোষণা দেন উপেন্দ্রলাল চাকমা।
- ১৯৯৫ ॥ ৩০ জুন পর্যন্ত আরও এক দফা অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি হয়। অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১ সেপ্টেম্বর '৯৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয় পরবর্তীতে। ৪ সেপ্টেম্বর সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রবিন র‍্যাফেল পার্বত্য সমস্যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১২ জুলাই সরকার-জনসংহতি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির। ১৬ নবেম্বর খাগড়াছড়িতে জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান।
- ১৯৯৬ ॥ অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রাঙ্গামাটিতে শান্তিবাহিনী ৩ পাহাড়ীকে অপহরণ করে। অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আবার বাড়ল। ১৫ এপ্রিল রাঙ্গামাটিতে শান্তি বাহিনীর হামলায় ৩ জন নিহত হয়। ২৪ জুন শান্তি বাহিনীর ৮ সদস্য আত্মসমর্পণ করে। ২৮ জুন অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১ জুলাই পর্যন্ত আবার বাড়ানো হয়। ৬ জুলাই শান্তিবাহিনীর ৬ দফার চুক্তির বিপরীতে পিপিএসপিসি ১৪ দফা দাবি পেশ করে। ১১ জুন '৯৬ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থানার লাইল্যাঘোনা থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা নিখোঁজ হন। ২৩ জুলাই সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন থেকে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়, তাঁরা এর সাথে জড়িত নন। অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় শান্তিবাহিনী। ২৬ জুলাই পানছড়ি থেকে ৯ বাঙালী অপহৃত হয়। ১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কল্পনা চাকমার ঘটনা তদন্তে সংসদীয় কমিটি হবে। ৭ আগস্ট রাঙ্গামাটির কাউখালী থানায় ওসিসহ ৬০ জন বাসযাত্রী অপহৃত হন। ২৫ আগস্ট অপহরণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে পালিত হয় হরতাল। ৯ সেপ্টেম্বর শান্তিবাহিনীর ৪ সদস্য আত্মসমর্পণ করে। ১১ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটির লঙ্গদুতে ৩৪ জন বাঙালীকে জবাই করে হত্যা করে শান্তিবাহিনী। ১৪ সেপ্টেম্বর এ

কারণে পার্বত্য এলাকায় হরতাল পালিত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর '৯৬ জনসংহতি সমিতি একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। ৬ অক্টোবর '৯৬ আওয়ামী লীগ সরকারের পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি খাগড়াছড়িতে বৈঠকে বসে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে। পার্বত্য সমস্যা সমাধানের প্রথম সোপান শুরু হয় এখান থেকে। ১৪ অক্টোবর ১১ সদস্যবিশিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। ৩০ নবেম্বর শান্তিবাহিনী বান্দরবানে ১০ জনকে অপহরণ করে। ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত খাগড়াছড়িতে জাতীয় কমিটির সাথে শান্তিবাহিনীর প্রথম বৈঠক বসে। বর্তমান সরকারের সময়ে এটি হলো প্রথম বৈঠক।

- ১৯৯৭ ॥ যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বাড়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ২৫ জানুয়ারি সরকার ও জনসংহতির প্রথমবারের মতো বৈঠক ঢাকায় শুরু হয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ মেয়াদ বৃদ্ধি বিল পাস হয় সংসদে। ত্রিপুরায় ১ মার্চ ঘোষণা করা হয় সরকারের ২০ দফা প্যাকেজ শরণার্থীদের জন্য। ১২ মার্চ সরকার ও জনসংহতির তৃতীয় বৈঠক ঢাকায় শুরু হয়। অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয় ৩০ জুন পর্যন্ত। ২৪ মার্চ তৃতীয় দফায় শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়। ৮ এপ্রিল কল্পরঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে গঠন করা হয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স।

২৪ মার্চ বিএনপি'র ডাকে ঢাকায় পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কনভেনশন হয়। ১১ মে সরকার ও জনসংহতির চতুর্থ বৈঠক শুরু হয় ঢাকায়। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি হয়। ৫ জুলাই তিন পার্বত্য জেলার মেয়াদ শেষ হলে গঠন করা হয় অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি। ১৪ জুলাই সরকার ও জনসংহতির পঞ্চম বৈঠক শুরু হয় ঢাকায়। ৭ আগস্ট শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের তৃতীয় বৈঠক হয় ত্রিপুরায়। বৈঠক ভেঙ্গে যায়। উপেন্দ্রলাল চাকমা প্রধানমন্ত্রীর সাথে ঢাকায় বৈঠক করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর সরকার ও জনসংহতির ষষ্ঠ বৈঠক ঢাকায় শুরু হয়। ঘোষণা আসে ২১ নবেম্বর থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হবে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ১৬ নবেম্বর পরবর্তী বৈঠকের দিন ঘোষণা করে জনসংহতি। ২৭ সেপ্টেম্বর বিএনপি সমাবেশ করে পার্বত্য এলাকায়। শান্তি চুক্তির খসড়া চেয়ে চিঠি দেয় জনসংহতি সমিতি। বিএনপি'র চলে হরতাল। সরকারের শান্তি সমাবেশ।

গ্রন্থনা ॥ কামরুল

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

উন্নয়নের জন্যই শান্তি চাই

আতিউর রহমান

১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে কয়েক দিনের জন্য রাঙ্গামাটিতে গিয়েছিলাম। একটি রেস্ট হাউসে স্ত্রী-কন্যাসহ ছিলাম। কিন্তু সে সময়টায় একদম স্বস্তি পাইনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারিনি। কেমন যেন থমথমে ভাব। কী পাহাড়ী, কী বাঙালী মন খুলে কেউ কথা বলতে চাইতেন না। সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ফাঁকা। শহর ছেড়ে বাইরে যেতে মানা করলেন শুভাকাঙ্ক্ষীরা, পাহাড়ীদের মনে ভীষণ ক্ষোভ। শান্তিবাহিনীর যে ক'জন সদস্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাঁরাও খুব ভীত। সামরিক বাহিনীর লোকজন খুবই তৎপর। এরশাদের শাসনামল। সব মিলে বড়ই অশান্ত পরিবেশ। একবার পর্যটন মোটেলে গিয়েছিলাম। সেখানেও নেই পর্যটক। অশান্ত পরিবেশে পর্যটকদের ভিড় না হবারই কথা। পুরো শহর ও তার আশপাশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিস্তেজ হয়ে গেছে। মানুষের মনে শঙ্কা। শঙ্কিত মানুষ নিশ্চিত বলতে পারি বিনিয়োগে উৎসাহী হতে পারে না।

এরপর এক দশক পার হয়ে গেছে। এরশাদের পর গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেই সরকারের পক্ষ থেকেও পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি সংসদীয় কমিটিও জড়িত ছিল শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে। কিন্তু শান্তি ফিরে আসেনি পার্বত্য অঞ্চলে। পাহাড়ের গাঁ বেয়ে রক্ত বয়ে যাওয়া বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি সামরিক তৎপরতা। বন্ধ হয়নি বিদ্রোহীদের তৎপরতা। বন্ধ হয়নি রাবার চাষের নামে জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়া। বন্ধ হয়নি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমতল থেকে তুলে আনা মানুষের পাহাড়ী ভূমিতে বসবাসের প্রক্রিয়া। বেড়েছে দামী কাঠের পাচার। বেড়েছে অস্ত্রের পাচার। বেড়েছে সন্ত্রাস। বেড়েছে অশান্তি। এমনই এক বাস্তবতায় নয়া সরকার ক্ষমতায় এসেই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বলতে গেলে অভাবনীয় সময়সীমার মধ্যেই একটি খসড়া শান্তি চুক্তি প্রণয়নের সাফল্য সরকারী ও পার্বত্য প্রতিনিধিগণ দাবি করতে পারেন। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই শান্তি চুক্তি তৈরি হয়েছে বলে আমরা আশা করতে পারি। তবে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা চুক্তি সম্পাদনের পরপরই সমাধান হয়ে যাবে এমনটি আশা করা বোধহয় ঠিক হবে না। এই চুক্তি শান্তির পথে হবে প্রথম মাইলফলক। আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের সকলের। উত্তরণের সেই সময়টি হবে আরও

বেশি স্পর্শকাতর। সেই সময়টাতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিভাবে আমরা এগোতে পারি তার ওপর নির্ভর করবে এই শান্তি কতটা টেকসই হবে।

তবে এরই মধ্যে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তি সাধারণ মানুষের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করেছে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ও বাঙালী সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের এই অবস্থানে সারা বিশ্বে শান্তির পক্ষে যে সুবাতাস বইছে তার প্রতিফলন ঘটেছে। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় আজকের বিশ্ব মানবাধিকার ও শান্তির পথে এখন বেশি জোরালো অবস্থান নিয়েছে। আফ্রিকা, পূর্ব ইউরোপে শান্তি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ যেভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা আগে কখনও দেখা যায়নি। তার পরেও মূলত অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর স্বার্থের সংঘাতের কারণে এসব এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিশ্বকে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে সামরিক খরচ কমিয়ে মানব উন্নয়নে বাজেট বাড়ান, সামাজিক খাতের উন্নয়ন, মানবাধিকারের উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক সুশাসন, পরিবেশসম্মত উন্নয়নের পক্ষে জাতিসংঘ তার সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করার ফলে সারা বিশ্বেই শান্তির পথের মানুষের কণ্ঠ উচ্চকিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সুবিধাবাদিতা, অগণতান্ত্রিকতা, অমানবিকতা ও সন্ত্রাসপ্রীতি মানব উন্নয়নের পূর্বশর্ত শান্তির জন্য সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করছে।

পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে মূলত অগণতান্ত্রিক সরকারগুলোর অমানবিক উন্নয়ন কৌশলের কারণে। আমরা সংখ্যাগুরু বাঙালীরা এক সময় পাঞ্জাবীদের সঙ্কীর্ণ রাজনীতি ও অর্থনীতির শিকার হয়েছিলাম। আমাদের জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের পথে তারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। সেদিন আমরা আন্দোলনে নেমেছিলাম আমাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক স্বকীয়তার জন্য। অবশেষে সেই আন্দোলন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। একই প্রক্রিয়ায় পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী জাতি বা উপজাতিসমূহের আর্থ-সামাজিক ও স্বাতন্ত্র্যের ওপরও চাপ সৃষ্টি করা হয়। ষাটের দশকে কাপ্তাই লেক তৈরি করা হয় সারা দেশে বিদ্যুত সরবরাহের লক্ষ্যে। লক্ষাধিক মানুষের ঘরবাড়ি পানির নিচে চলে যায়। এমনকি রাজার বাড়িটিও পানির নিচে চলে যায়। বহু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। এরা বাঁচবার জন্য পাহাড়ী সম্পদের ওপর নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। পাহাড়ী সম্পদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মালিকানার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এরা কোনমতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। তখনও বাঙালীরা এদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে তারা যে ন্যায়বিচার আশা করেছিল যে কোন কারণেই হোক আমরা তা নিশ্চিত করতে পারিনি। এদের

ছেলেমেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এদের অনেককেই আবার রাজাকারও করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা প্রকট হয় সামরিক সরকারসমূহের আমলে। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার কারণে সমতল ভূমি থেকে অস্বাভাবিকভাবে বাঙালীদের নিয়ে যাওয়া, সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি করা এবং পাহাড়ীদের দীর্ঘদিনের স্বকীয় অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করার ফলে ঐ অঞ্চলে অশান্তি দেখা দেয়। পাহাড়ীদের একটি অংশ অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের মোকাবিলার কারণে পুরো পার্বত্য অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হতে শুরু করে। অশান্তির এই আঁচ থেকে বাঁচার জন্য বেশ কিছু পরিবার দেশ ছেড়ে চলে যায়। উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশার কারণে পাহাড়ী-বাঙালী বৈরিতা আরও বেড়ে যায়।

এক পর্যায়ে এরশাদের আমলেই যুদ্ধরত শান্তিবাহিনীর সাথে সামরিক বাহিনী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। কারণ নিজ দেশের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার মধ্যে বাহাদুরি নেই এবং দুর্গম পাহাড়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই–এমন ভাবনা হয়ত সেনা কর্মকর্তাদের মনে এসেছিল। আলোচনার এই প্রক্রিয়া পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও চালু ছিল। প্রাক্তন যোগাযোগমন্ত্রী এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাবেক এমপি রাশেদ খান মেনন এবং উপজাতীয় এমপিরাও শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

সেই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবেই বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। পাহাড়ী ও বাঙালী নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসাবে শান্তি চুক্তির খসড়া তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে জেনে পুরো দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। তবে যাদের বাস্তব স্বার্থক্ষুণ্ন হবে এই চুক্তির ফলে, যাদের বন্ধুদের স্বার্থক্ষুণ্ন হবে শান্তির কারণে, যাদের অন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিপন্ন হবে চুক্তির কারণে, স্বাভাবিক কারণেই তারা বিচলিত। আর তারাই এই শান্তির সুবাতাসে বিষ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। আমার নিজের বিশ্বাস সরকারী বা বিরোধী দলে খুব কমসংখ্যক মানুষই আছেন যাঁরা শান্তি চান না। শান্তিই যে উন্নয়নের জন্য এখন জরুরী এ কথাটি কোন দেশপ্রেমিক নাগরিকই অস্বীকার করতে পারেন না। ফিলিপিন্সে কী ঘটেছে? মালয়েশিয়াতে কী ঘটেছে? ক্ষুদে জাতিসত্তার জন্য বড় জাতি সত্তার মানুষেরা কী করেছেন সেসব দেশের? ঐসব দেশে জাতিগত শান্তি অর্জন করা গেছে বলেই উন্নয়নের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। ফিলিপিন্সের মুসলিম গেরিলা নেতার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রামোস শুধু শান্তিই স্থাপন করেননি, তাঁকে তাদের

মানুষদের প্রশাসন করার অধিকারও দিয়েছেন। মালয়েশিয়ার নেতৃবৃন্দের পরামর্শেই ফিলিপিন্সের শাসকরা এই শান্তির পথ বেছে নিয়েছেন এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই ফিলিপিন্স এই শান্তির লভ্যাংশ পেতে শুরু করেছে। তাহলে আমাদের দেশে শান্তি অর্জনের পথে এমন বাধা কেন? স্বাধীনতা লাভের এত দিন পরেও কি আমরা যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই উদার গণতান্ত্রিক চেতনার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে চাই না? আমাদের রাজনীতিকরা সামান্য স্বার্থের কারণে দেশে অশান্তি ও সন্ত্রাস জিইয়ে রেখে আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা দিতেই থাকবেন? পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি নিশ্চয় আসবে। কেননা সারা দেশের বেশিরভাগ মানুষই শান্তির পক্ষে। তবে এই শান্তি যেন টেকসই হতে পারে সেজন্য আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

এক. শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হবার পর যেন আমাদের মনে 'আত্মসন্তোষ' তীব্র না হয়ে ওঠে গঙ্গা চুক্তির পর যেমনটা লক্ষ্য করেছি তেমন করে যেন আমরা অথবা আকাশচুম্বী আশাবাদ তৈরি না করি। শান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে সব বাস্তব কার্যক্রম নেয়া উচিত সেগুলো যেন আমরা কালবিলম্ব না করে হাতে নেই। পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করার মতো শান্তি বিনাশী শক্তির অভাব হবে না। এদের অপতৎপরতার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

দুই. পার্বত্য শান্তি স্থায়ী হবে যদি এখানকার প্রশাসন পুরোপুরি স্থানীয় সরকার পরিচালনা করে। স্থানীয় সরকারগুলোর সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের একজন স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান সক্রিয় থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি খুবই ভাল উদ্যোগ। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সকল সিদ্ধান্ত স্থানীয়ভাবেই যেন নেয়া যায় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। গতানুগতিক উন্নয়নের আশার বাণী সাধারণত আমলাতান্ত্রিক মারপ্যাঁচ ও দুর্নীতির যাঁতাকলে মার খায়। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন বিশেষ করে সামাজিক সেবার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই গতানুগতিক পথ অনুসরণ করার সুযোগ নেই। এখানে স্থানীয় সরকারগুলোকে সত্যি সত্যি স্বায়ত্তশাসন ও বাজেট দিলে নিশ্চয় তাদের নিজেদের পছন্দমতো উন্নয়নে উৎসাহী হবে।

তিন. স্থানীয় পর্যায়ের বাইরেও জাতীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। স্থানীয় সরকারকে অংশীদার করেই জাতীয় সরকারকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যক্তি খাতকেও এখানে জড়ানো যেতে পারে। মালদ্বীপে যেভাবে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে আমাদের

পার্বত্য অঞ্চলেও তেমনটি সম্ভব। মালদ্বীপ তার নিজ দেশের সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার অক্ষুণ্ন রেখেই দ্বীপগুলোর 'ইকোট্যুরিজম' প্রসারে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। আমার নিজের বিশ্বাস, আমাদের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই পার্বত্য অঞ্চলকে আমরা একইভাবে আকর্ষণীয় পর্যটন তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত করতে পারি। পাহাড়ী ও বাঙালী উভয়েই নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার সুযোগ পেতে পারে এর মাধ্যমে। এর ফলে দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের একটি বড় অংশ সপ্তাহান্তে পার্বত্য অঞ্চলের শান্ত পরিবেশে দু'রাত কাটিয়ে যেতে পারবেন। আমি দেখেছি মালদ্বীপের কোন কোন দ্বীপে বিশ্বের সেলিব্রেটীরা শুধু শান্তির অন্বেষাতে কয়েক দিন কাটিয়ে যান হাজার হাজার ডলারের বিনিময়ে। সে জন্য মালদ্বীপকে থাইল্যান্ডের মতো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন মূল্য দিতে হয়নি, পরিবেশকেও বিপন্ন করতে হয়নি। সে জন্যই আমার অনুরোধ থাকবে, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাবার পর যেন মালদ্বীপের অভিজ্ঞতার আলোকে এই অঞ্চলে 'ইকোট্যুরিজম' গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতার আলোকে ভারত ও নেপালে আসা অসংখ্য পর্যটকদের প্যাকেজ টুরের আওতায় কয়েক দিনের জন্য আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় বিমানবন্দর, রাস্তাঘাট, কটেজ ও অন্যান্য প্রমোদ সুবিধা তৈরি করতে হবে। আর এসব কাজের জন্য সময় খুব কম ব্যয় করতে হবে। কেননা শান্তির বিরুদ্ধে যারা, তারা এই বিলম্বকেই মূলধন করবে।

চার. শান্তি চুক্তির প্রতিটি ধারা ঠিক ঠিক পালন হচ্ছে কিনা, শান্তি চুক্তির পর যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো সময়মতো রূপায়ণ করা হচ্ছে কিনা, পাহাড়ী-বাঙালীদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও উন্নত হচ্ছে কিনা, স্থানীয় সরকারগুলো প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে কিনা–সে সব কিছুই নিরন্তর অবলোকন করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে সকল পক্ষের প্রতিনিধি কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষ (যথা–সিভিল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন মানবাধিকার কমিশন) সক্রিয়ভাবে অবলোকনের কাজটি যাতে করতে পারে সে উদ্যোগ এক্ষুণি নেয়া উচিত।

পাঁচ. পাহাড়ী এলাকায় রাজা হেডম্যান ও অন্যদের যে নৈতিক অবস্থান দীর্ঘদিন থেকে চালু রয়েছে তাকে আরও পোক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। বিশেষ করে রাজার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার যেন গড়িমসি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছয়. সংখ্যাগুরু জাতি হিসাবে আমাদের দায়িত্বই বেশি। ক্ষুদে জাতি বা উপজাতিগুলোর সংস্কৃতি, শিক্ষা ও স্ব শাসনের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সংখ্যাগুরু অংশের মানুষদের আরও বেশি উদার হতে হবে। একবার কানাডার একটি প্রদেশে লক্ষ্য করলাম ক্ষুদে জাতির সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে প্রাদেশিক রাজধানীতে ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। সকলেই আনন্দঘন পরিবেশে ক্ষুদে জাতির সদস্যদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনাগুলো উপভোগ করছেন। আমরাও কি এমন কোন জাতীয় অনুষ্ঠান করতে পারি না? সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের কাছে কি আমরা সংখ্যাগুরু বাঙালীরা আমাদের ক্ষুদে জাতীয় বা উপজাতীয় ভাইবোনদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সম্পদ ও সৃজনশীল আরও আন্তরিকভাবে তুলে ধরতে পারি না? আমাদের গণমাধ্যমে কি তাদের আরও বেশি সময় ও সুযোগ দিতে পারি না? আমাদের শিক্ষাঙ্গনে তাদের উপস্থিতি আরও বাড়াতে পারি না? শুধু লোক দেখানোর জন্য নয়, আন্তরিকভাবেই তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উন্নয়নের চিন্তা আমরাও করি–এই বার্তাটি কি আমরা তাদের দিতে পারি না? এমন ঔদার্যই আসলে শান্তির ভিত্তিকে শক্ত করে। আশা করি শান্তি চুক্তি সই হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চুক্তির সফল বাস্তবায়নে তৎপর হব। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই যে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার আমরা এক সময় হয়েছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি আমরা করিনি। আমরা ক্ষুদে জাতি বা উপজাতি সত্তার পূর্ণ বিকাশে বিশ্বাসী। আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের পছন্দমতো বাঁচার সংগ্রামে বিশ্বাসী। মানবিক উন্নয়নের এই সংগ্রামে বাঙালী-পাহাড়ী হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাবে–সেই প্রত্যাশাই আমাদের যেন সকলকে তাড়িত করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

ফুলের জন্য আনন্দের জন্য শান্তি হবে

মমতাজউদদীন আহমদ

খুব হইচই চলছে। হইচই চলানো হচ্ছে, হইচই করানো হচ্ছে। একজন তো কেবল হইচই করে থামবে না। যুদ্ধ করবে বলে হুমকি দিয়েছে। পাকিস্তানওয়ালারা যেমন হুমকি দিয়েছিল একাত্তরে, তেমন যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বাঙালিকে ভয় দেখাতে চাইছে একজন-দু'জন।

মোটকথা একটা ডামাডোল আর তোলপাড় অবস্থার সৃষ্টি করে বাংলাকে অস্থির, অধীর ও বিশৃঙ্খল করতে চাইছে। কারা চাইছে? যারা বাংলাদেশ চায়নি, তারাই চাইছে। যারা বাংলাকে গড়ে তুলতে দিতে চায় না তারাই

চাইছে। যারা সুযোগ মতো পালিয়ে যায় আবার সুযোগ মতো মুখ বারকরে উলুক ভুলুক করে, তারাই এমন সব হইচই লাগিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। কিছুতেই পারছে না। কিছুতেই পারছে না। যতই পারছে না, ততই ঝাঁপাঝাঁপির মাত্রা বাড়িয়ে যাচ্ছে।

আখেরে ফল কিছুই হবে না। যা হবার তাই হবে। শান্তি চুক্তি হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দশকের বেশি সময়ের ঝুটঝামেলা ক্ষান্ত হবে। কেন হবে! হবার কারণ আছে তাই হবে। কেউ মানে যারা শান্ত নিরীহ, সুসংস্কৃত এবং কল্যাণকামী তারা কেউই পচা দুর্গন্ধময় নালার কাছে মোটেও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু সুন্দর শোভিত পরিমল স্নিগ্ধ বাগানে তারা দিনের পর দিন থাকতে পারে। কেন পারে? কারণ, যারা ভাল চায়, মঙ্গল চায়, শুভ চায় তারা সব সময় শান্ত নির্মল, উন্নয়নমূলক অবস্থাকে আহ্বান করে। তারা ফুলের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে চায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা এখন শান্তি চাইছে। নিরঙ্কুশ শান্তি, অনাবিল শান্তি। শান্তির পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নির সন্ধানে সকলেই পাগলপারা হয়ে পড়েছে। আর কতকাল অশান্তি, বিদ্বেষ আর কোলাহল নিয়ে থাকবে প্রায় পনেরোটি বড়ছোট উপজাতির আট লক্ষ মানুষ। যারা এখানে নানা সূত্র ধরে গত চার শ' বছর ধীরে ধীরে আবাসন গড়ে তুলেছে, তারা বার তিনেক বিদ্রোহ বিপ্লব করেছিল বটে, কিন্তু ইতিহাস বলে তারা বার বার সন্ধিও করেছে। মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেছে, নবাবদের সঙ্গে করেছে আর ইংরেজদের সঙ্গে করেছে। কেবল পাকিস্তান আমলে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। আর সেসময় উপজাতির রাজা গজারা লোভের, মোহের, স্বার্থের ও লুটের ভাগ নেবার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে করমর্দন করে দাসত্ব পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে খেটে খাওয়া মানুষরা পাকিস্তানী পক্ষ অবলম্বন করেনি।

তবে একটা বিষয় অত্যন্ত সত্য। সে সত্যটা হলো চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরী–যাদের কথাই বলি না কেন, তারা সন্ধি করেছে। কিন্তু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু বিষয় আদায়ও করে নিয়েছে। এবারও যে শান্তি চুক্তি হতে চলেছে এবং যে চুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পঁচিশটি থানার তিনটি জেলায় কয়েকদিন থেকে মহোৎসব শুরু হয়েছে তাতে চৌদ্দ-পনেরোটি উপজাতির জাতি সত্তার অভিমান বিষয়ক কিছু কিছু ছাড় দিতেই হবে। সে ছাড় না নিয়ে উপজাতি নাগরিকরা সমতলভূমির মানুষকে আপন করে নিতে পারবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন প্রায় চল্লিশ ভাগ মুসলমান বাঙালি বসবাস করেছে। আর ষাট ভাগ উপজাতির বসবাস আছে।

উপজাতিদের মধ্যে চাকমারা আছে একত্রিশ ভাগ, মারমা আছে সতেরো ভাগ, ত্রিপুরী আট ভাগ আর অন্যরা ছয়ভাগ। সেদিক দিয়ে দেখলে, এককভাবে বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তবু উপজাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া গড়ে উঠেছে। সেকারণেই উপজাতিদের নানা মত পথ, ভেদ-অভেদের কথাটাই বিশেষ করে ভেবে নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অখণ্ড অংশ। উপজাতিরা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে উপজাতিদের সমান অধিকার। আর পাহাড়ী বলে তাদের অধিকারের পরিমাণ আরও বেশি। এ অধিকার তারা বহন করছে। চারশত বছর ধরে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে।

আনন্দের কথা হলো, উপজাতিদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার অগ্রাধিকার নিয়ে কারও মনে কোন সংশয় নেই। থাকার কথাও নয়।

সে অধিকার বন্দুকের নল দিয়ে তারা অর্জন করেনি বা সে অধিকার হরণ করার জন্য বন্দুকের নল ব্যবহার করে কোন লাভও হবে না।

পাকিস্তান বাংলাদেশ ভাগ হলো। না হয়ে উপায় ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বন্দুক উঁচিয়ে কথা বলেছিল বলেই বাংলার মানুষ অনতিক্রম্য সাধনায় নিমগ্ন হলো। যে সমস্যা রাজনৈতিক হৃদ্যতার মধ্যে সমাধান করা যায়, সেখানে সামরিক বল প্রয়োগ মানেই স্রোতের উল্টো দিকে ছোটা। তাতে লাভ হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।

বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কখনই সামরিক শাসন ও আগ্রাসনকে শুভ বলে বিবেচনা করেনি। গণতান্ত্রিক সরকার তাই রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের হৃদয়ে অভিমান, অহংকার, দুঃখ ও সঙ্কটকে মানুষের কাছে উন্মোচন করেছে, করেছে উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্য ও জাতি সত্তার পরিচয়। আর তার মধ্যেই সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্মিলনকে নিশ্চিত করতে চেয়েছে।

আমি গেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে। অভিবাসিত মুসলমানদের কথা শুনেছি। উপজাতি বা আদিবাসীদের কথাও শুনেছি। সবাই যে চায় শান্তি, তাও বেশ বুঝেছি। তবে পরস্পরের মধ্যে রাগ-অভিমান ও অবিশ্বাস আছে–তাও অলক্ষিত হয়নি। সেখানে দেখেছি একই কথা বার বার তোতা পাখির মতো বলার মানুষকে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নয়, বলার জন্য কথা বলছে তেমন লোকের কথাও শুনেছি। দেখেছি বিভ্রান্ত বিচলিত যুব সম্প্রদায়কে। দেখেছি কিছু সম্মান ও স্বীকৃতি লোভী মানুষের উষ্ণ বাকবিতণ্ডা। আর শুনেছি শান্তির জন্য উদগ্রীব নিরীহ মানুষের কথা। সব দেখার বড় দেখাটা দেখলাম, সকলেই শান্তি চায়, মিল চায়, মহব্বত চায়। অবিশ্বাস ও সঙ্কট দূর করতে চায়।

কিন্তু তাদের চাওয়া আর পাকিস্তানওয়ালাদের চাওয়ার মধ্যে দূরত্ব অনেক। এরা কিন্তু শান্তি চায় না পার্বত্য চট্টগ্রামে। খালেদাপন্থী বিএনপি'র সকলেই যে একটা নির্দিষ্ট কিছু চায়–তাও মনে হয় না। তবে তাদের সবাই হইচই চায়। সামনে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন, সে নির্বাচনে ভরাডুবি হতে চলেছে, তাই নির্বাচন বাতিলের জন্য ব্যাপক হুজ্জত হাঙ্গামা চায়। যারা মৌলবাদী ও পাকিস্তানওয়ালা তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চায় না, কেননা এখানকার দুর্গম অঞ্চলে তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, অস্ত্রের ঝনঝনানি আছে। সেই অস্ত্রের ব্যবহার করে রাজনীতিকরা আছে। তাই শান্ত বান্দরবন, স্থির খাগড়াছড়ি আর নির্মল রাঙ্গামাটি তারা নেবে না। একই রকমভাবে অস্ত্র নিয়ে অবৈধ ব্যবসা করা, আলবদর আলশামস শ্রেণীর মানুষরাও শান্তি চায় না। ফ. কা চৌধুরীর পুত্ররাও শান্তি চায় না। অস্ত্রের কাঁচা পয়সা, লুটপাটের সহজ টাকা তারা ছাড়বে কোন্ আক্কেলে! তবে তো সবই শেষ হয়ে যাবে। আর আছে ভয়াবহ মাদক পণ্যের ব্যবসা। এখানেই আছে ঘড়েল ঘড়েল দেশি-বিদেশী এজেন্ট। তারা ছাড়বে না পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরাপদ অরণ্য রাজ্য। অঢেল অর্থ আছে যে। সবশেষে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তরজুড়ে বিপুল সম্পদ। তেল আছে, গ্যাস আছে। সেজন্য বিদেশি বিনিয়োগের অসামান্য সম্ভাবনা আছে।

অতএব লোভ, মোহ আর বিপুল অর্থাগমের খেলা কে ছাড়বে? কিছুতে ছাড়বে না। মোহের কম্বল ছেড়ে কোন শয়তান বের হবে না। পড়ে থাকবে মাটি কামড়ে নোংড়া নর্দমার অশান্তির মধ্যে। যেমন মাছি বসে পচা খাদ্যে আর পোকা ঢুকে বিষ্ঠায়, তেমনি এরা কামড় দিয়ে পড়ে থাকবে নোংরাতে। হাজার টানাটানিতে এদের লেজ কাটা যাবে, চোখ আন্ধা হয়ে যাবে আর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাবে–কিন্তু তবু পার্বত্যের সার্বভৌমত্ব বলে বলে আকাশ-বাতাস কাঁপাতে থাকবে এই সব পঙ্গু অথর্ব দিগন্তহীন মানবমানবী।

অথচ পার্বত্যের চৌদ্দটি উপজাতি আর সমভূমির বাঙালি মুসলমান-হিন্দু সবাই শান্তি চাইছে। শান্তির ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছে। বাংলার সমভূমির জনগণ শান্তি চাইছে। পাহাড়ের টিলার মানুষ শান্তি চাইছে। সবাই স্বস্তি চাইছে। চাইছে না মাত্র কয়েকটা মানবমানবী। দেশে শান্তি ও বন্ধুত্ব হলে সবার সুখ, কিন্তু তাদের খুব বিসুখ। তখন শান্ত ধীরভাবে বিচার শুরু হবে। কোন্ দারোগা কোন্ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে কোটি টাকার মালিক হয়েছে, কোন্ সন্তান ফাটা গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে, কোন্ ঘাতক কতজন বাঙালিকে হত্যা করে এখন ধর্মের ভেক ধরেছে–সবকিছু এক এক করে চিহ্নিত হয়ে পড়বে। বিচারালয়ের শক্তি মজবুত হবে। বিচারকবৃন্দ ন্যায়বিচারের মহৎ সাধনায় অনুপ্রাণিত হবেন। আর তাতেই তো এদের

ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে। তখন আসবে মহা দুঃসময়। তখনই তো নর্দমার গভীর থেকে এক এক করে মানবমানবীদের টেনে তোলা হবে। দেশের দর্পণে ফুটে উঠবে এক একটা মেকি, ধুরন্ধর ও কদাকার কুৎসিত মুখ।

ওসব দেশপ্রেম আর সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার ওয়াদা সব ফাঁকা বুলি। ওসব হলো ধান্ধাবাজি আর লোক দেখানি। মূল হলো, নিজেকে আড়াল করা। আর দেশটাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়া।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৬ই নভেম্বর ১৯৯৭

শান্তির প্রত্যাশায়

শওকত আরা হোসেন

চারদিকে সবুজের লীলানিকেতন। কোথাও হলুদ সবুজ, কোথাও লালচে সবুজ, কোথাও সবুজে সবুজ। শুধু সমতল ভূমিতে নয়, উঁচু-নিচু ছোট ছোট পাহাড়জুড়ে সব জায়গাতেই। এর মাঝে কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে ক্ষীণকায় ঝরনাধারা। মেঘেরা খেলছে পাহাড়ের বুকে লুকোচুরি খেলা। মনে হয় বিধাতা নিজ হাতে গড়েছেন এ সৌন্দর্যভূমি। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন এ তিলোত্তমা ভূমিকে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তাকালেই দেখা যায়, এ সবুজের অরণ্যে ছোপ ছোপ তাজা রক্তের দাগ পাহাড়ী যুবকের, বাঙালী যুবকের। বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় সদ্য বিবাহিত তরুণীর বুক ফাটা কান্না, স্নেহময়ী মায়ের করুণ দীর্ঘশ্বাস। একই সাথে ইথারে ভেসে আসে অবুজ সন্তানের কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন–"আমার বাবা কোথায়? কত দিন তাঁকে আমি দেখছি না, বাবা কবে আসবে?" আর পুত্রহীন বাবার পাহাড়সমান বুকের বোঝা নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা–কাকে সে দায়ী করবো? ভাগ্যকে সৃষ্টিকর্তাকে অথবা রাষ্টকে? না কাউকেই অভিযুক্ত করা হয় না তার। কারণ সে তো শুধু একাই এ নির্মম পরিস্থিতির শিকার নয়। আরও অনেকেই আছেন–শতকের সংখ্যা ছাড়িয়ে হাজারে হাজারে পৌঁছেছে এ সকল অভাগা বাবার সংখ্যা।

আমি বাংলা মায়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের কথাই বলছি। এক দিনের সে শান্ত, সমাহিত জনপদ এখন বড় অশান্ত। শুধু তাই নয়, এখন সেখানে ঝরছে মানুষের তাজা রক্ত। কত রক্ত প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদৌ সে ভূমি কি রক্ত চাইছে! না পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনদিন রক্ত প্রয়োজন ছিল না, এখনও নেই। সে চাচ্ছে এখন শান্তি। মরবে, ফিস ফিস করে, মূক চাহনিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বলছে–"আমি শান্তি চাই, আর যেন কোন মানুষের এক ফোঁটা রক্ত আমার বুকে না ঝরে।"

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আমি দু'বার গেছি। একবার ১৯৯০-এ, দ্বিতীয়বার এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে। মাত্র সাত বছরের কম সময়ের ব্যবধানে, আমি দেখেছি সেখানকার পরিস্থিতির বড় ধরনের পরিবর্তন। '৯০-এ আমি খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান–তিনটি জেলাই ঘুরে ফিরে দেখেছি। পাহাড়ী বাঙালী সবার সাথেই কথা বলেছি, আলাপ করেছি। তখন আমার মনে হয়েছিল কিছু আন্তরিক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালালেই এ সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান হবে। সে সময় পাহাড়ী-বাঙালী এক টেবিলে বসে আলোচনা করেছি–সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কিভাবে হতে পারে। পাহাড়ী বাঙালী উভয়েই আন্তরিকভাবে, খোলা মনে এ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি মনে হয়েছে অনেক জটিল। কারণ আগে যে কয়টি স্বার্থের সংঘাত ছিল, সে স্বার্থের ক্রমিক নম্বর এখন অনেক বেড়ে গেছে। স্বার্থের গ্রন্থিতে একবার বাধা পড়লে, স্বচ্ছ-মুক্ত চিন্তার অবারিত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বা প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা সমস্যাটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পাকিস্তান রাষ্ট্র এ কারণে বলা যে, অনেক সময়েই রাষ্ট্রযন্ত্রটি দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এ সমস্যার যদি তাৎক্ষণিক সমাধান না হয়, তবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং এ সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্টির পর চাকমারা তাদের ভূমির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণও পাননি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সমস্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে অবশ্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল এবং সাংবিধানিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও সংবিধানে রাখা উচিত ছিল। জাতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তা–এ সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শব্দগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দক্ষ বিজ্ঞানী ছাড়া অন্যদের বোঝা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রয়াস। কিন্তু তারপরও দেখা যায়, ১৯৭৩-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটিতে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পৃথক সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার অবশ্যই রক্ষা করা হবে এবং কাউকেই তা ধ্বংস করতে দেয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। ... তাদের ওপর কোন অবিচার করা হলে, তিনি নিজেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন।" বাংলাদেশের সংবিধান প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে ১৩ বার সংশোধিত হয়েছে, এ ইস্যুতে সংশোধনের একটি মাত্রা সংযোজিত হলে বোধহয় দেশের মঙ্গল হতো।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বছরে 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'তে ব্যয় হয় পাঁচ শ' কোটি টাকা। দৈনন্দিন ব্যয় এক কোটি টাকার বেশি। মনে হয় পূর্ব-পুরুষের অর্বাচীন ঋণ–যে ঋণ করেছিল তারা–কাপ্তাই বাঁধ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র তা পরিশোধ করছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক কিংবদন্তির সেই রহস্যময় গোলক পথের মতো এ ঋণ আর শোধ হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত এ দরিদ্র রাষ্ট্রটি টাকা দিচ্ছে, কিন্তু ঋণের শেষ নেই। আসলে এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রতিদিন এক কোটি টাকা আমাদের ঋণ শোধতেই হবে। এছাড়া সঙ্গত কারণেই দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে উন্নয়ন খাতে এখানে ব্যয় বেশি। এ কারণে এ অঞ্চলে উন্নয়নও হচ্ছে বেশি–যা দেশের বাদবাকি অঞ্চলে হচ্ছে না। সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৯৩ সালেই এ অঞ্চলে

কলেজ (তিনটি সরকারী)	-	১১টি
হাই স্কুল	-	১২৬টি
প্রাইমারি স্কুল	-	১০২৬টি
পাহাড়ী ছাত্রদের হোস্টেল	-	৯টি
পাহাড়ী ছাত্রদের হোস্টেলসহ আবাসিক স্কুল	-	৪টি
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	-	১টি ছিল।

এ চিত্রটির সাথে দেশের অন্যান্য এলাকার কিন্তু মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। অন্যদিকে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মাত্রার উন্নতি রাষ্ট্র কাঠামোর শক্তি বৃদ্ধির চেয়ে রাষ্ট্রকে দুর্বল করে। বর্তমানে জাতীয়তাবাদের যে নতুন সংজ্ঞা দেয়া হয়, তাতে উল্লিখিত যে–একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে জাতীয়তাবাদের চেতনা, বিকাশ এবং সংহতির জন্য সবার অর্থনৈতিক সাম্যের প্রয়োজন।

এছাড়া ঐ অঞ্চলে যৌথ শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪ জন। এর মাঝে চাকমা শিক্ষিত শতকরা ৬২ জন (মতান্তরে ৭২ জন), মারমা শতকরা ২৫ জন, বাঙালী শতকরা ১০ জন এবং অন্যরা শতকরা ৩ থেকে ৫ জন। মানব সম্পদ উন্নয়নের এ ধরনের বিভিন্ন হার রাষ্ট্র সংহতির জন্য ক্ষতিকর। আসলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উন্নতি, এক অঞ্চলে বা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন/ভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উন্নতি না করে অবনতি ঘটায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত থাকায় চাঁদাবাজি আজকে একটি পেশাতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ী এবং বাঙালী উভয় জনগোষ্ঠী অতিষ্ঠ এজন্য। শান্ত বান্দরবানেও আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। এ অঞ্চলও উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আগুনের এ ছোঁয়া কি শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এ অঞ্চলগুলো সংলগ্ন অন্য কিছু এলাকায় ক্রমান্বয়ে এ বিষবাষ্প ছড়িয়ে যেতে পারে। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া বাঙালীদের প্রায় নিত্যসঙ্গী ওখানে। এমন কিছু দুর্গম অঞ্চল আছে, যে স্থানগুলো মানুষ বসবাসের অযোগ্য এবং দিনের বেলাতেও শুয়ে থাকলে মশারি টানিয়ে এবং কোন কোন কাজের সময় মাথা ও হাত মশা যাতে না কামড়াতে পারে সেজন্য নেট দিয়ে ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া এমন একটি রোগ, যা হলে বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং জীবন প্রদীপ অচিরেই নিভে যায়। এছাড়া দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে যদি অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে, তবে যারা ঐ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত তারা কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই ঐ কাজে উৎসাহ হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ পাহাড়ী এবং বাঙালীরা শুধুমাত্র পারস্পরিক বিবাদেই লিপ্ত নয়, দু'জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অবিশ্বাস বর্তমানে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে নিয়েছে। বাঙালী কিছু মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করায় পাহাড়ী জনগোষ্ঠী মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে বাঙালীদের বিশাল অংশ অনাহারে-অর্থাহারে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ীদের মাঝে নতুন নেতৃত্বের বিকাশে পুরনো নেতৃত্ব ভীত এবং শঙ্কিত। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কারিশমাযুক্ত নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে নতুন প্রজন্মের কোন নেতা এগিয়ে আসতে পারছেন না, যাঁর একক নেতৃত্ব সবাই মাথা পেতে মেনে নেবে। সব কিছু মিলিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা ঘোলাটে, অস্বচ্ছ–এ সকল কারণেই পাহাড়ী ভূমিতে আজকে শান্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে বাংলাদেশের "রাজনীতি যেন রাজনীতির জন্য করা না হয়"। রাজনীতি যেন হয় গণমানুষের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য। যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানব দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধে বেঁচে আছে, যে দেশে শতকরা ৪০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত যুবক বেকার, যে দেশে এখনও রোগের সুচিকিৎসা অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যে নেই, এমনকি খাবারের পানির নিশ্চয়তা যে রাষ্ট্র দিতে পারছে না, সে দেশের রাজনীতি যেন গুটিকয়েক মানুষের ভাগ্যোন্নতির জন্য না হয়। দেশের একটি অঞ্চলকে অশান্ত রেখে অন্য অঞ্চলে শান্তি এবং উন্নতি কোনটিরই নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে না। রাষ্ট্র অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের কাঠামোর মাঝে ঐ সমস্যার সমাধান থাকে। কাজেই রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি না করে এ বিষয়ে একটি ঐকমত্যে আসা, মানুষ এবং রাষ্ট্র উভয়ের জন্যই বাঞ্ছনীয়। একটি সমস্যা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে ঐ রাষ্ট্রই বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়, অন্য কোন রাষ্ট্র নয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি সংলাপ পিছিয়ে গেলেও শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হচ্ছে যথাসময়ে ২১ নবেম্বর

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া ॥ শান্তি সংলাপ পিছিয়ে গেলেও তা কোন প্রভাব ফেলছে না শরণার্থী প্রত্যাবাসনে। ২১ নবেম্বর থেকে পাহাড়ী শরণার্থীরা যথারীতি দেশে ফিরে আসা শুরু করবেন। রবিবার ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে–শরণার্থীদের এই প্রত্যাবাসন একটানা চলবে। সেখান থেকে দেশে ফিরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতাও একই কথা বলেছেন। এবারে তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে বেশি আসবে শরণার্থীরা। ২১ নবেম্বর সকালে এদের প্রথম দলটিকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গ্রহণ করবেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। টানা প্রত্যাবাসন বিষয়ে সেদিনই তাঁর সাথে শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমার একটি বৈঠক হবার কথা। প্রথম দিনে ফিরবেন ১০০ পরিবারের সদস্য। ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনে ফিরবেন ১২১৬ পরিবারের ৬ হাজার ৬শ' ৮৪ জন। এঁরা আসতে আসতে এ দফার পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যাবাসন ইচ্ছুকদের তালিকা চলে আসবে আশা করা হচ্ছে। এদিকে শান্তি সংলাপের স্থগিত বৈঠকের তারিখ ঠিক করতে রবিবারই সরকারী প্রস্তাবের চিঠি খাগড়াছড়ি পাঠানো হয়েছে। আজ সকালে এটি সেখানে যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার হাতে পৌঁছবার কথা। হংসধ্বজ চিঠিটি আজই দুদুকছড়িতে অপেক্ষমাণ জনসংহতি নেতাদের কাছে পৌঁছে দেবেন আশা করা হচ্ছে। আজ-কালের মধ্যেই বৈঠকের তারিখ নিশ্চিত হবে। পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত জনসংহতি নেতারা দুদুকছড়িতে অবস্থানের অনুমতি চেয়েছেন সরকারের কাছে।

প্রত্যাবাসন বিষয়ে আলোচনা করতে ত্রিপুরা সফরে যাওয়া বাংলাদেশ দলটি শনিবার মধ্যরাতে দেশে ফিরে আসে। দলপতি খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল রবিবার জনকণ্ঠকে জানান, এখন আর বিশেষ জটিলতা নেই। শরণার্থী নেতারা ডিসেম্বরের ৫ তারিখে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি বৈঠক করতে চেয়েছিলেন। আমরা বলেছি বৈঠক আরও আগে হোক–আমাদের লোকজন নিয়ে আসা অব্যাহত রাখা দরকার। তাঁরা রাজি হয়েছেন। জেলা প্রশাসক আভাস দিয়ে বলেন, পর্যালোচনা বৈঠকটি ডিসেম্বরের প্রথম তিন দিনের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। রবিবার রাতে আগরতলার একটি সূত্র জনকণ্ঠকে বলেছে, ত্রিপুরা সরকারও চায় এবার প্রত্যাবাসন একটানা চলুক। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসক লোকরঞ্জন

সরকারের পক্ষে এই মতটি জানিয়ে দিয়েছেন শরণার্থী নেতাদের। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের সময় ত্রিপুরা সরকারের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি শরণার্থী নেতাদেরও উপস্থিত রাখা হয়েছিল। শরণার্থীদের বকেয়া জ্বালানি কাঠের টাকা পরিশোধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শরণার্থী নেতারা সেখানে বলেছেন, আমরাও ফিরে যেতে চাই–তবে আমাদের দেশে ফিরিয়ে যেন আশ্রয় শিবিরে নয়, নিজেদের বাড়িঘরে পুনর্বাসিত করা হয়। ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষের ধারণা এই প্রত্যাবাসন চলতে চলতে বহুল আলোচিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে যাবে। তখন প্রত্যাবাসনও অব্যাহত রাখতে নতুন জোর আসবে।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল জনকণ্ঠকে জানান, এবার দেশে ফেরার পরপরই প্রতিটি পরিবারের হাতে নগদ ২১ হাজার টাকা দেয়া হবে। এর ১৫ হাজার টাকা এককালীন গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, ঘর তৈরির কাঠের বদলে নগদ ৩ হাজার টাকা এবং বাকি ৩ হাজার গরু ক্রয় বাবদ। জমির মালিক শরণার্থী পরিবারকে হালের বলদ কেনার জন্য ১০ হাজার, ভূমিহীনদের দুধের গাভি কেনার জন্য ৩ হাজার টাকা দেবার ঘোষণা আছে ২০ দফা স্বচ্ছ প্রস্তাব অনুসারে। এখন গরুর জন্য যে টাকা দেয়া হচ্ছে পরে তা জমির মালিকানা বা ভূমিহীন শনাক্তকরণের ভিত্তিতে এ্যাডজাস্ট করে নেয়া হবে। এ ছাড়া প্রতিটি পরিবারকে এক বছরের রেশন হিসাবে চাল, ডাল, নুন, তেল এবং দুই বান্ডিল সিআই শীট টিন দেয়া হবে ঘর তৈরির জন্য। কোন বিশেষ ঘটনায় নিহত শরণার্থী পরিবারের সদস্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য দেয়া হবে ১০ হাজার টাকা। উল্লেখ্য, এর আগে ৯ মাসের রেশন দেবার কথা থাকলেও গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শরণার্থী নেতাদের বৈঠকে এক বছরের রেশন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার টাকার বিষয়টি ফয়সালা হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপেন্দ্রলাল চাকমাসহ জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ৪ নেতা যোগ দেন।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক জনকণ্ঠকে বলেছেন, ২১ তারিখ থেকে যাঁরা আসছেন তাঁদের বেশির ভাগ মাটিরাঙা থানার বাসিন্দা। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির এক নেতাও এ দফায় দেশে ফিরে আসবেন। তৃতীয় দফা প্রত্যাবাসনের সময় তাঁদের আরেক নেতা অক্ষ্যমনি চাকমা দেশে ফিরে আসেন। এ দফায় টাকুমবাড়ি শিবির থেকে ৩শ' ৭৮ পরিবারের ২ হাজার ১শ' ৯৭, লেবাছড়া শিবির থেকে ৩১ পরিবারের ১শ' ২৫, পঞ্চরামপাড়া শিবিরের ১শ' ৩০ পরিবারের ৭শ', করবুক শিবিরের ৮৫ পরিবারের ৪শ' ৯৩, শিলাছড়ি শিবিরের ৩শ' ৬১ পরিবারের ২ হাজার ৯৬ জন দেশে ফিরবেন। এর প্রধানাংশই আসবেন তবলছড়ি সীমান্তপথে। রামগড় সীমান্তপথে আসবেন

২শ' ৩৩ পরিবারের ১ হাজার ৭৩ জন। প্রথম দিনে ১শ' পরিবার গ্রহণ করা হলেও দ্বিতীয় দিন থেকে গ্রহণ করা হবে প্রতিদিন গড়ে দেড় শ' পরিবার।

জেলা প্রশাসক তাঁর জেলা শহরে ১৪৪ ধারা জারির প্রচারিত খবরকে অসত্য আখ্যায়িত করে বলেছেন, ভকেশনাল ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের আশপাশে ধারাটির অধীনে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

পার্বত্য এলাকায় আজ নানিয়ার চর হত্যাদিবস পালিত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালের এ দিনে সেখানে জাতিগত দাঙ্গায় ২৩ জন নিহত হন। পাহাড়ী গণপরিষদ এ উপলক্ষে ঢাকায় স্মরণসভার কর্মসূচী নিয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

শান্তি চুক্তি হবেই, কারণ মানুষ শান্তি চায় ॥ ঝিকরগাছা ও নাভারনের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি, যশোর থেকে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার পরিষ্কার ভাষায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই জানিয়ে দিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে শান্তি চুক্তি হবেই। কারণ দেশের মানুষ এখন শান্তি প্রত্যাশী। যারা শান্তি স্থাপনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় তাদের কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। তিনি যশোরের ঝিকরগাছা ও নাভারণে দু'টি পৃথক জনসভায় ভাষণ দেন এদিন। দু'টি স্থানের ব্যবধান চৌদ্দ কিলোমিটার হলেও সবখানেই ভিড় উপচে পড়ে এবং তা বিশাল জনসভায় পরিণত হয়।

ঝিকরগাছার সিএম হাইস্কুল মাঠে প্রথম জনসভাটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতটুকু রাজনৈতিক বক্তব্য দেন, নাভারণের জনসভায় ঠিক ততটাই গুরুত্ব দেন উন্নয়নের প্রশ্নটিকে। অবশ্য নাভারণের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যথেষ্ট আবেগপ্রবণ। কারণ এখানে স্থানীয় সাংসদ ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তবিবর রহমান সরদারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন তিনি। সরকারী সাহায্য ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজের দ্বিতল ভবন নির্মাণসহ এর সামগ্রিক উন্নয়ন দেখে তিনি যে কিছুটা আবেগপ্রবণ হবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

শেখ মুজিব যখন একজন সাধারণ নেতা থেকে বাঙালীর অবিসংবাদিত জননেতা হিসাবে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হচ্ছিলেন সেই বিবর্তনকালের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ইতিহাসে জাতির জনকের নাম লিখা থাকবে, শত চেষ্টা করেও কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু একথা হয়ত অনেকেই জানবেন না এ দেশের সংগ্রামে, গণআন্দোলনে আমার মায়ের

কতখানি অবদান ছিল নেপথ্য থেকে। বঙ্গবন্ধু কারাগারে রয়েছেন, অনেক কর্মীও কারাগারে কিংবা পলাতক জীবনযাপন করছেন, তাঁদের সংসার অচল, সে সময় আমার মা তাঁর গহনা বিক্রি করে কর্মীদেরকে দিয়েছেন। স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে অটল ও অবিচল থাকতে সাহস এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন জাতির জনককে। তাঁর নামে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আপনারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমার মা বরাবর উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এজন্য যথেষ্ট ভূমিকাও রেখেছেন। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ থেকে এই অঞ্চলের মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাবে এটাই তাঁর স্মৃতির প্রতি বড় সম্মান জানানো। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে জাতির উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এতে মেয়েদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। খুব দ্রুত যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হতে যাচ্ছে, সেখানেও কারিগরি শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে বলে তিনি জানান। আগামী ২০০৭ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার আলো আমরা সর্বত্র জ্বালাতে চাই। ফজিলাতুন্নেছা মহিলা কলেজের জন্য তিনি যতটা সম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

নাভারণ, যার অনতিদূরের সামটা গ্রামে যে ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে সে প্রসঙ্গ টেনেও প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতোমধ্যে আর্সেনিক দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছে। চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণে সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রতিটি ইউনিয়নে উপকেন্দ্র স্থাপনে বদ্ধপরিকর। তবিবর রহমান সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাংসদ এ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান, সাংসদ আলী রেজা রাজু, সাংসদ আলেয়া আফরোজ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ ছাড়াও মঞ্চে ছিলেন জ্বালানি, বিদ্যুত ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী লেঃ জেনারেল (অব) নুরউদ্দিন খান, দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেক, হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজা, সাংসদ শেখ হেলাল, সাংসদ ফারুক খান প্রমুখ, যাঁদের সাথে জনতার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

ঝিকরগাছার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রবিউল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন হুইপ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অশান্তি এর জন্য দায়ী বিএনপিই, কারণ তাদের আমলেই অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ আমরা যখন শান্তি স্থাপন করছি,

তখন তাঁরা ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যেভাবে বলেছিল দেশ গেল, দেশ গেল, ঠিক সেভাবেই অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিএনপি বলেছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে উলুধ্বনি শোনা যাবে। প্রধানমন্ত্রী জনতার কাছে জানতে চান আপনারাই বলুন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর মসজিদে উলুধ্বনি কিংবা মন্দিরে আযান ধ্বনি শুনেছেন কিনা? জনতা না না ধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাব দেন। শেখ হাসিনা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে বলেন, এবার তাহলে আপনারাই বিবেচনা করুন কে মিথ্যাবাদী? খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে, রক্ত দিয়েছে। অথচ সে সময় বিএনপির জন্মই হয়নি। যারা স্বাধীনতা আনতে পারে, তারা কখনই দেশ বিক্রি করতে পারে না। বরং ক্ষমতায় থেকে যারা লুটপাট করেছে তারাই দেশ বিক্রি করতে পারে।

বিদ্যুতের ঘাটতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি দাবি করে তারা নাকি এ খাতে ৬/৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। যদি সত্যিকারে এত টাকা খরচই হয়। তাহলে বিদ্যুত ঘাটতি থাকবে কেন? আসলে তারা এ টাকার পুরোটাই লুট করেছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুতের ঘাটতি রোধে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বিদ্যুত পরিস্থিতি উন্নয়নে বিদেশী বিনিয়োগ ও ব্যক্তিখাতের ব্যবস্থা করেছি। ভবিষ্যতে বিদ্যুতের জন্য আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া–একে বাস্তবায়ন করতে শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে শরিক হবার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে সর্বক্ষেত্রে। বয়স্ক ভাতা চালু, মহিলা ও যুবকদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সরকারের নানা কর্মসূচীর বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিরোধী দলকে সংসদে ফেরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজপথে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ হবে না। যশোর অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে বৃহত্তর যশোর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮ই নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি সংলাপ আবার শুরু ২৬ নবেম্বর ॥ সরকারী প্রস্তাবে জনসংহতির সম্মতি

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া ॥ পার্বত্য শান্তি সংলাপ আবার শুরু হবে ২৬ নবেম্বর থেকে। জনসংহতি সমিতি সোমবার সরকারী প্রস্তাবে সায় দিলে তারিখটি চূড়ান্ত হয়। যথারীতি এই বৈঠকও হবে ঢাকায়। এই বৈঠকে শান্তি

চুক্তি স্বাক্ষর হবে এমন আশার কথা গতকালও জোর দিয়ে বলা হয়েছে সরকারী তরফে। উল্লেখ্য, এটি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে জনসংহতির ২৫তম, বর্তমান সরকারের সঙ্গে সপ্তম বৈঠক। ১৬ নবেম্বর বৈঠকটি হবার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে উভয়পক্ষের সম্মতিতে তারিখটি পিছিয়ে দেয়া হয়। জনসংহতি ২৫ নবেম্বর পরবর্তী তারিখ প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে সরকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেনি। রবিবার ২৬ নবেম্বর তারিখটি ঠিক করে ঢাকা থেকে সরকারী প্রস্তাব পাঠানো হয় খাগড়াছড়িতে–যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে। হংসবাবু সোমবার সকালে এটি দুদুকছড়িতে জনসংহতি নেতাদের কাছে পাঠান। সেখানকার সম্মতির কথা কাল রাতেই তিনি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। জনসংহতির আনুষ্ঠানিক চিঠি অবশ্য আজ মঙ্গলবার পাঠানো হবে ঢাকায়।

উল্লেখ্য, শেষ মুহূর্তে বৈঠক পিছানোতে সারা দেশে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ষষ্ঠ বৈঠক শেষে সন্তু লারমার মুখে খসড়া শান্তি চুক্তি প্রণীত হবার খবর শোনার পর দেশজুড়ে ব্যাপক আশাবাদের কারণ থেকেই বৈঠক পিছানো নিয়ে সংশয়ের সূত্রপাত। বিএনপি, জামায়াতসহ শান্তি চুক্তি বিরোধীরাও এ নিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড কারখানা ঘটিয়ে দেবার হুমকি দেয়। তারা ইতোমধ্যে চুক্তির পর পরই হরতাল ঘোষণা করে রেখেছে। সরকার চেয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটের সফর, ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে সুষ্ঠু, স্থিতিশীল পরিবেশ। ২৫ নবেম্বর এই দুই উপলক্ষের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে।

বৈঠক উপলক্ষে পানছড়ির দুর্গম সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়িতে এখন জনসংহতির ঊষাতন তালুকদার, রক্তোৎপল ত্রিপুরা, রূপায়ণ চাকমাসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতা অবস্থান করছেন। সমিতির শীর্ষ নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, আরেক প্রধান নেতা সুধাসিন্ধু খীসাও ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছেছেন। শান্তি বৈঠক উপলক্ষে দুদুকছড়ি এলাকার ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প প্রত্যাহার, ৮টি নিষ্ক্রিয় করা হয়। প্রথম দফা বৈঠক থেকেই এই কনভেনশন চালু আছে। বৈঠকের পাঁচদিন আগে, তিন দিন পর পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকলেও এবারে বৈঠক পিছানোর কারণে সরকারপক্ষের সম্মতিতে এই অবস্থান থাকছে মোট ২০ দিন।

এদিকে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির ছেড়ে যেসব বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থী ২১ নবেম্বর থেকে দেশে ফিরবে তাদের স্বদেশে স্বাগত জানানোর আয়োজন চলছে। জেলার সীমান্তবর্তী শহর রামগড় থানা ঘাটে ফেনী নদী পারাপারের জন্য সীমান্তের এপার থেকে ওপারে সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। কনকনে শীতের রাতেও কাজ চলছে। প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য রামগড়

মন্দিরঘাট সেতুটির দু'একদিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ হয়ে যাবে। মাটিরাঙ্গা থানার তবলছড়ি ট্রানজিট পয়েন্টে সীমান্তের পারাপারে সেতু নির্মাণ হয়েছে।

২১ নবেম্বর থেকে যে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হবে তা তবলছড়ি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে চলবে ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত। ২৯ ও ৩০ নবেম্বর দু'দিন রামগড় দিয়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরবে। এবার যারা আসছে তাদের মধ্যে ৮শ' ২৪ পরিবার মাটিরাঙ্গার, ২শ' ২৫ পরিবার দীঘিনালার, ৮৫ পরিবার রামগড়ের, ১৩ পরিবার মানিকছড়ির, ৩৯ পরিবার পানছড়ি থানার ও ১১ পরিবার খাগড়াছড়ি সদর থানার।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

চুক্তির দিন হরতাল নয়, চুক্তি দেখে হরতালসহ কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে ॥ মুন্সীগঞ্জে বেগম জিয়া

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ থেকে ফিরে : বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আগে আলোচনার দাবি জানিয়ে বলেছেন, চুক্তির পর দেশের স্বার্থবিরোধী কাজের বৈধতা দিতে পারি না। সবকিছু হতে হবে চুক্তির আগে। বেগম জিয়া তাঁর ভাষায় বলেন, সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীর কথামতো একতরফা চুক্তি হলে শান্তি আসবে না, ভূখণ্ড রক্ষা করা যাবে না। তিনি কর্মসূচী সংক্রান্ত আগের ঘোষণার পরিবর্তন করে বলেন, চুক্তি যেদিন হবে সেদিন হরতাল নয়। চুক্তি দেখে হরতালসহ কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী মঙ্গলবার বিকালে মুন্সীগঞ্জ সদর উপকণ্ঠে মুক্তারপুর বিসিক ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ নির্বাচনে সন্ত্রাস-কারচুপি হলে পরিণতি ভাল হবে না। তাহলে এখান থেকেই সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হবে। বেগম জিয়া সরকারকে উদ্দেশ করে বলেন, আন্দোলন তো শুরু হয়নি, হতে যাচ্ছে। তিনি চট্টগ্রামে বিএনপির জনসভার দিন সংঘটিত ঘটনার উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, সরকার ও তাদের লোকজন এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি এ সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে বলেন, এতে সত্যিকারভাবে কারা ঘটনা ঘটিয়েছে তা বেরিয়ে আসবে।

মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপি এ জনসভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা শাখার সভাপতি সংসদ সদস্য আব্দুল হাই। জনসভার প্রধান অতিথি খালেদা জিয়াসহ দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় ১৯ নেতা বক্তৃতা

করেন। এঁরা হলেন অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এম শামসুল ইসলাম, ফজলুর রহমান পটল, মিজানুর রহমান সিনহা, মজিবর রহমান মোল্লা, বাবুল আহমদ, সাজু কামাল, অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, সাজাহান সিকদার, মহসিন রেজা, কাজী শহিদুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, আজিজুল হক লেবু কাজী, আলহাজ জসিমউদ্দিন, তারেক কাসেম খান, রিপন মল্লিক ও রফিকুল ইসলাম বাচ্চু। জনসভা পরিচালনা করেন আতোয়ার হোসেন বাবুল। বেগম জিয়া মুন্সীগঞ্জ যাওয়ার পথে দুপুরে মুক্তারপুর ফেরিঘাটে দলের নেতাকর্মীরা তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। ফেরি পার হওয়ার সময় একটি নৌকায় চেপে বাদক দল "প্রথম বাংলাদেশ আমার..." গানের সুর বাজিয়ে ফেরির সঙ্গে নদী অতিক্রম করে। পথে পথে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসে চেপে এবং মিছিল নিয়ে লোকজন জনসভায় যোগ দেয়।

খালেদা জিয়া তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে অথচ তাদের কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক নয়। সভা-মিছিল-হরতাল করা গণতন্ত্রের অংশ। বিরোধী দল সভা-হরতাল করলে সরকার অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে তারা স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে। "ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে" সরকারের এ বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এ সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে নয় ভোট চুরি করে ক্ষমতায় বসেছে। এ সরকারের আমলে একটি নির্বাচনও সুষ্ঠু হয়নি। উত্তরাঞ্চল সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেখানে কৃষক ধান-পাটের দাম পায় না। প্রতিটি কৃষি উপকরণের দাম বাড়ানো হয়েছে। কৃষকরা সুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে। উত্তরাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত খুলে দেয়ায় পিঁয়াজ, আলু, ডিম, মিষ্টি সব আসছে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছে না। পরিকল্পিতভাবে দেশকে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, সরকার শান্তি চুক্তির মাধ্যমে দেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়। সংবিধানের আওতায় সমস্যার সমাধান করতে হবে। ভূখণ্ড রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী সেখানে ছিল, আছে ও থাকবে। বেগম জিয়া এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, শুধু ক্যান্টনমেন্টে থাকলে সেনাবাহিনী বন্দি হয়ে যাবে, তাই স্থায়ী-অস্থায়ী সব ক্যাম্প থাকতে হবে। চুক্তির পর সংসদে আলোচনা হবে সরকারের এ বক্তব্য উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, সব কিছু হতে হবে চুক্তির আগে।

বিএনপি চেয়ারপারসন সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, নির্যাতন-হয়রানি বন্ধ করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করুন, নইলে ফল ভোগ

করতে হবে। আমরা রাজনীতি করব, আপনারা চাকরি করবেন। দলীয় কর্মীর মতো আচরণ করলে চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করেন, জনগণ সচেতন হয়েছে। চামচাগিরি করে কেউ চামড়া বাঁচাতে পারবেন না।

খালেদা জিয়া বলেন, সরকারের লোকজন দুর্নীতি করছে। ২১ বছর খেতে পারেনি বলে তারা লুটপাট শুরু করেছে। ক'দিন ক্ষমতায় থাকবে তা তারা জানে। তাই এই লুটপাট।

অধ্যাপক বি চৌধুরী বলেন, এ সরকার সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ। ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করতে হবে। শামসুল ইসলাম বলেন, সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা দেয়ার নিয়ম আছে। বিএনপি সংসদে যাচ্ছে না। তাই মুন্সীগঞ্জ থেকেই অনাস্থা ঘোষণা করছি। আব্দুল হাই অভিযোগ করেন, এ সরকারের ১৭ মাসে মুন্সীগঞ্জে ৩০টি খুন হয়েছে। এখানে প্রশাসন দলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ করছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের বিবৃতি
পার্বত্য শান্তি চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার আহ্বান

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে আসাদুজ্জামান নূর, আলী জাকের, খায়রুল আলম সবুজ, তারানা হালিমসহ ১১০ জন নাট্য-চলচ্চিত্র শিল্পী পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। সোমবার বিবৃতিতে তাঁরা শান্তি চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

তাঁরা বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছর এই জনপদে শান্তিবাহিনীর সাথে সংঘাতে প্রায় ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। অন্যদিকে এই সংঘাতময় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বার্ষিক ব্যয় দাঁড়িয়েছে পাঁচ শ' কোটি টাকায়।

বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে এই বাড়তি অর্থ ব্যয় এবং বিশাল সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলকে যুগযুগ ধরে অশান্ত করে রাখার যুক্তি নেই।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

বিএনপি সেদিন যে ছাড় দিয়েছিল–

ফজলুল বারী ॥ বিএনপি আজ প্রস্তাবিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে এত সোচ্চার কেন? তাহলে তারা কেন শান্তি আলোচনা করেছিল জনসংহতি সমিতির সঙ্গে? সমিতিকে তারা কি কি ছাড় দেবার কথা বলেছিল তাকি তারা ভুলে গেছে? এসব প্রশ্ন রাখলেন ওয়াকিফহাল এক উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তা। বিএনপি আমলের আলোচনা পর্বের সঙ্গে এই কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু তথ্যও দিয়েছেন যা কিনা বিএনপি'র স্ববিরোধিতা প্রমাণ করে।

উল্লেখ্য, জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল এরশাদ আমলে, ১৯৮৫ সালের ২০ অক্টোবর। পানছড়ির পুজগাং এলাকায় একটি ইউপি অফিসে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আলোচনা চলে মোট ৬ দফা। সেই আলোচনার মূল পরিণতি শান্তি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। এই চুক্তি–পরে যা সম্মত বিবরণী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত করে পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধাবস্থার বিষয়। এরশাদ আমলের যুদ্ধ বিরতি বিএনপি আমলেও তিন মাস অন্তর অন্তর নবায়ন করা হয়েছে। এই নবায়ন বর্তমান সরকারের আমলেও চলছে। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে বিএনপি সরকারের মন্ত্রী কর্নেল (অব) অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় রাজনৈতিক কমিটি। এরশাদ আমলের আলোচনার সূত্র ধরে এই কমিটি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে শুরু করে শান্তি আলোচনা। এরশাদ আমলে জনসংহতি সমিতির পক্ষে দেয়া হয়েছিল ৫ দফা দাবি। বিএনপি'র সঙ্গে আলোচনার টেবিলে সমিতি দেয় ৪৭টি উপদফা সংবলিত সংশোধিত ৫ দফা। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটির পঞ্চম বৈঠক হয় ১৯৯৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফার জবাবে সেই বৈঠকে সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয় লিখিত কিছু প্রস্তাব। সূত্রটি বলেছে, এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে বিএনপি তখন কত বেশি ছাড় দিয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিল জনসংহতির সঙ্গে। জনসংহতির দাবি আর সরকারী প্রস্তাবে ছিল–(১) জনসংহতির নির্বাচিত, স্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদের দাবির জবাবে বিএনপি সরকারের প্রস্তাবে বলা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে বিশেষ এলাকার মর্যাদা, সুবিধা পাচ্ছে। জনসংহতি সমিতির দাবি-দাওয়ার বেশির ভাগ এসব পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এরশাদ আমলে গঠিত ৬৪টি জেলা পরিষদ বিএনপি

আমলে বাতিল করা হলেও তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ তারা বাতিল করেনি, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও এর নির্বাচনের ব্যবস্থা করেনি। (২) পার্বত্য এলাকার জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠনের দাবি জনসংহতির ছিল। বিএনপির লিখিত প্রস্তাবে এই দাবি পূরণ হবে না এমন কথা বলা হয়নি। প্রস্তাবে বলা হয়, 'আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠনের বিষয়টি স্থানীয় সরকার পরিষদের আইনের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত আছে।' বিএনপি এটি স্বীকার করে নিলেও স্থানীয় সরকার পরিষদের আইনের এই কর্তৃত্ব কার্যকর করতে দেয়নি। (৩) জনসংহতির সংশোধিত পাঁচ দফায় বলা হয়, ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্টের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের প্রত্যাহার, পার্বত্যভূমির ওপর পাহাড়ী স্বত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। বিএনপির প্রস্তাবে এই দাবির বিরোধিতা না করে বলা হয় : ভূমির ওপর অধিকার, বহিরাগতদের কাছে জমি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ভূমির বন্দোবস্তির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত আছে তিন পরিষদ আইনে। (৪) পাহাড়ী জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবির জবাবে বলা হয় পাহাড়ী জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে। (৫) বহিরাগতদের পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করতে বলেছিল সংহতি সমিতি। বিএনপি'র প্রস্তাবে এর বিরোধিতার ভাষাও ছিল খুব নমনীয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'বিষয়টি দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। (৬) সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার নিয়ে আজ বিএনপি যে হৈ চৈ করছে তারাই সেই বৈঠকের ষষ্ঠ প্রস্তাবে এ বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিল। প্রস্তাবটিতে বলা হয় নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রয়োজনীয় ছাউনি ছাড়া অন্যসব অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার পর অবশ্যই প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কিন্তু সেনানিবাসসমূহ এবং সেগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার চলতি আলোচনায় একই বিষয় আরও স্পষ্ট করে বলেছে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য এলাকার নিয়মিত সেনানিবাসসমূহ বহাল থাকবে অবশ্যই। (৭) সংসদে পার্বত্য এলাকার আসনসমূহ পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত দাবি করেছিল জনসংহতি সমিতি। বিএনপি'র প্রস্তাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে আরও সম্মান দিয়ে বলা হয় সংসদে 'জুম্ম' জনগণের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন নেই।

কারণ বর্তমান সাংসদরা ইতোমধ্যেই জুম্ম জনগণ থেকে নির্বাচিত। উল্লেখ্য, বর্তমান পার্বত্য এলাকার আওয়ামী লীগ দলীয় তিন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর ১৯৯১'র নির্বাচনেও বিজয়ী হয়েছিলেন। বিএনপি আওয়ামী লীগের এই সাংসদদের দেখিয়েই জনসংহতির সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিল। একই প্রস্তাবে জনসংহতিকে

জানিয়ে দেয়া হয়, সামরিক বাহিনীতে পাহাড়ীদের জন্য কোন কোটা বরাদ্দ রাখা যাবে না। (৮) পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্মল্যান্ড নামকরণের দাবির জবাবে বলা হয় 'এর কোন যুক্তি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। জুম্ম শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসনের অঙ্গীকার অবশ্য করা হয় একই প্রস্তাবে।' (৯) বিএনপি এখন পার্বত্য এলাকায় বাঙালী বিতাড়নের ভীতি ছড়াচ্ছে। সেখানকার গুচ্ছগ্রামসমূহে বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে এই ভীতি ছড়ানো হচ্ছে বেশি। অথচ বিএনপির পক্ষ থেকে দেয়া এই নবম প্রস্তাবে তারাই বলেছিল 'গুচ্ছগ্রামসমূহ ভেঙ্গে দেবার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

বিএনপির পঞ্চম বৈঠকে দেয়া এসব প্রস্তাবের আলোকে সূত্রটি প্রশ্ন রেখে বলেছে, পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা বর্তমান সরকারের চেয়েও বেশি ছাড় দিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে চেয়েছিল। অথচ তারা এখন এ সবকিছুরই বিরোধিতার মাধ্যমে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে। বিএনপি এতটা ছাড় দেয়া সত্ত্বেও তখন সমঝোতা এগোয়নি কেন?–প্রশ্নের জবাবে সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে, স্পষ্টত আন্তরিকতা, আর আস্থার অভাবে সেটি হয়নি। বিএনপি মূলত তখন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিল আন্তর্জাতিক চাপে। সূত্রটি বলেছে, অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিটির বৈঠকে সিরিয়াস আলোচনার চাইতে খোশগল্প হয়েছে বেশি। জনসংহতি তাদের সঙ্গে ষষ্ঠ বৈঠকে সরকারী প্রস্তাবসমূহের বিষয়ে একটি লিখিত জবাব দিয়েছিল।

কিন্তু সরকারী তরফ থেকে তার আর কোন জবাব দেয়া হয়নি। এরপর আর কর্নেল (অব) অলি আহমদ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসেননি। বামপন্থী নেতা রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে একটি উপকমিটির মাধ্যমে পরবর্তীতে আরও সাত দফা বৈঠক চালানো হয় দুদুকছড়ি এলাকায়। বৈঠক উপলক্ষে সেখানে শন-বাঁশের বড় ঘরও তৈরি করা হয়েছিল। সরকারী সদিচ্ছার অভাবে অস্ত্র বিরতি অব্যাহত রাখা ছাড়া এই আলোচনাকে আর এগিয়ে নেয়া যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

ধূম্র পাহাড় হরিৎক্ষেত্র সর্বত্র শান্তির কোরাস

শুভ রহমান

'এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার/ কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়/ কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র/ আকাশতলে মেশে/ এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়/ বাতাস কাহার দেশে!'–এইতো আমাদের দেশ। আবহমান বাংলা। পাহাড়-নদী-সোনালী

ধানের ক্ষেত, সব মিলিয়েই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ-ভূগোল, এ 'টপোগ্রাফি' পাল্টাবে কার সাধ্য! অথচ কি 'রেকলেস' কথা আগ বাড়িয়ে বলে চলেছেন বিরোধী নেত্রী। বলছেন, মানচিত্র বদলানোর চেষ্টা সহ্য করা হবে না। বলছেন, শান্তিচুক্তি হলে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়িয়ে পড়বে। বলছেন, একটিমাত্র উপজাতির সঙ্গে শান্তিচুক্তি করা হলে কেউ তা মেনে নেবে না। আবোল-তাবোল বকেই চলেছেন তিনি। নানাভাবেই বলা হচ্ছে তাঁর দলের পক্ষ থেকে যে শান্তি চুক্তি করে দেশ বিকিয়ে দেয়া হচ্ছে। শুরু করেছেন তিনি বরিশাল থেকে। তারপর চট্টগ্রামে খুনোখুনি হওয়ার পর দিনাজপুর থেকে কুষ্টিয়া পাঁচদিন ধরে জনসভা-সমাবেশে আসন্ন পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার করে যাচ্ছেন। উস্কানি দিয়ে যাচ্ছেন অন্যত্র এবং সব উপজাতির মধ্যেও আবার যাতে বিরোধ দেখা দেয়। এরপর মুন্সীগঞ্জে, তারপর আরও অন্যত্র তার 'অশান্তি মিশন' চলবে।

ওদিকে শান্তির কোরাসে মুখরিত হচ্ছে সারাদেশ। সবাই স্বাগত জানাচ্ছে পার্বত্য শান্তিচুক্তিকে। একটি পত্রিকার শেষ জরীপেও প্রকাশ, শান্তির পক্ষে রয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এবার সংসদে দায়িত্বশীল সাংসদরাও বলেছেন, শান্তি এলে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'সিংগাপুর, হংকং' হয়ে যাবে। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন, আমাদের তো মনে হয়, সমস্ত সম্ভাবনা কাজে লাগালে সারাদেশই অমন সুসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

এই বাস্তব প্রেক্ষাপটেই বিএনপি'র উপস্থিতিবিহীন সংসদ অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা গত রবিবার ৪০ মিনিট গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যে একদিকে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি সম্পর্কে আছে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ, অন্যদিকে, বিশেষ করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সরকারী অবস্থানের 'ক্লিয়ার কাট্' ব্যাখ্যাও রয়েছে। মনে হচ্ছে, বিএনপি'র সংসদ-বহির্ভূত অবস্থান থেকে একরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, কাল্পনিক ও লাগামছাড়া সব কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতেই সংসদনেত্রীকে জাতীয় দায়িত্ববোধ থেকেই ঐ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বিদেশে অবস্থানরত আমাদের শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে চাই। বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ীই এ-ব্যাপারে চুক্তিস্বাক্ষর হবে। যারা সংবিধানকে বার বার ক্ষত-বিক্ষত করছে, তারাই আজ সংবিধানের জন্য মায়াকান্না কাঁদছে। তাদের এই চক্রান্তের খেলা ধরা পড়ে গেছে।

বস্তুত বিএনপি'র চক্রান্ত কি ধরা পড়ে গেছে? প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেত্রী যা বলছেন, তাতে দেশের সাধারণ মানুষ কি 'কনভিন্সড্' হবে! প্রধানমন্ত্রীর উত্তরে কি তারা সন্তুষ্ট এবং আশ্বস্ত হতে পারবে!

চক্রান্তের খেলা সম্পর্কে আভাস দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক 'চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা' ও সংসদ বর্জনসহ বিএনপি'র এযাবতকালের কিছু ভূমিকা তুলে ধরেছেন। সেগুলোর মধ্যে হয়ত এমন একটা পারস্পর্য আছে, যেগুলো দিয়ে বোঝা যেতে পারে বিএনপি কেন সংসদ বর্জন করছে, কেন পার্বত্য শান্তিপ্রক্রিয়ার মতো জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপেরও বিরোধিতা করছে, ইত্যাদি।

বিএনপি'র অনুপস্থিতির কারণে অত্যন্ত জরুরী হওয়া সত্ত্বেও এবারও ৩৫টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের কাজ অসমাপ্ত রাখতে হলো। তবে একেবারে ফেলে না-রেখে সম্ভবত বিএনপি সাংসদদের জন্যই ৪৫টি নামের স্থান খালি রেখে দিয়ে ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠন করে ফেলা হয়েছে। তবু বিএনপি বলেছে, এটা বৈধ হয়নি। সংসদে না-গিয়ে এ-কথা বলার নৈতিক অধিকার তাদের থাকে কি? বিএনপি ছাড়া সংসদীয় কমিটি গঠনকে প্রধানমন্ত্রী নিজেই 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে উল্লেখ করে বলেছেন–১. কেন তাদের এই সংসদ বর্জন আমরা বুঝতে পারি না; ২. যতই দাবি মানা হচ্ছে, ততই নতুন দাবি আসছে; ৩. শর্তের যেন লেজ গজাচ্ছে।

এগুলোকে মনে হয়, নিছক মামুলি অভিযোগ বা নিছক 'স্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্ট' বা 'কথার কথা' বলে লঘু করে দেখার উপায় নেই। বিএনপি'র শর্তের সত্যিই লেজ গজাচ্ছে। এই ১৭ নবেম্বর, '৯৭ সোমবারের জনকণ্ঠেই আছে–'বিএনপি রবিবার রাতে জাতীয় সংসদে গঠিত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেছে, 'বৈধভাবে এ কমিটি গঠন করা হয়নি। পৃথিবীর সংসদীয় ইতিহাসে এভাবে কমিটি গঠনের নজির নেই।' প্রধান বিরোধীদলের নেতারা তাদের পুরনো তিন শর্তের সঙ্গে নতুন এ দাবির উল্লেখ করে বলেন, 'সরকারী দল চায় না বিএনপি সংসদে থাকুক। তারা সংসদকে একদলীয় করার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সংসদ অকার্যকর হলে সরকারই দায়ী হবে।' কথাগুলো বিএনপি নেতারা সংসদ অফিসে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন।

প্রসঙ্গত আমরা এখানে বিএনপি'র পক্ষ থেকে তাদের সংসদে ফেরার প্রশ্নে সংলাপে বসার জন্য যে-তিনটি শর্ত দেয়া হয়েছিল, তা স্মরণ করতে পারি। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গত ১৪ নবেম্বর বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে শর্ত তিনটি উল্লেখ করেন–১. আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; ২. সে-পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিএনপি'র প্রায় ২৫ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো তুলে নিতে হবে; ৩. জনসভার স্থান পুনর্নির্ধারণের আশ্বাস দিতে হবে।

বিবিসি'র সাক্ষাতকার গ্রহণকারী কামাল আহমেদের প্রশ্নের জবাবে মান্নান ভূঁইয়া বলেছিলেন–'১. সম্প্রতি সভার স্থান পুনর্নির্ধারণের পর যে-

কেসগুলো হয়েছে, সেগুলো সব রাজনৈতিক কেস এবং আমরা আশা করছি, সেগুলো প্রত্যাহার করা হবে; ২. পরিবেশ সৃষ্টি হলেই আমরা সংসদে যাব এবং এটা নির্ভর করে সরকারের ওপর।' সরকারের ওপর সব দোষ চাপানোর নোংরা খেলাও তারা খেলে যাচ্ছে। চিহ্নিত বিদেশী বেতার কৌশলে সে-খেলায় উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই সোমবারের জনকণ্ঠেও আছে, কিভাবে সে-বেতার থেকে খাগড়াছড়িতে একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারির মামুলি ব্যাপারটাকেই 'টুইস্ট' করে একজন মন্ত্রীর সাক্ষাতকার হিসাবে অপপ্রচারের মাধ্যমে সে-এলাকায় শান্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে নোংরা বিভ্রান্তি ছড়ানোর খবর দেয়া হয়েছে।

বিএনপি'র অভ্যন্তরেও সংসদীয় গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একটি অংশ রয়েছে। কিন্তু তারা হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। তাদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের সঙ্গে দু'বারের চেষ্টায় গোপন একটা বৈঠক সেরে ফেলেছেন। সেইসঙ্গে নিজামী-সোলায়মান প্রমুখ স্বাধীনতার ঘোর দুশমনদের সঙ্গে বিএনপি'র দৃঢ় একটা আঁতাত তিনি গড়ে তুলেছেন। প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে অবশ্য বেশ আরও আগে থেকেই। কিছুকাল আগে স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে বিএনপি ঢাকায় একটা সংহতি সম্মেলন করেছে। এরপরে পাকিস্তান সফরে গিয়ে খালেদা জিয়া '৭৫-এর বঙ্গবন্ধুর ক্যামুফ্লেজ করা হত্যাকারীদের সঙ্গেও বৈঠকে বসেছেন। আইএসআই-এর সঙ্গে 'হবনবিং' ও 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং'য়ের কানাঘুষাও শোনা যায়।

আজকের বিএনপি'র ভূমিকার সঙ্গে ঐসব ঘটনা বা কথিত ঘটনার যোগসূত্র একটা অবশ্যই রয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটছে বিএনপি'র সংসদ-বর্জন, পার্বত্য-শান্তির বিরোধিতা কিংবা বিক্ষোভ, হরতাল, আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যক্রমের মধ্যে।

সেজন্যই বোধকরি প্রধানমন্ত্রী তাঁর ৪০ মিনিটের বক্তৃতায় চট্টগ্রামে বিএনপি'র জনসভা-উত্তর সহিংস ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, 'ক্ষমতায় থেকে যেমন তারা মানুষ হত্যা করেছে, এখনও একই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে। কেন তাদের এসব কর্মকাণ্ড জাতি তা বুঝতে পারে।'

জাতির একথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট অবকাশই থেকে যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করার সুস্পষ্ট এক নীলনক্সা বাস্তবায়ন করতেই শান্তিপূর্ণ একটা জনসভার শেষপর্যায়ে গিয়ে অকস্মাৎ বোমা হামলা চালিয়ে পুলিশের একজন হাবিলদারসহ ৭টি মূল্যবান প্রাণ কেড়ে নেয়া হলো। সেজন্যই বিএনপি থেকে সাফাই গাওয়া হচ্ছে, পুলিশের ঐ হাবিলদার আসলে ছিল আওয়ামী সন্ত্রাসী। কি হাস্যকর সাফাই! জনসভা

ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্য থাকলে তো তা আরও আগেই করতে পারত, তাদের ভাষায়, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা! এ হচ্ছে '৭৫-পরবর্তী দেশে হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সবসময় অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখার নীলনক্সারই একটি ধারাবাহিক পর্যায় মাত্র।

সদ্যসমাপ্ত সংসদ অধিবেশনে সরকারী সাংসদরা মনে হয়, সঠিকভাবেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়েছেন, এ-নীলনক্সা পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ আইএসআই-এরই। এদেশে পাকিস্তানপন্থী আইএসআই এজেন্টরা আজ বিএনপি নেত্রীকে ঘিরে ফেলে তাঁর নেতৃত্বে আবার এখন সেই নীলনক্সাই কার্যকর করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

সময়টা বেছে নিয়েছে বিশেষ করে তারা দেশের জন্য কল্যাণকর ও দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দু'টি সুনির্দিষ্ট অবস্থাকে নস্যাৎ করার জন্যই–১. দীর্ঘ দু'যুগ পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়-অউপজাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির ঐতিহাসিক চুক্তি–শান্তিচুক্তি আসন্ন ও নিশ্চিত হয়ে ওঠার অবস্থা, ২. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং প্রভৃতি সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অর্থনৈতিক ব্যাঘ্রদেশের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা এদেশের বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও মূল্যবান সব খনিজ সম্পদ আহরণে শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে ওঠায় স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৬ বছর পর এদেশের সত্যিকার অর্থেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অবস্থা।

বিশেষ করে, গ্যাস সম্পদের মজুদের তথ্যই বোধ করি সারাবিশ্বকে চুম্বকের মতো টেনে আনছে। ২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এখনই আছে, যার মাত্র ৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট খরচ হয়েছে। সম্পূর্ণ আহরিত হলে মজুদ ৬০-৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুটেও দাঁড়াতে পারে।

একাত্তরের পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী শক্তিগুলো কিছুতেই চাইতে পারে না আমরা স্বাবলম্বী হই। এ অবস্থাকে তারা মেনে নেবে না। তারা তাই পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীকে ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো এবং উদ্ভট ও কাল্পনিক কত কথাই ছড়িয়ে চলেছে এবং সেগুলো ছড়ানো হচ্ছে বিশেষ করে, গণধিক্কৃত পাক আর্মির কথিত মুর্গি-সাপ্লায়ার ও বর্তমানে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার তথ্য উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদের মুখ দিয়ে। কী কথা সেগুলো? সেগুলো হচ্ছে–পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যে-চুক্তি হতে যাচ্ছে, তাতে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়–চট্টগ্রাম বন্দর, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এমনকি ফেনী পর্যন্ত বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ওদিকে, বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য কর্ণেল (অব) অলি আহমদ সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে এমন কথাও বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে চুক্তি হতে হবে ভারতের সঙ্গে। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে নয়। তারা

গোড়াতেই ঢাকায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারের বৈঠকে বসা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যে-সমস্যা আন্তর্জাতিক বা দ্বিপক্ষীয় নয়, আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মাত্র–ভারত সেখানে চুক্তি করতে যাবে কেন? তার মানে, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শান্তি চুক্তি হতে না-দেয়া। কেননা, এটাকে উপজাতীয় সমস্যা হিসাবেই তারা স্বীকার করতে চাইছে না। অন্য কথায় উপজাতীয় সমস্যাকে তারা চাইছে জিইয়ে রাখতেই। এখানেও একটা 'কাশ্মীর সমস্যা' সৃষ্টি করে রাখতে! তাদের চাওয়ার বহর দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কাদের স্বার্থে তারা সেটা চাইছে। আইএসআই যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে পারে, সেজন্য সেখানে শান্তি আসতে দেয়া যাবে না। সেই সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র লেনদেনের সঙ্গে জড়িত এ-দেশের শান্তি, স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতাবিরোধী শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ আর্থিক স্বার্থও হাসিল হবে। সেরকম অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে অনেকগুলোই বন্ধ করে দেয়। তারপরেও ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আর এদেশের স্বাধীনতাবিরোধীরা অপতৎপরতা চালিয়েই যাচ্ছে। 'উলফা'র কথিত সদস্য অস্ত্রসহ এখানে ধরা পড়ার খবরও বেড়িয়েছে। শান্তিচুক্তির বিরোধীরা বলছে, শান্তিচুক্তি হলে দেশে যুদ্ধ বেধে যাবে। এবং এখন চলমান শান্তি-প্রক্রিয়ার কারণে নাকি পার্বত্য জেলাগুলোয় একটা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকারী ও মৌলবাদী পত্রিকাগুলো তারস্বরে রোজ 'সরেজমিন রিপোর্ট' প্রচারের নামে এসব ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে চলেছে। দেশের মানুষের কাছেতো একথা দুর্বোধ্য কিছু হতে পারেনা যে, এরশাদের আমল থেকেই শান্তি-প্রক্রিয়া সূচিত হওয়ার কারণে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে এখন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতিই অব্যাহত রয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন না-হওয়া মানেই বরং আবার পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ বেধে যাওয়া। গত ২৬ বছরে সে-রকম যুদ্ধে ২০ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে। দেশের মানুষ কি চাইবে না, প্রাণহানি চিরতরে বন্ধ হোক? শান্তিচুক্তি ছাড়া সেটা সম্ভব কীভাবে! আগামী ২৬ নবেম্বর ঢাকায় আবার শান্তি বৈঠক বসছে। আশা করা হচ্ছে, অচিরেই শান্তিচুক্তি হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী যশোরের বিভিন্ন জনসভায় তা দৃঢ়ভাবেই বলেছেন।

তবে শান্তিচুক্তি হওয়া মানেই তো পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া নয়। চুক্তি বাস্তবায়নেও হয়তো লেগে যাবে দীর্ঘসময়। তবে, চুক্তিটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় ও ঐতিহাসিক এক সাফল্য। গঙ্গার ত্রিশ বছর মেয়াদী পানিবন্টন চুক্তিকে দু'দেশেরই কল্যাণকামী ও দেশপ্রেমিক জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে, তবু এখনও তার বাস্তবায়নে দেখা যাচ্ছে নানান সমস্যা। এমনকি তার পুনর্মূল্যায়নও করতে হচ্ছে। কিন্তু তাই

বলে দু'দেশের ঐতিহাসিক চুক্তিকে কি উন্মাদ ও মতলববাজ ছাড়া কারও পক্ষেই বাতিল করে দেওয়া সম্ভব? কিছুতেই নয়। পুনর্মূল্যায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী আগেই তাগিদ দিয়েছিলেন।

আজ এসব ঐতিহাসিক চুক্তিকে যারা 'গোলামী চুক্তি' বলছে, যারা দেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে বিপুল গ্যাস সম্পদ আহরণকে নিরুৎসাহিত করতে দেশ ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করছে প্রকৃতপক্ষে তারাই এদেশকে অনুন্নত, অস্থিতিশীল এবং পরনির্ভর রাখার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তারাই নিত্যনতুন শর্ত জুড়ে দিয়ে সংসদকে অকার্যকর এবং সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চাইছে। তারা আসলেই এদেশকে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার আন্তর্জাতিক অপশক্তির লেজুর মাত্র। তাদের কার্যকলাপ দিয়েই সঠিকভাবে তাদের চিনতে হবে এবং নির্মূল করতে হবে। এ মাটিতে তাদের কোন ঠাঁই নেই। ১৮.১১.৯৭ ॥

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

ভূখণ্ড হারাবার ভয় নেই

সরদার সিরাজুল ইসলাম

পার্বত্য চট্টগ্রামের 'বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর' সাথে সরকারের গত দু'যুগের সংঘাতের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ১৬ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি সমঝোতা চুক্তি করতে যাচ্ছে। এটি সরকারের একটি সহসী পদক্ষেপ। গত দু'দশকে যারা সরকার পরিচালনা করেছে তারা দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চাইতে বরং নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর এমন নির্যাতন চালিয়েছে যে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে যেতে বাধ্য হয়েছে যা কাম্য নয়। দেশবাসীর জানা আছে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে এই এদের সাথে সমঝোতা করার জন্য বিএনপি নেতা ও বিগত সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী কর্নেল অলি আহমদের নেতৃত্বে অন্তত ২৬ বার বৈঠক হয়েছে যার মধ্যে কয়েকবার বৈঠক হয়েছে ভারতের মাটিতে। তারাও চুক্তির খসড়া পর্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোন সমঝোতা চুক্তি করতে পারেন নি। কেন পারেন নি, তা তারা কখনও প্রকাশ করেন নি। সম্ভবত চুক্তি করার মতো সাহস তাদের ছিল না অথবা দেশে সমস্যা টিকিয়ে রাখাই তাদের রাজনীতি। এ ব্যাপারে

ঐ সময় কর্নেল অলির নেতৃত্বে যে কমিটি হয়েছিল তার একজন সদস্য ছিলেন রাশেদ খান মেনন। ভোরের কাগজে সম্প্রতি এক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন বর্তমান সরকারের চুক্তির সাথে বিএনপি সরকারের প্রস্তাবিত খসড়ার পার্থক্য থাকার কথা নয়। কর্নেল অলি এখনও চান শান্তি, তবে এক ধাপ এগিয়ে ডেইলি স্টার পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, ভারতের সাথে চুক্তি হওয়া উচিত। প্রশ্ন, বিএনপি কেন এই চুক্তির বিরোধিতা করতে চায়? তারা কি শান্তি চায় না? চুক্তির শর্ত সম্বন্ধে যদি তাদের কোন আপত্তি থাকে তবে দেশের স্বার্থে বর্তমান সরকারের কমিটিতে তাদের যে সব সদস্য আছে তাদের অথবা দলের যে কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তাদের প্রস্তাবিত খসড়ার সাথে কোন গড়মিল আছে কিনা। বস্তুত চুক্তি হবে আমাদের দেশের একটি বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর সাথে; ভারতের সাথে নয়। তাদের স্বাধীনতা দেয়ার চুক্তি এটি নয়। তা হলে ভূখণ্ড হাতছাড়া হওয়ার প্রশ্ন কেন আসে? সেনাবাহিনী যথারীতি থাকবে। সীমান্ত পাহারা দেয়ার ব্যাপারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকবে। বিদ্রোহীরা তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তারা স্বগৃহে ফিরে আসবে। অস্থানীয় হিসেবে যারা পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে তারাও তাদের অবস্থানে থাকবে। এর পরেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী তো থাকল। আসল কথা শান্তি বাহিনী দেশী-বিদেশীদের মদদ না পেলে যেমনি কিছু করতে পারত না, তেমনি ভবিষ্যতেও তাদের সহযোগিতা না পেলে তাদের দ্বারা শান্তি ভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নেই।

শান্তি চুক্তি হলে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেবে এ ধরনের উক্তি হাস্যস্পদ। একাত্তরে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম বলেই ভারত আমাদের সহযোগিতা করেছিল। এখন সে অবস্থা নেই। এমন একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ভারতের সাথে একীভূত হতে চায়। জ্যোতিবসুর ভাষায় 'দুই বাংলা এক হওয়ার সম্ভাবনা আগামী ৫০০ বছরেও নেই।' সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে কারও ভূখণ্ড দখল করার সময় নেই। কুয়েত দখল করার ঘটনাই এর সর্বশেষ নজির। আর ভারত যদি আমাদের ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করে তাহলে এ দেশের জনগণ বসে থাকবে না। বিশ্ববাসী প্রয়োজনে কুয়েতের মতো আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ভারত কেন আমাদের ভূখণ্ড দখল করবে? এর প্রয়োজন কি? বরং নতুন সমস্যা সে সৃষ্টি করতে যাবে কেন? বাস্তবতা হচ্ছে–আসাম-পূর্ববঙ্গ এবং বাংলাদেশ এক হলে ভারতের জন্য সেটা হবে বড় হুমকি। ভূখণ্ড দখল না হলেও ভারত তার ব্যবসা চালাচ্ছে। সাপটা চুক্তি করে বিএনপিই ভারতের বাজার করে দিয়েছে। একথা

এরশাদও বলেছেন। (জনকণ্ঠ ১১-১১-৯৭) আর '৯১-৯৬ সময়ে ভারতীয় রসগোল্লা পর্যন্ত বিএনপি এদেশে ঢুকিয়েছে। দেশ বিক্রির কথা বিএনপির মুখে মানায় না। কেননা তিন বিঘা করিডোরটি মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের ভূখণ্ড, কিন্তু তা ১৯৯২ সালে খালেদা জিয়া ভারতকে ছেড়ে দিয়ে ২/১ ঘণ্টা ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর টেনেছে। করিডোরটি ভারতের কাছে বিক্রি করে বিএনপি সরকার সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, যা অন্য কোন সরকার করেনি। শুধু ভারতের কাছে ভূখণ্ডই ছেড়ে দেয়নি বরং দেশের সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের কাছে। বলতে লজ্জা নেই ১৯৯১ সালে যেভাবে তারা বিশ্বমোড়লদের হাতে দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ভার ছেড়ে দিয়েছে, তাতে তারা রাজনীতি-সমাজনীতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমাদের সুযোগ ছিল সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে এসব পদক্ষেপ নেয়া। এসব থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ আর নেই। তাই দায়ভার বর্তমান সরকার এবং দেশবাসীকে মোটাদাগে শুনতে হচ্ছে। ভাবতে লজ্জা হয় সরকার বিরোধী দলে মতভেদ থাকবে কিন্তু সে জন্য খালেদা জিয়ার মতো একটি বড় দলের নেত্রী প্রাক্তন এবং ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী যদি দাতাগোষ্ঠীর কাছে মামুলী অজুহাত নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। অভিযোগ করার লোক তো শেখ হাসিনা জাতিকে উপহার দিয়েছেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে। কিন্তু বেগম জিয়া তাঁর কথা শোনেন না। বস্তুত ৫ বছর চেষ্টা করেও। বিএনপি'র সাহস অথবা প্রতিপক্ষের আস্থার অভাব অথবা পাকিস্তানের চাপে এ চুক্তি করতে ব্যর্থতা আর আওয়ামী লীগের সফলতাই খালেদা জিয়ার ঈর্ষার কারণ।

চুক্তি যাতে না হতে পারে সেজন্য খালেদা জিয়া একাত্তর ও পঁচাত্তরের খুনীদের নিয়ে কথিত সর্বদলীয় জোট বেঁধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। জেহাদের প্রথম শিকার দলীয় কোন্দলে বরিশালের জনসভার আগের দিন একজন নিহত আর চট্টগ্রামের ১১ নবেম্বর '৯৭-এর জনসভা শেষে খোদ খালেদা জিয়া এবং সা. কা. চৌধুরী মাইকযোগে তাদের দলীয় অস্ত্রধারীদের পুলিশের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যে নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে জীবনহানি হয়েছে একজন পুলিশসহ ৯ জনের (ইনকিলাব ১৩-১১-৯৭ইং) আর আহত শতাধিকের মধ্যে ২০ জন পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (যাদের দু'জন গুরুতর)। আর সে সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরে বিএনপি যে তাণ্ডব চালিয়েছে তাতে কয়েক শ' গাড়ি ভাংচুর, হোটেল-দোকান লুটপাট করে জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। খালেদা জিয়া এখন কি করতে চান? তবে সবচেয়ে মারাত্মক কথা বলেছেন বি. দোজা চৌধুরী। তিনি আরেকটি ১৫ আগস্ট এবং ৭ নবেম্বর এর ঘটনার সরাসরি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তারা কি মনে করেন সেনাবাহিনী তাদের আজ্ঞাবহ? সেনাবাহিনীর বহু সদস্যের রক্ত বিএনপি সরকার ঝরিয়েছে। গত দু'দশকে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে এবং সব চাইতে বেশি পার্বত্য চট্টগ্রামে।

বিশ্বে যখন সর্বত্র শান্তির লক্ষ্যে মার্কিন-চীন, রাশিয়া-চীন, ফিলিস্তিন-ইসরাইল মতভেদ ভুলতে যাচ্ছে তখন খালেদা জিয়া নিজ দেশের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ শান্তি চান না বলে নিজের রাজনীতিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, তা তিনি বুঝতে পারেন কি? তাঁর নিজের দলের প্রভাবশালী নেতারা কি সবাই তাঁর সাথে আছে? সাইফুর রহমান কি বলেন? আজকাল বড় নেতাদের তো তাঁর সাথে দেখা যাচ্ছে।

চট্টগ্রামের জনসভায় অলি-নোমানরা ছিল না কেন? খুনীদের নিয়ে জোট করে, তাঁর কি লাভ হচ্ছে? তিনি দলীয় প্রভাবশালী নেতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন? তিনি কি বুঝেন না যে বিশ্বে যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা চলছে তাতে জনগণ চায় অর্থনৈতিক মুক্তি; অরাজকতা নয়।

ভাগ্য খালেদা জিয়াকে জাতীয় নেত্রীর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। আচরণটা সে রকমই হতে হবে। শেখ হাসিনার সাফল্যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তৃতীয় বিশ্বে জনপ্রিয়তা ধরে রাখা কষ্টকর বিশেষ করে অন্তহীন সমস্যা জর্জরিত এই বাংলাদেশে। তাই আগামী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করাই সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। আশা করি খালেদা জিয়া ও তাঁর সমর্থকরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২০শে নভেম্বর ১৯৯৭
সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক অঙ্গন বিগত কিছুদিন ধরে অনেকখানি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তপ্ত করে তোলার প্রক্রিয়াটি অবশ্য শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। সম্ভাব্য এই চুক্তির বিরোধিতায় নানা বক্তব্য এরই মধ্যে শোনা গেছে। এবং বিরোধিতায় হরতালও ডাকা হয়েছিল। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্যপরিষদ তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে কয়েকদিন আগে। ওদিকে চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক জনসভায় বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া চুক্তিটি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য দিনে অর্থাৎ ১৬ তারিখে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে সেদিনই, অথবা ঐদিন না হলে যেদিন স্বাক্ষরিত হবে সেদিনই সকাল-সন্ধ্যা হরতালসহ আরও কঠিন কর্মসূচী

ঘোষণা করা হবে বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে বিরোধী দলীয় নেত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া মুন্সিগঞ্জের জনসভায় বলেছেন, চুক্তির দিন হরতাল নয়, চুক্তি দেখে হরতালসহ কঠোর কর্মসূচী দেয়া হবে। ওদিকে নির্ধারিত ১৬ নবেম্বর শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়নি। আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকলেও জনসংহতি সমিতির একটি চিঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৬ তারিখে ঢাকায় পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতির মধ্যে সপ্তম দফা শান্তি বৈঠক হচ্ছে না। জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা অসুস্থ। পরে নতুন তারিখ ঠিক করা হবে দু'পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যমে। সরকারী সূত্র জানিয়েছিল, টেকনিক্যাল কারণে ঐদিন সরকারের পক্ষেও বৈঠকের আয়োজন করা সম্ভব নয়। ফলে গত ১৬ তারিখে প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি, পিছিয়ে গেছে তারিখ। অতি সাম্প্রতিক এক তথ্যে জানা গেছে, পার্বত্য শান্তি সংলাপ আবার শুরু হবে ২৬ নবেম্বর। জনসংহতি সমিতি গত সোমবার সরকারী প্রস্তাবে সম্মতি দিলে এই তারিখটি চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে আরও জানা গেছে, ঐ বৈঠকটিও হবে ঢাকায়। বৈঠকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এমন আশা ব্যক্ত করা হয়েছে সরকারী তরফ থেকে। সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর আকস্মিকভাবে ১৬ নবেম্বর নির্ধারিত বৈঠক পিছিয়ে দিয়ে জনসংহতি সমিতি ২৫ নবেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে। এর পর শান্তি সংলাপের ভবিষ্যতের ব্যাপারে শোনা যায় নানা জল্পনা। যাই হোক, এবার সরকার ও জনসংহতির মধ্যে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে নতুন তারিখ নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল জল্পনার অবসান ঘটেছে।

নতুনভাবে নির্ধারিত সময়ে সপ্তম বৈঠক হবে, এটা আশা করা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, এ বৈঠক একটানা কয়েকদিন চলার পর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই চুক্তি হলে দেশের ক্ষতি হবে। প্রধান বিরোধী দল এই চুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে শান্তিচুক্তি হবেই। কারণ, দেশের মানুষ এখন শান্তি প্রত্যাশী। যারা শান্তি স্থাপনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় তাদের কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। তিনি বলেছেন, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এতকাল কি ঘটেছে? যে পরিস্থিতি এতকাল সেখানে বিদ্যমান ছিল সেটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। একটি স্বাধীন দেশের কোন একটি এলাকায় একটানা অশান্তি-হাঙ্গামা-খুনাখুনি চলতে থাকবে–এটা

কোনভাবেই কেউই মেনে নিতে পারে না। কারণ অশান্তি, হানাহানি, পারস্পরিক শত্রুতা জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়; অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লাভজনক নয়, বরং ক্ষতিকর। পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিন চলেছে অশান্তি সৃষ্টিকারী ঘটনাধারা। সেই ধারাটির স্থায়ী অবসান এখন সমগ্র দেশের স্বার্থেই জরুরী। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক–এটা মানুষ চায়। কিছুদিন আগে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন নামক একটি সংগঠন এক জরিপ চালিয়েছিল। সে জরিপে দেখা গিয়েছিল, পার্বত্য এলাকায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ শান্তি চায়। এর বিপক্ষে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। ঐ জরিপ থেকে জানা যায়, উত্তরদাতার কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, যে কোন সুস্থ মানুষ শান্তিচুক্তি সম্পাদনকে সমর্থন করবে। এর বিরোধিতা করার মধ্যে যুক্তি থাকতে পারে না। ওদিকে অতিসম্প্রতি সহযোগী এক দৈনিকের পক্ষ থেকে পরিচালিত এক চকিত জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, জনমতের ৭০.৪১ শতাংশই অবিলম্বে পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পক্ষে তাঁদের রায় দিয়েছেন। মাত্র ১৯.৪৭ শতাংশ মতামত রেখেছেন এই শান্তিচুক্তির বিপক্ষে। আর এ প্রসঙ্গে কোনরূপ মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন ১০.১২ শতাংশ মানুষ।

পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে বর্তমান সরকার সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে–এটি স্পষ্ট। কিন্তু এ ব্যাপারে সফল না হলেও এর প্রয়োজনীয়তা পূর্ববর্তী সরকার অনুভব করেছিল। আর করেছিল বলেই পূর্ববর্তী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি চুক্তি করার জন্য ভারতে উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে ১৩ বার বৈঠক করেছিল।

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, হানাহানি, রেষারেষি পাকাপোক্তভাবে দেশের কোথাও বহাল থাকাটা জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হচ্ছে সাংবিধানিক কাঠামোর আলোকে এবং আওতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যেই সকলের উদ্যোগে একত্রিত হোক–দেশবাসী এটাই দেখার ব্যাপারে আগ্রহী।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২০শে নভেম্বর ১৯৯৭

কী লিখব তাঁদের পক্ষে

এবিএম মূসা

আকস্মিকভাবে বহুদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক সময়ে বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন, পরবর্তীতে বিএনপি আমলে বিমান প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে সাংসদ আবদুল মান্নান। বিমানের দায়িত্বে

থাকাকালীন তার সুনাম ছিল, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া সাধারণভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে ছিল সুমধুর সম্পর্ক। অনেকের মতো আমি নিজেও মাঝে মাঝে সেই সম্পর্কের সুবিধা নিয়েছি, কখনও কোন ব্যাপারে না করেননি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেই সম্পর্কের কথা এখনও মনে রেখেছি। পরবর্তীতে এরশাদ আমলে জেলে যেতে হয়েছে, তারপর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, সংসদ সদস্য হয়েছেন, প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এত পরিচয় দিলাম এজন্য, যদিও এখন বিএনপি'র সাংসদ, রাজনীতিতে পাদপ্রদীপে নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর মতো ভদ্রলোক আমার মতে বেমানান। বিশেষ করে বিএনপি'র বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণে দলের আরও অনেকের মতো তিনিও পশ্চাৎপটে চলে গেছেন।

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে ভিআইপি লাউঞ্জে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরলেন, তারপরই হেসে বললেন, "আপনার লেখা পড়ি, শুধু আমাদের বিপক্ষেই লেখেন, একটু-আধটু পক্ষেও লিখবেন।" এদ্দিন পর তাঁর আন্তরিকতাটুকু ভাল লাগল, তবে কোন উত্তর দিলাম না শুধু অপ্রস্তুতের মতো হাসলাম। পরে বিমানে বসে ভাবতে লাগলাম। মান্নান সাহেব যে বললেন, আমি শুধু বিএনপি'র সমালোচনা করি। কেন, পক্ষেও কি লেখা উচিত নয়, অন্তত নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার স্বার্থে? আমার কোন কোন পাঠকও মাঝে মাঝে মান্নান সাহেবের মতো অনুযোগ করেন। কোন এক পাঠক একদিন টেলিফোনে সরাসরি বললেন, "আপনি তো জানতাম সাংবাদিক, এ্যাডভোকেট হলেন কবে থেকে? যেভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্রিফ হাতে নিয়েছেন তাতে ওকালতিই মানাত ভাল।" মজার ব্যাপার হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের অনেকে কিন্তু মনে করেন না আমি তাঁদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিচ্ছি। একটু-আধটু সমালোচনা করলেই মুখটা বাঁকা করে ফেলেন। কিন্তু বর্তমান বিরোধী দল ও অতীতের ক্ষমতাসীন বিএনপি'র সমালোচনা কি শুধু পক্ষ-বিপক্ষের ব্যাপার? অর্থাৎ আমি বি-এন-পি'র বিপক্ষ একমাত্র এই কারণেই কি সকল সমালোচনা কিংবা সকল বক্তব্য কি যুক্তিহীন, অর্থহীন ও অকারণ? মান্নান সাহেবের অনুযোগের প্রেক্ষিত এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। বলা যায় কলম ঘুরাবার কথা ভাবা যেতে পারে। ধরে নিলাম, বিএনপি দলীয় রাজনীতি ও কর্মকাণ্ডের পক্ষে লিখতে হবে। কোন্‌টা দিয়ে শুরু করব, কোন্ কাজটির অথবা তাঁদের দলীয় কোন্ বক্তব্যটি সমর্থন করব? প্রথমেই বিএনপি'র প্রধান ও সোচ্চার বক্তব্যটি পর্যালোচনা করতে হয়। সেই বক্তব্যটি হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দেশ বিক্রির অভিযোগ। এই অভিযোগটির যথার্থতা প্রমাণ করে লিখতে হলে জানতে হবে

দেশ ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে, না বিক্রির পাঁয়তারা চলছে। কারণ বেগম জিয়া কখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম, কখনও ফেনী, কখনও সমগ্র দেশ বিক্রি হয়ে গেছে বলেন। আবার বলেন, এখনও বিক্রি হয়নি ষড়যন্ত্র চলছে। লেনদেন চলছে, অতি শীঘ্রই বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় শান্তিচুক্তির পর বিক্রি হবে। তাঁর বক্তব্য মেনে নিলে আমাকে জানতে হবে এই বিক্রি কি বিনামূল্যে সাফ কবলা, না কোন লেনদেনের ব্যাপার আছে। কবে, কখন ও কোথায় এই চুক্তি হয়েছে–তা পরিষ্কারভাবে জানতে হবে। শুধু বেগম জিয়ার কথায় বিশ্বাস করে "গেল গেল, সব গেল" বলে তাঁর সমর্থনে লেখা যায় না। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার খাতিরে বিস্তারিত পাঠককে জানাতে হবে। কারণ কলাম লেখা আর রাজনৈতিক ময়দানে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দেয়া এক কথা নয়। দেশ বিক্রীর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলে এ নিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

দেশ বেচা প্রসঙ্গে আসছে পার্বত্য এলাকায় শান্তির প্রশ্নটি। এই প্রশ্নে বেগম জিয়া শান্তি বা অশান্তির ব্যাপারটি মোটেই বিবেচনা করছেন না। তিনি শুধু বলছেন, (১) চুক্তি হলে এলাকাটি ভারতের দখলে চলে যাবে, (২) এই এলাকা থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার করা যাবে না। তাঁর প্রথম বক্তব্য যদি সত্যি হয় তবে অবশ্যই চুক্তির বিরোধিতা করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে, চুক্তিতে কি আছে এখন পর্যন্ত সবাই জানেন না, সরকারী দলও পুরোপুরি বলছে না। বেগম জিয়াও বিস্তারিতভাবে বলছেন না তিনি কি জেনেছেন, জানার সূত্র কী? বিএনপি নেত্রী যদি মনে করেন, শান্তিচুক্তি করে পার্বত্য এলাকা ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তবে তিনি সকল শর্ত জানেন এবং জনসমক্ষে তাঁকে সব ফাঁস করে দিতে হবে। দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে। পার্বত্য এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করলেই আপনা-আপনি তা ভারতে চলে যেতে পারে না। সাতচল্লিশ সালে ভারতবিভাগের সময়ে র‍্যাডক্লিফ সাহেব মানচিত্রে যে রেখা টেনে এই এলাকাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, সেই রেখাটি মুছে যাবে না। অপরদিকে শান্তিচুক্তি হলে আমার দেশের যেসব নাগরিক ভারতে চলে গেছেন, সে যে কারণেই হোক, তাঁরা নিজ জন্মভূমে ফিরে এলে এলাকাটি বেদখল হয়ে যাবে কি করে? একাত্তরে প্রায় এক কোটি বাঙালী ভারতে চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসাতে কি এই এলাকা বাংলাদেশ না হয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে গিয়েছিল? এবংবিধ কারণে চাকমা শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শান্তি ব্যাহত হবে, বিরাট পার্বত্য এলাকা ভারতের দখলে চলে যাবে তা সমর্থন করে বিএনপি সভানেত্রীর বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে লেখার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, পার্বত্য এলাকায় সংঘাত থাকবে না, সেনাবাহিনী দিয়ে নিজের দেশের নাগরিকদের

হুমকি দিয়ে দাবিয়ে রাখতে হবে না সরকারী দলের–এ বক্তব্য বোঝা অতি সহজ। কিন্তু দেশের মানুষ দেশে ফিরে এলে, বাঙালী তথা বেগম জিয়ার নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাভাষীদের সঙ্গে পাহাড়ী বাংলাদেশীদের ঝগড়া-মারামারি কেন হবে–তা বিরোধী দল পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারছে না। শুধু "ভারত নিয়ে গেল" বলে শোরগোলই করছে। সর্বোপরি, শান্তিচুক্তির আলোচনার জন্য যে সংসদীয় কমিটি করা হয়েছে তাতে অংশ নিয়ে চুক্তির সম্ভাব্য দেশ-স্বার্থবিরোধী শর্তের কেন বিরোধিতা করল না–তাও বলতে হবে। অথবা স্বার্থবিরোধী শর্তগুলো কি অন্তত ব্যাখ্যা করতে হবে। তা না হলে এই চুক্তির বিরোধিতায় বিএনপির পক্ষে কি লিখব?

পার্বত্য এলাকার ব্যাপারে বিএনপি সভানেত্রীর সেনাবাহিনী নিয়ে বক্তব্যও মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি বাদ দিলাম, কিন্তু আমার দেশের একটি এলাকা কাশ্মীর বা শ্রীলঙ্কার জাফনার মতো সেনাবাহিনী দিয়ে দখলে রাখতে হবে কেন? কাশ্মীরীদের মতো আমাদের পাহাড়িয়ারা অন্য দেশের সঙ্গে মিলিত হতে চায় বলে মনে হয় না, তামিলদের মতো বিচ্ছিন্ন হতে চায় বলে শুনিনি। তবে কি আমাদের এই এলাকায় ভারতীয় কোন হুমকি দেখা দিয়েছে, ইরাকের কুয়েত দখলের মতো কোন ঘটনা ঘটবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বেগম জিয়ার মনে? এ ধরনের কোন বক্তব্য তিনি এখনও সরাসরি দেননি। শুধু বলছেন, শান্তিচুক্তি করে সেনাবাহিনী সরিয়ে আনলে এলাকাটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। নিহাত একটি খেলো বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে না পেলে জনাব মান্নান অনুযোগের জবাবে পক্ষে লিখব কি করে? প্রসঙ্গত ভারতীয় দখলের কথাই যদি আশঙ্কা করা হয়, তবে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা যদি এলাকাটি নিতেই চায় তবে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে চুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? আর এই অঞ্চলটি তাদের দখলে রাখার ইচ্ছা থাকলে একাত্তরেই তো সেই সুযোগ ছিল পুরো দেশটিতে কায়েমী হয়ে বসার। অবশ্য বিএনপির নেতারা স্বীকার না করতে পারেন, বাহাত্তরে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না এলে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটত কিনা অনেকে সেই ব্যাপারেও চিন্তান্বিত ছিলেন। দেশের একটি অংশ ভারতের হাতে তুলে দেয়ার বিষয়ে ফিরে আসা যাক। বিলেতে থাকতেই দেশের পত্রিকা হাতে পেয়ে দেখলাম, বেগম জিয়া বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, একেবারে ফেনী পর্যন্ত ভারতে চলে গেছে অথবা অচিরেই যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্যের স্বভাবতই কোন যুক্তি বা প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য ছিল না। সুতরাং এই বক্তব্যের সমর্থনে কিন্তু লেখার প্রশ্নই ওঠে না, তবে সাময়িকভাবে একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম দেশে ফিরব কি করে কিংবা কোথায় ফিরব। আমার

বাড়ি ফেনী, পাসপোর্টে সে কথাই লেখা হয়েছে, যদিও আমি দীর্ঘদিন ঢাকার অধিবাসী। ভাবলাম পাসপোর্টে জন্মস্থানের নাম পরিবর্তন না করে কি ভুলটাই না করেছি। এখন যদি বেগম জিয়া প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ফেনী ভারতে চলে গিয়ে থাকে তবে আমার বাংলাদেশী পাসপোর্টটি কার্যকর হবে কিনা। আমাকে কি লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে নতুন পাসপোর্ট নিতে হবে অথবা ভারতের ভিসা নিতে হবে? আমার বিলেত প্রবাসী বন্ধু অবশ্য আমাকে আশ্বস্ত করে জানালেন, ফেনী এখনও ভারতে যায়নি। কারণ বেগম জিয়ার বাংলাদেশ সংসদের সদস্যপদ বহাল আছে। তিনিও তো ফেনীর অধিবাসী, জন্ম সেখানে না হতে পারে তবু সেই দাবি নিয়েই ভোট পেয়ে এলাকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। এলাকাটি এখনও বাংলাদেশেই আছে। ভারতে চলে গেলে তিনিও এখন ভারতীয় নাগরিক। একজন বিদেশী তো আর বাংলাদেশের সাংসদ পরের কথা একটি রাজনৈতিক দলের সভানেত্রী থাকতে পারেন না, এ নিয়ে কথা বলতে পারাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমার জন্মভূমি ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়েছে কেন তা নিয়ে লেখালেখি করারও গরজ নেই।

তবে কি নিয়ে লিখব বিএনপি'র পক্ষে? একটি গুরুতর বিষয় অবশ্য আছে, তা হচ্ছে সংসদ বর্জন। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখা যায় কিনা তা নিয়ে তারা যেতে পারে? কিন্তু কেন এই বর্জন তাও পরিষ্কার নয়। ধরে নিলাম, এই সংসদে বিএনপিকে কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না, অন্তত বাইরে তাঁরা এ কথা বলে আসছেন। সংসদীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের মতো তুচ্ছ কারণ একটি আছে বৈকি। কিন্তু সংসদে বিএনপি'র অনুপস্থিতির পক্ষে জোরালো বক্তব্য খুঁজে পাচ্ছি না। বর্তমান সংসদ সত্যিকার অর্থে একটি গণপ্রতিনিধিত্বশীল। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সব সংসদ থেকে এর প্রতিনিধিত্বের কাঠামো অতুলনীয়। আগে কখনও বিভিন্ন বা ভিন্ন মতের এত সদস্য সংসদে আসেননি। বৃহত্তম বিরোধী দল রয়েছে, সর্বোপরি এটি সার্বভৌম ও স্বাধীন। এখানে সাংসদেরা যা সিদ্ধান্ত নেন তার উপরে কথা বলার কেউ নেই। আইয়ুব খান, এরশাদ এমনকি জিয়ার আমলে ছিল রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট। বিরোধী দলের বক্তব্যের কোন মূল্যই ছিল না, ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তি এখানে প্রদত্ত বক্তব্যকে কোন পাত্তাই দিতেন না, যা খুশি তা করতে পারতেন। তবুও সেসব সংসদে বা জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল ছিল, যতটা পারত জনগণের কথা তুলে ধরত, নিদেনপক্ষে হৈ চৈ করত কিন্তু একাধারে বর্জন করেনি। বর্তমান সংসদে বিএনপি'র অবস্থান নিশ্চয়ই আইয়ুব-জিয়া-এরশাদের আমলের বিরোধী দলের চেয়েও খারাপ নয়। তবে কেন এই বর্জন, কি লিখব বর্জনের সমর্থনে?

অবশ্য সংসদে ফেরার জন্য বিএনপি'র মহাসচিবের তিনটি শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর দলের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নিঃশর্ত ছেড়ে দিতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বেকসুর নির্দোষ বলে ঘোষণা দিতে হবে? কিন্তু যদি বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতা করতে হয় এই দাবীর পক্ষে লেখা কি বিবেকসম্মত হবে? সব সময়ে লিখছি গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হচ্ছে, আইনের শাসন, আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। তা হলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিনা বিচারে খালাসের কথা লেখা কি উচিত হবে? সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না বলে সরকারের মুণ্ডপাত করব, তারপরেই বলব সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দাও, আমার পাঠকদের কি আমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে? তাছাড়া তাঁরা সংসদ সদস্য পদে দিব্বি বহাল আছেন। ভিতরে যাবেন না কেন? এ যেন চাকুরীতে আছি সাহেবের উপর রাগ করে অফিসে যাব না। তবে মাসে মাসে বেতনটি ঠিকই নেব।

তবে লিখব বৈকি, বিএনপি যদি সংসদে গিয়ে স্পীকারকে "শুয়োরের বাচ্চা", সরকারী দলের সদস্যদের 'চুপ বেয়াদব' না বলে আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা বলে, তেল, চাল-ডালের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে হৈ চৈ করে, চুক্তি সত্ত্বেও গঙ্গার পানি পাচ্ছি না কেন তা জানতে চান তবে অবশ্যই তাদের পক্ষে কলম ধরব, এটুকু নিশ্চয়তা মান্নান সাহেবকে দিতে পারি। এমনকি পানি চুক্তি বরখেলাপের দায়ে যদি বিএনপি ভারতের সমালোচনা করেন তবে তাঁর সুরে সুর মিলাব। কিন্তু চুক্তি কেন করল আওয়ামী লীগ সরকার সেই অবান্তর প্রশ্ন করতে পারব না। মোদ্দা কথা সংসদে আসতে হবে, এমনকি তাঁদের দলের কাকে কোথায় কি কারণে হয়রানি করা হচ্ছে তা নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব তুলে আলোচনা করতে না দিলে যদি ওয়াকআউট করেন তবে নীতিগতভাবে সমর্থন জানাব। পার্বত্য এলাকা নিয়ে কি চুক্তি হচ্ছে তা তাঁদের মতো আমরাও জানতে চাই এবং সংসদে বিবৃতি দিয়ে চীফ হুইপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই জানাতে হবে। বেগম জিয়া কিন্তু জানার দাবি জানাচ্ছেন চাটগাঁ, নীলফামারী আর বগুড়া জনসভায়। সরকারী দলকেও কি মাঠে সভা করে উত্তর দিতে হবে? বিএনপি সংসদে দাবি তুলুক, দশ কলম লিখে তাঁদের প্রতিও সমর্থন জানাব, জোরালোভাবে পক্ষে লিখব। যদি সরকারী দল সংসদে এ সব প্রশ্ন তুলতে না দেয় জবাব না দেয় তবে শুধু কলম নয় ঝাড়া হাতে মান্নান সাহেবদের সঙ্গে রাস্তায় নামব।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২০শে নভেম্বর ১৯৯৭

শরণার্থীরা ফিরতে শুরু করবেন কাল থেকে ॥ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে

ফজলুল বারী ॥ সারা জাতির দৃষ্টি এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে স্থির। ২৬ নবেম্বর শুরু হচ্ছে ষষ্ঠ দফা শান্তি সংলাপ। আগামীকাল শুক্রবার পাহাড়ী শরণার্থীরা আবার দেশে ফেরা শুরু করবেন। তবে শান্তি আলোচনা উপলক্ষে ২৬ ও ২৭ নবেম্বর প্রত্যাবাসন বন্ধ থাকতে পারে। আলোচনা চূড়ান্ত একটি পর্যায়ে আসায় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে চলছে স্নায়ুর লড়াই। জনসংহতির পক্ষ নিয়ে শেষ মুহূর্তে বিশেষ চাপ প্রয়োগের চেষ্টা হচ্ছে সরকারের ওপর। আগরতলার এক চাকমা নেতা দাবি করেছেন, তিনি বুধবার এ ব্যাপারে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। এই নেতা একই চিঠির কপি পাঠিয়েছেন বিবিসির কলকাতা অফিসে। বিবিসির বুধবারের রাতের পালায় এটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে।

বুধবার এ ব্যাপারে আগরতলায় টেলিফোনে যোগাযোগ করলে হিউমেন প্রটেকশন ফোরাম নামের এনজিও প্রধান মৃণাল কান্তি চাকমা জনকণ্ঠকে বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অফিসের ঠিকানায় ফ্যাক্সে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এই চিঠির বিষয়বস্তুর ব্যাপারে জনসংহতি নেতাদের সায় আছে বলে তিনি দাবি করেছেন। তবে তিনি বিশেষ কোন নেতার নাম বলতে চাননি। মৃণাল কান্তি চিঠিতে শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ চেয়েছে। মৃণাল অভিযোগ করে বলেন, শান্তি আলোচনায় পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় বিদ্রোহী জনসংহতি নেতারা ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে তিনি পাহাড়ীদের ভূমি সসম্যা, সেটেলার বাঙ্গালীদের স্থানান্তর, প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিল, বাড়তি ক্ষমতার বিষয় এড়িয়ে খসড়া চুক্তি প্রণয়নের অভিযোগ করেন। মৃণাল এও হুমকির সুরে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করলে ২৬ নবেম্বরের শান্তি বৈঠক ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। উল্লেখ্য, মৃণাল কান্তি চাকমা কিছুদিন আগে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছিলেন ভারত সরকারকে। কিন্তু ভারত সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিবিসিকে বলা হয়, চাকমা শরণার্থী ইস্যুতে তাদের ভূমিকা আছে। কারণ শরণার্থীরা ভারতের মাটিতে থাকে। অন্য কোন রাজনৈতিক বিষয় সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। মৃণাল চাকমার বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্য করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক সদস্য জনকণ্ঠকে

বলেন, যেখানে সন্তু লারমা নিজেই ঢাকা বৈঠকে খসড়া চুক্তির ঘোষণা দিয়ে গেছেন, সেখানে অন্য কারও কাছ থেকে অন্য কোন বক্তব্য কাম্য নয়। এই সদস্য বলেন, শান্তি আলোচনার বিষয়ে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, সন্তু লারমা ছাড়া অন্য কারও বক্তব্য রাখারও সুযোগ নেই। দুই নেতা এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তাঁরা বিষয়টি যথার্থভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

জাতীয় কমিটির এই সদস্য মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, মৃণাল কান্তি চাকমার দুঃখবোধ অন্য কোথাও থাকতে পারে। তাঁর সংগঠন শরণার্থী ইস্যু ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখন শরণার্থীরা চলে এলে তিনি কি করবেন এ বিষয় নিয়েই তাঁর উদ্বিগ্নতা বাড়তে পারে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২১শে নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শরণার্থী
প্রত্যাবাসন
শুরু আজ

ফজলুল বারী/জিতেন বড়ুয়া ॥ বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের দুই সীমান্ত প্রস্তুত। আজ পাহাড়ী শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবাসন আবার শুরু হচ্ছে। ত্রিপুরার শিবির জীবনের পাঠ চুকিয়ে আজ যারা ফিরে আসছেন স্বদেশ-ভূমিতে তাদের প্রথম দলটিকে তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্টে গ্রহণ করবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। পাঁচ সদস্যের প্রথম এ দলটিতে আছেন মাটিরাঙা থানার বিল তালুকদার পাড়া গ্রামের শিক্ষক সুকমল চাকমা (৪০), তাঁর স্ত্রী বীনাপানি চাকমা (৩৬), তাঁদের দুই ছেলে, এক মেয়ে। জাতীয় কমিটির সদস্য পার্বত্য এলাকার তিন সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ, স্থানীয় সরকার চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, বীর বাহাদুর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের সচিব কাজী গোলাম রহমান, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল, সেনাবাহিনীর জিওসি আবদুল মতিন চৌধুরীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত থাকবেন। ওপারে শরণার্থীদের বিদায় জানাতে উপস্থিত থাকার কথা ত্রিপুরার বিদ্যুতমন্ত্রী কেশব মজুমদারসহ কয়েক মন্ত্রীর। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ নেতৃবৃন্দও এ উপলক্ষে সীমান্তে আসবেন। তবলছড়িতে চীফ হুইপের সঙ্গে উপেন্দ্রের একটি বৈঠকের সম্ভাবনাও আছে। গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকায় বৈঠকের পর উপেন্দ্র একনাগাড়ে

শরণার্থী প্রত্যাবাসনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু শরণার্থী নেতারা এবারেও উদ্যোগ নিয়েছেন দফাওয়ারী প্রত্যাবাসনের। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে একনাগাড়ে প্রত্যাবাসনে ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক জনকণ্ঠকে বলেছেন, এই দফায় প্রত্যাবাসন চলতে চলতে আরও শরণার্থীর তালিকা পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে। এর মাঝে বহুল প্রত্যাশিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেলে একনাগাড়ে প্রত্যাবাসনও নিশ্চিত হবে আশা করা হচ্ছে–বলেছে সরকারী আরেকটি সূত্র।

আজ প্রথম দিনে ফিরবেন ১শ' পরিবারের ৫শ' ৭৪ সদস্য। তবলছড়ি সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে ২৮ নবেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৯৩ পরিবারের ৫ হাজার ৯শ' জন দেশে ফিরে আসবেন। এ পর্বে ত্রিপুরার টাকুমবাড়ি শিবিরের ৩শ' ৭৮ পরিবার, লেবাছড়া শিবিরের ৩১ পরিবার, পঞ্চরামপাড়া শিবিরের ৩১ পরিবার, কারবুক শিবিরের ৮৫ পরিবার এবং শিলাছড়ি শিবিরের ৩শ' ১৬ পরিবার ফিরছেন দেশে। ২৯ ও ৩০ নবেম্বর রামগড় সীমান্ত দিয়ে ফিরবেন ২শ' পরিবারের ১ হাজার ৭৩ জন। এঁরা আসছেন কাঁঠালছড়ি শিবির থেকে। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য এলাকায় পরিকল্পিত অশান্তি, দাঙ্গার প্রেক্ষিতে এই শরণার্থীরা প্রাণ ভয়ে স্বদেশ-ভূমি ছেড়ে গিয়েছিলেন। ভারত সরকার প্রথমে তাদের সীমান্তে পুশব্যাক করে ফেরত পাঠিয়েছিল। কিন্তু পরে অব্যাহত জনস্রোতের প্রেক্ষিতে মানবিক কারণে তাদের ঠাঁই করে দেয়া হয়। এর মাঝে বার্ধক্য আর অসুখ-বিসুখে অনেকের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। তাদের আর দেশে ফেরা হলো না। শিবিরে জন্ম হয়েছে অনেক শরণার্থী শিশুর। যারা দেশের কথা শুনেছে। দেশ দেখবে এই প্রথম। ১৯৯২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরে গেলে তাঁর তৎকালীন ভারতীয় প্রতিপক্ষ নরসীমা রাওয়ের সঙ্গে বৈঠকে শরণার্থী প্রত্যাবাসনে সম্মত হন। সেই সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালের ১৫-২২ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফায় ৪০৫ পরিবারের ১৯৭২ জন, এর পাঁচ মাস পরে দ্বিতীয় দফায় ৬শ' ৪৮ পরিবারের ৩ হাজার ৩শ' ২৭ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। কিন্তু পুনর্বাসন যথাযথ না হবার অভিযোগে পরবর্তীতে প্রত্যাবাসনের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ বছরের প্রথম দিকে তৃতীয় পর্বে ১ হাজার ২শ' ৪৮ পরিবার দেশে ফিরলেও সেই প্রত্যাবাসনও অব্যাহত থাকেনি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরণার্থী নেতাদের বৈঠকের পর এ সম্পর্কিত জটিলতার অবসান হয়। প্রধানমন্ত্রী সেই বৈঠকে শরণার্থী পরিবারের রেশন ১ মাসের জায়গায় এক বছর, নিহতদের শ্রাদ্ধের জন্য ১০ হাজার টাকা মজুরের সিদ্ধান্ত দেন। এছাড়া ১৯৯৪ সালে দুই সফায় এবং ইতোমধ্যে স্বেচ্ছায় যেসব শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রেও ২০ দফা গুচ্ছ

প্রস্তাবের সুযোগ সুবিধা মঞ্জুরের আশ্বাস দেন তিনি। এতে করে আগে যারা এককালীন ১০ হাজার টাকা গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি পেয়েছেন তাঁরাও বর্তমানের ১৫ হাজার টাকা হারের বাকি অংশ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। রেশন বাদে এসব দাবি-দাওয়া মেটাতে প্রায় ৩০ কোটি টাকার দরকার হবে। আজ থেকে যারা দেশে ফিরছেন তাঁদেরকে অভ্যর্থনা কেন্দ্রেই নগদ দেয়া হবে ২১ হাজার টাকা। এর ১৫ হাজার গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি, ৩ হাজার ঘর তৈরির কাঠ বাবদ, ৩ হাজার টাকা গরু ক্রয় বাবদ দেয়া হচ্ছে। ২০ দফা গুচ্ছ প্রস্তাবে জমির মালিকদের হালের বলদ ক্রয় বাবদ ১০ হাজার, ভূমিহীনদের দুধের গাভী ক্রয় বাবদ ৩ হাজার টাকা দেবার ঘোষণা আছে। জমির মালিকানা শনাক্তকরণ সাপেক্ষে পরবর্তীতে এডজাস্ট করে নেয়া হবে গরুর টাকা। এছাড়া প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে এক বছরের রেশন হিসাবে চাল, ডাল, নুন, তেল-এর একটি অংশ প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দেয়া হবে অভ্যর্থনা শিবিরে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২১শে নভেম্বর ১৯৯৭

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তি চুক্তি

আনিসুল হক

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল একটি সমস্যা, জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। কমিটির মধ্যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কয়েকজন সাংসদ ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। কমিটি জনসংহতি সমিতির সাথে কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে একটি খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেছে। জনসংহতি সমিতির নেতা সন্তু লারমা এই খসড়া চুক্তি প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, পরবর্তী বৈঠকে সরকারের সাথে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হবে। সরকার পক্ষ থেকেও এ ঘোষণার সত্যতা পাওয়া গেছে।

সংলাপের সময় কমিটির বিএনপি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন না, জাতীয় পার্টির সদস্য ২টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি কেন সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি আর জাতীয় পার্টি পরবর্তীতে কেন সরে দাঁড়াল তার কারণ দেশবাসীকে জানিয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ বর্তমানে এ দু'দল সম্ভাব্য চুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিএনপি-জামায়াতসহ কয়েকটি বিরোধী দল একে প্রতিহত করার জন্য আন্দোলনে নেমেছে এবং এর মধ্যে কিছু কর্মসূচীও পালন করেছে, ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচীর ইঙ্গিতও দিয়েছে।

সংলাপের সময় উভয়পক্ষ বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছে। একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। তবে 'খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে, পরবর্তী বৈঠকে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হবে'–এমন ঘোষণা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণ আশা করেনি। একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের ব্যাপারে দেশবাসীকে উপেক্ষা করে এবং জনগণের নির্বাচিত সংসদকে পাশ কাটিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাওয়াটা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সঙ্কট সমস্যা দূর হয়ে শান্তি ফিরে আসুক, এটা সকলেই চায়।

সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে একটি সমঝোতা চুক্তির উদ্যোগের পাশাপাশি আর একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজধানীকেন্দ্রিক দেশের নামী-দামী বুদ্ধিজীবীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আনা হচ্ছে। এঁরা পর্যায়ক্রমে ৫/৬ জনের ছোট ছোট দলে এখানে এসে মুক্তভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে মতবিনিময় করছেন, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করছেন। এই দলভুক্ত বুদ্ধিজীবীবৃন্দ তাঁদের অনুভব-অনুভূতি মিলে অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়াবলী যে সরকারকে জানাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারার এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ মুহূর্তে যাঁদেরকে স্মরণ করতে পারছি তাঁরা হলেনঃ ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার মাইনুল হোসেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এনায়েত উল্লাহ খান, শফিক রেহমান, মুনতাসির মামুন, মমতাজ উদদীন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবুল মাল মুহিত, ড. আবদুল মান্নান, শাহরিয়ার কবীর, গিয়াস কামাল চৌধুরী, মতিউর রহমান, বোরহান আহমেদ, সৈয়দ তোসারফ আলী, তারেক শামসুর রহমান, সাঈদ উর রহমান, শাহীদুজ্জামান প্রমুখ। আগতদের কেউ কেউ আগে ২/১ বার বেড়াতে এসেছেন, অন্যরা আসেননি। কেউ কেউ বলেছেন, পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর বই-পত্র পড়া নেই, পত্র-পত্রিকা এবং মুখে মুখে যা শুনেছেন তাই সম্বল। সময় এবং পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার কথা চিন্তা করে এরা হেলিকপ্টারে এসে আবার হেলিকপ্টারেই চলে গেছেন। আমার জানার মধ্যে প্রায় সকলেই আন্তরিকভাবে সমস্যা উপলব্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে দু'একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতে আসা লোকজনের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। ২/১ জনের আচরণে মনে হয়েছে যেন তাঁরা পাঠশালায় শিশুদের পড়াচ্ছেন আর বোঝাচ্ছেন। একজন বিশিষ্ট লেখকের ব্যবহার ছিল কর্কশ এবং শ্লেষাত্মক। ভাবখানা এই যে, তিনি সবকিছুই জানেন ও বোঝেন এবং উপস্থিত লোকজন যা বলছেন সবই মিথ্যা। কেউ কিছু বলতে চাইলে তিনি আগেভাগে 'জানি-জানি' বলে তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করে বসেন। তার পরও বলব এ ধরনের পদক্ষেপের জন্য সরকার বাহবা পাবার যোগ্য।

অধিকাংশ উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বন্ধের মধ্য দিয়ে শান্তি ফিরে আসুক এটা চায়। এই সাধারণ উপজাতিরা অ-উপজাতিদের সাথে জমিজমাসহ কোন সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে ভাবিত বলে মনে হয় না। এদের অবশিষ্ট অংশ এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে অ-উপজাতি উচ্ছেদ করে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ ও হিল উইমেন ফেডারেশনের মধ্যে স্পষ্ট বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এদের অধিকাংশ বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে কাজ করছে। ছোট ছোট উপজাতীয় সম্প্রদায় তাদের অধিকার ও অস্তিত্বের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়। তারা মনে করে জনসংহতি সমিতি, শান্তিবাহিনী, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন ফেডারেশন ও পাহাড়ী গণপরিষদ চাকমা সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র প্রাধান্য বলে শান্তি চুক্তির পর সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে তারাই। তাছাড়া জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফার ভিতর কেবল ১০টি জাতিসত্তার কথা বলা হয়েছে; অথচ তঞ্চঙ্গা, গুর্খা, অহমিয়া, সাঁওতাল এবং রাখাইনরা যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করছে। এরা বাদ পড়ল কেন এবং এদের কথা বলবে কে? চুক্তিনামায় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি সরকারকে নিজ দায়িত্বে নিশ্চিত করতে হবে।

অধিকাংশ অ-উপজাতিও শান্তি চায়। আদি, পুনর্বাসিত যাই বলা হোক না কেন–এরা সকলেই একেবারে সাধারণ শ্রেণীর। এদের দাবি বা চাওয়া-পাওয়ার তেমন কিছু নেই। এরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছে সেভাবে থাকার নিশ্চয়তাটুকুন চায়। সরকার এখনও যাদেরকে গুচ্ছগ্রাম নামক বন্দীশিবিরে রেখেছে তা থেকে তারা পরিত্রাণ চায়, যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা বলে এখানে আনা হয়েছে তা যেন অনতিবিলম্বে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কে তার ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে চায় ও যায়? রিক্ত, নিঃস্ব এবং অস্তিত্বহীনরাই কেবল সরকারের দেয়া কোন প্রলোভনের বড়শি গিলতে পারে। যে যাই বলুক না কেন সরকার কেবল এদেরকে এখানে ছুড়ে ফেলেই দায়িত্ব শেষ করেছে। তবে তারা বসে থাকেনি, থেমে থাকেনি–হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি আর দেহের রক্ত ঝরিয়ে আজ যে অস্তিত্বের ভিত তৈরি করেছে তা থেকে তাকে যেন কোন অজুহাত তুলে বঞ্চিত করা না হয়। কেউ কেউ এদেরকে মন্দ মানুষ বলে অপবাদ দেয় অথচ এই মন্দ ঘোষণাকারী শিক্ষিত মানুষগুলো যদি প্রকৃত শিক্ষিত হতো তা হলে তারা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারত যে, আসলে তারাই মন্দের হোতা। অ-উপজাতিদের হাতেগোনা একটি শ্রেণী আছে যারা শান্তি চায় না। এরা অন্য জেলা থেকে শূন্য হাতে এখানে নিজেরা নিজেদেরকে আশ্রিত করেছে। ছলে-বলে-কৌশলে অগাধ সম্পদ ও টাকার

মালিক হয়েছে। এই শ্রেণীর সাথে বাইরের কিছু প্রভাবশালী লোকও (যারা এখানে থাকে না) আছে যারা বিভিন্ন কৌশলী চক্রান্তে অনেক পাহাড় জমি হাতিয়ে নিয়েছে। এদেরই সকল রকম অপকর্মের বোঝা বহন করতে হচ্ছে সাধারণ নিরীহ অ-উপজাতিদের। সরকার উদ্যোগ নিলে এই লুটেরা শ্রেণীকে চিহ্নিত করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

সংলাপের সময় উভয়পক্ষ বেশ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেছে। একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কোন পক্ষ থেকে খসড়া চুক্তির বিষয়াবলী প্রকাশ করা না হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিভিন্নভাবে তা তুলে ধরেছে। সরকারী পত্রিকা বিচিত্রাও দফাভিত্তিক বিষয়গুলো প্রকাশ করেছে। সরকার পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে হ্যাঁ, না কিছু বলা হয়নি। তবে এদিকে কিছু অবাঞ্ছিত বিষয় পার্বত্য এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উপজাতীয়দের প্রায় সমান সংখ্যক অ-উপজাতির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যেমন–সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেয়া হবে, যার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে; পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক পরিষদের হাতে থাকবে এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে এ পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে; যে সকল অউপজাতি এখানে জায়গা-জমি কিনেছে তা নিয়ে যাওয়া হবে, পুনর্বাসিত অ-উপজাতিরা ২০/২২ বছর ধরে যে সকল স্থানে বসতবাড়ি তৈরি করে বসবাস করছে এবং যে জমিতে চাষাবাদ করছে তা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে নতুন স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে; যাদেরকে জোর করে (?) এখানে আনা হয়েছে তাদেরকে এখান থেকে বিতাড়ন করা হবে। কাপ্তাই লেকে পানি ধরে রেখে এর পাড়ে বসতি স্থাপনকারী অ-উপজাতিদের বাড়িঘর ও তাদের চাষাবাদী জমি ডুবিয়ে এখান থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ইত্যাদি। আবার কে বা কারা অ-উপজাতি পাড়ায় গিয়ে ফরম বিতরণ করছে এবং জানতে চাচ্ছে কত টাকা দিলে চলে যাবে; কেউ কেউ বলছে, এটা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হয়ে যাচ্ছে, এখানে আর থাকা যাবে না, অতএব আগে ভাগে চলে যাও। এ সকল গুজবের কথা সরকারের কানে না যাওয়ার কথা নয়। সরকার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জরুরী আইনগত ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির পর একদিকে শান্তিবাহিনীর আগমন অপরদিকে বিরোধী দলের হুমকি ইত্যাদি মিলে উপজাতি, অ-উপজাতির মধ্যে একটি আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই আতঙ্ক মুক্ত হতে তারা এখনও সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থাশীল বলে মনে হয়, কিন্তু বর্তমানে তাদের কোন ক্ষমতা আছে কি?

সরকার যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে চেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক সে সময় পাকিস্তানী নাগরিক ত্রিদিব রায় সে দেশের 'ডন' পত্রিকায় দেয়া এক

সাক্ষাতকার 'আজকের কাগজ' পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। তিনি বলেনঃ 'তিনি এখনও চাকমাদের প্রধান। তিনি জানান শুধু তাঁর অনুপস্থিতে চাকমাদের জন্য তার ছেলে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।....যদি মিজু এবং নাগারা স্বায়ত্তশাসন পেতে পারে তবে কেন চাকমারা নয়?' ঠিক একই ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে ২৩ নবেম্বর ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে। ওয়ার্ল্ড চাকমা অরগানাইজেশনের সেক্রেটারি জেনারেল ভারনারেবল বিমল ভিক্ষু ঐ সেমিনারে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেনঃ 'It is therefore, worthwhile to think that perhaps the creation of a separate homeland for the Chakmas is the only solution to safeguard their indentity and to ensure them the right to self determination.' এই লোকের একখানা ৩২ পৃষ্ঠার বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে ১৯৯৩ সালে, নাম 'Inquest of peace.' বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তার পঠিত প্রবন্ধের সংকলন। এ বই-এর ২০ পৃষ্ঠায় যা ২১ ফেব্রুয়ারি '৯২ ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আইএনইবি কনফারেন্সে বলেছিলেন ঃ 'Bangladesh security forces and Bengali Muslims settlers Enclave have killed perhaps more than 2,00,000 people in the CHT since the formation of Bangladesh.' 12 IPOJmr, 1989 xJPu \JKJPJ FT Bkx TjiJPrP mPuPZj" 'At present 90,000 refugees have taken shelter in 6 refugee camps in the Tripura State of India", (ঐ, পৃ. ১৬)।

পাঠক লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যে ২টি বিষয়ই খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঃ (১) ত্রিদিব রায় চান চাকমাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন আর বিমল ভিক্ষু চান আলাদা দেশ। তা হলে অন্য সম্প্রদায়গুলোর কি হবে? তারা যাবে কোথায়? (২) বিমল ভিক্ষু বলেছেন, দু'লাখ লোক মেরে ফেলা হয়েছে, আর নব্বই হাজার লোক ভারতে চলে গেছে। তা হলে তো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে তিন লাখের অধিক উপজাতি থাকার কথা নয়। বিমল ভিক্ষু জাপানের সেই প্রেস কনফারেন্সে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুনর্বাসিতদের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা হলোঃ

Phase 1: 1980	25,000 Muslim Bengali families.
Phase 2: 1981	1000,000 Muslim Bengali families.
Phase 3: 1982	250,000 Muslim Bengali families. (ঐ, পৃ. ১৮)

দেখুন, বাংলাদেশ পরিবার প্রতি জনসংখ্যার হিসাব সম্ভবত ৫.১। যদি ৫ জনও ধরি তাহলে জনসংখ্যা হবে ৬৩,৭৫,০০০ অর্থাৎ তেষট্টি লাখ পঁচাত্তর হাজার। এ ব্যাপারে কি সত্য মিথ্যার প্রশ্ন তোলার দরকার আছে? শান্তি ও সহঅবস্থানের জন্য এদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা এবং মিথ্যা তথ্য পরিবেশনা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, আর না হয় শান্তিকামীদেরকে এদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা আগে থেকেই আমাদের মাথায় ঢুকে আছে। যেন তারাই পার্বত্য সমস্যার হোতা এবং এ সমস্যা জিইয়ে রেখেছে, তারা অকাতরে লুটেপুটে খাচ্ছে আর নির্বিবাদে ধর্ষণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে, এখানে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই সরকারী নির্দেশে দায়িত্ব পালনের জন্য তারা এসেছে। পত্রচারণা অনুযায়ী ধর্ষণ চললে অন্তত এতদিনে কুড়ি বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের চেহারাই পাল্টে যেত। সেনাবাহিনী আলাদা জগতের মানুষ নয়, তাদেরকে আলাদাভাবেও সৃষ্টি করা হয়নি। তারা আমাদেরই সন্তান, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়স্বজন। দায়িত্ব পালন করতে এসে তারাও অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। কখনও কখনও ভুলভ্রান্তি বা অপরাধ তারা করেনি এমন কথা বলা যাবে না। তবে তার জন্য অনেকে চাকরি হারিয়েছে। কারও কারও পদাবনতিও ঘটেছে। সেলিব্রেল ম্যালেরিয়ায় শুধু তারা মরেনি, মরেছে তাদের প্রিয়জনও। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অশান্ত পরিবেশের মধ্যেও যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার মূলে এদের বিরাট অবদান রয়েছে। সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির পর সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে থাকবে কি থাকবে না, থাকলে কিভাবে থাকবে এবং তাদের ভূমিকা কি হবে তাও চুক্তির আওতাভুক্ত হওয়ার কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তির জন্য ভারতের সহযোগিতা অপরিহার্য। তবে বিনিময় ছাড়া এ সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। আর অশান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সে অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সংক্ষিপ্ত ও সরলীকরণের জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ সাধনের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা দরকার। ভারত একটি বিরাট দেশ, দেশটি বর্তমানে বিরাট সমরশক্তিতেও পরিণত হয়েছে। এই শক্তিশালী দেশটির সাথে কয়েক শত মাইল সীমান্ত এলাকা রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের তিনদিক ঘিরে রেখেছে ভারত। দেশ ভারতীয় পণ্যে সয়লার হয়ে গেছে, ফলে দেশী শিল্পকারখানাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশ। এ অবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে বৈরীভাব দেখানো বা বৃহৎ শক্তিকে এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণও সুবুদ্ধিসম্পন্ন হবে না। তবে অবশ্যই

জাতীয় স্বার্থকে দেখতে হবে, জাতির বর্তমান-ভবিষ্যতকে দেখতে হবে। উদারনীতি গ্রহণের দরকার আছে, কিন্তু এমন কোন চুক্তি বা সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না যাতে করে দেশ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি হয়।

যেহেতু বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতি-অউপজাতির সংখ্যা প্রায় সমান, এ কারণে শান্তির জন্য উভয়পক্ষকে প্রায় সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং প্রায় সমান মর্যাদা দিতে হবে। এ ছাড়া উভয়পক্ষকে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ও সহনশীল হতে হবে, সহ-অবস্থানের প্রতি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। না হয় শান্তি ও সমঝোতার কথা শুধু কাগজেই লেখা থাকবে, বাস্তবে তার নাগাল পাওয়া যাবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শরণার্থী প্রত্যাবাসন আরম্ভ ॥
প্রথম এলো শিশু তুতু
বাংলাদেশের পতাকা হাতে

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে : পাহাড়ী শরণার্থীরা আবার দেশে ফেরা শুরু করেছেন। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, এ দফার প্রত্যাবাসন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম দফায় আরও ৬ হাজার শরণার্থী ফিরে আসবেন দেশে। দীর্ঘ ১২ বছরের শরণার্থী জীবনের পাঠ চুকিয়ে শুক্রবার তবলছড়ির সীমান্ত দিয়ে যিনি প্রথম পা রাখলেন স্বদেশে তিনি হলেন, মাটিরাঙা থানার একজন স্কুল শিক্ষক সুকমল চাকমা। শরণার্থী শিবিরে জন্ম নেয়া। তাঁর শিশুপুত্র সুকুমার চাকমা তুতুর হাতে ছিল বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা। এপারে ওপারে শত শত মানুষ এ দৃশ্য দেখে আবেগে আপ্লুত হয়। ওপার থেকে সুকমল চাকমাকে পাঁচ সদস্যের পরিবারসহ বিদায় জানান ত্রিপুরার বিদ্যুত ও জ্বালানিমন্ত্রী কেশব মজুমদার। এপারে এদেরকে বরণ করে নেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। এরপর আলোকিতা তালুকদার (৩০) ৪ সদস্যের পরিবার ও নিজেদের মালামালসহ স্বদেশে আসেন। শুক্রবার ৩টি নবজাতকসহ ১শ' পরিবারের ৫শ' ৭৭ জন শরণার্থী ফিরে এসেছেন দেশে। আজও প্রত্যাবাসন চলবে। ২৮ নবেম্বর পর্যন্ত এ যাত্রায় শরণার্থীরা তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে আসবেন। ২৯, ৩০ নবেম্বর আসবেন রামগড় সীমান্তের মন্দিরঘাট দিয়ে।

শুক্রবার প্রত্যাবাসন পর্ব সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হবার কথা থাকলেও তা দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা পর শুরু হয়। শরণার্থীদের বকেয়া পরিশোধ, ওপার থেকে আসার জন্য যানবাহন সমস্যা এসব কারণে তাঁরা সীমান্তে পৌঁছতে দেরি করে

ফেলেন। ওপারের শিলাছড়ি এলাকায় বিদায় উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাধিপতি রতন ভৌমিকের সভাপতিত্বে সেই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিদ্যুতমন্ত্রী কেশব মজুমদার, যুব ক্রীড়ামন্ত্রী জীতেন চৌধুরী, শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা, বাংলাদেশের চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, কল্পরঞ্জন চাকমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কেশর মজুমদার শরণার্থীদের ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। শরণার্থীদের উদ্দেশে বলেন, দেশে ফিরে গিয়েই নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। চীফ হুইপ আব্দুল্লাহ বলেন বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাবাসনের আন্তরিক সব উদ্যোগ নিয়েছে। পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও এখন দ্বারপ্রান্তে। উপেন্দ্রলাল চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। আশা করি প্রত্যাবাসন যথাযথ হবে। বাকি ৩৬ হাজার শরণার্থীও দেশে ফিরতে পারবেন শীঘ্রই।

উপেন্দ্রলাল চাকমা ঘোষণা দিয়ে বলেন, চতুর্থ দফা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চম দফায় আরও ৬ হাজার শরণার্থীকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। পঞ্চম দফার পর ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পর পরবর্তী প্রোগ্রাম সিডিউল তৈরি করা হবে। এসময় চট্টগ্রামের সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ান, রাঙ্গামাটি পরিষদ চেয়ারম্যান চিংকিউ রোয়াজা, বীর বাহাদুর এমপি, দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, জাতীয় কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি, আতাউর রহমান খান কায়সার, জাতীয় পার্টির হুইপ এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী, এসএস চাকমা, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব কাজী গোলামুর রহমান, এলজিইডি'র চীফ ইঞ্জিনিয়ার কামরুল হাসান সিদ্দিকী, বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল।

প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠান দেখার জন্য দু'পারে মানুষের ভিড় ছিল প্রচুর। বিদায় জানাতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ শনিবার আসবে ১শ' ৫০ পরিবারের ৮শ' ৫০ জন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থন

২৬ নবেম্বর শহীদ মিনারে
নাগরিক সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থনে আগামী ২৬ নবেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নাগরিক সমাবেশ হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে ৬/এ ধানমণ্ডি ভবনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিচারপতি কে এম সোবহান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রস্তাবে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধিতায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপির ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে কোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সকলেরই কাম্য।

এর বিরোধিতার অর্থ দাঁড়ায় সমস্যাকে জিইয়ে রাখা, সংঘাত সহিংসতার পন্থাকে প্রশ্রয় দেয়া যা যে কোন বিচারে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সমস্যা নিরসনে শান্তি চুক্তি হলেই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ হয়ে যাবে, এরূপ ধারণা বা প্রচারণা বালখিল্য বৈ কিছু নয়। প্রস্তাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানে যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর বিরোধিতার পন্থা পরিহার করে শান্তি প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক অবদান রাখার জন্য বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম, সৈয়দ হাসান ইমাম, ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, কাজী আরেফ আহমদ, মাহফুজা খানম, সাবের হোসেন চৌধুরী, অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ডঃ মীজানুর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, মাওলানা আবদুল আউয়াল, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, হারুন অর রশিদ, হামিদা বানুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ৪৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিরোধী তৎপরতায় নির্মূল কমিটির উদ্বেগ

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভা শুক্রবার শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের আহ্বায়ক শামীম আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি'র সঙ্গে একাত্তরের ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগী অপরাপর সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলসমূহের অশান্তির আন্দোলন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২২শে নভেম্বর ১৯৯৭

শরণার্থীদের ফেরত নিতে বাংলাদেশ সরকার আন্তরিক ॥ ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ

ফজলুল বারী, আগরতলা থেকে ফিরে : ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছেন, শরণার্থীরা যত শীঘ্রই সম্ভব চলে যাবে, এটাই আমরা চাই। এর চাপ দীর্ঘদিন বয়ে যাবার সঙ্গতি, ইচ্ছা কোনটাই আমাদের নেই। আমরা মানবিক কারণেই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি। মানবিক কারণেই তাদের জোর করে ফেরত পাঠাতে পারি না। কিন্তু আমরা অনির্দিষ্টকাল বইতে পারি না এর অর্থনৈতিক ধকলও। ইতোমধ্যে শরণার্থী খাতে এক শ' কোটির বেশি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারও এখন তাদের ফিরিয়ে নিতে আন্তরিক। আশা করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বুঝিয়ে দেশে ফিরিয়ে নেয়া হবে। আমরাও তাদেরকে বোঝাচ্ছি। শরণার্থী নেতা উপেন বাবুকে বলেছি, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই কথা বলেছেন, আপনাদের সাথে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন, কাজেই এর সুযোগ কাজে লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান। নতুবা পরে আম ছালা দু'টোই যাবে। বৈদ্যনাথ মজুমদার সম্প্রতি ত্রিপুরা মহাকরণের অফিসে জনকণ্ঠ প্রতিনিধির সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে কথাগুলো বলেন।

বৈদ্যনাথ বলেন, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বার বার কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই প্রশ্ন আমাদেরও। বাংলাদেশ থেকে আসা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং কল্পরঞ্জন চাকমা এমপির সাথেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি। শরণার্থী সমস্যা দেখাশোনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদেরকে এ বিষয়ে কথা বলতে বলেনি। তারপরও আমরা কথা বলি। বাংলাদেশকে ফীল করি বলেই। বাংলাদেশ তার সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা করছে বলেই জানি। শরণার্থীদের বিশ্বাসের সমস্যাও আছে। সহানুভূতিশীলভাবে এটাও উতরানো যাবে বলে মনে করি। তাদের মূল সমস্যা জমির সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যাবে। কোন কোন শরণার্থী নেতার কারণে প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে এ ব্যাপারে তিনি তাঁর অজ্ঞতার কথা বলেন।

বৈদ্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে কার্যত রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন। ৭৫ বছর বয়সী প্রবীণ এই কমিউনিস্ট নেতার পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের

অধিবাসী ছিলেন। বললেন, শিবিরে শরণার্থীদের একটি জেনারেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরা না বাংলাদেশের, না ভারতের নাগরিক। এদের জন্ম ভারতে। কিন্তু ভারত তাদের নাগরিকত্ব দেয়নি। তারা চায়ওনি। এদের পড়াশোনা হচ্ছে না। ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য শীঘ্রই তাদের দেশে ফেরা দরকার। আগের দফায় বকেয়ার দাবিতে শেষ মুহূর্তে শরণার্থী প্রত্যাবাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এবারও জ্বালানি কাঠের দাম বকেয়া থাকার অভিযোগ নিয়ে সমস্যা হতে পারে, বলেছে আগরতলার একটি সূত্র। উল্লেখ্য, প্রাপ্তবয়স্ক শরণার্থীদের প্রতিদিন মাথাপিছু ৩০ পয়সা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ১৫ পয়সা হারে জ্বালানি কাঠ কেনা বাবদ দেয়ার কথা। বিভিন্ন ক্যাম্পে এর বকেয়া থাকার অভিযোগ বেশি। বৈদ্যনাথ বাবুকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হেসে বললেন, এমন কিছু সমস্যা হতে পারে তা তো শুনিনি। তা ছাড়া তারা তো আমাদের বনজঙ্গল সব লাকড়ির জন্য সাবাড় করে দিয়েছে। তা ছাড়া তারা যদি চলেই যায় এই বকেয়ার দাবি থাকলে তা নিশ্চয় অসম্পূর্ণ রাখা হবে না।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর কি শান্তিবাহিনী ভারত ছেড়ে যাবে? বৈদ্যনাথ জবাবে বললেন, তা তো জানি না। আবার প্রশ্ন, তারা তো ভারতে ছিল এবং এখনও আছে। আবারও জবাব, এটাও জানি না। মূলত তিনি শান্তিবাহিনী বিষয়ক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, শান্তিবাহিনীর ৮টি ক্যাম্প ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারেও তাঁর অজ্ঞতার কথা বলেন। তবে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিআই (এম)-এর আরেক প্রভাবশালী নেতা জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁরা জানেন শান্তিবাহিনীর ক্যাম্প এখন ত্রিপুরায় নেই। আছে মিজোরামে। ত্রিপুরার শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর সাথে কিছু ছাউনিতে বাহিনীর নিষ্ক্রিয় সদস্যরা শরণার্থীর মতোই বসবাস করে। এই সূত্রমতে, ত্রিপুরা মিজোরামের খান্তলান প্যাসেজ দিয়েই শান্তিবাহিনীর যাতায়াত। জম্পুই পাহাড়ের কাছে দুর্গম এলাকাটির আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। দুর্গম এলাকাটিতে সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীরও যাতায়াত কম। এলাকাটি বাংলাদেশের দুদুকছড়ি সীমান্ত সংলগ্ন। বৈদ্যনাথ শান্তিবাহিনী সম্পর্কিত প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও বাংলাদেশে ভারতীয় বৈরীদের অবস্থানের অভিযোগ ঠিকই করলেন। বললেন, দুঃখজনক সত্য হচ্ছে আমাদের লোকজনকে অপহরণ করে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবশ্য বলেন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ হয়ত বৈরীদের সাহায্য করছে না। তারা লুকিয়ে চুপিসারে থাকছে। ট্রানজিট সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে কথা বলতে বলেছি বাংলাদেশের সাথে। বাংলাদেশ যদি রাজি হয় ত্রিপুরার গরিব

মানুষজন খুবই উপকৃত হবে। ট্রানজিট হলে বাংলাদেশ হয়ত কিছু রাজস্ব পাবে–কিন্তু ত্রিপুরার গরিব মানুষজনের যে উপকারের বিষয়টি হবে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতার।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭
স্বাক্ষরিত হবে পার্বত্য সমঝোতা স্মারক

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি সংলাপের সপ্তম দফা বৈঠকে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এই সমঝোতা স্মারক সংসদে উত্থাপনের বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি খাগড়াছড়িতে হবার সম্ভাবনা বেশি। ওয়াকিবহাল একটি সূত্র শুক্রবার রাতে জনকণ্ঠকে তথ্যটি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তম দফা শান্তি সংলাপ ২৬ নবেম্বর ঢাকায় শুরু হচ্ছে।

সূত্রটি বলেছে, সরকার এখন এই সমঝোতা স্মারকের বিষয়াদি এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, সদস্য আতাউর রহমান কায়সার চূড়ান্ত এই পর্যায়টির বিষয়আশয় সরাসরি তদারকি করছেন। এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি নেতা সন্তু লারমার এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২৬ নবেম্বরের বৈঠক উপলক্ষে জনসংহতি নেতারা পানছড়ির সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়িতে অবস্থান করছেন। পরবর্তী বৈঠকের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সমিতি নেতারাও পাহাড়ী বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছেন। ওয়াকিবহাল সূত্রটি বলেছে, ২৬ নবেম্বরের বৈঠকের বিষয়ে জনসংহতির আনুষ্ঠানিক সম্মতির চিঠি শুক্রবার যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমার কাছে এসে পৌঁছে। জনসংহতি সমিতির পক্ষে চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন উষাতন তালুকদার।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য শান্তি চুক্তি
বানচালের ষড়যন্ত্র
রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান

জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোটের সভাপতি সালাউদ্দিন বাদল ও সাধারণ সম্পাদক শেখ আবদুল কাদেরসহ ১৫১ জন সংস্কৃতিসেবী এক যুক্ত বিবৃতিতে

পার্বত্য এলাকার মানুষের দীর্ঘকালের সমস্যা নিয়ে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার আন্তরিক বহির্প্রকাশ পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ঘটতে যাচ্ছে বলে সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ শান্তিচুক্তিবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩শে নভেম্বর ১৯৯৭

আরও ১৪৯ পরিবারের ৮৪৮ জন শরণার্থী ফিরে এসেছে

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি থেকে: পাহাড়ী শরণার্থীদের দেশে ফেরা অব্যাহত আছে। শনিবার দ্বিতীয় দিনে ফিরেছেন ১শ' ৪৯ পরিবারের ৮শ' ৪৮ জন। এ নিয়ে শুক্র-শনি দু'দিনে ২শ' ৪৯ পরিবারের ১ হাজার ৪শ' ২৫ জন ফিরে আসলেন স্বদেশ ভূমিতে। আজ ফিরবেন ১শ' ৫০ পরিবারের ৯শ' ৯ জন। এঁরা আসবেন ত্রিপুরার শিলাছড়ি এবং লেবাছড়া শিবির থেকে। দেশে ফিরতে পারায় শরণার্থীরা ভীষণ খুশি। অভ্যর্থনা শিবিরেই তাঁদের অনেকে এ বিষয়ে আনন্দ-উল্লাস চাপা রাখতে পারেননি। মাটিরাঙ্গার বর্ণাল কদমতলী গ্রামের সুনিশ বিকাশ চাকমা (৪০), তার স্ত্রী কালোরানী চাকমা (৩৩) আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, বহু বছর পর নিজের গ্রামে ফিরে যাব। এ আনন্দের কোন সীমা নেই। সুনিশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা অনেক বদলেছে। ওপারে বসে এসব খবর আমরা পেয়েছি। সে জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি দেশে ফেরার। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সহসভাপতি ও শিলাছড়ি ক্যাম্পের পরিচালক হেমন্ত প্রসাদ চাকমা সীমান্তে এসেছিলেন শরণার্থী বিদায় তদারকি করতে। দেশে কবে ফিরছেন জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, ফেরার জন্য তো আমরা সবাই প্রস্তুত। এটি এখন সময়ের বিষয় মাত্র। শান্তি সংলাপে কি হয় তা দেখেই আমরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেব।

শনিবার প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল পৌনে ১০টায়। বিকাল ৫টা পর্যন্ত টানা সাত ঘণ্টা চলেছে এই প্রক্রিয়া। ১শ' ৫০ পরিবার গতকাল ফেরার কথা থাকলেও ফিরেছে ১শ' ৪৯ পরিবার। অসুস্থতার কারণে এক পরিবারের দুই সদস্য ফিরতে পারেননি। ত্রিপুরার অমরপুর মহকুমা কর্তৃপক্ষ খুব ভোর থেকেই বাস বোঝাই করে শরণার্থীদের সীমান্তে নিয়ে আসা শুরু করে। এঁরা সেখানে শিলাছড়ি শিবিরে ছিলেন। গতকাল ফিরে আসা সকল শরণার্থীই মাটিরাঙ্গা থানার বাসিন্দা। এপারে তাদের অভ্যর্থনা জানান খাগড়াছড়ির এডিএম মোঃ লেহাজ উদ্দিন চৌধুরী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ। দিনের

প্রথম দফায় গুলকেতা চাকমা (৫৬), আট সদস্যের পরিবারসমেত প্রথম ফিরে আসেন। ওপারে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন অমরপুরের মহকুমা শাসক শান্তিরায় রিয়াং। শুক্র-শনি দু'দিনেই প্রত্যাবাসনকারী প্রতি পরিবারকে রেড ক্রিসেন্টের তরফ থেকে তিন মাসের রেশন হিসাবে ১২ কেজি ডাল, ৬ কেজি লবণ, ৬ লিটার সয়াবিন তেল দেয়া হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে আপাতত পরিবারপিছু ৫০ কেজি চাল দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০ দফার প্রস্তাবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বাড়তি প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতি পরিবারকে এক বছর রেশন দেয়া হবে বিনামূল্যে। শুক্রবার ফিরে আসা শরণার্থীদের ৪১ জন সীমান্তে স্থাপিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব খুলে ৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জমা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, দেশে ফেরার পর প্রতি পরিবারকে নগদ দেয়া হচ্ছে ২১ হাজার টাকা। এ ছাড়া সীমান্তের অস্থায়ী ব্যাংকে ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। শুক্রবার ২৬ শরণার্থী সেখানে ৩৫ হাজার ৫শ' ৪৪ টাকার ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশী ৫৪ হাজার ৬শ' ৫২ টাকা ৮০ পয়সা গ্রহণ করেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭

প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি ও মানচিত্র বদলানোর কথা

মাওলানা আবদুল আউয়াল

কোনপ্রকার ভূমিকা না করেই বলতে হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন প্রশ্নে জনসংহতি সমিতির নেতাদের সাথে সরকারের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া যেসব কথা বলছেন, তা রীতিমতো আপত্তিকর। সম্প্রতি দিনাজপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর পিতা ভারতের কাছে বেরুবাড়ী তুলে দিয়ে দেশের মানচিত্র বদলিয়েছেন। এখন তাঁর উত্তরসূরি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের হাতে তুলে দিয়ে দেশের মানচিত্র আবারও বদলানোর ষড়যন্ত্র করছেন। এই ষড়যন্ত্র আমরা বাস্তবায়ন করতে দিব না।' তার আগে আর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'শান্তি চুক্তি করে ফেনী পর্যন্ত ভারতকে দিয়ে দেয়া হবে।'

বেগম খালেদা জিয়ার এসব উক্তি সম্পর্কে কিছু বলার আগে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তিটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ইন্দিরা-মুজিব সীমান্তচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মূলনীতি ছিল ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারত পাবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহলগুলো বাংলাদেশ পাবে। ভারতের অভ্যন্তরে

বাংলাদেশের ৯৫টি ছিটমহল রয়েছে। এগুলোর সর্বমোট আয়তন হচ্ছে ১৯ দশমিক ২ বর্গমাইল। এসব ছিটমহল ভারত পাবে। অপরদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়েছে ভারতের ১২৬টি ছিটমহল। আয়তন ৩২ দশমিক ৭৫ বর্গমাইল। এই ভূমি বাংলাদেশ পাবে। চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ বেরুবাড়ীর ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল ছিটমহল বাংলাদেশ পাওয়ার কথা। অপরদিকে ৭ বর্গমাইলের বেশি এলাকা নিয়ে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল দুটো ভারতের অংশে পড়ে। কিন্তু বেরুবাড়ীর উক্ত এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী হচ্ছে হিন্দু। এজন্য ভারত উক্ত এলাকাটি বাংলাদেশের নিকট হস্তান্তরে অপারগতা প্রকাশ করে। অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটমহল দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। সুতরাং বঙ্গবন্ধুও এই দু'টো ছিটমহল বাংলাদেশকে দেয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, ছিটমহল দু'টোতে যাতায়াতের জন্য বঙ্গবন্ধু একটি করিডোর দেয়ারও অনুরোধ জানান। ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেন। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "১২নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল এলাকা ভারতের সাথে বিনিময় হবে। বাংলাদেশের সাথে থাকবে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল। পানবাড়ী মৌজার (পাটগ্রাম) সাথে দহগ্রামের যোগাযোগের জন্য তিনবিঘার ১৭৮×৮৫ মিটার এলাকা ভারত বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী লিজ দেবে।'

এই চুক্তির সারমর্ম দাঁড়ায়, ভারত ও বাংলাদেশের বিনিময়যোগ্য ছিটমহলগুলোর মোট ভূমির পরিমাণ ৫১ দশমিক ৭৭ বর্গমাইল। বাংলাদেশ ১৯ দশমিক ২ বর্গমাইল এলাকার বিনিময়ে পেয়েছে ৩০ দশমিক ১১ বর্গমাইল। আর ভারত ৩২ দশমিক ৭৫ বর্গমাইল এলাকার বিনিময়ে পেয়েছে ২১ দশমিক ৬৬ বর্গমাইল। এছাড়া ইন্দিরা-মুজিব সীমান্তচুক্তিতে মিজোরাম-বাংলাদেশ সেক্টর, ত্রিপুরা-সিলেট সেক্টর, ত্রিপুরা-পার্বত্য চট্টগ্রাম সেক্টর, ত্রিপুরা-বিলোনিয়া সেক্টর, বিয়ানীবাজার-করিমগঞ্জ সেক্টর, হিলি প্রভৃতি এলাকায় সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এসব এলাকায়, বিশেষ করে ত্রিপুরা-সিলেট সেক্টরে লাঠিটিলা রিজার্ভ হিল, মিজোরাম-বাংলাদেশ সেক্টরে আসালংয়ের মতো কিছু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বাংলাদেশ লাভ করে। এসব এলাকায় ২৪ বছরব্যাপী একাধিকবার সামরিক অভিযান চালিয়েও পাকিস্তান দখল করতে পারেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারতের নিকট থেকে এসব এলাকা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

উক্ত চুক্তিতে দেখা যাচ্ছে, বেরুবাড়ীর ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল ভূমির বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার ৭

বর্গমাইলেরও বেশি এলাকা বাংলাদেশের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে যাতায়াতের জন্য বঙ্গবন্ধু ভারতের তিনবিঘার ১৭৮×৮৫ মিটার এলাকা চিরস্থায়ী লিজ নেয়ার ব্যবস্থা করেন। এই হলো বঙ্গবন্ধুর আমলে সীমান্তচুক্তির বাস্তব অবস্থা। অপরদিকে যারা আওয়ামী লীগকে ভারতের 'সেবাদাস', 'দালাল' ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করে আসছে, তাদের আমলে সীমান্ত চুক্তির কি দশা হয়েছে, তাও পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাদের আমলে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। শুধু তিনবিঘা করিডোরের ব্যাপারে এরশাদ সরকার ও খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার ভারতের সাথে দু'টো চুক্তি করেছে। ১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর তিনবিঘা লিজ দেয়ার বিষয়ে আবার নতুন চুক্তি হয়। এ চুক্তিতে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির অন্য বিষয়গুলো বাদ রাখা হয়। শুধু তিনবিঘা করিডোর ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরশাদ সরকারের আমলে সম্পাদিত এই চুক্তিতে বলা হয়, "লিজ এলাকায় ভারতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। লিজ এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ, সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনী যাতায়াত করতে পারবে। লিজ এলাকায় উভয় সরকার কেবল, বিদ্যুত লাইন, পানির লাইন বসাতে পারবে।"

১৯৮২ সালে এরশাদ সরকারের সাথে এই চুক্তির পর ভারতীয় জনগণ আইনের আশ্রয় নেয়ার প্রেক্ষিতে চুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ভারতের সাথে বিএনপি সরকারের তিনবিঘা করিডোর নিয়ে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১১টি শর্ত এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন চুক্তিটি কার্যকর করা হয়। বিএনপি সরকারের সম্পাদিত এই চুক্তিতে এরশাদের আমলে সম্পাদিত চুক্তির চেয়েও নতজানুর পরিচয় দেয়া হয়। ১৯৮২ সালের চুক্তিতে বাংলাদেশের অধিকার যতটুক সংরক্ষিত ছিল, ১৯৯২ সালে বিএনপি সরকারের আমলে সম্পাদিত চুক্তিতে তাও বিসর্জন দেয়া হয়। এরশাদের নতজানু চুক্তিতে তবু ঐ করিডোর দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাংলাদেশের জনগণ, পুলিশ, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রসহ যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু 'আপোসহীন নেত্রী' খালেদা জিয়া তাও ছেড়ে দেন। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, বেগম খালেদা জিয়া সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশীদের জন্য অনেকটা শুল্কহীন চেকপোস্টের মতো। তাও আবার সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুধু দিনের বেলা ছ'বার এক ঘন্টা পর পর করিডোর দিয়ে বাংলাদেশীরা যাতায়াত করতে পারবে। সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনী ও পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে কিনা তাঁর কোন উল্লেখ নেই। বঙ্গবন্ধুর আমলে সম্পাদিত চুক্তি ছিল একটা সার্বিক

সীমান্ত চুক্তি। তাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমীমাংসিত স্থানগুলো চিহ্নিত করে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনকি ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিতে তিনবিঘা করিডোর শর্তহীনভাবে স্থায়ী লিজের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী দু'টো চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়া সরকারের আমলে ভারতের নিকট দেশের বিসর্জন দেয়ার আরও ঘটনা রয়েছে। সবাই জানেন ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এক কোটি নাগরিক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর যেসব শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, বাংলাদেশ কেবলমাত্র তাদেরই গ্রহণ করবে। এই সময়ের আগে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী কোন নাগরিককে বাংলাদেশ গ্রহণ করবে না। সে সময় বাংলাদেশের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী শরণার্থীদের গ্রহণ করা হয়। কিন্তু খালেদা জিয়ার ভারত সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "দু'দেশের সীমান্তে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্ট সমস্যা বিবেচনা করে উভয়পক্ষ পারস্পরিক সমঝোতা জোরদার করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অবৈধভাবে জনগণের সীমান্ত পারাপার বন্ধ করতে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।"

ইন্দিরা-মুজিব সীমান্তচুক্তির সাথে যেমন পরবর্তী দু'টি সীমান্তচুক্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী শরণার্থী গ্রহণ ব্যবস্থার সাথেও ভারত ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার যুক্ত ইশতেহারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। তাতে অনুপ্রবেশ স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আর অবৈধ অনুপ্রবেশের সময়সীমা উল্লেখ না থাকায় তা কেউ ১৯৪৭ সাল থেকেও ধরে নিতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, উক্ত যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত হিন্দু ভারতে চলে গেছে তারা সবাই বাংলাদেশে ফিরে আসার অধিকার লাভ করেছে। কারণ তারা কেউই বৈধ উপায়ে ভারতে যায়নি। আর ক্ষমতা হারানোর পর এখন খালেদা জিয়াই বলছেন, বঙ্গবন্ধু নাকি বেরুবাড়ী ভারতকে দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র বদলিয়েছেন। কিন্তু পরিবর্তিত মানচিত্রে কি পরিমাণ ভূমি নতুন করে সংযোজিত হলো, তা ভুলেও তিনি উল্লেখ করছেন না। আর তিনি যে, কি ছেড়ে দিয়েছেন তা তো তাঁর মুখে উচ্চারিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি না বললেও দেশের সচেতন নাগরিকদের এসব অজানা নয়।

বেগম খালেদা জিয়া কখনও বলছেন, 'সন্ত্রাসীদের সাথে শান্তিচুক্তি হচ্ছে।' পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে যে শান্তি আলোচনা চলছে, এটা কি বর্তমান সরকারই শুরু করেছে, নাকি

এর আগেও হয়েছে? দেশবাসী সবাই জানেন, এরশাদ সরকারের আমলে এই আলোচনার সূচনা হয়। বিগত বিএনপি সরকারের আমলেও বহুবার আলোচনা হয়েছে। খালেদা জিয়ার সরকার নাকি তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন দিতেও প্রস্তুত ছিল। এখন তিনি পাহাড়ী প্রতিনিধিদের সন্ত্রাসী বলছেন। এখন যদি তাঁরা সন্ত্রাসী হয়ে থাকেন, বিএনপি'র সাথে আলোচনাকালেও সন্ত্রাসী ছিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা তখন বিএনপি সরকার কেন সন্ত্রাসীদের সাথে আলোচনা করেছিল।

খালেদা জিয়া বলেছেন, 'শান্তি চুক্তি করে নাকি ফেনী পর্যন্ত ভারতকে দিয়ে দেয়া হবে।' আলোচনা চলছে বাংলাদেশের নাগরিক পাহাড়ী প্রতিনিধিদের সাথে। শান্তিচুক্তি হবে বাংলাদেশে। এক্ষেত্রে ভারতকে ফেনী পর্যন্ত ছেড়ে দেয়ার অলীক স্বপ্ন তিনি দেখলেন কিরূপে। খালেদা জিয়া একজন দায়িত্বশীল নেত্রী। তাঁর কথাবার্তায় দায়িত্বশীলতা ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকা উচিত। কিন্তু তা কি আছে?

তিনি বলেছেন, "চুক্তির আগে তা প্রকাশ করতে হবে।" পৃথিবীতে এ ধরনের চুক্তি এটাই প্রথম নয়। আরব-ইসরাইল, ব্রিটিশ-আইরিশ এবং এ ধরনের আরও বহু শান্তিচুক্তি হয়েছে এবং এখন হচ্ছে। স্বাক্ষরের আগে তা কি প্রকাশ করা হয়? তিনি নিজে ভারতের সাথে চুক্তি করার আগে তা কি জনগণের সামনে প্রকাশ করেছিলেন? যা তিনি নিজে করেননি, বর্তমান সরকারের নিকট তা কোন্ যুক্তিতে দাবি করছেন? আমাদের সংবিধানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির নিকট তা পেশ করতে হবে। তিনি ইচ্ছা করলে তা সংসদে আলোচনার জন্য পাঠাতে পারেন। তাও সংসদের গোপন বৈঠকে আলোচনা করতে হবে। এই দিক থেকে বেগম জিয়া স্বাক্ষরের আগে চুক্তি প্রকাশের দাবি করে কি সংবিধান লঙ্ঘন করছেন না?

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সংহত করা হচ্ছে ॥ বিশেষ মহলের অপতৎপরতার আশঙ্কা

ফজলুল বারী ॥ সপ্তম দফা বৈঠককে সামনে রেখে পার্বত্য তিন জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সংহত করা হচ্ছে। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র রবিবার রাতে জনকণ্ঠকে বলেছে, বিশেষভাবে নজররাখা হচ্ছে সম্প্রতি প্রত্যাবাশনকারী শরণার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে। কোন অশুভ শক্তি যাতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই

প্রত্যাবাসন বানচাল করতে না পারে সেজন্য নেয়া হচ্ছে সব রকমের ব্যবস্থা। শরণার্থী প্রত্যাবাসন-পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত টাস্কফোর্সকে যে কোন সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের নির্দেশ দেয়া আছে। উল্লেখ্য, গত ২১ নবেম্বর চতুর্থ দফা প্রত্যাবাসন শুরু হয়। ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত এই পর্ব গড়াবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। কারণ নির্ধারিত ৬৬৮৪ জনের বাইরে এ পর্যায়ে ফিরে আসবেন অতিরিক্ত ৬ হাজার। এদের পুনর্বাসন শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ওপর পরবর্তী পর্যায়ের প্রত্যাবাসন নির্ভর করবে।

উল্লেখ্য, আগামী বুধবার থেকে ঢাকায় সপ্তম দফা শান্তি সংলাপ শুরু হচ্ছে। আগামী বৈঠককে ঘিরে শান্তিকামী বিভিন্ন মহলের আশাবাদের পাশাপাশি বিএনপি, জামায়াতসহ কয়েকটি দলের বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টাও আছে। বিশেষ একটি সংস্থার সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে, পার্বত্য তিন জেলায় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ কিছু ঘটনা সংঘটনের চেষ্টা হতে পারে। এই এলাকাগুলোর বেশির ভাগ খাগড়াছড়ি জেলাসীমার। জেলার দিঘিনালা এবং মাটিরাঙা থানার কয়েকটি এলাকাকে রিপোর্টে খুবই স্পর্শকাতর উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইউপি নির্বাচনের ডামাডোল ওইসব এলাকাতে জোরে শোরে চলা সত্ত্বেও প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিয়ে কোন কোন মহল বিশেষ ইস্যু তৈরিতে তৎপর। রিপোর্টটি ঢাকায় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ার পর এ বিষয়ে নিরাপত্তা সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়।

রবিবার ছিল চতুর্থ দফা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের তৃতীয় দিন। ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত এ পর্বে ১২১৬ পরিবারের ৬৬৮৪ জন দেশে ফিরে আসবেন। ২১ নবেম্বর ত্রিপুরার শিলাছড়িতে শরণার্থী বিদায় অনুষ্ঠানে তাদের নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা আরও ৬ হাজার শরণার্থীকে এই দফাতেই ফিরত পাঠানোর ঘোষণা দেন। এতে করে চতুর্থ পর্বে ফিরবেন ১২ হাজার ৭শ'র বেশি শরণার্থী। এ হিসাবে চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত ২৫ হাজারের বেশি শরণার্থীর দেশে ফেরা হবে। এ বাবদ ইতোমধ্যে সরকারের বরাদ্দ সম্প্রতি আরও ৩০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই হিসাব করা হয়েছে ত্রিপুরার শিবিরে থাকা আরও ৩০ হাজারের বেশি শরণার্থীর বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই। সরকারী সূত্র বলেছে, ৪র্থ দফা প্রত্যাবাসনের পর শরণার্থী নেতারা টাস্কফোর্সের সঙ্গে বৈঠকের জন্য খাগড়াছড়ি আসবেন। তারা ঘুরে দেখবেন পুনর্বাসিত গ্রামগুলোতে। তারপর পঞ্চম দফা প্রত্যাবাসনের তারিখ ঠিক হবে। এর মাঝে বহুল প্রত্যাশিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেলে অনেক কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশা করা হচ্ছে। শান্তিচুক্তির পর কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে যাতে প্রত্যাবাসন ব্যাহত না হয় সেজন্য নেয়া হচ্ছে আগাম সব সতর্কতা।

খাগড়াছড়ি থেকে জীতেন বড়ুয়া জানিয়েছেন, রবিবার প্রত্যাবাসনের তৃতীয় দিনে ১৫১ পরিবারের ২ হাজার ৩৪৬ জন দেশে ফিরে এসেছেন। ১৫০ পরিবার ফেরার কথা থাকলেও ফিরেছে এক পরিবার বেশি। শনিবার একটি পরিবার কম এসেছিল। সকাল ১০টায় শুরু প্রত্যাবাসন চলেছে টানা ৫ ঘণ্টা বিকাল সোয়া ৩টা পর্যন্ত। মাটিরাঙার আচালংবাজার গ্রামের বীরেন্দ চাকমার (৫০) ৯ সদস্যের পরিবার গতকাল প্রথম আসে। গতকাল আসা পরিবারগুলোর মধ্যে মাত্র ৫টি পরিবার পানছড়ি থানা এলাকার। বাকি সব মাটিরাঙা থানার। এ পর্বে মাটিরাঙা থানার শরণার্থীরাই বেশি ফিরে আসছেন। ফিরে আসা শরণার্থীদের গতকালই পুলিশ প্রহরায় সরকারী গাড়িতে করে স্ব-স্ব গ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়। ঘর তৈরির আগে এদেরকে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি অথবা নিকটবর্তী স্কুলে অস্থায়ী শিবিরে রাখা হচ্ছে। গত তিন দিনে প্রত্যাবাসনকারীদের মধ্যে নগদ ৮৩ লাখ ৭৯ হাজার টাকা, ১৯ হাজার ৯৫০ কেজি চাল, ৪ হাজর ৭৮৮ কেজি ডাল, ২ হাজার ৩শ' ৯৪ কেজি লবণ, ২ হাজার ৩৯৪ লিটার তেল বিতরণ করা হয়েছে। ট্রানজিট ক্যাম্পের ব্যাংকের অস্থায়ী শাখায় ১০৩টি এ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে ১৭ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। ৫৫ হাজার ৬৩৮ ভারতীয় রুপী পরিবর্তন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৪শে নভেম্বর ১৯৯৭

মহিলা পরিষদের সমাবেশ

না দেখেই পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে ষড়যন্ত্রকারী মহল পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে পাগলের প্রলাপ বকছে। তাঁরা বলেন, এ চুক্তি দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। অথচ মহলটি চুক্তি না দেখে, না বুঝে আগেই কর্মসূচী ঘোষণা করে বসে আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ ও শান্তিচুক্তি সফলের দাবিতে মহিলা পরিষদ আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা রবিবার এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় এ সমাবেশ।

এ সময় বক্তারা শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর তৎপরতা বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, গণতন্ত্রমনা সকলের উচিত এ চুক্তিকে স্বাগত জানানো। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে বলেন, যদি এ চুক্তি দেশের স্বার্থবিরোধী হয় তবে যাঁরা আজ চুক্তির বিরোধিতা করছেন তাঁদের সাথে মহিলা পরিষদ

রাজপথে নামবে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দায়িত্বশীল নেত্রী হয়ে খালেদা জিয়া যেভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দিচ্ছেন তা জনগণ কখনও গ্রহণ করবে না। খালেদা জিয়ার উদ্দেশে তাঁরা বলেন, কিভাবে দেশ বিক্রি হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলুন। আমাদের যদি বোঝাতে পারেন তাহলে মহিলা পরিষদ আপনার সাথে আন্দোলনে শরিক হবে। বক্তারা অভিযোগ করেন যে, বিরোধীদলীয় নেত্রী গণতন্ত্রের লেবাস পরে পাকিস্তানের চরের মতো কথা বলছেন। নেত্রীর উদ্দেশে তাঁরা বলেন, দেশ বিক্রির ধুয়া তুলে একবার নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছেন। জনগণ এখন সচেতন হয়েছে। বারবার একই ধুয়া তুলে ভোট পাবেন না।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন পরিষদের সহসভানেত্রী ডাঃ মাখদুমা নার্গিস রত্না ও সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম। সভাপতিত্ব করেন হেনা দাস।

সমাবেশে পাঁচ দফা দাবি সংবলিত ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এতে দাবি করা হয়, অনতিবিলম্বে শান্তিচুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য। শান্তিচুক্তিতে পাহাড়ী ও বাঙালী উভয়ের স্বার্থরক্ষার দাবি করা হয়। চুক্তি সম্পর্কে ষড়যন্ত্রকারী মহলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য সকল গণতান্ত্রিক ও সচেতন মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, এ চুক্তির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা সুসংহত হবে। সমাবেশ শেষে শান্তিচুক্তির সমর্থনে একটি মিছিল শহীদ মিনার থেকে প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭
কাল থেকে আবার
শান্তি সংলাপ

ফজলুল বারী ॥ আগামীকাল বুধবার আবার শুরু হচ্ছে পার্বত্য শান্তি সংলাপ। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এটি জনসংহতি সমিতির পঁচিশতম, আওয়ামী লীগ সরকারের সপ্তম এবং ঢাকায় ষষ্ঠ বৈঠক। এ উপলক্ষে বুধবার বিকাল তিনটায় শান্তি মিছিল বেরুবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে। বহুল প্রত্যাশার পার্বত্য শান্তি চুক্তির খুবই কাছাকাছি অবস্থানকে কেন্দ্র করে এই বৈঠক নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জনসংহতি নেতা সন্তু লারমার খসড়া চুক্তিতে উপনীত হবার ঘোষণা, আবার কিছুদিন আগে ত্রিপুরাবাসী এক চাকমা নেতার ভিন্ন বক্তব্যের কারণে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের একটি বক্তব্যও সংশয়ে ইন্ধন যুগিয়েছে। এই অবস্থার ভিতর আশাবাদের তথ্যটি হচ্ছে সোমবার

প্রত্যাবাসন ইচ্ছুক আরও ১৩৬১ শরণার্থী পরিবারের তালিকা এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে। এখন যে প্রত্যাবাসন চলছে তার সঙ্গে তালিকাটি যুক্ত হবে। জাতীয় কমিটির এক নেতা সোমবার রাতে অবশ্য এই বৈঠকেই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন জনকণ্ঠের কাছে।

সরকারী সূত্রগুলো বলেছে, সপ্তম দফা বৈঠকের জন্য ঢাকার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। জনসংহতি নেতা সন্তু লারমাও এ উপলক্ষে সোমবার দুদুকছড়ি এসে পৌঁছেছেন। সমিতির অন্যান্য নেতা আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন পানছড়ির সীমান্ত গ্রামটিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা সমিতি নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে গতকাল দুদুকছড়ি যান। সেখান থেকে তিনি একটি বিশেষ বার্তা এনেছেন বলে জানা গেছে। বৈঠক উপলক্ষে আগামীকাল সকালে সামরিক হেলিকপ্টার দুদুকছড়ি যাবে। দুপুরের মধ্যে সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসা, রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরাসহ আরও ৪ জনকে নিয়ে হেলিকপ্টার ঢাকা পৌছার কথা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ পুরনো বিমানবন্দর থেকে জনসংহতি সমিতি নেতাদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা পদ্মায় নিয়ে আসবেন। পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ পদ্মাতেই থাকবেন। সূত্রটি বলেছে, বৈঠক খুবই সংক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। তবে অতিথিশালা পদ্মার বুকিং নেয়া আছে আটদিনের, ডিসেম্বরের তিন তারিখ পর্যন্ত। আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ঢাকার শান্তি মিছিলের আয়োজন করছে আওয়ামী ফাউন্ডেশন। চট্টগ্রামের মেয়র সেখানকার এবং নাগরিক কমিটি তিন পার্বত্য জেলা শহরের শান্তি মিছিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

জীতেন বড়ুয়া খাগড়াছড়ি থেকে জানিয়েছেন, চতুর্থ পর্যায়ে উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার আওতায় আরও ১ হাজার ৩শ' ৬১টি পরিবারের ৬ হাজার ৩শ' ৮৮ জনের একটি তালিকা সোমবার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল জানান, নতুন করে শরণার্থীদের তালিকা পাওয়ায় শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলবে। এ প্রক্রিয়ায় নতুন করে ফিরবে ত্রিপুরার টাকুমবাড়ী শিবির থেকে ২শ' ৩৩ পরিবারের ১ হাজার ২শ' ১৪ জন, লেবাছড়া থেকে ৯৮ পরিবারের ৩৭৪ জন, পঞ্চরাম পাড়ার ৩শ' পরিবারের ১৫৪৭ জন, করবুক শিবির থেকে ৩৯০ পরিবারের ১ হাজার ৭শ' ৯৬ জন, শিলাছড়ি থেকে ৪৩ পরিবারের ১শ' ৭৮ জন ও কাঁঠালছড়ি শিবির থেকে ২শ' ৯৭ পরিবারের ১ হাজার ২শ' ৭৯ জন।

চতুর্থ পর্যায়ের শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শেষ হবার সাথে সাথে এই পর্যায়ে ৫ম তালিকার শরণার্থীরা দেশে ফিরবে। ভারতের ত্রিপুরা প্রশাসন একই সাথে রামগড় ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করেছে। এদিকে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন যানবাহন স্বল্পতার কারণে একনাগাড়ে তবলছড়ি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে প্রত্যাবাসন শেষে রামগড় সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ত্রিপুরা প্রশাসনের কাছে আজ মঙ্গলবার প্রস্তাব পাঠাবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৫শে নভেম্বর ১৯৯৭
সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ
শান্তিচুক্তি হলেই দেশ বিক্রি হয় না, তবে
সংসদের বিশেষ অধিবেশনে
খসড়াটি আলোচনা করুন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদ অবিলম্বে বিশেষ অধিবেশন ডেকে প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির খসড়া নিয়ে সংসদে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার বারিধারার নিজস্ব অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে এরশাদ বলেন, তাঁর দল শান্তি চুক্তির বিরোধী নয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই চুক্তির দরকার আছে। চুক্তি হয়ে গেলেই দেশ বিক্রি হয়ে যাবে একথা তিনি মনে করেন না। একথাটি কেন বলা হচ্ছে এটিও তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়। এরশাদ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জিয়া সরকারের অউপজাতীয় বসতি স্থাপনের নীতি সঠিক ছিল না। শান্তি চুক্তির পর পার্বত্য এলাকায় সেনানিবাস ছাড়া অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো রাখারও কোন দরকার নেই। সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সরকার এবং বিএনপি সরকার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা করেছিল। আমাদের কোন ত্রুটির জন্যই হয়ত তখন আমরা সফল হতে পারিনি। এখন আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি করে ফেললে তা সরকারের জন্য প্লাস পয়েন্ট হয়ে যাবে এর জন্যই হয়ত কেউ কেউ বিরোধিতা করছেন। সংবাদ সম্মেলনে দলের নেতা নাজিউর রহমান মঞ্জু, সরদার আমজাদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য সমস্যার সৃষ্টি প্রসঙ্গে সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়ী বাঙালী, জাতি-উপজাতির পার্থক্য ভুলে যাবার আহ্বান জানিয়ে রাঙ্গামাটিতে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। পার্বত্য রাজা ত্রিদিব রায়কে তিনি স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করেন। এতে

উপজাতীয়রা আরও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য বাকশাল গঠনের পর এমএন লারমা, চান খোয়াই রোয়াজা, চারু বিকাশ চাকমা, অনন্ত বিহারী খীসা প্রমুখ উপজাতীয় নেতা বাকশালে যোগ দেন। ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করেন। বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হয় এমএন লারমার নেতৃত্বে। এরপর সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালে পার্বত্য তিন জেলায় সমতল ভূমির জনগণের বসতিস্থাপন শুরু করলে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে শান্তিবাহিনী। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে সেনাবাহিনী এর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যার ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার পাহাড়ী, বাঙালী ও সেনা-পুলিশ-বিডিআর সদস্য নিহত হয়েছেন। খরচ হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। জিয়া সরকারের সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে তখন বাঙালী বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করেছেন কিনা, এ ব্যাপারে জিয়াকে কোন পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে এরশাদ বলেন, এর সুযোগ ছিল না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে উপজাতীয়দের সংখ্যালঘু করার জন্য এটা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে শুধু বলা হয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য। এরশাদ বলেন, তাঁর আমলে কোন অউপজাতীয় বসতি স্থাপন হয়নি। সেই সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল না। তাই ক্ষমতায় গিয়ে তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেননি। তাঁর আমলে শরণার্থী সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বলেন, সেটেলারদের অনেকে পাহাড়ীদের নানা নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ছিল। সে জন্য অনেকে প্রাণ ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। এরশাদ বলেন, তিনিই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার। সে জন্যই জনসংহতির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। শান্তি বাহিনীর একটি অংশ তখন আত্মসমর্পণও করেছিল। রাজনৈতিক সসম্যা সমাধানের আলোচনা কেন সামরিক বাহিনীর লোকজনকে দিয়ে করা হয়েছিল তার জবাবে বলেন, সেই আলোচনায় বেসামরিক লোকজনও ছিল। সেই আলোচনার পর উপজাতীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। জনসংহতি সমিতির বেশ কিছু দাবি অনুসারে ক্ষমতা পরিষদকে দেয়া হয়েছিল। এমনকি পুলিশ বাহিনী গঠনের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছিল। তারপরও তাঁর আমলে, বিএনপি আমলে আলোচনা কেন সফল হয়নি জানতে চাইলে বলেন, জনসংহতির তখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল।

সাংবিধানিক কারণে এ দাবি পূরণ আমাদের সম্ভব ছিল না। এখন হয়ত সেই দাবি থেকে তারা সরে এসেছে। আলোচনাও এগিয়েছে। আলোচনার সাফল্যের প্রশ্নে ভারতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে বিএনপি'র এক নেতার মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে এরশাদ বলেন, এটা আমি বলতে পারব না।

সমস্যাটি আমাদের। ভারত এর সঙ্গে জড়িত কিনা তা বলতে পারব না। কারণ আমাদের কাছে তেমন প্রমাণ নেই। ভারতীয় জঙ্গীদের তাঁর আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রশিক্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, বেগম জিয়ার আমলে এটা হয়েছে শুনেছি। শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বেগম জিয়ার আন্দোলনের পিছনে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকার অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বলেন, আইন অনুসারে শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তিই সংসদে পেশ করার বিধান আছে। এটা নিয়ে সংসদে আলোচনা করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। জনসংহতির সঙ্গে প্রস্তাবিত চুক্তি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি নয়। তারপরও এ সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহের কারণে এটা নিয়ে সংসদে আলোচনা করলে ভাল হবে। সবার আশা চুক্তি অবশ্য সংবিধানের আলোকে হবে। সংসদে আলোচনা না করলে, চুক্তি সমতার ভিত্তিতে না হলে তাঁরা তার বিরোধিতা করবেন। এরশাদ বলেন, চুক্তিতে কি আছে তা আমরা জানি না। সেজন্যই তারা আলোচনা চান। চুক্তি হলেই তারপর বাস্তবায়নের বিষয় আসবে। তিনি আশা করে বলেন–শান্তি চুক্তি প্রত্যাশামাফিক হবে। শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। তিনি শরণার্থীদের যথাযথ পুনর্বাসন বিষয়েও গুরুত্ব দেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম ॥ চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য
আজ জনসংহতির সাথে
বৈঠক শুরু হবে ঢাকায়

ফজলুল বারী/জীতেন বড়ুয়া ॥ একটি চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আজ জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বৈঠক শুরু হচ্ছে ঢাকায়। বর্তমান সরকারের সঙ্গে সমিতির এই 'লাকি সেভেন' বা সপ্তম দফা বৈঠকেই বহুল প্রত্যাশিত ফল সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটি সূত্র মঙ্গলবার জনকণ্ঠকে বলেছে, অমীমাংসিত বিষয় মীমাংসার জন্য এই বৈঠক দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে সূত্রটি এই বৈঠকেই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হবার বিষয়ে আশাবাদের কথা বলেছে। সরকারী একটি সূত্র আশাবাদ জানিয়েছে চুক্তি স্বাক্ষর প্রশ্নে। যথারীতি বৈঠকে সরকার পক্ষে জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, অপর পক্ষে জনসংহতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা নেতৃত্ব দেবেন। সন্তু লারমাসহ পাহাড়ী নেতৃবৃন্দকে আজ সকালে হেলিকপ্টারে দুদুকছড়ি থেকে

ঢাকায় নিয়ে আসা হবে। জনসংহতি সমিতির আলোচনা দলের অন্যতম সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা অসুস্থতার কারণে এ বৈঠকে থাকছেন না। শান্তি বৈঠক উপলক্ষে আজ ঢাকা, চট্টগ্রামে নাগরিক সমাবেশ, শান্তি মিছিল হবে। প্রত্যাশিত শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে তিন পার্বত্য জেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। কাজ শেষ হয়েছে তিন পার্বত্য জেলার সব সার্কিট হাউস, অন্যান্য রেস্ট হাউসের সংস্কারের। সূত্রগুলো বলেছে, স্থানীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ভূমির ওপর অধিকারের ইস্যুই শেষ মুহূর্তের দরকষাকষির বিষয়। জনসংহতি সমিতি তাদের সর্বশেষ ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত বক্তব্যে স্থানীয় প্রশাসন এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন বিষয়ে সমঝোতা অমীমাংসিত থাকার কথা বলেছিল। সমিতি তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের চাকরি প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের অধীনে রাখতে চায়। ওয়াকিফহাল একটি সূত্র বলেছে, শেষ মুহূর্তে তারা পুলিশ সুপারের বিষয়ে অটল থাকতে পারে। জেলা প্রশাসকের বিষয়ে তাদের শেষ ছাড় হতে পারে তার ডিএম এর ভূমিকা থাকবে না। জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক এবং রাজস্ব কর্তৃত্ব ভোগ করবেন। তবে এখন ডিএম'এর ভূমিকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকে। সূত্রমতে সমঝোতা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন বোর্ড একটি ইঞ্জিনিয়ারিং উইং-এ পরিণত হবার সম্ভাবনা বেশি। জিয়া আমলে প্রতিষ্ঠিত এই বোর্ডের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সেনাবাহিনীর এলাকার জিওসি। সমঝোতার পর সম্ভবত এলজিইডির ভূমিকা তিন পার্বত্য জেলায় বিলুপ্ত করা হবে। আগের মতোই কাজ করবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। বৈঠক সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির আহ্বায়ক হংসধ্বজ চাকমা জনকণ্ঠকে বলেছেন, এখন সামান্য কিছু বিষয় অমীমাংসিত আছে। সরকার এখানে আলোচনায় জনসংহতির তুলনায় অনেক অনেক বড়। বড় ভাই ছোট ভাইকে কিছুটা ছাড় দিলে এই বৈঠকেই শান্তিচুক্তি না হবার কোন কারণ দেখছি না।

জনসংহতি সমিতি ভূমির ওপর অধিকারের বিষয়টিও আঞ্চলিক কাউন্সিলের কর্তৃত্বে রাখতে চায়। সরকারের বক্তব্য হচ্ছে–বিষয়টি চূড়ান্ত করবে চুক্তি পরবর্তী ভূমি কমিশন। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে প্রস্তাবিত এই কমিশন পার্বত্য এলাকার ভূমি জরিপের কাজ শুরু করবে সবার আগে। স্থানীয় প্রশাসন, ভূমির বিষয় মীমাংসার পর যে বিষয়টি প্রাধান্য পাবে তা হলো শান্তিবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া এবং বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের প্রক্রিয়া। সূত্র মতে, চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই বাহিনীর সদস্যদের তালিকা দেয়া হবে সরকারের কাছে। সে হিসাবে এবারের বৈঠকের সময় এই তালিকাটি জনসংহতি নেতারা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর অতিদ্রুত

সময়ের মধ্যে শান্তিবাহিনী সদস্যদের 'টোকেন আত্মসমর্পণ' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও আছে সংশ্লিষ্টদের। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবার সম্ভাবনা বেশি। নবনির্মিত কুড়ি সহস্রাধিক আসনের স্টেডিয়ামটি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর ইচ্ছা স্থানীয় প্রশাসনের। ওয়াকিফহাল সূত্রগুলোর মতে, সমঝোতা হবার পর পর জনসংহতি সমিতি নেতা সন্তু লারমার আর গোপন ডেরায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম। কারণ তখন তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। নানা পক্ষকে ক্ষুব্ধ করে তিনি সমঝোতার বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত তাঁর সংগঠনকে নিয়ে এসেছেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সন্তু লারমাকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান করার চিন্তাভাবনাও আছে। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান বা চেয়ারম্যান পদটি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন হবার কথা।

শরণার্থী প্রত্যাবাসন

শরণার্থী প্রত্যাবাসনের পঞ্চম দিনে মঙ্গলবার ১৫১ পরিবারের ৮৮২ জন সদস্য দেশে ফিরে এসেছেন। ত্রিপুরার টাকুমবাড়ি শিবির থেকে ফেরা এসব শরণার্থী মাটিরাঙ্গা ও দিঘিনালা থানার বাসিন্দা। আজ বুধবার টাকুমবাড়ি, লেবাছড়া, পঞ্চরাম পাড়া শিবির থেকে ফিরে আসবেন ১৫০ পরিবারের ৭৫৮ জন। ত্রিপুরা থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের ব্যাপক কদর এখন ইউপি নির্বাচনের প্রার্থীদের কাছে। শরণার্থীরা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। সেজন্য প্রার্থীরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা শরণার্থীদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭

শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা বরদাশত করা হবে না ॥ বিভিন্ন সংগঠনের হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিভিন্ন সংগঠন নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এসব সংগঠন নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, শান্তিচুক্তিকে কেন্দ্র করে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা বরদাশত করা হবে না।

মঙ্গলবার পৃথক পৃথক কর্মসূচী পালনকালে বিভিন্ন সংগঠন নেতৃবৃন্দ সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, সংবিধানের আওতায় চুক্তি হলে গণতন্ত্রমনা কোন মানুষ এর বিরোধিতা করতে পারবে

না। গতকাল যেসব সংগঠন পার্বত্য শান্তিচুক্তির সমর্থনে কর্মসূচী পালন করে সেগুলো হচ্ছে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ হকার্স লীগ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি

জাতীয় সমন্বয় কমিটি আয়োজিত সম্প্রীতি সমাবেশে পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিগত ২১ বছর ধরে পার্বত্য এলাকার সমস্যা ইচ্ছা করে জিইয়ে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপে আলোচনার উদ্যোগ নিলেও আন্তরিকতা ছিল না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, কাজী আরেফ আহমেদ, শাহরিয়ার কবির, অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ হাসান ইমাম।

পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, বিদেশী প্রভুদের ইঙ্গিতে আজ এ চুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে।

'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিস্থাপনে সমস্যাবলী' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা বলেছেন, কোন সরকারই সংবিধান পরিপন্থী কোন চুক্তি করতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। শান্তিচুক্তির উদ্যোগ এই সরকারের একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বিদ্বেষপ্রসূতভাবে এই উদ্যোগকে ব্যাহত করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গত মঙ্গলবার বিকালে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির এক নম্বর হলে এই সংলাপের আয়োজন করে।

সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংলাপে অংশ নেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে এম সোবহান, আইনবিদ ডঃ কামাল হোসেন, প্রবীণ সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, মঈদুল হাসান, অজয় রায়, মফিদুল হক, নূহউল আলম লেলিন, এনায়েতুর রহিম এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশীদ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

সমঝোতার লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তি সংলাপ শুরু

ফজলুল বারী ॥ পার্বত্য শান্তি সংলাপে একটি সমঝোতা স্মারকে উপনীত হবার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারী একটি সূত্র আশা প্রকাশ করে বলেছে, এই প্রথম মনে হয়েছে জনসংহতি নেতারা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার

প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকা এসেছেন। সরকার পক্ষও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য প্রথম শুরু হয়েছে এখনও অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা। বুধবারের বৈঠকে প্রস্তাবিত পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব নিয়েই মূল আলোচনা হয়। সপ্তম দফা বৈঠকের প্রথম দিনে বৈঠক হয়েছে ৪ ঘণ্টা। দুপুর আড়াইটায় শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। আজ সকালে বৈঠক আবার শুরু হবে। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা স্ব স্ব পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, জনসংহতির সঙ্গে এখনও ভূমির ওপর কর্তৃত্ব, আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব এবং আত্মসমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা বাকি। সরকার সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পর প্রস্তাবিত ভূমি কমিশনের কাছেই ভূমি বিষয়ক কর্তৃত্ব নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। জনসংহতি এ ব্যাপারে আগেভাগেই স্পষ্ট কিছু ঘোষণা চায়। পার্বত্য তিন জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারদের চাকরি, তাদের এসিআর লেখার কর্তৃত্ব জনসংহতি আঞ্চলিক কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে রাখতে চায়। বিশেষত পুলিশ সুপারের বিষয়ে তারা বেশি জোর দিচ্ছে। তাদের পক্ষে বলা হয়, স্থানীয় সরকার পরিষদ যেগুলো তিন পার্বত্য জেলায় আছে সেগুলোর আইনে আলাদা পুলিশ বাহিনী গঠনের বিধান থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। অতীত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তারা এ বিষয়ে এখনই কার্যকর একটি ব্যবস্থার নিশ্চয়তা চায়। জনসংহতি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণের পর পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তাদের পক্ষে বলা হয় এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েই তারা বাহিনীর সদস্যদের সমঝোতার বিষয়ে রাজি করিয়েছে। আলোচনা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, তিন পার্বত্য জেলায় গণতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন ব্যবস্থা চালু করতে সরকারের কোন আপত্তি নেই। আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব প্রশ্নে সে কথাই বলা হয়েছে জনসংহতি নেতাদের। এই সূত্র বলেছে, আলোচনায় দু'পক্ষই খুব আন্তরিক। সে জন্য এ বৈঠকেই ফয়সালা হবে এটা আশা করা এখন মোটেই অবান্তর নয়। জনসংহতিও সম্মানজনক রাজনৈতিক ফয়সালা চায়। সকল দলমত নির্বিশেষে ঐকমত্যের ফয়সালা চায়। এ বিষয়টিও তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

বুধবার বেলা আড়াইটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার এই সপ্তম দফা শান্তি সংলাপ শুরু হয়। বৈঠক উপলক্ষে এর আগে জনসংহতি নেতারা সকাল সাড়ে ১০টায় দুদুকছড়ি থেকে রওনা হন। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তাঁদের বহনকারী সামরিক হেলিকপ্টার পুরনো বিমানবন্দর সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নামলে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা ও অন্যান্যকে অভ্যর্থনা জানান। আব্দুল্লাহ তাঁর গাড়িতে করে লারমাকে পদ্মায় নিয়ে আসেন। দুপুরের

খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। গতকালই আলোচনা পর্ব কখনও চারজন, কখনও ছয়জনের গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। দু'পক্ষের দুই নেতাও আলাদা বৈঠক করেছেন। সন্তু লারমা ছাড়াও জনসংহতির পক্ষে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা, রক্তোৎপল ত্রিপুরা এবং ডাঃ বাবুল চাকমা। জাতীয় কমিটির পক্ষে চীফ হুইপ ছাড়াও আতাউর রহমান কায়সার, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্সের সচিব কাজী গোলাম রহমান প্রমুখ অংশ নিচ্ছেন আলোচনা পর্বে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭
'পাহাড়ী-বাঙালী ভাই ভাই
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'
চট্টগ্রামে বিশাল
শান্তি মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ 'পাহাড়ী-বাঙালী ভাই ভাই, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'–স্লোগানে-স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছিল বুধবার বিকালের চট্টগ্রাম। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের পাহাড়ী-বাঙালীর রক্তের হোলিখেলা শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে শান্তি চুক্তির পূর্ব মুহূর্তে গতকাল সর্বস্তরের জনতার ঢল নামে নগরীর রাজপথে।

চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর ডাকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর অসংখ্য নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী আনন্দ-উল্লাসমুখর পরিবেশে একাত্ম হয়ে যায় বাঙালীদের সাথে। বিকাল ৪টায় নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে জনতার বিপুল সমাগম ঘটে। এরপরই শুরু হয় বর্ণাঢ্য শান্তি মিছিল। এই মিছিলে যোগ দিতে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান থেকে ছুটে আসেন অসংখ্য পাহাড়ী নারী-পুরুষ। ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ব্যানারসহ হাজার হাজার মানুষের এ মিছিলে একই কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় 'পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই, আমরা সবাই শান্তি চাই', 'পাহাড়ী বাঙালী ভাই ভাই এক সাথে থাকতে চাই'।

বিশাল এই মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে লালদীঘি, কোতোয়ালি থানা, নিউমার্কেট, স্টেশন রোড, এনায়েত বাজার হয়ে আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

মিছিলের অগ্রভাগে মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর সাথে ছিলেন বান্দরবান স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যান থোয়াইংপ্রু মাস্টার। মিছিল শুরু করার আগে

মেয়র বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে যে শান্তি চুক্তি হতে যাচ্ছে, তার বিরোধিতা যারা করছে তারা দেশের শান্তি চায় না। দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যাদির একটি সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানকল্পে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে পাহাড়ী-বাঙালী শান্তির পথে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়। তাই শান্তি চুক্তি অত্যাবশ্যক। বান্দরবান স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান বলেন, পাহাড়ী-বাঙালী কোন ভেদাভেদ নেই, আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চিরস্থায়ী হোক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডঃ আবু ইউসুফ আলম, এ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন বাবুল প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

২৯ নবেম্বর শান্তিবাহিনী খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ করতে পারে

মনিরুল ইসলাম মনু, বান্দরবান থেকে: পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্বত্য শান্তি আলোচনা চলতে থাকলে আগামী ২৯ নবেম্বর খাগড়াছড়িতে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল একটি সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, সব কিছু ঠিক থাকলে অস্ত্র সমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন।

পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছিল ১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল। ঐ সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরের ১০ দিন পর ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে শান্তিবাহিনীর (প্রীতি গ্রুপ) ২শ' ৩৩ জন সশস্ত্র সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল।

দায়িত্বশীল অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, এবার চূড়ান্ত সমঝোতা স্বাক্ষর হলে ৪ শতাধিক সদস্য প্রতীকী অত্মসসমর্পণ করতে পারেন ২৯ নবেম্বর। এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সদস্যের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র সমর্পণ করার কথা রয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ির দুদুকছড়ি সীমান্ত সংলগ্ন পার্বত্য উপত্যকায় বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র সদস্য অপেক্ষারত রয়েছেন। এঁদেরই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে এ নিয়ে সরকারী মহলে জল্পনা কল্পনা চলবে। চুক্তির নিস্পত্তিকৃত বিষয়সমূহ কি কিংবা কোন্ কোন্ বিভাগ সরকার প্রস্তাবিত আঞ্চলিক

কাউন্সিলে ন্যস্ত করবেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কেউ কোন তথ্য না জানালেও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সূত্রের গোপনীয়তা সত্ত্বেও কিছু কিছু তথ্য বেরিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে, আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এই সংস্থায় একীভূত হয়ে যাবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজসমূহ এলজিইডি এবং গণপূর্ত বিভাগের পরিবর্তে উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। আঞ্চলিক কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে সড়ক ও জনপথ বিভাগ নতুন পরিকল্পনা/প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবর্তে পুরনো সড়কসমূহের সংস্কার কাজের দায়িত্ব পালন করবে মাত্র। তবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাবে। এসব তথ্য পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। ফলে কোন্ বিভাগ কি অবস্থায় যাবে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ।

ইতোপূর্বে বিশেষ কার্যাদি বিভাগের এক নির্দেশে ২১ নবেম্বর পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত রাখা হয়েছিল। ঐ নির্দেশ এখনও বলবত রয়েছে।

এদিকে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর এবং শান্তিবাহিনী সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পরও বান্দরবানে শান্তিবাহিনীর নামে বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চলমান কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গত ৩ দিন আগে বিভিন্ন সাইট থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের উঠে আসতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৭শে নভেম্বর ১৯৯৭

নাগরিক সমাবেশে পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া সফল করার দৃঢ় অঙ্গীকার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকায় বুধবার অনুষ্ঠিত নাগরিক সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন, ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন বিএনপি সরকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ১৩ দফা বৈঠক করেছে। এখন বিএনপি ও তার সাম্প্রদায়িক সহযোগীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছে। নাগরিক সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া সফল করার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সমর্থনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এ নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের বিভিন্ন

স্তরের বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ এ নাগরিক সমাবেশে অংশ নেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থান হতে মিছিলসহ তাঁরা এ নাগরিক সমাবেশে শরিক হন।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ নাগরিক সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনী ও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সরকারের সঙ্গে শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দের ১৩ দফা বৈঠক হয়েছে। সেই সময় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের সেই শান্তি আলোচনায় বাধা দেয়নি। বরং এ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আওয়ামী লীগের যে একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি প্রায় প্রতিটি বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন। অথচ বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত কমিটিতে বিএনপি'র দুই প্রতিনিধির একজনও একটি বৈঠকেও যোগ দেননি। বরং শান্তি আলোচনা শুরু হতে না হতেই বিএনপি'র নেতা-নেত্রী এবং তাদের সাম্প্রদায়িক দোসররা শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

নাগরিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিচারপতি কেএম সোবহান, সৈয়দ হাসান ইমাম, অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী, ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম তালুকদার ও সালাহ উদ্দিন বাদল প্রমূখ।

বিচারপতি কেএম সোবহান বলেছেন, শান্তিচুক্তি নস্যাত করার জন্য শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ষড়যন্ত্র চলছে। সৈয়দ হাসান ইমাম বলেছেন, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর যারা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের শান্তি প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দামাল ছেলেরা প্রয়োজনে আবার অস্ত্র ধরবে।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মানুষকে বিভ্রান্ত না করার জন্য জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তিচুক্তি সংবিধানের পরিপন্থী তো নয়ই, বরং এ চুক্তি সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করবে। নাগরিক সমাবেশে প্রায় সকল বক্তা বলেছেন, হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭

ক'দিনের মধ্যেই স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে পার্বত্য সমঝোতা স্মারক ॥ 'খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে'

ফজলুল বারী ॥ আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাক্ষরিত হবে পার্বত্য সমঝোতা স্মারক। সরকার এ ব্যাপারে নিজস্ব প্রস্তুতির গাইডলাইন তৈরি করেছে। জনসংহতি সমিতির চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের দফা-রফা। জনসংহতি নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বৃহস্পতিবার নিজের মুখেই সে আভাস দিলেন সাংবাদিকদের। বললেন, 'খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। শীঘ্রই চুক্তি করতে যাচ্ছি'। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু লারমার এই ঘোষণার সময় তাঁর পাশে দাঁড়ানো ছিলেন আলোচনায় সরকার পক্ষের নেতা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। চীফ হুইপ কাল কিছু বলেননি। তবে তাঁর মুখের স্মিত হাসি বলে দিচ্ছিল, তিনি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। জাতীয় কমিটির এক সদস্য জনকণ্ঠকে বলেছেন, তাঁরা এই সমঝোতা স্মারকের জন্য এখনই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের কথা ভাবছেন না। বললেন, এর মনে হয় প্রয়োজনও নেই। কারণ এটি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি নয়। এই সদস্য অবশ্য বলেন, শাসক দল আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতার বিশেষ অধিবেশনের চিন্তা আছে।

ওয়াকিবহাল একটি সূত্র বলেছে, প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক নিয়ে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ মঙ্গলবার সরকারের নীতিনির্ধারণী এক ব্যক্তির সঙ্গে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বৈঠক করেন। আলোচনায় জাতীয় কমিটির সদস্যের বাইরে পার্বত্য সমঝোতার প্রশ্নে এই ব্যক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ষষ্ঠ বৈঠকের পর সরকার এবং জনসংহতির মাঝে যতটা যোগাযোগ হয়েছে তাতে উভয় পক্ষ স্ব-স্ব সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত হন। এরপর গত পক্ষকাল আগে জনসংহতির কাছে খসড়া স্মারকের যে কপি পাঠানো হয়েছে এবার ঢাকা আসার সময় জনসংহতি নেতারা তার একটি জবাব নিয়ে আসেন। জানা গেছে, বুধবারের বৈঠকের শুরুতে সন্তু লারমা তাদের পক্ষ থেকে জবাবের একটি কপি দিয়েছেন চীপ হুইপকে। চীপ হুইপও তখন সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় চূড়ান্ত একটি স্মারকের কপি সন্তু বাবুর হাতে দেন। সরকারী একটি সূত্র এই বিষয়কেই খসড়া বিনিময় হিসাবে উল্লেখ করেছে। দুই পক্ষের চলতি আলোচনাকে বলা হচ্ছে, এক পক্ষের কাছ থেকে আরেক পক্ষের আয়পর্ব।

সরকার এক্ষেত্রে এখনও তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। বৃহস্পতিবারের আলোচনায় পার্বত্য এলাকায় ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কথা হয়েছে।

সূত্রগুলোর মতে, জনসংহতি এখনও চাইছে প্রস্তাবিত ভূমি কমিশন প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। সরকার এ বিষয়টিতে আপত্তি জানিয়ে বলেছে, একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে এ ধরনের কমিশন কোন স্থানীয় সংস্থার কর্তৃত্বে রাখার বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন করে না। জনসংহতির পক্ষে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সরকারকে রাজি করাতে একাধিক দাতা দেশের কাছে তদবির হয়েছিল। সেখান থেকেও বলা হয়েছে এটা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন করে না এমন কিছু অনুরোধ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত ভূমি কমিশন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর পার্বত্য এলাকার ভূমি জরিপের কাজ শুরু করবে। তখনই ভূমিসংক্রান্ত অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হবে। জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারের চাকরির কর্তৃত্ব রাখতে চায় প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে। আত্মসমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পার্বত্য এলাকায় পুলিশ বাহিনীতে চাকরির বিষয় নিশ্চিত করতে চায়। সরকার আত্মসমর্পণের পর শান্তিবাহিনীর সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার চাকরি দিতে রাজি। তবে এক্ষেত্রে সরকারী প্রস্তাব হচ্ছে, তাদের পোস্টিং দেয়া হবে পার্বত্য এলাকার বাইরে। জনসংহতি এখনও এ বিষয়ে রাজি হচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার শান্তি সংলাপের দ্বিতীয় দিনে বৈঠক হয়েছে গ্রুপভিত্তিক। চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, আতাউর রহমান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা সরকার পক্ষে এবং সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, গৌতম চাকমা জনসংহতির পক্ষে ছিলেন। সকাল ১১টায় দিনের প্রথম দফা বৈঠক শুরু হয়। দুপুর দেড়টায় শেষ হয় এ পর্ব। বিকাল তিনটায় শুরু পরের পর্ব চলেছে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সাতটায় ব্রিফিং দেয়া হবে সাংবাদিকদের। ব্রিফিং হয় সাতটা পঁচিশে। কালো রঙের সাফারি পরা সন্তু লারমা অন্যদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এসেই হাত তুলে নমস্কার জানান। তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। ষষ্ঠ বৈঠকের ব্রিফিংয়ের সঙ্গে এবারের প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্যে মিল ছিল। তখন সন্তু লারমা বৈঠক শেষে বলেছিলেন, 'আমরা একটি খসড়া চুক্তিতে উপনীত হয়েছি।' এবার বললেন, 'খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। আগেরবার বলেছেন, 'আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে চুক্তির বিষয়াদি ঠিক করব।' 'আবার ঢাকা আসব চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যই। এবার বলেছেন, 'শীঘ্রই চুক্তি

করতে যাচ্ছি।' বৈঠক সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করতে আরও তিন দিনের বেশি সময় লাগতে পারে। আজ শুক্রবার তৃতীয় দিনের বৈঠক শুরু হবে বিকাল ৩টায়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

একদিকে মহাসমাবেশ, অন্যদিকে হরতাল ॥ আহত আরও একজনের মৃত্যু

চট্টগ্রামে টানটান উত্তেজনা ॥ সংঘর্ষের আশঙ্কা

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস ॥ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সর্বত্র টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। আজ শনিবার একদিকে চট্টগ্রামে বিএনপি আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল এবং অপরদিকে আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ। ফলে সর্বত্র চরম এক অস্থিতিশীল ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। উভয়পক্ষ স্ব-স্ব কর্মসূচীর পক্ষে দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। ফলে আবারও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা সর্বত্র। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ আরও একজন মারা গেছে। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। সকাল থেকে শুরু হবে বিএনপি'র হরতাল। আর বেলা ২টায় বিশাল পলোগ্রাউন্ড ময়দানে মহাসমাবেশের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হবেন কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের সাথে নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির সমর্থনে চট্টগ্রাম মহানগরী, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এ মহাসমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে। এ সমাবেশের ৪৮ ঘণ্টা আগে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মধ্যে ঘটে গেছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। আর এ সংঘর্ষের রেশ চলেছে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিএনপি আজ শনিবার চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে।

একই দিনে বিএনপি'র হরতাল ও আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সর্বত্র উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণা করা হয়েছিল, হয় আওয়ামী লীগ সমাবেশ স্থগিত বা বিএনপি হরতাল প্রত্যাহার করবে। ন্যূনতম পক্ষে হরতাল সকাল-সন্ধ্যার হলে কমিয়ে আধ-বেলা করা হবে। কিন্তু উভয় পক্ষ স্ব-স্ব অবস্থানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনড় রয়েই গেছে। ফলে একদিকে হরতাল অন্যদিকে মহাসমাবেশ দুয়ের মাঝে আজ চট্টগ্রামে কি ঘটে যেতে পারে তাই এখন সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয়। রাজনৈতিক সূত্রসমূহ জানিয়েছে, উভয়পক্ষ শক্তির মহড়া প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আজকের

হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, আওয়ামী লীগ বহু আগে থেকে এ মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে। এ দিন হরতাল আহ্বান পরিকল্পিত। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, মহাসমাবেশে আগত জনগণের ওপর কোন হামলা বা নির্যাতন চালানো হলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার বিএনপিকেই বহন করতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে নগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, একই সময় নাসিমন ভবনস্থ দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছেন, আজকের সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলবে। হরতালে কেউ বাধা দিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দিলে এর দায়ভার তাদের ওপরই বর্তাবে। বিএনপি নেতা সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান ও সাবেক মেয়র মীর মোঃ নাসির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, হরতাল প্রত্যাহারে আমরা কারও আবেদন অনুরোধ পাইনি।

এছাড়া হরতাল কর্মসূচী পুনর্বিবেচনার সুযোগও নেই। তাঁরা মেডিক্যাল ক্যাম্পাসে পুলিশের ছত্রছায়ায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন। এ সময় বিএনপি নেতা সাংসদ ওয়াহিদুল আলম, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে পুলিশ প্রশাসন বলেছে, তারা আজ ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কা করছে। দাঙ্গা পুলিশের পাশাপাশি প্রচুর বিডিআর ও আর্মড ব্যাটেলিয়ন পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হবে। পুরো বিষয়টি সরকারের উঁচু মহলকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থানরত পুলিশের মহাপরিদর্শক ইসমাইল হোসেনের সাথে বিএনপি কর্মকর্তারা ঘটনার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অপরদিকে উভয়পক্ষের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী চট্টগ্রামে জড়ো হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজির দেউড়ি, বহদ্দারহাটসহ বিভিন্নস্থানে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। কেউ হতাহত হয়নি। অন্যদিকে বৃহস্পতিবারের ঘটনায় কাপাসগোলায় গুলিবিদ্ধ খায়রুল ইসলাম (২২) গভীর রাতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ে খায়রুলকে তাদের সমর্থক বলে দাবি করেছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩ জনে উন্নীত হলো। উভয়পক্ষ শুক্রবার সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৃহস্পতিবারের ঘটনার প্রতিবাদে একে অন্যকে দায়ী করে। মেডিক্যাল ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ২৫ বিএনপি ও ছাত্রদল নেতার নামে থানায় একটি

হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। নিহত ২ ছাত্রলীগ কর্মীর জানাজা হয়েছে শহীদ মিনার চত্বরে। রাতে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানান হয়, বিশেষ সংস্থাগুলোও তাদের গোপন রিপোর্টে সহিংসতার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

২৯শে নভেম্বর ১৯৯৭

যে কোন সময়ে পার্বত্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে

ফজলুল বারী ॥ ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে পার্বত্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের। আজ-কাল-পরশুর যে কোন দিন এটি স্বাক্ষরের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছে একাধিক সরকারী সূত্র। চূড়ান্ত দফা বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে শুক্রবার একটি বৈঠক হয়। পর্যবেক্ষক কূটনৈতিক ব্যক্তিরাও নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেছিলেন। সরকার এবং জনসংহতির মধ্যে গতকালের বৈঠকটি ছিল একান্তভাবে দুই নেতার। সরকারী পর্যায়ে যে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই এখন মূল দরকষাকষি হচ্ছে।

সরকারী একটি সূত্র বলেছে, বৃহস্পতিবার সন্তু লারমা নিজের মুখে ঘোষণা দিলেও তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা ভূমি এবং প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কমিশনের ক্ষমতার বিষয়ে দরকষাকষি করে যাচ্ছেন। ভূমির মালিকানা নিয়ে তাদের মূল দাবিকে এখনও বলা হচ্ছে 'প্রথাগত অধিকার' শিরোনামে। ১৯০০ সালের হিলট্র্যাক্স রেগুলেশন এ্যাক্ট অনুসারে পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ীদের সংরক্ষিত ভূমি অধিকারের পুনর্বহাল চাইছেন তাঁরা। ভূমি বিষয়ক কর্মকর্তা পর্যায়ের তদারকির বিষয়ে সরকার এখন পর্যন্ত এসি ল্যান্ড পর্যায়ের কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কাউন্সিলের কাছে দিতে রাজি হয়েছে। তবে সূত্রগুলো বলেছে, বর্তমান মতভেদগুলোর শীঘ্রই মীমাংসার সার্বিক চেষ্টা চলছে। সরকার পক্ষের মূল আলোচক চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এসব বিষয়ে দ্রুত ফয়সালায় আর একটি ঘনিষ্ট সূত্রের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সূত্র মতে, সার্বিক বিষয়ে সমঝোতা এগিয়ে নেবার পাশাপাশি সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। আজ চট্টগ্রামে, আগামীকাল ঢাকা-চট্টগ্রামসহ ৬ বিভাগীয় শহরে বিরোধীদলের হরতালের কর্মসূচী আছে। সমঝোতা স্মারক বা শান্তি চুক্তি হয়ে যাবার পর বিরোধীদলের হরতাল করার কথা। তাই এই হরতাল দু'টির সময়েই শান্তির নিজস্ব কাজটি করে নেয়া যায় কি না সে ব্যাপারেও চিন্তা করছে সরকারী একটি মহল। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মুহূর্ত নিয়ে পার্বত্য

এলাকায়ও এখন চলছে অপেক্ষার পালা। খাগড়াছড়ির গুরুত্বপূর্ণ এক পাহাড়ী নেতা শুক্রবার জনকণ্ঠকে বলেছেন তিনি ঢাকার টেলিফোনের অপেক্ষায় আছেন। ডাক পেলেই ঢাকা রওনা হবেন। শুক্রবার সকালের দিকটায় কোন বৈঠক হয়নি। সকালে দুইপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলাদা বৈঠক করেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর চীফ হুইপ অতিথিশালা পদ্মায় যান। তিনি সেখানে প্রথমে কথা বলেন সন্তু লারমা, রূপায়ণ দেওয়ান, গৌতম চাকমার সঙ্গে। এরপর তিনি সন্তু লারমার সঙ্গে একান্তে রুদ্ধদ্বার একটি বৈঠকে বসেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় চীফ হুইপ পদ্মা ছেড়ে চলে যান। সূত্র বলেছে, আজ সকালের দিকে বৈঠক হবার সম্ভাবনা কম।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩০শে নভেম্বর ১৯৯৭
অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠন করা হবে আঞ্চলিক পরিষদ

ফজলুল বারী ॥ তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে। জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরে অনুমোদন নেয়া হবে এই অধ্যাদেশের। সরকার পক্ষের আলোচকরা জনসংহতি নেতাদের কাছে এই প্রস্তাব দিয়েছেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে এই আঞ্চলিক পরিষদ। এর নাম হবে পার্বত্য পরিষদ। তবে জনসংহতি নেতারা এখনই একটি অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠনের জন্য চাপ দিচ্ছেন সরকারকে। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী পরিষদ কাজ চালিয়ে যাবে। সরকারী আলোচকরা এ ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত কথা দেননি। তাছাড়া ভূমির অধিকার, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন বিষয়েও এখন মতপার্থক্য বহাল রয়ে গেছে। এই অবস্থায় শনিবার জনসংহতির সঙ্গে চতুর্থ দিনের বৈঠকটিও হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির এক সদস্য জনকণ্ঠকে বলেছেন, চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ অসুস্থ। সেজন্য বৈঠক হয়নি। আব্দুল্লাহ জ্বরে ভুগছেন বলে জানা গেছে। আজ রবিবার হরতালের পর বৈঠকটি হতে পারে। গতকাল বিকালে জাতীয় কমিটির সদস্য আতাউর রহমান কায়সার, কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপঙ্কর তালুকদার, বীর বাহাদুর পদ্মায় গিয়েছিলেন। কিন্তু চীফ হুইপ আসতে না পারায় বৈঠকটি হয়নি।

সূত্র বলেছে, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের দিনক্ষণ শনিবার পর্যন্ত ঠিক হয়নি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। গত

কয়েকদিন ধরে দেশে বিশেষ একটি পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষ করে সর্বশেষ বিরোধী দলের নেত্রীর চট্টগ্রাম সফর পরবর্তী ঘটনাবলী, শনিবারের বিভিন্ন সহিংস ঘটনার জের কোন্ দিকে গড়ায় লক্ষ্য রাখা হচ্ছে সেদিকে। সূত্রটি বলেছে সরকার যে কোন দিন চুক্তির জন্য তৈরি আছে। আজ রবিবারের আধাবেলার হরতাল কর্মসূচীর পরবর্তী পরিস্থিতি দেখে এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিদেশী কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানোর কথা আছে। ওই সময়ে সাংবাদিক উপস্থিতির বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। একটি পক্ষ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর প্রেসব্রিফিং-এর পক্ষপাতী। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপরই নির্ভরশীল সবকিছু। সূত্র বলেছে, এখন প্রতিদিন আলোচনা করার মতো বিশেষ কিছু বাকি নেই। অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি চীফ হুইপ আব্দুল্লাহ এবং সন্তু লারমার মধ্যে কথা হচ্ছে। সমঝোতা স্মারকের মূল কাঠামোটি সরকার পক্ষ থেকে প্রায় চূড়ান্ত করাই আছে। সরকার এবং জনসংহতি সমিতি উভয়পক্ষ এখন সতর্ক প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকের আইনগত খুঁটিটনাটির বিষয়ে, অনেকেই এর বিরুদ্ধে নানা প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। কেউ আদালতে গিয়ে যাতে পুরো বিষয়টিকে গোলমেলে অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে না পারে সে জন্যই নেয়া হয়েছে আগাম সতর্কতা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৭
আরও ৯৭৬ পাহাড়ী শরণার্থী ফিরেছেন

খাগড়াছড়ি, ৩০ নবেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–তবলছড়ি-রামগড় সীমান্ত দিয়ে পাহাড়ী শরণার্থীদের দেশে ফেরা অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ১০ম দিনে আজ রবিবার ২০৬ পরিবারের ৯শ' ৭৬ শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি যে কোন মুহূর্তে

ফজলুল বারী ॥ আজ কি পাহাড়ে শান্তি সূচনার বহুল প্রত্যাশিত সেই দিন? আজ মঙ্গলবার পার্বত্য শান্তি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। একাধিক সরকারী সূত্র সোমবার রাতে জনকণ্ঠকে তথ্য দিয়ে বলেছে,

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম দিকেই হবার সম্ভাবনার কথা। এ উপলক্ষে জাতীয় কমিটির সকল সদস্যকে ঢাকায় উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। জাতীয় কমিটির জাপা দলীয় সদস্য এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী সোমবার ঢাকার বাইরে ছিলেন, তাঁকেও অনুরোধ করা হয়েছে আজ সকালের মধ্যে ঢাকা পৌঁছবার জন্য। সোমবার রাতে বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাবার সময় চীফ হুইপ সাংবাদিকদের বলেন, আশা নিয়েই বেঁচে আছি। সময় হলেই সবকিছু জানতে পারবেন।

সূত্রগুলো বলেছে, রবিবার বিকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দীর্ঘ বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ আলমগীর সমঝোতা স্মারকের খসড়া প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। চাকমা রাজা দেবাশীষ আইনগত খুঁটিনাটির বিষয়ে পাহাড়ী নেতাদের সহায়তা করেন। সূত্রমতে সংবিধানের ভিতরেই সব সমঝোতা হচ্ছে। সেজন্য পাহাড়ী নেতাদের অনেক দাবিই সরকার মানতে পারেনি। সোমবার দুপুর পর্যন্ত চূড়ান্ত খসড়া অনুসারে ভূমি বন্দোবস্ত ধারায় স্থানীয় সরকার পরিষদকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিতে সরকারপক্ষ রাজি হয়েছে। সমঝোতা স্বাক্ষরের পর একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ভূমি কমিশন পার্বত্য এলাকার ভূমি জরিপ শুরু করবে। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কমিশন গঠনের পর পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান অন্তর্বর্তী স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ কাজ করে যাবে। জনসংহতি সমিতি তিন পার্বত্য জেলার তিন পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন নিয়ন্ত্রণ চেয়েছিল। কিন্তু সংবিধান সম্মত না হওয়ায় সরকার দাবিটি মানেনি। সরকার প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদকে প্রয়োজনীয় প্রো-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেবার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। জনসংহতিকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে আত্মসমর্পণের পর শান্তি বাহিনীর সদস্যদের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হবে। উল্লেখ্য, ভূমির অধিকার, আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসন প্রশ্নেই জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সরকারের মূল মতবিরোধ ছিল।

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে বর্তমান সরকারের সঙ্গে সপ্তম দফা বৈঠকেরও আজ সপ্তম দিন। সোমবারের ষষ্ঠ দিনে সকালে বিকালে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রথমে সংক্ষিপ্ত, সন্ধ্যার পরে কয়েকঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠক হয়। দীর্ঘ বৈঠকের সূচনাপর্বে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, জনসংহতি প্রধান সন্তু লারমা একান্তভাবে আলোচনা করেন। সূত্রমতে রবিবার রাতে দীর্ঘ বৈঠকের পর সন্তু লারমা

কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সোমবার সকালের বৈঠক হয়নি। পাহাড়ী এই নেতা এ্যাজমাসহ নানা অসুখে ভুগছেন। সূত্রমতে সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করা উপলক্ষে গতরাতে পদ্মা অতিথিশালার ভিতরেই কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক লোকজন নিয়ে যাওয়া হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : সব অপেক্ষার পালা শেষ। এদ্দিন যা ছিল জল্পনা, কল্পনার, তা এখন দিবালোকের মতো সত্য বিষয়। স্বাক্ষরিত হয়েছে পার্বত্য শান্তির ঐতিহাসিক সমঝোতা চুক্তি। মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বহুল প্রত্যাশিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, পার্বত্য জাতীয় কমিটি জনসংহতির নেতৃবৃন্দ, তিন বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ প্রধান, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রায় অর্ধশত সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন মাহেন্দ্রক্ষণটিতে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সংবিধানের বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করে প্রণীত চুক্তিটি রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে এবং বিরোধী দল চাইলে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চীফ হুইপ এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এর কপি বঙ্গভবনে পৌঁছে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। ঢাকার বিদেশী কূটনীতিকরাও চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার বিকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর মন্ত্রণালয়ে কূটনীতিক এবং দাতাদেশ প্রতিনিধিদের সভায় চুক্তির বিষয়বস্তু বিস্তারিত জানালে তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

জনসংহতি সমিতির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ২৬তম এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ৭ম বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা আত্মসমর্পণ করবেন। এর মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের তালিকা এবং অস্ত্র গোলাবারুদের হিসাব জমা দেয়া হবে সরকারের কাছে। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বাঙালী জনগোষ্ঠীর কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা হবে না। যাদের সেখানে বৈধ জমি নেই তাদের সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসন করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সব নিয়মিত সেনানিবাসসমূহ থাকবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর

পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পসমূহ গুটিয়ে সৈন্যদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেয়া হবে। একই সঙ্গে বহাল থাকবে বিডিআর, আনসার, আর্মড পুলিশের সব ব্যবস্থাপনা এবং সীমান্ত চৌকিসমূহ। চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকারের নতুন নাম হবে পার্বত্য জেলা পরিষদ। তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের এবং তাঁর মর্যাদা হবে প্রতিমন্ত্রীর। এছাড়া একজন উপজাতীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রী করে গঠন করা হবে পৃথক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠন করা হবে ভূমি কমিশন। এই কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিষয়ক যে কোন অভিযোগ ফয়সালার বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এই কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাবে না। স্থানীয় পরিষদসমূহ পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরসহ নিম্নবর্তী পদসমূহে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ কর্তৃত্ব লাভ করবে। সূত্র বলেছে, চুক্তি বাস্তবায়ন পর্বে বর্তমান স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ মূলত সাধারণ জেলা পরিষদের মর্যাদায় রূপান্তরিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পরপরই জনসংহতি নেতা সন্তু লারমা তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পানছড়ির সীমান্ত গ্রাম দুদুকছড়ি রওনা হয়ে যান। সরকারী একটি সূত্র বলেছে, যথানিয়মে আগামী তিনদিনের মধ্যে ওই এলাকার নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহ বহাল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, শান্তি বৈঠকের পাঁচদিন আগে দুদুকছড়ি এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর ৮টি ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং ৫টি নিষ্ক্রিয় করা হয়। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল আছে। যেহেতু আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আত্মসমর্পণ করার কথা সেহেতু অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আরও একদফা বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

এক নজরে চুক্তি

২২ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন উপজাতীয় ব্যক্তি। পরিষদে উপজাতীয় সদস্য চেয়ারম্যানসহ থাকবেন ১৫ জন। এদের মধ্যে ২ জন মহিলা। ১ জন মহিলাসহ অউপজাতীয় সদস্য ৭ জন থাকবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যরা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন একজন উপজাতীয় সদস্য। উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের ৫ জন চাকমা, ৩ জন মার্মা, ২ জন ত্রিপুরা সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন। মুরং, তনচৈঙ্গ্যা থেকে ১ জন এবং লুসাই, বোম, পাংখো, খুশী, ঢাক ও খিয়াং উপজাতি থেকে ১ জন সদস্য নেয়া হবে। অউপজাতীয় পুরুষ সদস্য প্রতিজেলা থেকে থাকবেন ২ জন। পরিষদের সংরক্ষিত ৩টি মহিলা সদস্যের

একজন হবেন অউপজাতীয়। পাঁচ বছর মেয়াদী আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব বাজেট প্রণয়ন, অনুমোদন, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিষদ বাতিলকরণের ক্ষমতা থাকবে। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার পদে অগ্রাধিকার থাকবে একজন উপজাতীয় প্রার্থীর। আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধায়ন করতে পারবে। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয়, উপজাতীয় আইন ও স্থানীয় বিচার, ভারি শিল্পের লাইসেন্স প্রদান এ সব কিছু থাকবে আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বে। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ এখন থেকে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ' নামে অভিহিত হবে। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং নির্বাচিত অন্যান্য সদস্য শপথ নেবেন হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন বিচারপতির কাছে। এর আগে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের কাছে শপথ নেবার বিধান ছিল। আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে নিয়োগ কর্তৃত্ব ভোগ করবে–এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে উপজাতীয় ব্যক্তিরা। পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও তার নিচের স্তরের সকল সদস্যকে নির্বাচন করে নিয়োগ দেবে পরিষদ। উপজাতীয় ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। পরিষদ এ ছাড়া হেডম্যান, চেনম্যান, আমিন, সার্ভেয়র, কানুনগো, এসি ল্যান্ডদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতে কোন কর্মকর্তাকে পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা দেয়া যাবে না। পরিষদ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা–এসব বিষয়ে সমন্বয়-তত্ত্বাবধান করতে পারবে। এছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের দায়িত্বে থাকবে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার, যুবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্পের বাণিজ্যের লাইসেন্স, কাপ্তাই হ্রদ ছাড়া অন্যান্য নদীনালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনী কারবার ও জুমচাষ। পরিষদ অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফী, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কর, ভূমি-দালানের ওপর হোল্ডিং কর, গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের কর, সামাজিক বিচার ফীস, সরকারী-বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর হোল্ডিং কর, বনজ সম্পদের রয়্যালটির অংশবিশেষ, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাসের ওপর সম্পূরক কর, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে রয়্যালটির অংশবিশেষ, ব্যবসা, লটারী, মাছ ধরার ওপর কর নির্ধারণ, আদায় এবং

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দাবি করতে পারবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে উপজাতীয় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

পার্বত্য এলাকার বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গাজমি জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া ইজারা, বন্দোবস্ত দেয়া, কেনা-বেচা ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুত প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা, সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। একই সঙ্গে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সম্মতি ছাড়া অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করতে পারবে না সরকার। ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে পরিষদ তা নিজের তহবিলে রাখবে। কাপ্তাই হ্রদের ঝিলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হবে জমির মূল মালিকদের। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠন করা হবে একটি ভূমি কমিশন। সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তিন বছর মেয়াদী কমিশনের সদস্য হবেন। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি ছাড়াও এ যাবত যেসব জায়গা জমি পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত বেদখল হয়েছে সে জমি পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলের ক্ষমতা কমিশনের থাকবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত আপীল করা যাবে না।

চুক্তি আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের আত্মসমর্পণের দিন-স্থান ঠিক হবে। এই সময়ের মধ্যে বাহিনীর সদস্যদের নাম, গোলাবারুদের তালিকা জমা দেয়া হবে সরকারের কাছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করে সাধারণ জীবনে ফিরে আসবে তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা করা হবে। প্রত্যাহার করা হবে তাদের বিরুদ্ধে সমুদয় মামলা। মওকুফ করা হবে সমুদয় ঋণ। তবে এই নির্ধারিত তারিখের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না এলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের প্রতি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য নগদ দেয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নামে এর আগে জারি করা সব হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে। সমিতির সদস্যরা যে যে পদে চাকরিরত ছিলেন তাঁদের স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল, পরিবারের সদস্যদের নিয়োগ করা হবে যোগ্যতামাফিক চাকরিতে। তাঁদের বয়সের ক্ষেত্রে শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

চুক্তির বৈশিষ্ট্য

* পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয়, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান–তিন জেলার সমন্বয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে * নতুন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন পাহাড়ী। চেয়ারম্যানের মর্যাদা হবে প্রতিমন্ত্রীর। আঞ্চলিক পরিষদের সাত সদস্য হবেন অ-উপজাতীয় * ৪৫ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করবেন শান্তি বাহিনীর সদস্যরা * বর্তমানে বসবাসরত কোন বাঙালীকে পার্বত্য এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হবে না * অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন জমিসংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি করবে * পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বর্তমান সেনানিবাসসমূহ থাকবে। আর আর্মড পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সব ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার, স্থাপনাসমূহও থাকবে যথাস্থানে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর অপ্রয়োজনীয় সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে * চাকমা রাজাসহ তিন পার্বত্য সার্কেল প্রধানের মর্যাদা বাড়বে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

বিরোধী দল চাইলে পার্বত্য সমঝোতা
চুক্তিটি সংসদে উত্থাপন
করা যেতে পারে ॥ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া। দেশবাসীকে অভিনন্দন। আজ আমার জীবনের বড় একটি আনন্দের দিন। দেশের একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘদিনের বাধা দূর হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারাও এই শান্তিচুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কোন কারণে হয়ত পারেননি। আমরা পেরেছি। তাই আসুন আর বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, সবাই মিলেমিশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করি। কারণ দেশকে আমরা সবাই ভালবাসি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তিটি মঙ্গলবারেই তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতি যদি প্রয়োজন মনে করেন, বিরোধী দল যদি চায় তবে এটি সংসদে উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর মঙ্গলবার সকালে তাঁর দফতরে সাংবাদিকদের উদ্দেশে এক তাৎক্ষণিক ব্রিফিংয়ে এ কথাগুলো বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদিত চুক্তিকে দুই ভাইয়ের মধ্যকার বিরোধের অবসান হিসাবে আখ্যা দেন। বললেন, এখন থেকে সম্ভাবনাময় পার্বত্য অঞ্চলে সংঘাতের বদলে শুরু হবে শান্তি আর অগ্রগতির ধারা। দীর্ঘদিনের এই সংঘাত আমাদের দেশ-জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমরা অনেক রক্ত, ত্যাগ, তিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন করেছি। এ দেশে কোন যুদ্ধাবস্থা থাক তা আমরা চাই না। বর্তমান বিশ্ব শুধুই এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের নিজ দেশে সংঘাত থাকবে এটা কারোরই কাম্য ছিল না। এ কারণে আমরা শুরু থেকেই আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলাম। আমি আশা করছি, এখন সংঘাতময় অবস্থার অবসান, শান্তি স্থাপন হবে। প্রধানমন্ত্রী এই দুঃসাধ্য সাধনের সঙ্গে জড়িত জাতীয় কমিটির সকল সদস্য, কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ, সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধানসম্মতভাবে দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণ অবিচল থেকেই এই সমঝোতা চুক্তি করা হয়েছে। দেশের মানুষ শান্তি চায়। সেজন্য তিনি আশা করে বলেন, শান্তিকামী জনসাধারণ এর বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন। এর বিরুদ্ধে কোন উস্কানিমূলক কার্যক্রমে কেউ জড়িত হবেন না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অশান্তি অবসানের স্বপ্ন আমার দীর্ঘদিনের ছিল। বিরোধী দলে থাকতেও সেজন্য সেখানে কোন ঘটনা ঘটলেই আমি সেখানে ছুটে গেছি। আমি সমস্যাটিকে শুরু থেকেই রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখতাম। রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবেই সমাধানের চিন্তা করতাম। চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সকল অঞ্চলের মতোই সেখানকার নাগরিকদের সমান অধিকার রয়েছে। সকলে মিলেমিশে আমরা এই দেশ গড়ে তুলতে চাই। বিরোধী দলের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অযথা অশান্তি সৃষ্টি না করে শান্তির পথে আসুন। আমাদের পবিত্র ধর্মেও শান্তির কথা আছে। প্রধানমন্ত্রী হবার পর শেখ হাসিনা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম যাননি। কবে যাচ্ছেন–প্রশ্নের জবাবে বললেন, যাবো শীঘ্রই।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
সংবাদ ভাষ্য

চুক্তি হয়েছে, শান্তি চাই

এবিএম মূসা

অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য এলাকায় শান্তির নিশ্চয়তা দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, অনেক সমালোচনা ও অপপ্রচারের মোকাবিলা করে বর্তমান সরকার একটি ঐতিহাসিক পর্ব সমাপ্ত করেছে। চুক্তি যে হবেই এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না, শুধু পদে পদে যে বাধা ছিল তা নিয়েই ছিল অনেক আশঙ্কা। সরকার প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর ছিল, তাদের এই একটি কাজে প্রথম থেকে আন্তরিকতার ছাপ ছিল। জনগণও পার্বত্য এলাকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চেয়েছিল, সেই সমাধানের নাম চুক্তি, সমঝোতা বা সন্ধি যাই দেয়া হোক না কেন, আমি বরং চুক্তি শব্দটির বিরোধিতা করি। চুক্তি হয় দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে, একটি দেশের সরকার আর জনগণ কোন কারণে প্রতিপক্ষ হতে পারে না। বলা যায়, দেশের জনগণের একটি অংশের অসন্তোষের সমাপ্তি ঘটবে একটি বোঝাপড়ার মাধ্যমে। সেই বোঝাপড়ার জন্য প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়েছে অসন্তোষ আছে, তার কারণও বাস্তবসম্মত। সর্বোপরি সেই অসন্তোষ দূরীভূত করতে উদ্যোগ আন্তরিকতার সঙ্গেই নেয়া হয়েছিল। তাই শান্তিচুক্তি মানে আমি ধরে নিচ্ছি দেশের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মনে বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সংঘাতের ফলে যে দেশবাসী দেশ ছাড়া হয়েছিলেন, তাঁরা এবার নিশ্চিন্তে দেশে ফিরে আসবেন।

আমাদের পার্বত্য এলাকায় এই অসন্তোষ আজকের নয়। যেদিন সেই এলাকার জনগণের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পৃথক সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছিল সেদিন থেকেই অসন্তোষের সূচনা। সেই সূচনা ব্রিটিশ শাসন আমলে, আমাদের দেশে সামরিক শাসনামলে যা উস্কে দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরে আসার পরই শুধু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অসন্তোষকে স্বীকৃতি দিয়ে তা দূরীকরণের সঠিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই আমাদের স্মরণ করতে হবে, যুক্ত পাকিস্তানেও আমাদের এই অঞ্চলে অসন্তোষের কারণেই সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর পৃথক সত্তাকে পাকিস্তানী শাসকরা স্বীকার করেনি বলেই রাষ্ট্রটির অখণ্ডতা বজায় রইল না। পার্বত্য এলাকার ব্যাপারেও অতীতে আমাদের শাসক মহল একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিল। যার ফলে সহিংসতা, হত্যা ও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল একই দেশের দুই শ্রেণীর নাগরিকের মাঝে। বিচ্ছিন্নতার

আশঙ্কা হয়ত ছিল না, বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন সেই বিভেদ দূর হবে। একটি অহেতুক জটিলতা থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, একটি বিশেষ মহল এই সমঝোতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল দু'টি। এক. পার্বত্য অধিবাসীদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। দুই. চুক্তি করে দেশের একটি অঞ্চল ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসে নয়, বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশে আঞ্চলিক বিসম্বাদ ও অসন্তোষজনিত সংঘাতের উদাহরণ পাওয়া যাবে। তামিলরা সিংহলীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ এনে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। সেখানে কলম্বো সরকার তাদের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে বিচ্ছেদ এড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার দাবি প্রশমিত করার জন্য ভারত তার সংবিধান সংশোধন করে অন্য রাজ্যবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রশাসনিক অধিকার দিয়েছে। তবুও তাদের দাবি মেটানো যায়নি, অসন্তোষ প্রশমিত করা যায়নি। ব্রিটিশ সরকার আইরিশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করছে সর্বাধিক আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে। স্কটল্যান্ডকেও প্রায় অর্ধেক স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে তাদের নিজস্ব পার্লামেন্ট, এমনকি পৃথক বিচার ব্যবস্থার দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে। অপরদিকে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীগুলোকে চুক্তি অনুযায়ী সরকার শুধু সীমিত সুযোগ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত দেয়ার ও ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণের। বাস্তবে বলা যায়, পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে চুক্তি দেশের অন্য অঞ্চলে যে স্থানীয় প্রশাসন চালু করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারই বিস্তৃত রূপ। এক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকাকে দেশ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়নি, বরং কোনদিন কাশ্মীরী, তামিল বা আইরিশদের মতো সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের উদ্ভব না হয় সেই ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। এই সহজ-সরল অন্তর্নিহিত সত্যটুকু কেউ কেউ অনুধাবন করতে পারেননি।

অপরদিকে যে বলা হয় চুক্তি করে পার্বত্য এলাকা ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়েছে? যাঁরা চুক্তি নিয়ে হৈ চৈ করেছেন, তাঁরা কোন্ ধারাটিতে এই বিপদ বা আশঙ্কা প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছেন তা বোধগম্য নয়। এমনকি চুক্তি হওয়ার আগে থেকেই, আলোচনা হওয়ারও পূর্বে এই অভিযোগ এনে বিরোধীরা ব্যাপারটি খেলো করে ফেলেছেন। তদুপরি একটি অঞ্চলের জনগণ যদি এক রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে শান্তিতে থাকতে পারেন, সকল অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তবে তাঁরা কেনইবা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব মেনে নেবেন অথবা পৃথক হয়ে যেতে চাইবেন? অতীতে বা নিকট বর্তমানে

পাহাড়ীদের তরফ থেকে এমন দাবি শোনা যায়নি। তবুও শান্তিবিরোধীরা এই অপপ্রচারকেই পুঁজি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

অবশেষে সকল অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা ব্যর্থ করে এই দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিচ্যুত অংশকে আবার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে বর্তমান সরকার। কৃতিত্বের কিছু দাবিদার পূর্ববর্তী সরকারও, যারা এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের সূচনা করেছিল। তবে রহস্যজনক দিক হচ্ছে, পরবর্তীতে উদ্যোগকে ফলপ্রসূ করার জন্য বর্তমান সরকার বাস্তব পদক্ষেপ নিলে তাঁরাই বিরোধিতা শুরু করেন। সংসদীয় কমিটির বিএনপি সদস্যদ্বয় আলোচনায় অংশই নিলেন না। অর্থাৎ আগে থেকেই শান্তি আলোচনার বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল, দেশ বেচা আর ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়ার স্লোগান সেই সিদ্ধান্তের পূর্ব প্রতিফলন মাত্র।

শান্তির সকল অনুশীলনের সাফল্যের মূল ও আশাব্যঞ্জক দিকটি হচ্ছে, অবশেষে এই দেশের মানুষ প্রমাণ করেছে তারা শান্তির পিয়াসী। তাই পার্বত্য অঞ্চলে বিভেদ বজায় রাখার, এমনকি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অশান্তি-সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির সকল ষড়যন্ত্র তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। অশান্তি সৃষ্টির নিশির ডাকে সাড়া দেয়নি। জনমতের কাছে অপপ্রচারকারীরাও শেষ পর্যন্ত চুপসে গেছে। কারণ শান্তির পক্ষে যুক্তি থাকে, অশান্তি সৃষ্টি করে অহেতুক জিদ ও যুক্তিহীন বক্তব্য। এখন শান্তি প্রক্রিয়ার সাফল্যের পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার কঠিনতর কর্তব্য সম্পর্কে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বানচাল করার চেষ্টা প্রতিহত করতে সরকার ও জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। সর্বোপরি হারানো বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে এনে পার্বত্য এলাকার সকল সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্প্রীতি পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
ফিরে দেখা

পার্বত্য সমঝোতা চুক্তির পিছনে তিন সরকারের দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার ইতিহাস

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : মঙ্গলবার জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যে পার্বত্য সমঝোতা চুক্তিটি হয়েছে তার নেপথ্যে রয়েছে তিন সরকারের দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার ইতিহাস।

এরশাদ, খালেদা জিয়ার আমলে বৈঠক হয়েছে ১৯ দফা। ৭ দফা বর্তমান সরকারের আমলে। সব মিলিয়ে ২৬ দফা বৈঠকেই প্রচেষ্টাটি আলোর

মুখ দেখল। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সঙ্গে জনসংহতি নেতৃত্বের মূল সমস্যা ছিল আস্থাহীনতার। তাছাড়া জনসংহতি তখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকেও দূরে আসতে রাজি ছিল না। এমনকি এরশাদ আমলের প্রথম পাঁচ বৈঠকে তারা খাগড়াছড়ি এসেও বৈঠক করতে রাজি হয়নি। বর্তমান সরকারের সঙ্গে প্রথম দফা বৈঠক খাগড়াছড়িতে হলেও এর পরের সব বৈঠক হয়েছে ঢাকায়। সেখানে এরশাদ আমলে জনসংহতি নেতারা বৈঠকের ছবি তুলতে দিতেও রাজি ছিলেন না। সেখানে ঢাকা পর্যন্ত তাদের আসতে সম্মত হওয়ার বিষয়টিকে তখনই আস্থার সঙ্কট কেটে যাবার লক্ষণ মনে করা হচ্ছিল। সর্বশেষ সাতটি বৈঠকে পর্যবেক্ষকদের কাছে উভয় পক্ষকেই মনে হয়েছে সমাধান প্রশ্নে যথেষ্ট আন্তরিক এবং আস্থাশীল। ঢাকায় বৈঠকে আসায় জনসংহতি নেতাদের তাদের দেশী-বিদেশী শুভার্থীদের সঙ্গেও যোগাযোগ, শলা-পরামর্শের সুযোগ পান। সমঝোতায় পৌঁছুতে এটিও সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে। সর্বশেষ সমঝোতা ফয়সালায় চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে সম্পৃক্তকরণ ত্বরান্বিত করেছে সমঝোতা পর্ব। এখানে গ্রন্থনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী সময়ের, বিশেষত এরশাদ আমলের সূচনা পর্বের সালতামামী।

এরশাদ আমলের আগে ১৯৭৭ সালে জিয়া সরকার উপজাতি সম্মেলন নামের একটি রাজনৈতিক ফোরাম সৃষ্টি করে। জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৯৭৯ সালে পার্বত্য এলাকায় পরিকল্পিতভাবে বাঙালী বসতি স্থাপন শুরু হলে উদ্যোগটি মুখ থুবড়ে পড়ে। আসে এরশাদ যুগ। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে সরকারের তরফ থেকে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু হয়। একই সঙ্গে চেষ্টা চলছিল শান্তিবাহিনীতে ভাঙ্গন সৃষ্টির। এই পূর্বে সাফল্য আসে ১৯৮৫ সালে ২৯ এপ্রিল শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপের বড় অংশের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। উপেন্দ্রলাল চাকমাকে করা হয় যোগাযোগ কমিটির নেতা। ১৯৮৪ সালে মারিশ্যায় শেল কোম্পানির অপহৃত প্রকৌশলীদের মুক্ত করতে উপেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া সাবেক সাংসদ এবং মন্ত্রী হওয়াতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ওপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। রামগড়ের বাবু নকুলচন্দ্র ত্রিপুরা এবং বাবু কেএস প্রু চৌধুরী ছিলেন এই কমিটির অপর দুই সদস্য। পার্বত্য অঞ্চলের সেনাবাহিনীর তৎকালীন মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম, খাগড়াছড়ির ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর পানছড়ির পূজগাং-এ জনসংহতি রূপায়ন দেওয়ানের নেতৃত্বে প্রথম বৈঠকে আসে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত একটি

পাঁচ দফা প্রস্তাব দেয় জনসংহতি সমিতি। কিন্তু সংবিধানবিরোধী হওয়ায় দাবিটি সরকার পক্ষ গ্রহণ করেনি। প্রথম বৈঠকেই আস্থাহীনতার অভাবে নানা শর্ত দেয়া হয় সমিতির পক্ষে। এর মাঝে ছিল তাদের ছবি তোলা যাবে না, কথাবার্তা রেকর্ড করা যাবে না, কথাবার্তা উদ্ধৃত করা যাবে না ইত্যাদি। পরবর্তী বৈঠক হয় সে বছরেরই ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু সরকার এবং জনসংহতি স্ব-স্ব অবস্থানে অনড় থাকায় বানচাল হয়ে যায় বৈঠক। ১৯৮৬তে ব্যাপক জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয় পার্বত্য এলাকায়। এই দাঙ্গা শুরুর দিনটিও ছিল ২৯ এপ্রিল। শান্তিবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালীরা বড় ধরনের প্রত্যাঘাত শুরু করে। অভিযোগ আছে–এর নেপথ্যে বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা ছিল। আগুন দেয়া হয় পাহাড়ী গ্রামগুলোতে। ৫০ সহস্রাধিক পাহাড়ী শরণার্থী হয়ে চলে যায় ভারতে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা অতিক্রম করে দেশের সীমানা। শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হওয়াতে আন্তর্জাতিক মহলের নজর পড়ে এদিকে। বিভিন্ন দাতা দেশ, গোষ্ঠীর চাপ বাড়তে থাকে তৎকালীন সরকারের ওপর।

সরকারের তরফ থেকে তখন উদ্যোগ নেয়া হয় দেশের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের। ১৯৮৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে ৫০ উপজাতীয় নেতাকে দেখা করানো ছিল এই উদ্যোগের অংশ। এরপর তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি জাতীয় কমিটি। ১৯৮৭'র ১৭-১৮ ডিসেম্বর এই কমিটির সঙ্গে প্রথম বৈঠক হয় জনসংহতির। ২৫-২৬ জানুয়ারি, ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারিতে ('৮৮) পরবর্তী বৈঠকগুলো হয়। কিন্তু তার সবই নিষ্ফল হয় জনসংহতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংশোধন না করায়। চতুর্থ বৈঠকের পর জনসংহতি সরকারের যোগাযোগও আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর আগে ১৯৮৭ সালের আগস্টে সামরিক কায়দায় স্থানীয় পর্যায়ের একটি বৈঠক হয় লংগদুতে। পাহাড়ীদের ১৯টি গরু চুরির ঘটনার জের হিসাবে তখন সেখানে পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। সামরিক কমান্ডের উদ্যোগে স্থানীয় হেডম্যান, বাঙালী ইউপি চেয়ারম্যানদের একটি ঘরে দু'দিন রেখে শান্তি ফর্মুলা খুঁজে বের করতে বলা হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানে ছিল। স্থানীয় নেতারা সেখানে আলোচনা করে চুরি যাওয়া গরুর ১২টি উদ্ধার করেন। ৯টি গরু কিনে দেয়া হয় সামরিক বাহিনীর উদ্যোগে। বিবিসি সেই ঘটনাকে লংগদু শান্তি চুক্তি শিরোনামে প্রচার করেছিল।

১৯৮৮ সালের সে মাসের ৮ তারিখে বঙ্গভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য এলাকায় বাঙালী হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে

দেশজুড়ে এরশাদ তখন সমালোচিত। এরশাদ সেখানে বলেন, বাঙালী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আমার জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল। এটা বন্ধ করতে হবে। তাকে বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় অউপজাতীয়দের সেখানে নেয়া হয়েছে, তাদের অনেকে যেসব কাজকর্মে লিপ্ত সে তুলনায় নিহত হবার ঘটনা খুবই কম। এই কথায় চুপ হয়ে যান এরশাদ। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের তিন প্রস্তাব দেয়া হয় সেখানে। পার্বত্য এলাকা থেকে পুনর্বাসিত অউপজাতীয়দের প্রত্যাহার, অউপজাতীয়দের মধ্য থেকে স্থানীয় পর্যায়ে আনসার, ভিডিপি'র সংখ্যাবৃদ্ধি এবং গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই তিনটি প্রস্তাবের শেষেরটিই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠাকে সামরিক কৌশল মনে করে জনসংহতি সমিতি ক্ষিপ্ত হয়। এক মাস সময়ের মধ্যে আক্রমণ হয় এমন এক শ' গুচ্ছ গ্রামে। এরশাদ আবার আলোচনা শুরুর তাগিদ দেন। ১৯ জুন পঞ্চম এবং ১৪ ডিসম্বের ষষ্ঠ দফা বৈঠক হয়। কিন্তু এরপর আর জনসংহতি সমিতি আলোচনায় আসেনি। আলোচনার ব্যর্থতার জন্য জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে একটি দীর্ঘ বক্তব্য দেন উপেন্দ্র লাল চাকমা। এতে করে শান্তিবাহিনীর রোষানলে পড়ার ভয়ে তিনি নিজে ভীত হয়ে পড়েন। এই দায় মুক্তির জন্য এরশাদ সরকারের প্রতিও অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য দেশত্যাগ করেন তিনি। নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ত্রিপুরার শিবিরবাসী শরণার্থীদের। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল সংসদে উপস্থাপন করে এরশাদ সরকার। বিল সংসদে উপস্থাপনের পরই জনসংহতির পক্ষে যোগাযোগ করা হয় সরকারের সঙ্গে। শর্ত দিয়ে বলা হয় তারা আলোচনায় বসতে রাজি তবে তার আগে সংসদ থেকে বিল তিনটি প্রত্যাহার করতে হবে। এরশাদ সরকার তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে জনসংহতি নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। ওই অবস্থায় তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন করে নেয়া হয় জুন মাসের ২৫ তারিখে। এরপর ১৯৯০ সালে পতন ঘটে এরশাদ সরকারের। কিন্তু তিন পরিষদ বার বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে বহাল রাখা হয়। বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি একদলীয় সাধারণ নির্বাচনের ঝুঁকি নিলেও তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করতে সাহসী হয়নি। মঙ্গলবার স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এই তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের নামকরণ করা হয়েছে পার্বত্য জেলা পরিষদ।

জাতীয় পার্টির আমলের ছয় দফা ব্যর্থ বৈঠকের পর বিএনপি আমলের বৈঠক পর্ব শুরু হয়। কর্নেল (অব) অলি আহমদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রথম আলোচনা শুরু করে জনসংহতির সঙ্গে। এরপর আলোচনা হয় রাশেদ

খান মেননের নেতৃত্বাধীন উপকমিটির মাধ্যমে। মোট আলোচনা হয় ১৩ দফা। এর মধ্যে পঞ্চম দফা বৈঠকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারসহ বেশ কিছু প্রস্তাবও দেয়া হয়েছিল তৎকালীন সরকারের পক্ষে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আস্থাসঙ্কটে সেই বৈঠকগুলোও সাফল্যের মুখ দেখেনি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
বিরল ঐতিহাসিক
সেই মুহূর্তে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট : সে এক বিরল ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই মুহূর্তটি ঐতিহাসিক পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের। মঙ্গলবার সকাল ১০টা ২৪। ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিল্পী সাহাবুদ্দিনের স্বাধীনতার পতাকা আর অ, আ, ক, খ বর্ণমালা আঁকা তৈলচিত্রের নিচে রাখা টেবিলের একপ্রান্তে বসেছিলেন দুই নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বসেছিলেন অপর চেয়ারটিতে। মুখোমুখি দুই সারির একটিতে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, অপর সারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জনসংহতির নেতৃবৃন্দ, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ দাঁড়িয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীসহ সবার মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা। সবার মুখে স্মিত হাসি বিজয়ের। বিশেষ দু'টি কলম হাতে তুলে নিলেন দুই নেতা আবদুল্লাহ এবং সন্তু। পনেরো পৃষ্ঠার চূড়ান্ত চুক্তির দু'টি ফাইলে বাংলায় পরপর স্বাক্ষর করলেন দুইজন। একজন ফাইল তুলে দিলেন আরেকজনের হাতে। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল অনেক ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাতি। করতালিমুখর আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন উপস্থিত সবাই। পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানালেন। আলিঙ্গন করলেন। স্বাক্ষর হয়ে গেল পার্বত্য সমঝোতা চুক্তি। দুই যুগের বেশি সময়ের ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত, রক্তক্ষয়, হানাহানির অবসানকল্পে ১২ বছরের বেশি সময় ধরে আলোচনার পর প্রায় অসম্ভব বিষয়টি সম্ভব হয়েছে গতকাল। স্বাধীনতার পর পর যে সমস্যার সৃষ্টি, জিয়ার আমলে যা জটিল করা হয়েছে বহুগুণ, এরশাদ, খালেদা আমলের ১৪ বছরে যে সমস্যার সমাধান করা যায়নি–বর্তমান সরকারের মাত্র ১৭ মাস সময়ের মধ্যে এর একটি সম্মানজনক সাংবিধানিক মীমাংসা এত চটজলদি সম্ভব হয়ে যাবে তা এ বিষয়ের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও ভাবতে পারেননি। জানা গেছে, শেষ মুহূর্তের নানা জট খুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর পরিশ্রমী ভূমিকার পাশাপাশি

শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ডঃ আলমগীর সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে মঙ্গলবার রাতে জনকণ্ঠের কাছে মন্তব্য করে বলেন–তিনটি বিষয়ে বিজয় অর্জনের চেষ্টা করেছে সরকার। এক. বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর স্বৈরশাসকরা পার্বত্য এলাকার পাহাড়ী নাগরিকদের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছিল। তারা পাহাড়ীদের বাস্তুচ্যুত করে শরণার্থী জীবন এবং সশস্ত্র পন্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা চুক্তির মাধ্যমে শরণার্থীদের স্বদেশে নিয়ে এসে যথাযথ পুনর্বাসন, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ তৈরি করেছি। দুই. তৎকালীন স্বৈরশাসকরা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য গরিব বাঙালীদের সারা দেশ থেকে নিয়ে গিয়ে তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে গুচ্ছগ্রামবাসী করেছিল। আমরা চুক্তির মাধ্যমে তাদের অসহায়ত্ব দূর করার পদক্ষেপ নিয়েছি। তারা এখন গুচ্ছগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পাবে। এবং তিন. গত ২২ বছরে পার্বত্য অঞ্চলের কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এখন সম্ভাবনাময় পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
শান্তি চুক্তি সম্পর্কে
সন্তু লারমা, হাসনাত,
সেনাবাহিনী প্রধান–

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা বললেন, আমি আনন্দিত। এই চুক্তির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন দীর্ঘদিনের দাবি স্বীকৃতি অর্জন করেছে। চুক্তি পর্যায়ে উপনীত হওয়াটা যতটা কঠিন ছিল বাস্তবায়ন পর্যায়টি তার চেয়ে কঠিন। সরকারকেই এই বাস্তবায়নের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের ওপর আমাদের আস্থা আছে। তাই বিশ্বাস করি সরকার আন্তরিকভাবে কাজটি করবে, করতে পারবে। আমাদের তরফ থেকে যা যা সহযোগিতা দরকার তা আমরা দেব। সন্তু লারমা মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে দৈনিক জনকণ্ঠকে কথাগুলো বলেন। সন্তু লারমা চুক্তি স্বাক্ষরের মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর অগ্রজ জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত মানবেন্দ্র লারমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি আমাদের সকল পাহাড়ীর মহান নেতা। জুম্ম জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

আমরা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি। বিএনপিসহ চুক্তিবিরোধী দলগুলোর আন্দোলন প্রশ্নে কোন মন্তব্য না করেই সন্তু লারমা বলেন, আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবার সহযোগিতা চাই। সকলের মিলিত চেষ্টার মাধ্যমেই এই শান্তি সম্ভব। শান্তি প্রতিষ্ঠায় দলমত নির্বিশেষে সবার সম্মিলিত ভূমিকার জন্য তিনি জনকণ্ঠের মাধ্যমে বিশেষ আহ্বান জানান। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী গণপরিষদের একাংশের চুক্তিবিরোধী অবস্থান সম্পর্কে সন্তু লারমা কোন তাৎক্ষণিক মন্তব্য করতে রাজি হননি।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর জাতীয় কমিটির প্রধান চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। এ বিজয় জনগণের, আল্লাহ আর জনগণের ইচ্ছাতেই এ বিজয় সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, এই চুক্তিতে বাংলাদেশ জয়ী হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত দেশে যে অবস্থা ছিল সে প্রেক্ষিতে এটি সর্বোত্তম চুক্তি। চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় বলেন, পাহাড়ী-বাঙালী সবাইকে মিলেমিশে এখন শান্তির জন্য কাজ করতে হবে। পার্বত্য এলাকার নেতৃবৃন্দকে তিনি চিরস্থায়ী শান্তি, উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, এই শান্তিচুক্তি বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফসল। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই চুক্তি ভূমিকা রাখবে আশা করছি। কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি বলেন, আমি খুবই খুশি। কারণ আমি এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এই মুহূর্ত থেকে শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেল। এখন আমাদের অনেক দায়িত্ব। দীপংকর তালুকদার এমপি বলেন, আজ পার্বত্য এলাকার পাহাড়ী-বাঙালী সকল সম্প্রদায়ের আনন্দের দিন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে শান্তিচুক্তি করেছে। এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের। বীর বাহাদুর এমপি বলেন, এই মুহূর্তটি আমার জীবনের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। আজ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার আসল প্রক্রিয়া শুরু হলো। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মাহবুবুর রহমান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা আমাদের সকলের আরাধ্য বিষয়। আমরা শান্তির ধর্মে বিশ্বাসী। সেনাবাহিনী এই শান্তি প্রক্রিয়ার শরিক। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা আমাদের ভূমিকা রেখে যাব। বিডিআর এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান বীরউত্তম বলেন, আমার আজ আনন্দের দিন। আমি পার্বত্য এলাকায় থাকতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন নানা উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আজ সেটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

এ চুক্তি সংবিধান পরিপন্থী ঃ মান্নান
ভুঁইয়া ॥ বিএনপি, জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এ চুক্তিকে সংবিধান পরিপন্থী এবং জাতীয় সংসদের অধিকার খর্বকারী চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন, এ চুক্তির প্রতিবাদে আজ বুধবার কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। বিএনপির বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, আগামী রবিবার সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতালসহ অন্যান্য ঘোষণা করা হতে পারে।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটি ও বিএনপিসহ সমমনা সাত দল শান্তিচুক্তি পর্যালোচনার জন্য গতকাল ঢাকায় মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবনে জরুরী বৈঠক করেছে।

বিক্ষোভ মিছিল

বিএনপি শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে নয়া পল্টনস্থ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। দলের ঢাকা মহানগরী আহ্বায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপি এ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি বিজয়নগর হয়ে জিরো পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।

জামায়াতে ইসলামী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে গতকাল ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে।

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মিছিলে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা যানবাহন ভাংচুর করতে পারে এ আশঙ্কায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ উভয় মিছিলকে অনুসরণ করে। এ ছাড়া নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়, কাকরাইল মোড়, পুরানা পল্টন মোড়, জাতীয় প্রেসক্লাব, জিরো পয়েন্টসহ বিভিন্ন স্থানে বিপুলসংখ্যক পুলিশ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটি ও সাত দলের বৈঠক

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের খবর প্রচারিত হওয়ার পর বিএনপি'র স্থায়ী কমিটি এবং বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন সাত দল গতকাল ঢাকায় জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়।

বিএনপি'র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আবদুল মান্নান

ভূঁইয়া, সাইফুর রহমান ও ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্থায়ী কমিটির বৈঠক চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামীসহ তিন জন জামায়াত নেতা মিন্টো রোডে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আসেন। জামায়াত নেতারা আলোচনা শেষে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবন ত্যাগ করার পর সাত দলের অন্য নেতারা আসতে শুরু করেন।

সাত দলের বৈঠকে জাতীয় পার্টির (জা-মো) কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমেদ, জাগপার চেয়ারম্যান শফিউল আলম প্রধান, ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ, পিএনপি'র চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নীলু উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক চলাকালে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বৈঠক কক্ষের বাইরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংবিধান পরিপন্থী, দেশে বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এ চুক্তিতে সংসদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। দেশের এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটেছে।

তিনি বলেন, আমরা সংবিধান ও বিদ্যমান চুক্তির নিরিখে এ চুক্তিটি পর্যালোচনা করছি। আজ বুধবার কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

বিএনপি'র অন্য কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, তড়িঘড়ি করে কর্মসূচী ঘোষণা না করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েই বিএনপি এবার কর্মসূচী দিতে চায়। সেজন্যই গতকাল মঙ্গলবার কর্মসূচী দেয়া হয়নি। তবে বিএনপি আজ বুধবার যে কর্মসূচী ঘোষণা করতে যাচ্ছে, তাতে আগামী রবিবার সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল ডাকা হতে পারে। এ ছাড়া মশাল মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল, এমনকি ৪৮ ঘণ্টার হরতালের প্রস্তাবও বিবেচনাধীন আছে। তবে কর্মসূচী ঘোষণার সময় সারা দেশে চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

তিন পাহাড়ী সংগঠনের এ শান্তি চুক্তি প্রত্যাখ্যান

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে একটি 'আপোস দলিল' আখ্যায়িত করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন তা

প্রত্যাখ্যান করেছে। মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, তারা এই চুক্তি মানবে না। সংগঠন তিনটির পক্ষে গণপরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রসিত বিকাশ খীসা বলেন, এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনবে না। তিনি আরও বলেন, এই চুক্তিতে পাহাড়ী জনগণের মৌলিক দাবি–তাদের জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সেনাবাহিনী ও বহিরাগতদের প্রত্যাহার এবং ভূমির ওপর অধিকার নিশ্চিত হয়নি। –ইউএনবি

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

মহানগরী আওয়ামী লীগের সমাবেশ

যারা শান্তি চুক্তিকে ইস্যু করে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবে তাদের সাথে বোঝাপড়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, অতীতের সরকারগুলো অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সঙ্কট জিইয়ে রেখে লাখ লাখ মানুষের জীবন-সম্পদ নিয়ে জুয়া খেলেছে।

তাঁরা বলেন, যারা এ চুক্তিকে ইস্যু করে দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবে তাদের সাথে বোঝাপড়া হবে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় পল্টন ময়দানে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৯ নবেম্বর চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এই সমাবেশ এবং সমাবেশ পরবর্তী বিক্ষোভ মিছিল বিজয় সমাবেশ ও বিজয় মিছিলের রূপ নেয়। রং-বেরঙের ব্যানারসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এ মিছিলে অংশ নেন।

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, পানি সম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, গণপূর্ত ও গৃহায়নমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, আবদুল মান্নান ও ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন প্রমুখ।

জিল্লুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ওয়াদার সফল বাস্তবায়ন করেছেন।

তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। ষড়যন্ত্র আরও হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে।

আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় খালেদা জিয়া ব্যর্থ হয়েছেন, আওয়ামী লীগ সফল হয়েছে। এটাই ওদের গাত্রদাহের কারণ।

মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বহুমুখী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্বল্পসময়ের মধ্যে ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এতদিন এসব সঙ্কট জিইয়ে রাখা হয়েছিল। এ দু'টি চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে খালেদা জিয়া সংবিধানবিরোধী কথা বলছেন বলে মোহাম্মদ নাসিম উল্লেখ করেন।

মোহাম্মদ হানিফ বলেছেন, এ চুক্তি না মেনে, এ চুক্তিকে ইস্যু করে যদি কেউ ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সারা দেশে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তবে তাদের সাথে আওয়ামী লীগের বোঝাপড়া হবেই হবে।

সমাবেশ শেষে পল্টন ময়দান থেকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

২১৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীর নগর, প্রকৌশল, কৃষি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৫ জন শিক্ষক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই ঘটনা আমাদের জাতীয় অগ্রগতি উন্নতির পথকে সুগম করবে।

মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ফারাক্কা চুক্তি সম্পাদনের পর এটি বর্তমান সরকারের আরেকটি ঐতিহাসিক সাফল্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ এই শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত জড়িত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, দলমত নির্বিশেষে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ অন্যান্য মতপার্থক্যের উর্ধে উঠে এই চুক্তির পক্ষে অবস্থান নেবেন।

দৈনিক জনকণ্ঠ
৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭
সাবেক সেনা কর্মকর্তার দৃষ্টিতে
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি

ব্রিগেডিয়ার শরীফ আজিজ, *পিএসসি (অব)*

প্রথমবার ১৯৮৩-৮৪ সালে বান্দরবানে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯০-৯২ সালে খাগড়াছড়ি অঞ্চলে চাকরি করার অভিজ্ঞতা এবং পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে একজন উৎসুক নাগরিক, এই নিরিখেই আমার এই লেখা। সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা সাধারণ জনগণের তুলনায় বেশি। এই সম্পৃক্ততার কারণে বিগত প্রত্যেকটি সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি সম্পর্কে আমরা কমবেশি অবহিত। তাই কিছুটা নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে, বিগত সব সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে তাদের নীতি নির্ধারণের বেলায় ছিল আন্তরিক। তাই আসন্ন শান্তিচুক্তিটি যেন বাস্তবায়ন হতে পারে, তার জন্য সবারই ইতিবাচক ভূমিকা নেয়া অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

পার্বত্য সমস্যাটি বেশ পুরনো ও জটিল। তবে এ ব্যাপারে আমাদের যে সন্দেহমুক্ত হওয়া প্রয়োজন তা হলো এ সমস্যা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেনি। উত্তরাধিকার সূত্রে এর দায়ভার টানতে হচ্ছে আমাদের। নানা সমস্যায় জর্জরিত এ দেশ এ যাবতকাল তার সীমিত ক্ষমতায় বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে এ সমস্যা সমাধানের জন্য।

আগেই উল্লেখ করেছি, এই সমস্যার যে একটি সমাধান হওয়া উচিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার ও দল তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। আমাদের বৃহত্তর দলগুলোর মধ্যে এখনও অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকলেও বাংলাদেশের সব ক'টি সরকার এবং দল অন্তত পক্ষে একটি সমস্যার ব্যাপারে যে ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছে, তা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে দলগুলোর বক্তব্য শুনলেই সেটা বোঝা যায়। আজকের শান্তি আলোচনা এবং আসন্ন শান্তি চুক্তি–এই ঐকমত্যের ফল হিসাবে গণ্য করা যায়।

তবে দীর্ঘ এই চলার পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতিতে কিছু ভুলভ্রান্তিও হয়েছে। আজ উপজাতীয়দের মনোকষ্টের একটি প্রধান কারণ হিসাবে স্বাধীনতাউত্তর সরকারের ঘোষণা দেয়া বাঙালী হওয়ার আহ্বানের কথা বলা হয়, তবে এরও একটি প্রেক্ষাপট ছিল কিনা সেটি ভেবে দেখবার বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপামর জনতার স্লোগান ছিল, "তোমার-আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা" অথবা "তুমি কি আমি কি বাঙালী-বাঙালী" একথা হয়ত বা শান্তিবাহিনীর সদস্যরাও স্বীকার করবে। যা হোক সদ্য স্বাধীন

অগোছালো একটি দেশ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে কিন্তু শর্তসাপেক্ষ বৈঠক তখন ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৭৭ সালে কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমান, যিনি একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসন করেছিলেন, তার অনেক যুক্তি তখনকার নীতি নির্ধারকরা হয়ত দিতে পারবেন। তবে বিরাজমান সমস্যায় এটা যে একটি নেতিবাচক মাত্রা যোগ করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এইভাবে বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে, যা আমাদের মেনে নেয়া উচিত। তবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এগুলোর ইতিবাচক মূল্যায়ন করে, অনেক কিছুই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, পিছনের দিকে আর না তাকিয়ে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গলজনক হবে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিএনপি সরকার দুই দুই বার ক্ষমতায় থেকে এই সমস্যার সমাধান দিতে চেয়েছে আন্তরিকভাবে। একইভাবে এরশাদ সরকারও আন্তরিকভাবে চেয়েছিল এর একটা সমাধান হোক। জেলাভিত্তিক স্থানীয় সরকার পরিষদ, যেটি এখনও বলবত তা এরশাদ সরকারই দিয়েছিল। স্থানীয় সরকার পরিষদের কাঠামোটি সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, এর মাধ্যমে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বাধীকারকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্থানীয় পরিষদের এই অনুপমত্বের কারণেই নানা বাধা-বিপত্তির পরও এই পরিষদ অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। তবে এটা সত্য যে, এই কাঠামোটিকে সঠিক হোমওয়ার্ক না করে পার্বত্যবাসীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য এটা আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

আজকের যে শান্তি আলোচনা, এর নবসূচনা কিন্তু করেছিল বিএনপি সরকার। ১৯৯১ সালে শুরু হয় শান্তি আলোচনার নব দিগন্ত। ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১ তারিখের নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে দু'মাসের মধ্যে ১৪ এপ্রিল '৯১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কাউন্সিল কমিটির প্রথম সভার আয়োজন করে। এরপর ৯ জুন '৯১ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র ২ মাস সময়ের মধ্যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত সর্বোচ্চ ফোরামের পর পর দু'টি সভার আয়োজন করে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৯০ সালে পটপরিবর্তনের পর একটি গণতান্ত্রিক সরকার অতি অল্প সময়েই অনুধাবন করেছিল যে, পার্বত্য সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। দীর্ঘ ৪ বছর বিরতির পর শান্তি আলোচনা শুরু হয় ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে। তদানীন্তন যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমেদ, বীর

বিক্রম শুরু করেন এই আলোচনা। প্রথমবারের মতো সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সর্বোচ্চ এবং প্রথম সারির নেতারা এই আলোচনায় বসেন। পরের ঘটনা সবাই জানেন। ৪ বছর এই আলোচনা চলে। শেষের দিকে রাশেদ খান মেনন সমস্যার গভীরে গিয়ে এই আলোচনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। কোন সিদ্ধান্ত যেন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে না দেয়া হয় তেমনি কোন বহিরাগত প্রভাব যেন বাংলাদেশের ওপর না পড়ে, তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তাঁরা শান্তি আলোচনা চালিয়ে যান। অলি আহমেদ এবং রাশেদ খান মেননের কৃতিত্ব এটুকু যে, তারা শান্তি আলোচনার পথটি কঙ্করময় না করে, সুগম রেখে গেছেন।

বর্তমান সরকার, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, তিনি চেয়েছেন, সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংরক্ষণ, এদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে সচেতন। বিরোধী নেত্রী হিসাবে ১৯৯২ সালে খাগড়াছড়ি সফর করে এক ইতিহাস রচনা করেন। কোন সরকারপ্রধান বা বিরোধী নেতা-নেত্রী এক নাগাড়ে পার্বত্য এলাকায় ৩৬ ঘণ্টা অবস্থান করে তাদের সমস্যা জানতে চেয়েছেন বলে কোন রেকর্ড নেই। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর সেই সফরে সড়কযোগে (হেলিকপ্টারে নয়) সবচেয়ে প্রত্যন্ত শহর পানছড়ি গিয়েই ক্ষান্ত হননি, একেবারে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের উপর অবস্থিত লোগাং গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি দুই দিন খাগড়াছড়ি ছিলেন এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা গভীর রাত পর্যন্ত সার্কিট হাউসে বসে শুনেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, সেই বিরোধী নেত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি আন্তরিকভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। এই আন্তরিকতার চূড়ান্ত প্রমাণ শান্তি আলোচনার শেষ অধ্যায় "শান্তিচুক্তি" স্বাক্ষরিত হলো।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সমস্যাটির সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরে নয়। আমাদের প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম দেশটিই পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘমেয়াদী এই সমস্যাটির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক। কাজেই সমস্যাটির সার্বিক সমাধানে তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। পানি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যে বর্তমান সরকার তাদের সাথে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের শুভ সূচনা করেছে তাকে কাজে লাগিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাটির সমাধান কঠিন নয় এবং এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যেভাবে পরিস্থিতির সামাল দিয়েছে তা অতি প্রশংসনীয় ব্যাপার।

জনসংহতি সমিতির অন্য দাবিসমূহের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবিটি তুলনামূলকভাবে স্পর্শকাতর। এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং যত্নশীল হতে হবে। আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয়টি ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে কিনা তা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখা দরকার। আঞ্চলিক পরিষদের বদলে পার্বত্য পরিষদ দেয়া যায় কিনা? আমরা আমাদের সংবিধানকে কতটুকু সংশোধন করে এই দাবির পক্ষে সায় দিতে পারি এর একটি বিহিত হওয়া উচিত।

উপজাতীয়দের আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিষয়টি বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ কিভাবে গ্রহণ করবে, বিষয়টি আওয়ামী লীগবিরোধীদের জন্য একটি বড় ধরনের ইস্যু সরবরাহে ভূমিকা রাখবে কিনা তা বিবেচনায় রাখা দরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতির একটা রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে অতীতে সংসদে পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ বিল অনুমোদনপূর্ব তিনটি পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়েছে; অউপজাতীয়দেরকে নতুন করে সেখানে গিয়ে বসবাস করা এবং জমি ক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বস্তুত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার সংরক্ষক স্থানীয় সরকার পরিষদের এই কাঠামোটি একটি অনন্য ব্যবস্থা। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার জন্য যা যা করণীয় তার প্রায় সবকিছুরই সংস্থান রাখা হয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থাকে জোরদার করা এবং এর সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা যায় কিনা, তা নতুনভাবে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। শান্তিচুক্তি পুরো জাতির প্রত্যাশা। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির বিপক্ষে কেউ নন। তবে সবাই চান এমন একটি চুক্তি, যা সংবিধান সিদ্ধ হবে এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রামকে কারা অশান্ত রাখতে চায়?

হোসেন তওফিক ইমাম

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি বিরোধী বলয়ে বিভিন্ন ধারার শক্তি একত্রিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বিএনপি'র পতাকাতলে সমাবেশ ঘটেছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের দল ও ব্যক্তির। মুখ্য উদ্দেশ্য তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে অশান্ত রাখতে কারা চায়? কেন চায়? কাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে?

পূর্বকথা

বাংলাদেশে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ক্রমাগত একটি প্রচারণাই চলছে। সেটা হলো ভারতের আধিপত্যবাদ, ভারতের আগ্রাসন, ভারতের শোষণ। পাকিস্তান আমলেও তৎকালীন সরকারের সকল ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হতো ভারতকেই। যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, হানাহানি এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস–সব কিছু মিলিয়ে ভারতের প্রতি অবিশ্বাস এবং সন্দেহকে তৎকালীন শাসকচক্র সব সময়েই কাজে লাগিয়েছে। আমাদের গর্ব মুক্তিযুদ্ধকে তারা ভারতের আগ্রাসন বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে এবং সেই প্রচারণাই চালিয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, পাকিস্তানের সাথে আমাদের এখন তো আর শত্রুতা নেই। রাজনীতি এবং পররাষ্ট্র নীতিতে কোন চিরস্থায়ী শত্রু বা মিত্র বলতে কিছু নেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ কথা নিতান্তই আপ্তবাক্য। পাকিস্তান আমাদের জন্মশত্রু। আমরা যতই পাকিস্তানের কথা ভুলে থাকতে চাই না কেন, পাকিস্তান কোন মতেই আমাদের ভুলেনি। বরঞ্চ বাংলাদেশ যতই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে যাচ্ছে, পাকিস্তানের বৈরিতা, শত্রুমনোভাব ততই বেড়ে চলেছে। রেডিও পাকিস্তানে এবং পিটিভিতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার বড় একটা অংশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি তারা "গাদ্দার" নামক একটি ফিল্ম প্রচার করেছে, যেটি আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে নিয়ে। পাকিস্তানীদের চোখে (অর্থাৎ সেখানকার শাসককূলের কাছে) আমাদের "বীরশ্রেষ্ঠ" হচ্ছে একজন গাদ্দার। পাকিস্তান বলতে আমি সে দেশের সাধারণ মানুষ বোঝাতে চাইছি না। পাকিস্তান অর্থ সে দেশের সামরিক বাহিনী, শাসকচক্র, ধনাঢ্য শ্রেণী। বাংলাদেশের সাথে বাইরে তারা যতই বন্ধু সেজে থাকুক না কেন, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের বৈরিতা প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পাকিস্তানীচক্র এবং তাদের দোসররা তাই শয়নে-স্বপনে ভারত বিদ্বেষের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে এবং তারপর এক এক করে উল্লেখযোগ্য সামরিক নেতাদের নিশ্চিহ্ন করেছে। পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক অফিসারবৃন্দ এবং তাদের অনুসারীরা, ট্রয়ের ঘোড়ার মতো বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে কতিপয় অতি উচ্চাভিলাষী মুক্তিযোদ্ধাকে সামনে রেখে আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের হয় হত্যা নতুবা অপবাদ

দিয়ে তাদের পথ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ছলে-বলে-কৌশলে দখল করে প্রতিনিয়ত সেই অতি পুরনো ভারত-বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এরা পাকিস্তানী না বলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাকিস্তানীদের হানাদার বাহিনী বলে প্রচার করেছে। পুরনো পাকিস্তানী ঢংয়ে একই সাথে চালু আছে ইসলাম বিপন্নের ধুয়া।

এ দেশে অনেকেই মনে করেন যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানের এখন কোন স্বার্থ নেই–পাকিস্তান তো সেই সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এখন, বাংলাদেশ তাদের কাছে কোন ফ্যাক্টর নয়। মস্ত বড় ভুল এই সাদামাটা, সহজ-সরল হিসাবে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এবং শাসকচক্র ১৯৭১-এর পরাজয় কিছুতেই মেনে নেয়নি, নেবেও না। বাংলাদেশে তাদের এত অত্যাচার, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ, গণহত্যার এর কোনটাই তারা কখনও স্বীকার করেনি; পাকিস্তানের জনগণকে জানতেও দেয়নি। ইসলামের নামে, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার নামে তারা যা করেছে তার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ, লজ্জা তাদের নেই, বরং তারা গর্বিত তাদের কৃতকর্মের জন্য। তাদের সাথে তাদের বাংলাদেশের মিত্র এবং দোসররাও মনে করে তাদের কোন অপরাধ নেই, তারা ভাল কাজ করেছে। আজ পর্যন্ত কোন পাকিস্তানী (বাংলাদেশী-পাকিস্তানী) ভুল স্বীকার করেনি, ক্ষমা প্রার্থনাতো দূরের কথা। বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা সম্পদের সামান্যতম অংশও পাকিস্তান থেকে পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান স্বীকারই করেনি যে, বাংলাদেশের কোন পাওনা আছে। এমনকি বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের ফেরত নেবার বিষয়েও তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এখন বিচার করা যাক বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানীদের কি স্বার্থ। প্রধান কারণটি হলো পাকিস্তানের বৃহত্তর সামরিক কৌশল। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশাল এলাকা দখল করার এবং অব্যাহত সামরিক চাপ বজায় রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের ওপর ভারতের সামরিক চাপ কমানো। পূর্বাঞ্চলে অস্থিতিশীল অবস্থা থাকলে বিশেষ করে সামরিক শিক্ষিত, রণকৌশলে পারদর্শী গেরিলা তৎপরতা চলতে থাকলে ভারতকে বাধ্য হয়ে এই এলাকায় বিরাট সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে হয়। এই বিশাল পূর্বাঞ্চলে প্রতিটি এলাকাতেই ভারতকে সামরিক বাহিনী নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে। ভারতের সুশিক্ষিত Mountain Division গুলোর একটা বড় অংশ পূর্বাঞ্চলে মোতায়েন। এই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের সামরিক বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে পশ্চিমাঞ্চলে নিয়োজিত হতো যার পরিণাম পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র সাহায্য এবং প্রশিক্ষণ যে পাকিস্তানই দিয়ে

আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ যাবত কাল (বিগত ২১ বছর) পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্যবহার করা হয়েছে staging ground হিসাবে। দুই, বাংলাদেশকে অশান্ত ও অস্থিতিশীল (destabilize) করতে হলে এটাই সবচাইতে সহজ এলাকা; কেননা পার্বত্য এলাকা বিধায় গেরিলা হামলা চালানো সহজ। তদুপরি তাদের কাছে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র পাওয়া বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষ করে মিজোরা আগে থেকেই তৎপর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মিজোরা সরাসরি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ১৯৭১ এই পাকিস্তানীরা এখানে ঘাঁটি করেছে–অস্ত্র লুকিয়ে (Cache) রেখেছে। তিন নম্বর, রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ এবং চোরাচালান চলছে অব্যাহতভাবে। এক ঢিলে কয়েক পাখি–

ক. ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা,

খ. বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল রেখে প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং

গ. রোহিঙ্গা রুটে অস্ত্র এবং চোরাচালান, যার দ্বারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী এজেন্টদের অর্থ সরবরাহ করা যায়।

সোনায় সোহাগা! এত বড় স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে মানুষ পাগল হবারই কথা।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল যাবত পাকিস্তানের আইএসআই (সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা)-এর ব্যাপক তৎপরতার বিষয় আলোচিত হয়ে আসছে। বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। এই তৎপরতার অনেকগুলো দিক আছে। রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল রাখা, সন্ত্রাসীদের সাহায্য করা, ভারতবিরোধী প্রচারণা চালানো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের বিরুদ্ধে নানাবিধ সামরিক-আধা সামরিক তৎপরতা চালানোর ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা। ঐ গুলোই হচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ-নীতির স্তম্ভ। বাংলাদেশ যখন তার অর্থনৈতিক-সামাজিক বিভিন্নরকম সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, ঠিক তখনই চলেছে এ দেশে পাকিস্তানের খেলা। বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে অলক্ষ্যে, অগোচরে তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের মাধ্যমে আরেক আফগানিস্তান সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

১৯৭১ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আইএসআইয়ের যে তৎপরতা চালাতে পারেনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর খুনী সরকার সেই সুবিধাই করে দেয় তাদেরকে। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকে ব্যবহার করার অপূর্ব সুযোগ অথচ দায়-দায়িত্ব সব বাংলাদেশ সরকারের। ভারতের সাথে বাংলাদেশের তিক্ততাও সৃষ্টি হলো আবার ভারতের বিরুদ্ধে আরেক ফ্রন্টও খোলা হলো।

ভারতের সর্ব পূর্বে অরুণাচল, মণিপুর রাজ্য, নাগাল্যান্ড, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা সব কয়টি রাজ্যেই স্থানীয়-অস্থানীয় বিবাদ

দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে আদিবাসী এবং উপজাতীয়দের ক্ষোভ এবং বিদ্বেষ অস্থানীয়দের বিরুদ্ধে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের নিজেদের মধ্যেও বিরোধ। এই উপজাতীয়দের অল্প সংখ্যককে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখলে সমগ্র পূর্বাঞ্চল অস্থিতিশীল করে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়। এই সুযোগ পাকিস্তান পুরোপুরি নিয়েছে তাদের বাংলাদেশের সহযোগীদের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা এই উপজাতীয় সংঘাতকে "মুক্তিযুদ্ধ", "স্বাধীনতার যুদ্ধ" আখ্যায়িত করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে তার তুলনা পর্যন্ত করেছেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত উপজাতীয় নেতার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে তাদের তৎপরতা বন্ধ করে দিলে আমাদের সমূহ বিপদ। এটা যে আইএসআইয়ের বানোয়াট গল্প আর বাংলাদেশকে হুমকি দেবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস তা বুঝতে দেরি হয় না।

অবাক হই এই ভেবে যে, কি করে আমাদের বড় বড় নেতা নাগা, কুকী, বোড়ো, টিপরা, খাসিয়া, মিজো এদেরকে এবং এদের উপজাতীয় চেতনা এবং দাবি-দাওয়াকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে তুলনা করেন? শুধু কি তাই? এদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এঁরা কি নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছেন না? টিপরা, নাগা প্রভৃতির দাবি মানলে আমাদের নিজস্ব চাকমা এবং অন্য উপজাতীয়দের দাবি মানতে হয় সমানভাবে। তাদেরকেও মুক্তিযোদ্ধা বলে আখ্যায়িত করতে হয়। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সাত বোন (Seven sisters) আন্দোলন তাতে চাকমাদের পৃথক রাজ্যের দাবিও অন্তর্গত।

পাকিস্তানের স্বার্থ হাসিলের সাথে আছে আমাদের দেশীয় জাতীয়তাবাদের লেবাস পরিহিত দল এবং তাদের সহযোগী কিছু তথাকথিত নেতা (যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল)। মুনতাসীর মামুন তাঁর লেখায় এঁদের চমৎকারভাবে চরিত্র চিত্রন করেছেন, "এদের হাতে দেশ কতটা নিরাপদ" এই শিরোনামের লেখায়। এদের কয়েকজনকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি, এদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও অবহিত আছি। আনোয়ার জাহিদ যে পাকিস্তানের সহযোগী এবং বিভিন্ন দল বদলকারী তাই নন, ছাত্রকালে যখন তাঁর তুখোড় বামপন্থী নেতা বলে পরিচিতি ছিল সেই কালে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে (আলতাফ গওহর তখন সচিব) গোপন তথ্য পাঠাতেন। আমি তৎকালীন সিনিয়র মন্ত্রী (তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত) খাজা শাহাবুদ্দীনের একান্ত সচিব। খাজা সাহেব এবং আলতাফ গওহরের ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন তখনকার অনেক পূর্ব পাকিস্তানী নেতা-ছাত্রনেতার পরিচয় জানতাম। শফিউল আলম প্রধান, ৭ খুনের আসামী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত,

সোনার দোকানে ডাকাতি করার মতো অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, মুসলিম লীগের রক্ত যার ধমনীতে তার পক্ষে সবই করা আর বলা সম্ভব। এদের সাথে আছে মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধিতাকারী, প্রকাশ্যে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য জঘন্য কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারী চট্টগ্রামের অতি পরিচিত ভ্রাতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত চট্টগ্রামের রাওজান, হাটহাজারী ও সংলগ্ন এলাকায় এদের চরম বর্বরতা আমাদের ইতিহাসে এক ঘৃণ্য অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষমার সুযোগে, জিয়াউর রহমানের ছত্রছায়ায় এবং পরবর্তী অন্যান্য সরকারের আমলে ফুলে-ফেঁপে ওঠা, বাংলাদেশে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও এদের পাকিস্তানপ্রীতি অটুট। তথাকথিত এর নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তির প্রধান অন্তরায়। এরা যে হায় হায় করবে, ভারত সব দখল করে নিল বলবে এতে আর বিচিত্র কি? বিএনপি-তে যোগদানকারী আরও একটি বড় অংশ তাদের চলনে-বলনে, যথা বার্তায়, আচার-আচরণে পুরোপুরি পাকিস্তানী। এরা প্রাক্তন মুসলিম লীগের ধ্বজাধারী। এই তিন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ এখন বিএনপি'র কর্ণধার বেগম খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠতম সহচর এবং পরামর্শদাতা।

আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই অবাক হই ভেবে যে, মান্নান ভূইঞা এবং কর্নেল অলির মতো মুক্তিযোদ্ধা কেমন করে এই পাকিস্তানী ঐক্যতানে সুর মেলাচ্ছেন। তাঁরা ভারতবিরোধী কথাবার্তা বলতেই পারেন। বৃহৎ প্রতিবেশীরূপে ভারতের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তিকর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের ওপর ভারতের পক্ষ থেকে যে কোন হুমকি আমরা কখনই সহ্য করব না, যে কোন হামলা অবশ্যই প্রতিহত করব। কিন্তু অকারণে অন্য আরেক দেশের (অর্থাৎ পাকিস্তানের) স্বার্থরক্ষা, তাদের বৈদেশিক ও সামরিক কৌশলের ঘুঁটি হয়ে, নিজের নাক কেটে ভারতের যাত্রাভঙ্গ করার প্রয়াসকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যারা এতদিন আমাদের অঞ্চলকে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতায় ব্যবহৃত হতে দিয়েছে, নিজেদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপন্ন করেছে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। রোহিঙ্গাদের ব্যাপকহারে বাংলাদেশে আগমন এবং তাদের পিছনে বর্মী বাহিনীর বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ নিশ্চয়ই আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলা। তেমনইভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে প্রক্সিযুদ্ধ চালাতে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেদের ভূমিকে ব্যবহার নিশ্চয়ই সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। জামায়াতে ইসলামী কখনই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ চায়নি। পাকিস্তান তাদের ধ্যান, জ্ঞান, চেতনা আফগানিস্তানে তালেবানদের অভ্যুদয় এবং পাকিস্তানের সাহায্য তাদের আরও অনুপ্রাণিত করছে নিশ্চয়ই। মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট ইসলাম বিকৃতকারী এই দল যেভাবে কথা বলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রগুলোর সাহায্যে এরা বিশাল ধন সম্পদের মালিক। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এদের ক্যাডারদের হাতে। পাকিস্তান আর রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে তাদের অস্ত্র সরবরাহ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় এদের নিজস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। চট্টগ্রামের মুসলিম লীগপন্থী নেতাদের ক্যাডার এবং জামায়াতের ক্যাডার অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্ন–উদ্দেশ্য তাদের এক। বাংলাদেশকে দুর্বল রেখে তাকে পাকিস্তানের নীতি বাস্তবায়নে ব্যবহার করা।

অশান্ত রাখার চক্রান্ত কেন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্য সামরিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এর অবস্থান, তেমনি তার প্রাকৃতিক সম্পদ। এই অঞ্চল বাদ দিলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা কোন এলাকারই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের জন্যও এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই জেলা বরং আরও বেশি কিছু ছিল। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে কথাই এখানে বিবৃত করতে চাই। এই ঘটনা স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান আন্তর্জাতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্বে ভারতের মিজোরাম (যার পিছনেই আসাম এবং অরুণাচল), উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং দক্ষিণে বর্মা। দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজারের কাছে, কয়েক মাইলের মধ্যেই বঙ্গোপসাগর। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বর্মার সীমান্ত থেকে বেশ কাছেই পূর্ব দিকে সরে গেলে বিখ্যাত চিনডিট হিলস। বর্মার উত্তরাঞ্চলে এই পর্বতমালা একদিকে থাইল্যান্ড এবং অন্যদিকে চীনের সীমান্তে চলে গেছে। আবার সেখান থেকে উত্তর লাউসেও যাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সঙ্গমস্থলের অপরিসীম সামরিক গুরুত্ব প্রথম চোখে পড়ে। চিনডিট হিলস এলাকা থেকে বিখ্যাত আমেরিকান জেনারেল স্টিল ওয়েলল তাঁর চীন অভিযান পরিচালনা করতেন। মিত্র পক্ষের বর্মা অভিযানকালেও পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ এবং কক্সবাজার বিশেষ প্রয়োজনীয় অঞ্চল বলে বিবেচিত হয়। আরাকান রোড কক্সবাজারের রামু হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে রেশ অনেকটা চলে গেছে। এখানেই গুং ধুং নামক স্থানে বাংলাদেশ-বর্মা চেকপোস্ট।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোত্তরে রামগড় শহর ফেনী নদীর পাশেই অবস্থিত। নদীর তীরে ত্রিপুরার জেলা শহর সাব্রুম। দুই শহরের মাঝখানে ব্যবধান ১০০ গজের বেশি না। এখানে খরস্রোতা ফেনী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। শুকনো মৌসুমে হাঁটুপানি–পাহাড়ে একটু বৃষ্টি হলেই ঢল নামে। দু'কূল ছাপিয়ে হঠাৎ করে বন্যা চলে আসে। এই রামগড় শহর থেকে সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে গুং ধুং পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা আছে। খাগড়াছড়ি থেকে আরও দক্ষিণে

মহালছড়ি। ২০/২৫ মাইল হবে। মহালছড়ি কাপ্তাই হ্রদের ওপরেই। নদীপথে রাঙ্গামাটি আসা যায়। আবার সেখান থেকে আরও দক্ষিণে মানিকছড়ী নামক স্থানে আসা যায়। এটি চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি রাজপথের ওপর। মানিকছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি পাঁচ মাইল। সে দিকে না গিয়ে চট্টগ্রামের পথে ১০/১২ মাইলের মতো গেলে ঘাগরা। এখান থেকে বাঁদিকে বেশ পার্বত্য পথে কাপ্তাই থেকে সরাসরি দক্ষিণে বান্দরবান পর্যন্ত রাস্তা চলে গেছে। সেখান থেকে রামু হয়ে গুং ধুং পাকা সড়ক। আবার কক্সবাজারও। এমন একটি অঞ্চল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হিসাব কিতাবের মধ্যে অনেক উপরে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি?

১৯৬৯-৭০-এ পার্বত্য চট্টগ্রামে নেপথ্যে আরও একটি নাটক চলছিল। যার কারণে আমাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সান্নিধ্যে আসতে হয় এবং তাদের পরিকল্পনা মোটামুটি আমি জানতে পারি। পরবর্তীকালে নিজে পর্যালোচনা করে, বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু বুঝতে পারি যেটা প্রথম দিকে পরিষ্কার ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি আছে, যার নাম সাজেক। বড় সুন্দর এই অঞ্চল। গড় উচ্চতা ৩ হাজার ফুটের মতো। উত্তর থেকে দক্ষিণে সীমান্ত বরাবর এই মালভূমিতে ৬টি উপজাতীয় মৌজা–রুইলুই, তুইচুই ইত্যাদি। এর সবগুলোর অধিবাসী লুসাই। আমাদের লুসাই এবং ভারতের মিজো একই উপজাতি সীমান্তের এপারে তাদের বলা হয় লুসাই, ওপারে মিজো। ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম সব এক। এরা অধিকাংশ খৃষ্টান। খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা এই অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি। যদিও রাঙ্গামাটি থেকে এখানে যাতায়াত করার কোন রাস্তা নেই এবং মারিশ্যা থেকে সাজেক পর্যন্ত পথ অত্যন্ত দুর্গম (২ দিনের কমে অতিক্রম করা যায় না), তবু লুসাইদের এই অঞ্চলে স্কুল, গির্জা সবই আছে। চাকমা, মগ ও ত্রিপুরাদের পর সংখ্যা ও প্রভাবে লুসাইরা চতুর্থ। সাজেক ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আরও অনেক স্থানে লুসাই আছে।

ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে মিজোরাম বলে লুসাইদের রাজত্ব ছিল এবং বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ বড় একটা অংশ এদের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল বলে লুসাইরা দাবি করে। ভারতের মিজোরাম অধিবাসী লুসাই এবং আমাদের উপজাতি একত্রে স্বাধীন, সার্বভৌম একটি "মিজোরাম" প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে অনেক দিন থেকেই। ভারতে লালডেঙ্গার নেতৃত্বে এই মিজোরা দুই যুগ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নেমেছে। এদের দমন করার জন্য শিলচরে ভারতকে পুরো একটি আর্মি কোর নিয়োগ করতে হয়েছিল। এছাড়া রাজধানী আইজলে আছে সামরিক অবস্থান, "মিজোরাম" প্রদেশের পিছনে, উত্তর-পূর্বে নাগাল্যান্ড সেখানে চলেছে নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা।

পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই এই মিজো এবং নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য দিয়ে আসছিল। সেজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের। মিজো নেতা লালডেঙ্গা এবং নাগা নেতা ফিজো প্রায়ই যাতায়াত করতেন পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে। ঢাকায় তাদের যোগসাজশ ছিল পাকিস্তানী কর্তাব্যক্তিদের সাথে। মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানেও যাতায়াত করত এরা। বিশেষ মিজোদের প্রধান ঘাঁটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে সাজেক মালভূমি এবং জঙ্গলে। মিজোদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধন করত পাকিস্তানের Inter Services Intelligence বা ISI (আন্তঃবাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা)। এদের সাহায্য করত SSG বা কমান্ডো বাহিনী, যারা রাঙ্গামাটির আশপাশে ঘাঁটি গেড়েছিল।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বরাবরই স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আরেকটি পাকিস্তান বা নিদেনপক্ষে একটি "মুসলিম বাংলার" স্বপ্ন দেখে এসেছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের দোসরদের মাধ্যমে, যারা আমাদের মধ্যেই বিরাজমান প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান এবং কক্সবাজার এলাকায় এরা অত্যন্ত তৎপর। রোহিঙ্গা বাহিনীকে দিয়ে বর্মার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। বাংলাদেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট করা, সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হানা এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে অরাজকতা সৃষ্টি যাকে বলে পুরোপুরি "Destabilize" তাই হলো পাকিস্তানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে কি পরিমাণ অস্ত্র বাংলাদেশে এসেছে এবং সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তা সকলেরই জানা আছে। কথিত অঞ্চলে ট্রেনিং থেকে শুরু করে ধর্মভিত্তিক মুসলিম বাংলার পক্ষে মগজ ধোলাই এবং ক্যাডার সৃষ্টি এখন সর্বজনবিদিত। উপরে উল্লিখিত মিজো-বাহিনীর মতো রোহিঙ্গা বাহিনী (Liberation Front) গত প্রায় তিন দশক থেকে পাকিস্তানী সাহায্যপুষ্ট। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ডেপুটি কমিশনার থাকাকালীন এদের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলাম। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সে সময় শামসুল আলম (ডিরেক্ট) এবং আমি বিভিন্ন সময়ে বর্মার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে পরবর্তীকালে এই রোহিঙ্গাদের সর্বপ্রকারে পাকিস্তান ব্যবহার করেছে এবং করছে। এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের উদ্দেশে বর্মার সেনাবাহিনীকেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে। রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বর্মী বাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে, আমাদের ক্ষতি সাধন করেছে, আমরা কিছুই করতে পারিনি। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছি।

এখানে একটি চমকপ্রদ তথ্য দেয়া যেতে পারে আমার বক্তব্যের সমর্থনে। আমাদের সহকর্মী অবসরপ্রাপ্ত সচিব নুরুন্নবী চৌধুরী ২/৩ বৎসর আগে মিসরে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সেই সময়ে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের সমর্থনে মিসরে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত সেখানকার পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ/চিঠি লেখেন, যা স্পষ্টতই বাংলাদেশবিরোধী। কোন রাষ্ট্রদূত আরেকটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং তথাকথিত বন্ধুরাষ্ট্রের বিরোধী বক্তব্য তাঁর সরকারের অনুমোদন ছাড়া প্রকাশ করতে পারেন না। বন্ধুবর নুরুন্নবী চৌধুরী এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর জানা মতে এর কোন বিহিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৭১-এ ডিসেম্বরের শেষদিকে পাকিস্তান সেনা ও নৌবাহিনীর বেশ উঁচুপদের অফিসাররা নির্বিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বান্দরবান/কক্সবাজার হয়ে প্রথমে আরাকান এবং তারপর পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। এটা সম্ভব হয় আগে থেকেই তাদের সেখানে বন্ধু এবং ঘাঁটি থাকার জন্য–অর্থাৎ রোহিঙ্গা লিবারেশন ফ্রন্ট ও তার আশ্রয়। মিজো বিদ্রোহীদের জন্য বেশ কয়েকটি ক্যাম্প এবং ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে। রাঙ্গামাটিতে এদের খুব সাধারণ (যা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে) একটি দপ্তর ছিল। কিন্তু প্রধান তৎপরতা ছিল উত্তরের সংরক্ষিত বন অঞ্চলে। সেখানে তাদের ঘাঁটি ছিল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। মিজোরামের অভ্যন্তরে এবং পার্বত্য ত্রিপুরায় সামরিক হামলা চালিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। মিজো বাহিনীর সামরিক সদর দপ্তর ছিল সাজেক মালভূমি এবং গভীর অরণ্যে। এরা নিজেদের বিভিন্ন সামরিক খেতাবে ভূষিত করত যেমন, জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল ইত্যাদি যদিও তাদের সর্বমোট সংখ্যা হাজারের উর্ধে ছিল বলে মনে হয় না।

ভারতীয় বাহিনীকে পর্যদুস্ত করা ছাড়াও পাক বাহিনীর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল যা পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্পষ্ট বোঝা যায়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যদি 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন ঃ (ক) বাঙালীবিরোধী তৃতীয় কোন শক্তির সাহায্য, (খ) চট্টগ্রাম বন্দর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য মিত্রশক্তি এবং (গ) প্রয়োজনবোধে বাঙালী বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থা। পাকিস্তানীরা ভাল করেই জানত যে, ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলার জন্য গেরিলা যুদ্ধ ব্যতীত গতি নেই এবং সেটা করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামই সর্বোত্তম স্থান। অতএব এই অঞ্চলে পূর্ব থেকেই নিজস্ব সেনাবাহিনী নিয়োগ না করে যদি কোন মিত্র (এবং অনুগত) বাহিনী রেখে দেওয়া যায়, যারা

ইঙ্গিতমাত্র পিছনে থেকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হবে, তার চাইতে ভাল আর কি হতে পারে? মিজো বাহিনী তাই পাকিস্তানীদের হিসাবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

মিজো অপারেশন সম্পর্কে কোন তথ্য বাইরে কারোই জানা ছিল না। এর ব্যাপকতা সম্পর্কে আমি নিজেও তেমন ওয়াকিবহাল ছিলাম না প্রথম দিকে। পাকিস্তানী ISI-এর অফিসাররা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং তথ্য সংগ্রহে উত্তরে যাচ্ছেন এ কথাই বলতেন। ক্রমশই মিজোদের বিচরণ ক্ষেত্রে ব্যাপক এলাকায় শুরু হয় এবং এর ধ্বংসাত্মক দিকটি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে প্রতিভাত হয়। ফলে তাদের মধ্যে মিজোবিরোধী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মিজোদের অবস্থানের ফলে ঐ জেলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। প্রথমত, পাকিস্তানীরা তাদের সর্বত্র চলাফেরা করার সুযোগ দেবার ফলে এরা ক্রমশ নিচের জনবসতি এবং হাট-বাজারের দিকে আসতে থাকে। নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর অত্যাচারও বেড়ে চলে। রেশনের ঘাটতি হলে জনসাধারণের কাছ থেকে ধান, হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল সংগ্রহ ক্রমেই নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। পরে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়। তারপর পেটের চাহিদা মিটলে অন্যদিকে নজর। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের খবরও আসতে থাকে। এরপর শুরু হয়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হামলা। খুব অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দিক থেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে শুরু করে। চাকমা, ত্রিপুরা, মগ সব উপজাতীয়রাই সোচ্চার হয়ে ওঠে। সাথে সাথে আমাদের বন বিভাগ এদের অত্যাচারে অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে বার বার অভিযোগ করতে থাকেন। মিজো বা লুসাইদের আমি বলতাম omnivorous বা সর্বভূক। এরা খেত না এমন জিনিস ছিল না। কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি সব কিছুই এদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছোট-খাটো পোকা-মাকড়, সর্বপ্রকার পাখি ইত্যাদিও বাদ পড়ত না। এদের নির্বিবাদ ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের বড় বড় সংরক্ষিত বনগুলো উজাড় হয়ে যেতে থাকে। বন বিভাগের কর্তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং আমাকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। আরও মজার ব্যাপার হলো এই যে, যাদের বিব্রত করতে মিজোদের নিয়োগ করা সেই ভারতীয়রা মিজোদের পিছু ধাওয়া করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে এদের ঘাঁটি ধ্বংস করতে থাকে। প্রতিবার ভারতে মিজো আক্রমণের পাল্টা আক্রমণে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই ভারতীয় বাহিনীর শিকার হয়ে পড়ে। এবং এদের বাধা দেওয়ার কোন শক্তিই পাকিস্তানীদের ছিল না। জেলা প্রশাসনের জন্য মিজোদের উপস্থিতি মারাত্মক আইন-শৃঙ্খলাজনিত হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই

পরিস্থিতিতে আমি বাধ্য হয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ দাবি করি। ISI-এর ওপর প্রাদেশিক সরকারের কোন এক্তিয়ার ছিল না বিধায়, আমাকে সামরিক বাহিনীর কাছে যেতে বলা হয়। ফলে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি ইন-সি জেনারেল সাহেবজাদা মোহাম্মদ ইয়াকুব খান আমাকে ঢাকা ডেকে পাঠান এবং আমি সমস্ত পরিস্থিতি তার কাছে বর্ণনা করি। তাঁকে এবং তাঁর সহযোগীদের আমি এটা বোঝাতে প্রয়াস পাই যে, মিজোদের আমাদের ভূমিতে কিছুতেই স্থান দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আর যদি তাদের আশ্রয় দিতে হয়, তাহলে তাদের গতিবিধির ওপর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্য থাকতে হবে এবং তাদের স্থানীয় আইনের আওতায় আসতে হবে। এর ফলশ্রুতিতে মিজোদের ওপর আমাকে কিছুটা কর্তৃত্ব দেয়া হয় এবং ISI-এর অফিসারদের আমার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে বলা হয়। এ সময় আমি সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রতিবেদনে এটাই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করতে চাই যে, মিজোদের উপস্থিতিতে আমাদের লাভের চাইতে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। সেই সময় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা এর সামরিক সুবিধার কথা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তাদের কাছে পাকিস্তানের (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের) সুবিধাটাই বড় উপজাতীয়রা যাই বলুক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি যাই হোক না কেন। এতদিন পরেও সেই সামরিক কৌশলই পাকিস্তান প্রয়োগ করছে।

উপসংহার

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে শান্তি প্রতিষ্ঠার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। বেশি দেরি হলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফলে একটি বারুদের স্তূপ হয়ে আছে। একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে সেখানে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। স্বাধীনতাবিরোধীদের তাই কামনা এদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

শান্তি-প্রক্রিয়াবিরোধী চক্র দেশে আগুন লাগাতে ব্যস্ত। গত কয়েকদিনে চট্টগ্রামের ঘটনা তাই প্রমাণ করে। এদের আছে অঢেল অর্থ, প্রতিপত্তি, অস্ত্র, রশদ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার। এদের রুখতে হবে। বাংলার জনগণকে সাথে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উন্নয়ন আর প্রগতির ধারায় শামিল করতে হবে।

[লেখক সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব]

দৈনিক জনকণ্ঠ

৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৭

প্রেক্ষাপট

পার্বত্য শান্তি চুক্তি

জীতেন বড়ুয়া

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটেছে। পূর্ববর্তী সরকারসমূহের ভ্রান্তনীতি এবং কিছু সংখ্যক উপজাতীয় নেতার হঠকারী কার্যকলাপের কারণে গত দুই দশক ধরে পার্বত্য অঞ্চলে জ্বলছিল অশান্তির দাবানল। বর্তমান সরকারের আপাত উদার দৃষ্টিভঙ্গিই এই শুভ সূচনার প্রধান উৎস।

আলাপ-আলোচনাই সকল সমস্যা সমাধানের পথ। সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অস্ত্রের ভাষায় কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। ৭ম শান্তি সংলাপে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলা যথাক্রমে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে শান্তিচুক্তির বিপক্ষে একটি মহল উঠেপড়ে লেগেছিল। বিশেষত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে বিভিন্নভাবে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের বোঝানো হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তি করে শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবে ভারতের কাছে এ অঞ্চল তুলে দেয়া হবে। প্রচারণা চালানো হয়েছিল যে, পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত বাঙালীদের স্বার্থ শান্তিচুক্তিতে যথাযথভাবে রক্ষিত হবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়েছে এবং বিগত সরকারগুলো এ সমস্যাকে কিভাবে দেখেছে তা খতিয়ে দেখলে পার্বত্য অঞ্চলের সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য শান্তিচুক্তি ছিল জরুরী। আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে তাকাই তা হলেই উপলব্ধি করতে পারব পার্বত্য চট্টগ্রামে রক্তপাত ও সশস্ত্র সংঘাতের কারণ।

ব্রিটিশরা ১৯০০ সালে চিটাগাং হিলট্রাক্ট রেগুলেশনের মাধ্যমে অনগ্রসর পার্বত্যবাসীদের অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ব্রিটিশরা সেই রেগুলেশনের ৩৩, ৫১ ও ৫২ নামক তিনটি বিধি জারি করে পাহাড়ীদের চারদিকে গড়ে তোলে একটি অদৃশ্য দেয়াল। রেগুলেশনের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, এতে পার্বত্যবাসীরা অন্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক থাকবেন এবং এতে তাদের জীবিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কিন্তু তা হয়নি। এই অবরুদ্ধ অবস্থার ফলে পাহাড়ীদের সনাতনী কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। যেহেতু অর্থনীতিই জীবন

ব্যবস্থার অন্যান্য কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু পাহাড়ীদের অনগ্রসর অর্থনীতি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটাতে দেয়নি। তাদের পেশায় কোন বৈচিত্র্য আসেনি। কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটেনি। সেই সাথে বিস্তার ঘটেনি শিক্ষার। পার্বত্যবাসীদের বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হলেও তাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না।

স্বাধীনতার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম, যা বাংলাদেশের আয়তনের এক-দশমাংশ, একটি অনগ্রসর জনপদ ছিল। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবহেলা এবং রাজনৈতিক মতভেদের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০-এর ১ ধারা ননরেগুলেশন জেলা হিসাবে শাসিত হয়ে আসছিল। এ রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের আগমন বন্ধ করা, উপজাতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করলেও উপজাতীয়রা এর আওতায় কোন রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত না। সুপারিনটেনডেন্ট অব হিল ট্রাক্ট ও পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সার্কেল চীফগণ জেলা প্রশাসনের অধীনে কর আদায় ও সাংস্কৃতিক বিচার ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্তান অভ্যুদয়ের পরেই শুধুমাত্র প্রচলিত শাসনতন্ত্রের আওতায় তারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে শুরু করে। তৎকালীন পাকিস্তান শাসন আমলে এই মেন্যুয়ালের কিছু সংশোধন আনা হয়–যা এই অঞ্চলের এক এক্সক্লুডেড এরিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং বহিরাগতদের বসতি স্থাপনে সুযোগ সৃষ্টি করে। যদিও মোগল শাসন আমলের পূর্ব থেকেই কিছু কিছু বাঙালী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছিল। তথাপি পাকিস্তান অভ্যুদয়ের পর থেকেই অধিক সংখ্যক হারে বাঙালী এই এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকে। এর ফলে জমির অধিকার স্বত্ব নিয়ে উপজাতি এবং অউপজাতির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে উপজাতীয়রা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে বিমাতাসুলভ ব্যবহার পেয়ে আসছিল। চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষা–সবক্ষেত্রেই ছিল তারা অবহেলিত। প্রশাসনের কাছ থেকেও তেমন সহযোগিতা পেত না।

১৯৬০ সালে নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪ হাজার একর আবাদী জমি জলমগ্ন করে এবং এতে চাকমা সার্কেলের প্রায় ১ লাখ লোক ছিন্নমূল হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন করা হয়নি। ক্ষতিপূরণ যা দেয়া হয়েছিল তা ক্ষতির তুলনায় ছিল কম। এটাই অসন্তোষের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চলের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি এবং চাকমা

উপজাতীয় যুবকদের অনেকে রাজাকার ও সিএফএ হয়েছিল। এসবকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার পর পার্বত্য অঞ্চলে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই (১৯৭২ সালে) প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু নেতা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে শান্তি বাহিনী নামে একটি আর্মড ক্যাডার সৃষ্টি করেন। এর আরও আগে পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনাকে মূলধন করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তার কিছু অনুগামী উপজাতীয় যুবকদের সংগঠিত করতে থাকেন। ১৯৭২ সালের মে মাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গোপনে গঠিত হয় রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথম এডহক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমা, ভবতোষ দেওয়ান, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও কালিমাধব চাকমা প্রমুখ। কেন্দ্রীয় ক'জন নেতা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির কথা আর কেউ তেমন জানত না। পার্টির বাইরের আরও কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় প্রকাশ্য দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে গঠন করা হয় গোপন ও প্রকাশ্য দলের সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। এ দু'টি সংগঠন গঠনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল প্রধান। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমা দু'জনই ছিলেন শিক্ষক।

এদিকে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলাদেশ নাগরিকদের বাঙালী আখ্যায়িত করাকে উপজাতীয়রা তাদের জাতিসত্তার ওপর আঘাত বলে গণ্য করে এবং চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়। অতঃপর ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে একটি পুলিশ প্যাট্রোল বাহিনীকে এ্যাম্বুশের মাধ্যমে তাদের সশস্ত্র তৎপরতা শুরু হয়।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর সে উদ্যোগ ভেস্তে যায়। জিয়া ক্ষমতায় এসে পার্বত্য সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে। তার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনসংখ্যার সামঞ্জস্য এনে শান্তিবাহিনীকে অস্ত্রের মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা চালান। ফলে পার্বত্য সমস্যা আরও বিকট আকার ধারণ করে। দেশে-বিদেশে এর প্রচার-প্রচারণা চলে।

এরশাদ সরকারের আমলে পার্বত্য সমস্যাটি প্রথম রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়। '৮০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শান্তিবাহিনী ও সরকারের সাথে আলোচনা শুরু হয়। এ সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৫ সালে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানার পুজগাংমুখ কমিউনিটি সেন্টার হলে অক্টোবর মাসে প্রথম শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সাথে এসময় ৬ দফা শান্তি আলোচনা চলে। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বৈঠক একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। এ সময় শান্তিবাহিনীর সাথে আলোচনা করতেন সেনা কর্মকর্তারা। তৎকালীন চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম এর নেতৃত্ব দিতেন।

পরবর্তীতে এই শান্তি সংলাপ সফল হয়নি। ফলে সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের নিয়ে ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ সৃষ্টির মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের সাময়িক চেষ্টা করেন। এ সময় পার্বত্য জেলাগুলোতে শান্তিবাহিনীর নাশকতামূলক তৎপরতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। তখন একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর সাথে শান্তিবাহিনীকে গেরিলা কায়দার যুদ্ধ করতে হয়। এ সময় অনেক পুনর্বাসিত বাঙালী ও উপজাতীয়দের প্রাণ হারাতে হয়। শুরু হয় পাহাড়ী ও বাঙালীদের মাঝে সহিংস ঘটনা। ফলে উপজাতীয়দের ভিটাবাড়ি ছেড়ে যেতে হয় ভারতের শরণার্থী জীবনে। ১৯৯২ সালের দিকে শান্তিবাহিনী একতরফা অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে পার্বত্য অঞ্চলে সহিংসতা বন্ধ রাখে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৯৩ সালের ৫ নবেম্বর শুরু হয় শান্তিবাহিনীর সাথে পার্বত্য শান্তি সংলাপ। এ সময় মন্ত্রী অলি আহমেদের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মূল কমিটি ৭ বার ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে উপকমিটি পর্যায়ে ৮ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এসময়ের আলোচনায় সমস্যা সমাধানের খুব একটা অগ্রগতি হয়নি।

এরশাদ চেষ্টা করেছেন পার্বত্য সমস্যার সাময়িক সমাধান। কিন্তু তেমন সুফল হয়নি। খালেদা জিয়া সরকারের আমলে রাজনৈতিক সমাধানের কথা মুখে বলা হলেও তাদের প্রস্তাব ছিল দ্বিধান্বিত। বস্তুত সে সময় তাঁরা সমস্যার প্রকৃত সমাধান চাননি। কারণ বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল জনগোষ্ঠীর সমস্যা অনুধাবনে রাজি ছিলেন না। ফলে বাস্তবে এর কোন অগ্রগতি হয়নি। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর ধারাবাহিক আলোচনার সূত্র ধরে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পর পার্বত্য সমস্যা দ্রুত

সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সাথে ৬ দফা বৈঠকে বসেছে। এর মধ্যে ১টি খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ও বাকি ৫টি ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। বৈঠকে পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি এবং বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য শান্তি চুক্তি করতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে। গতকাল ২ ডিসেম্বর আলোচনার মাধ্যমে এ অঞ্চলের শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলো।

THE BANGLADESH OBSERVER

The Bangladesh Observer
September 20, 1996
CHT problems to be resolved, says PM

Prime Minister Sheikh Hasina on Thursday said all problems of Chittagong Hill Tracts would be resolved through establishment of peace and rejuvenating development activities there, reports BSS.

"A peaceful atmosphere and a full-scale development activities are the main requirements to weed out any problem from Chittagong Hill Tracts," she said.

The Prime Minister said this when Chairmen of three Local Government councils of Chittagong Hill Tracts called on her at her office in Dhaka.

They were Chairman of Rangamati District Local Government Council Rabindralal Chakma, Chairman of Khagrachhari District Local Government Council Samiran Dewan and Chairman of Bandarban District Local Government Council Mayung Kyme Ching Choudhury.

The three chairmen expressed their confidence that the way to solving the problems of Hill Tracts had been opened after a long time with the return of Awami League to power through the people's mandate.

They also felt that the present Government would be able to find a solution to their problems.

Prime Minister Sheikh Hasina stressed the need for a greater unity in the hill districts and said the Government was aware of their problems and needs in the area.

She also referred to recent killing and said the concerned minister had already visited the area and took due measures in this regard.

Referring to the development efforts in the area, the Prime Minister said the Government had already taken several projects for implementation there. "Preservation of Fruits, harnessing fish resources and afforestation have greater scope to create employment in these areas which together will help solve tensions there," she said.

Sheikh Hasina also said that the Government would provide all help and assistance towards establishment of peace in the region.

The Bangladesh Observer
September 27, 1996
Razzak says
Govt firm to resolve CHT issue politically

Present Awami League government is determined to resolve the long-standing Chittagong Hill Tracts crisis politically instead of seeking a military solution, reports UNB.

"The government considers it as a political problem and it should be solved peacefully, not by police or military," said Water Resources Minister Abdur Razzak.

He, in this regard, expressed his conviction that a peaceful solution of the problem is very much possible only through discussion.

"Both sides should realise that solution to the problem is not possible by arms and military," he said addressing the inaugural session of a two-day seminar on "CHT: Peace, Democracy and Self-Determination" in Dhaka on Thursday.

This was the first disclosure by a top-level policymaker of the present government on its thought on the CHT problem since it assumed power three months back.

National Committee for Protection of Fundamental Rights in CHT organised the seminar at German Cultural Centre to make clear the stand of both the ruling party and main opposition on the issue. But BNP Secretary General Abdul Mannan Bhuiyan who was to address the function didn't turn up.

The inaugural session was also addressed by Attorney General KS Nabi, journalist Matiur Rahman, Rashed Khan Menon of Workers Party, Hasanul Haq Inu of JSD, Anu Muhammad of Ganotantrik Biplobi Jote, Mostafa Faruq of BSD (Jaman) and Farida Akhter of Sammilito Nari Samaj.

Addressing the function, Abdur Razzak told the seminar that the government would officially announce its full-fledged policy on the CHT crisis to the nation soon considering it as a national and political problem.

He informed that the government had already started work on the matter. "For this, so far I know, Bangladesh has talked with India and both sides emphasised the need for reaching a solution," he said.

"This is very sad," he said. Maybe, the incidents were part of a design so that the problem cannot be solved. He, in this regard, sought sincere effort and cooperation from all concerned quarters.

He said a solution of the problem was not impossible as everybody wants it. "But we have also to find out if there is anyone who does not want the solution."

Referring to Bangalee settlers in hill districts, the minister said the present government would continue rehabilitation of plain-land people there. It wants to further extend the present ceasefire that ends this month, he added.

On the Kalpana Chakma issue, Razzak urged all to help the probe committee. If anyone is found guilty in connection with the abduction of Kalpana, he or she will be tried, the minister warned.

Barrister KS Nabi said the problem had been lingering since the British colonial period and a vested interest group kept the problem alive till now.

The Editor of Bhorer Kagoj, Matiur Rahman, emphasised revival of the ministerial council committee and formation of a national parliamentary committee for discussion with the hill leaders.

Matiur Rahman as well as Workers Party leader Rashed Khan Menon called upon the Parbaty Chattagram Jana Sanghati Samity and its armed wing, Shantibahini, to involve themselves in the main stream of the national politics.

"Whether the Jana Sanghati Samity admits or not, people believe that Shantibahini is being sponsored by India and under this identity no movement will succeed in the country," Rahman said.

Menon said the problem has a cross-border implication. Quoting an Indian official, he said even the Indian foreign office did not decide whether the refugees will return or not. "It is decided by Research and Analysis Wing (RAW)," he added.

The Bangladesh Observer
October 1, 1996
Bid to find political solution
National committee
on CHT to be formed

The Cabinet on Monday adopted some important decisions, including formation of a National Committee on the Chittagong Hill Tracts to hammer out a political solution to the staggering CHT problem, reports UNB.

Chaired by Prime Minister Sheikh Hasina, the meeting decided to allow private companies to operate larger aircraft and helicopters in the country's airspace.

An official announcement said the National committee would be formed to find out a way for political solution of the CHT problem.

The Cabinet also accepted a proposal from Parbatya Chattagram Janasanghati Samity, the political front of the Shantibahini, for extending the current truce upto October 31 in the hill tracts.

The Cabinet meeting endorsed a proposal for introducing airplane, including STAL, as well as helicopter service in the private sector in the domestic routs.

It hoped that the decision would open the country's sky gradually for private aircraft and helicopter service in domestic routes, which is consistent with the free-market economic policy.

The Cabinet meeting was informed that an expert committee would be constituted to find out the source and extent of arsenic poising and means of prevention.

It also approved in principle the amendments to the Standard of Weights and Measures Ordinance 1982.

The meeting appreciated the contribution of outgoing Cabinet Secretary Ayubur Rahman in his professional life, including in the War of Liberation of Bangladesh, and his role during the free and fair elections held under caretaker governments in 1991 and 1996.

Ministers, state ministers in charge of different ministries, the outgoing Cabinet Secretary, Principal Secretary to the Prime Minister and secretaries concerned were present.

The Bangladesh Observer
October 2, 1996
National body on
CHT headed by
Chief Whip

The Government has formed a national committee, seeking a negotiated settlement of the long standing Chittagong Hill Tracts problem, reports UNB.

Headed by Chief Whip Abul Hasanat Abdullah, the committee will start its work soon to find out a solution of the CHT problem through discussion and understanding.

The committee also includes the Chittagong City Mayor and other elite, including MPs.

It was constituted as per decision of the Cabinet meeting held on Monday with Prime Minister Sheikh Hasina in the chair.

An official release said the Government thought the declaration of the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) extending the truce up to October 31 as a favourable response and a sign of goodwill for the solution of the CHT problems through talks.

Accepting their proposal for extending the truce, the Government expressed its willingness to solve the problem through discussion.

The Bangladesh Observer
October 6, 1996
1st meeting
of CHT
national body

The first meeting of the 11 member national committee on Chittagong Hill Tracts affairs was held on Saturday at the Special Affairs Division Conference room of the Prime Minister's office at Bangladesh Secretariat with committee chairman and Jatiya Sangsad Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, says BSS.

An official handout said the meeting took several decisions on politically resolving immediately the Chittagong Hill Tracts problem.

A number of members of the committee led by committee chairman Mr. Abdullah leaves Dhaka on Saturday for Khagrachhari as part of their programme, the handout said.

Talks with SB today

UNB adds from Khagrachhari: The National Committee on Chittagong Hill Tracts will hold a closedoor meeting tomorrow (Sunday) with the liaison committee which mediates between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

The Government has formed the National Committee, headed by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, to find out a solution for the long standing CHT problem through discussion.

Competent sources said the meeting would discuss present situation of the Hill Tracts, five-point proposal of the PCJSS and matters relating to truce.

The then Government in November 1985 for the first time started negotiation with the Shanti Bahini to come to a peaceful solution of the CHT problem.

During the past BNP Government, there was a number of meetings with PCJSS, the political wing of the Shanti Bahini, seven times at the main committee level and six times at the sub-committee level.

Members of the national committee, expected to arrive here tomorrow (Sunday) morning, are: Chittagong City Corporation Mayor Alhaj ABM Mohiuddin Chowdhury, Kalparanjan Chakma MP, Dipankar Talukder MP, Bir Bahadur MP, Amir Khasru Mahmud Chowdhury MP, Syed Wahidul Alam MP, Adv. Fazle Rabbi MP and Ataur Rahman Khan Kaiser.

Officials of the local administration, including Deputy Commissioner and Superintendent of Police, will be present at the meeting.

The Bangladesh Observer
October 7, 1996
CHT body holds
meeting with
SB Liaison
Committee

KHAGRACHHARI, Oct. 6: The National Committee on Chittagong Hill Tracts has expressed the government's eagerness to find a political solution to the long-standing CHT problem instead of through military means or other coercive measures, says UNB.

The national committee held a closedoor meeting, the first since its formation by the present government, with the members of the Liaison Committee here today (Sunday) with Chief Whip Abul Hasnat Abdullah in the chair.

The national committee, headed by the Chief Whip, was constituted by the government at a cabinet meeting on October 1, to seek a comprehensive and durable peace deal with the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political umbrella of the Shantibahini.

The meeting at the local Circuit House laid emphasis on finding ways and means to bring about peaceful resolution of the CHT problem.

The government side asked the liaison committee members to talk all necessary preparations to resume peace talks with the PCJSS for an early solution of the problem.

The national committee member present at the meeting allege meaningless procrastination by the past governments in resolving the problem. They said the present government on its 103rd day in power started seeking a solution of the CHT problem by forming the powerful national committee.

The committee chairman, Chief Whip Abul Hasnat Abdullah. said that the present democratically elected government has all the good intentions and cordiality in solving the protracted problem of the CHT region.

The liaison committee member told the meeting that they do not want to see a bloody situation in CHT any longer. They said the pepple of the region hope that the democratically elected government would be able to solve the problem quickly.

National committee member Chittagong city mayor Alhaj ABM Mohiuddin Chowdhury, Dipankar Talukder MP (Rangamati), Bir Bahadur MP (Bandarban), Engineer Mosharraf Hossain MP (Mirsarai) and Ataur Rahman Khan Kaiser, the finance and planning secretary ruling Awami League, were preset in the meeting.

Three members of the national commtitee Amir Khasru Mahmud Chowdhury MP and Syed Wahidul Alam MP of BNP, and Adv. Fazle Rabbi MP of Jatiya Party were not present.

The liaison committee member who attended the meeting, were Bakul Chandra Tripura, Mahua Lal Chakma and Mohammad Shafi.

Divisional Commissioner of Chittagong Sakhawat Hossain, DIG Chittagong Range Ali Mohamad Iqbal, Director General of the special Affairs Department Chowdhury Mohammad Mohsin, local GOC … Kazi Ashfaq, Deputy Commissioner Mohammad Ismail and Superintendent of Police Anwar Hossain also attended the meeting.

The Bangladesh Observer

October 21, 1996

CHT body awaiting Shanti Bahini proposals

The 11-member National Committee, formed by the Government to resolve the problems of Chittagong Hill Tracts, on Sunday, said it was awaiting Shanti Bahini's proposals to initiate discussion, reports BSS.

A Press release issued in Dhaka after meeting of the committee chaired by its Chairman and Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah, said the Liaison Committee between the Government and the Shanti Bahini was asked on October 6 last to convey the Shanti Bahini of the Government's cordiality and good intensions for immediate political solution of the Hill Tracts problems.

But the National Committee is yet to get any response from the Shanti Bahini, the Press release said.

It added that the national committee would be waiting for proposals from the Shanti Bahini before taking next steps.

The meeting decided that the next steps be taken on the basis of views and suggestions of the officials members of the law enforcing agencies and political leaders, who in different periods worked in the Chittagong Hill Tracts to resolve the Hill Tracts problems.

Members of the National Committee Mayor of Chittagong Alhaj ABM Mohiuddin Chowdhury, Eng. Mosharraf Hossain, MP, Dipankar Talukdar, MP, Advocate Fazle Rabbi, MP, former Divisional Commissioner of Chittagong Ali Haidar Khan and Finance and Planning Secretary of Awami League Ataur Rahman Khan Kaisar, took part in the meeting while Major General (Retd) Abdus Salam, MP was present as a resource person and additional Foreign Secretary Tarek Karim was present on special invitation.

Members of the technical committee on the Hill Tracts Acting Secretary of the Special Affairs Division Kazi Golam Rahman, Divisional Commissioner of Chittagong Shakhawat Hossain, Joint Secretary of Home Ministry Anwarul Islam DG South Asian Desk of the Foreign Ministry, Prof. Dr. Anupam Sen Retired Additional Secretary S.S Chakma, Retd. Brig Sharif Aziz and DCs of the three hill districts were present at the meeting.

The Bangladesh Observer
October 23, 1996
PCJSS replies
to national
body on CHT
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Oct 22:- The Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), mentor of the Shanti Bahini has replied to the letter of National Committee which is entrusted with the task to find out a solution to the CHT problems.

The PCJSS letter that was addressed to the National Committee reached the Liaison Committee Convener Hangsadhaj Chakma on Monday. The reply was made to the letter of National Committee that despatched it on October 11 also through Liaison Committee.

The government side (National Committee) wrote the letter seeking immediate resumptions of on-going peace talks to hammer out a lasting solution to CHT problems. In reply, the PCJSS emphasised to work out the modalities before the start of talks afresh.

The PCJSS is said to have urged government side to let it known through the Liaison Committee by October 27 whether the government wants to extend the present ceasefire in CHT. It mentioned that the proposal for cease-fire was supposed to come from the government to keep the present process of peace going.

The PCJSS insisted to stop afforestation and settlement of Khas Land in CHT before the start of peace talks. It also demanded the unconditional release of arrested PCJSS members before the talks.

Jagdish Chakma, a member of its Information and Publicity Wing was the signatory to the letter on behalf of the PCJSS leadership.

The Bangladesh Observer
October 28, 1996
Talks with
Shantibahini
in late Nov

KHAGRACHHARI, Oct. 28- The government plans to hold peace talks with Shantibahini sometime in late November, competent sources here said today, reports UNB.

On Saturday, the government's Special Affairs Department sent a letter to Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of the tribal insurgents, inviting it to a dialogue in quest of peace in the hill tracts.

It said the present government will take quick measures to bring about a political solution of the two-decade old CHT problem.

The letter mentioned that the government would have no objection to further extension of Shantibahini's self-proclaimed ceasefire in the greater interest of maintaining status quo in the CHT.

The ongoing truce expires October 31.

The letter assured the PCJSS of quick governmental measures for keeping the law and order situation in the CHT fair.

To accelerate the peace process, the government is taking steps to release the Shantibahinimen, arrested during ceasefire, as per decision taken by the previous government.

The Bangladesh Observer
November 13, 1996
CHT issue
Talks with
PCJSS
Nov 23
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Nov. 12:- The long-awaited peace talks between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the mentor of Shanti Bahini is likely to be held at remote border hamlet Daduckchhari of Panchhari thana under hill district Khagrachhari on November 23.

To that effect, the Special Affairs Division in the Prime Minister's Secretariat sent a letter addressed to the PCJSS leadership through Liaison Committee on Monday. The Liaison Committee convener Hangshadhaj Chakma immediately despatched the letter that came under the signature of Mashiur Rahman, Director (administration) of the Special Affairs Division by a courier. The letter also had enclosure of copies of three circulars issued by the Cabinet Division in connection with CHT affairs.

Earlier the 11-member National Committee on CHT, held its first meeting with the Liaison Committee on October 7 to pave the way for resumptions of peace talks with the Shanti Bahini's apex body-PCJSS.

The Bangladesh Observer
December 4, 1996
PCJSS agrees to hold talks Dec 21

KHAGRACHHARI, Dec 3:- Parbattya Chattagram Jano Sanghati Samity has accepted the government proposal to hold the proposed meeting at Khagrachhari Circuit House on December 21 instead of December 10, reports UNB.

Responding the government's call to defer the date of the meeting, Shantibahini, the armed wing of the Jano Sanghati Samity, sent a letter to the National Committee on CHT today (Wednesday).

Convenor of the Liaison, Committee on CHT Hangsadhaj Chakma carried the letter to the National Committee.

The letter, signed by Shantibahini Leader Ushatan Talukder, demanded of the government to release their 15 leaders arrested during ceasefire since 1993.

The Bangladesh Observer
December 20, 1996
CHT peace talks tomorrow
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Dec 18:- The long awaited peace talks between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) will take place at a remote border hamlet at Daduckchhari of Panchhari thana under hill district Khagrachhari next Saturday (December 21).

The PCJSS, mentor of the Shanti Bahini earlier in a letter to the Government has given concurrence to the holding of talks on that day. This will be the first round of peace talks between the present Awami League Government and the PCJSS.

However, the letter that was handed over to the Government by the Liaison Committee cheif Hangsadhaj Chakma came under the signature of top Shanti Bahini Commander Ushatan Talukdar.

The PCJSS through that letter put up a precondition to release nine rebel tribals from the jail before the next round of peace talks. The nine imprisoned rebel tribals whose release was sought by the PCJSS are Abani Kumar alias Ashes, Jekentu Khisha alias Jekentu, Premranjan Chakma alias Hiron, Biswa Kalyan Chakma alias Breyar, Deva Ranjan Chakma alias Manabik, Sadhan Kumar Chakma alias Soumen, Sunil Kanti Chakma alias Susham, Subhasdan Chakma and Prabha Sankar Chakma. Accordingly, the government released all of them.

There is now a truce between the Shanti Bahini insurgents, armed cadre of the PCJSS and the Security Force in Chittagong Hill Tracts in order to create a conducive situation for the peace talks. The present phase of truce between the two sides will expire on December 31.

In the first round of talks, the government side will be headed by the Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdulla. Apart from the Chief Whip, the government side-all National Committee members on CHT will be comprised of Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, three CHT Parliament Members-Kalparanjan Chakma, Dipanker Talukder and Bir Bahadur, Awami League central leader Ataur Rahman Khan Kaiser, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, a BNP MP, Syed Wahidul Alam, MP of BNP and Advocate Fazle Rabbi, MP of Jatiya Party.

The PCJSS team in the talks will include, apart from its chief Jatindra Buddhipriya Larma alias Shantu Larma, Central Committee members Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma alias Ashok, Raktautpal Tripura and Shudasindhu Khisha. Besides, the liaison committee members will also remain present during the talks.

As agreed upon between the two sides earlier, eight military camps of the security forces were dismantled and five more made inoperative. The PCJSS team members will be received at Daduckchhari, a bordering village under Panchhari thana of hill district Khagrachhari by the liaison committee members. They will be flown to Khagrachhari Circuit House by a helicopter so that they could hold peace talks on schedule.

During the previous BNP Government, seven round of inconclusive peace talks were held between the two sides till May 5, 1994.

The Bangladesh Observer
December 21, 1996
CHT peace
talks today
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Dec. 20-All preparations have been completed for the first round of official peace talks between the high powered National Committee and the PCJSS, mentor of the Shanti Bahini under the present Awami League government at Khagrachhari Circuit House tomorrow (Saturday).

The National Committee members headed by the Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah already arrived at hill district Headquarters Khagrachhari in quest of lasting peace in Chittagong Hill Tracts (CHT). The committee members appear optimistic about a political solution acceptable to all sides.

The government delegation will include parliament members Bir Bahadur, Dipankar Talukdar, Kalparanjan Chakma, Engineer Mosharraf Hossain and Advocate Fazle Rabbi, Mayor of Chittagong ABM Mohiuddin Chowdhury and AL leader Ataur Rahman Khan Kaiser of Chittagong.

Three other members of the 11 member national committee are BNP lawmakers Syed Wahidul Alam, Amir Khasru Mahmud Chowdhury and Ali Haider Khan,

The five-member Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) delegation will be received at Dudukchhari, a bordering village under Panchhari thana of Khagrachhari district by the Liaison Committee members. The PCJSS delegation will be led by its supreme leader Jatindra Buddhipriya Larma alias Shantu Larma. Then they would be flown to the Khagrachhari Circuit House by a helicopter so that they can hold peace talks on schedule.

During the peace talks, the movement of people around the Circuit House will also remain restricted. Even the newsmen and the photographers will not be allowed there. Only the Liaison Committee members have the clearance to remain present at the meeting or talks.

Meanwhile, the Parbattya Chattagram Jatiyo Samannoy and Shanti Parishad presented an 11-point memorandum to the National Committee Chief Abul Hasnat Abdullah on the eve of peace talks. The Parishad through the memorandum demanded the presence of newsmen and photographers at the venue of peace talks.

The Bangladesh Observer
December 22, 1996
CHT truce
extended
till Mar 31
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Dec. 21:-The present cease-fire in Chittagong Hill Tracts (CHT) scheduled to expire on December 31 has been extended for three more months.

The decision for extension of cease-fire till March 31 next year was taken during the first round of peace talks held between the National Committee and the Parbattya Jana Sanghati Samity (PCJSS), the mentor of the Shanti Bahini at Khagrachhari Circuit House today.

The first round of peace talks that took place under the present democratic Awami League Government held out an olive branch anew for peace in CHT. The inconclusive talks between the two sides were adjourned till December 24. The meeting will take place at the same Circuit House at 10 a.m. after two days. However, the National Committee members were found buoyed up with all optimism of solution to the problems.

Giving the reason for adjournment of peace negotiation, the National Committee Chief Abul Hasnat Abdullah said. We had to adjourn the talks in view of ailment of PCJSS Chief Shantu Larma. He is still suffering from Malaria. The PCJSS supreme leader who looked frail also dittoed to Chief Whip Hasnat about his indisposition. But the two leaders gave the consensus opinion of their determination for continuation of peace talks in quest of lasting peace in CHT.

The two leaders Abul Hasnat Abdullah and Jatindra Boddhipriya Larma alias Shantu Larma in a joint Press briefing echoed each other that the peace talks were be held amidst “extreme cordial and fraternal atmosphere”. Hasnat said, “The talks turned out fruitful.”

When Shantu Larma’s attention was drawn to the installation of Awami League Government and its sincere endeavour for a settlement of CHT. problems Shantu Larma observed, with the return of Awami League to power, our hopes and aspirations for peace rekindled. We are now hopeful.

The PCJSS Chief firmly refuted the involvement of the Shanti Bahini in the massacre of 28 woodcutters at Langadu, kidnapping of nine nontribals at Panchhari and the abduction of Thanchhi Thana Nirbahi Officer Azimuddin Azim. He also denied any sort of breach of ceasefire in CHT by the Shanti Bahini.

Earlier, five members PCJSS team Shantu Larma, Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma alias Ashok, Raktautpal Tripura and Shudasindhu Khisha were received at Dudukchhari, a bordering village under Panchhari thana of hill district Khagrachhari by the members of Liaison Committee. From there, they were all flown to Khagrachhari Circuit House by a helicopter so that they could hold peace talks.

At the Circuit House helipad, they were cordially received by the Chief Whip of the Parliament Abul Hasnat Abdullah and other National Committee members. The members from two sides also exchanged pleasantries. The talks started at 11 a.m. at the ground floor of the two storied circuit house and continued till 2 p.m. At around 3.30 p.m. the five member PCJSS delegation left Khagrachhari also by an air-force helicopter for Dudukchhari.

Of the eleven members of the National Committee, nine members attended the first round of peace talks. The absentees were the two BNP MPs Amir Khasru Mahmud Chowdhury and Syed Wahidul Alam. However, Advocate Fazle Rabbi MP of the Jatiya Party attended the talks. Apart from Committee Chief Abul Hasnat Abdullah, the others present at the talks included Chittaging City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Kalparanjan Chakma MP, Dipankar Talukdar MP, Bir Bahadur MP, Engineer Mosharraf Hossain MP and Ataur Rahman Khan Kaiser, Special Affairs Division Secretary Kazi Golam Rahman, Chittagong Divisional Commissioner Shakwat Hossain and Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail.

Commenting on the first round of talks, an influential tribal leader said. "A new sense of expectancy for peace now reigns in the strife-torn CHT." Hastening, he asked "The big questions now loom all over; will the peace down at last?"

The Bangladesh Observer
December 24, 1996
CHT talks
resume
today
(Chittagong Office)

CHITTAGONG, Dec 23:-The high powered National Committee will sit with the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) leaders at Khagrachhari Circuit House for the inconclusive peace talks on Tuesday.

This will be the extended talks of the first round held between the sides last Saturday when the talks were adjourned for two days in view of "ailment of PCJSS Chief Shantu Larma".

The five-member PCJSS team will be led by its Chief Jatindra Boddhipriya Larma alias Shantu Larma at the talks. The four other team members are Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma alias Ashok, Raktautpal Tripura and Shuda Sindhu Khisha.

On behalf of the government side, the eleven-member National Committee will be headed by the Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah.

The PCJSS the mentor of the Shanti Bahini is expected to table its five-point charter of demands in Tuesday's talks. The five-point charter of demands, inter alia, include the sanction of 'regional autonomy' in the battle-scarred Chittagong Hill Tracts (CHT).

The PCJSS delegation will be received at Duduckchhari, a bordering village under Panchhari thana of hill district Khagrachhari by the Liaison Committee members in the morning. They will be then flown to Khagrachhari Circuit House by a helicopter so that they could hold talks on schedule.

During the BNP government, in all seven round of peace talks were held between the two sides till May 5, 1994.

The Bangladesh Observer
December 26, 1996
PM's order to arrest Subinoy's Killers
Prominent CHT leader
gunned down

KHAGRACHHARI, Dec. 25:- A top leader of the Chittagong Hill Tracts National Coordination and Peace Council was gunned

down in Rangamati today, a day after peace talks between the government and the leaders of tribal insurgents, reports UNB.

Subinoy Chakma, 40, Secretary General of the Council, was killed by a single shot behind his head within 40 yards of his residence at Champaknagar in the Rangamati hill district town at about 6 in the evening, police said.

He was returning from a local market while the assailants shot him from an ambushcade.

The body was kept in his residence till filing this report at about 10:00 p.m. Dipankor Talukder MP, Rangamati Local Government Council Chairman Rabindra Lal Chakma, Nagarik Committee President Goutam Dewan, Deputy Commissioner and Police Super visited the dead.

Chittagong Hill Tracts National Coordination and Peace Council, a combined body of tribal and nontribal people of the three hill districts Rangamati, Khagrachhari and Bandarban-was formed on December 10 in 1991.

The council opposes the insurgency by the Shanti Bahani, the armed brigade of Parbartya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

It organised two "long-march" campaigns of tribal and non-tribal people of the three hill districts in the capital in 1992 and in 1994. Besides, it has held about a hundred peace meetings in the CHT.

The council welcomed the fresh peace talks between the National Committee on Chittagong Hill Tracts and the PCJSS which concluded on Tuesday at Khagrachhari Circuit House with both sides expressing statisfaction over the outcome of the dialogue.

BSS adds:-The identity of the killers could not be ascertained. None was arrested in this connection till 9.30 p.m.

Subinoy Chakma was an active. leader of the so-called Shanti Bahini. He surrendered about 10 years ago.

Mr. Subinoy Chakma was actively involved in the peace process in the area.

Local Member of Parliament Dipankar Talukdar, Chairman Local Government Council Rabindra Lal Chakma and former Chairman of the Council Gautom Dewan in separate statements expressed profound shock at his death. They demanded punishment to the persons responsible for the killing.

In another statement, Saiful Islam Dildar and Shashi Kanti Talukdar President and Joint Secretary General of Chittagong Hill Tracts National Co-ordination and Peace Council (CHTNCPC) strongly deplored the killing of Mr. Chakma.

Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday night directed the district and local administration to round up immediately the persons responsible for the assassination of Mr. Subinoy Chakma, the Secretary General of Chittagong Hill Tracts' National Coordination and Peace Council, an official handout said, reports BSS.

Mr. Subinoy Chakma was killed by unknown assailants at Champaknagar, Rangamati on Wednesday evening.

Hasina condoles death

Another report adds:- Prime Minister Sheikh Hasina on Wednesday night expressed her deep shook at the killing of the Secretary General of Chittagong Hill Tracts' National Coordination and Peace Council, Mr Subinoy Chakma, by unknown assailants.

In a condolence message, the Prime Minister recalled the role of Mr. Subinoy Chakma is establishing peace and stability at the local level. Strongly condemning the killing, the Prime Minister said with the untimely demise of Subinoy Chakma caused an irreparable loss to the country and the nation particularly to the hill districts.

She extended her deep sympathy to the members of the bereaved family.

The Bangladesh Observer
January 24, 1997
Govt-PCJSS
talks in Dhaka
tomorrow
Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 23:-The Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), mentor of the Shanti Bahini insurgents for the first time will go to Dhaka next Saturday in quest of durable peace in battle scarred Chittagong: Hill Tracts.

The PCJSS in a letter to the Liaison Committee at Khagrachhari on January 18 for the first time since the insurrection of insurgency in CHT to decades ago gave its concurrence to sit the Government side for peace talks in Dhaka.

The first round of peace talks between the two sides under the present democratic Awami League Government was held at hill district headquarter Khagrachhari on December 21 and the extended one on December 24: In the past, 13 round of inconclusive peace talks were held during the previous BNP Government and six round under Ershad Government.

The 11-member National Committee set up by the Government to negotiate with the PCJSS team and to hammer out a solution to the problems is headed by the Chief Whip of the Parliament Abul Hasanat Abdullah. The 5-member PCJSS delegation as in the past will be led by its supremo Jatindra Buddhipriya Larma.

The PCJSS delegation will fly to Dhaka from a border jungle-hamlet Daduckchhari in Panchhari thana under Khagrachhari district by an Air Force helicopter in the morning and return back to Daduckchhari by the helicopter the same day evening.

Meanwhile, eight military camps of security force were dismantled and five more made inoperative at Dadukchhari area from January 20. Five days before each round of talks these camps were made inoperative so that the PCJSS leadership can attend the talks on schedule.

The Bangladesh Observer
January 25, 1997
Crucial talks with PCJSS begin in city today
staff Correspondent

The crucial peace talks between the government and the Parbattya Chattagram Jano Sanghati Samity (PCJSS) political wing of Shanti Bahini, to end the 18-year-old insurgency in three hill districts will begin in Dhaka today (Saturday).

It will be the first meeting between the government and the PCJSS leaders in the capital city since the insurgency in the hill districts began about two decades ago.

When contacted, a high level government source expressed his optimism about reaching an agreement between the government and the PCJSS during the talks.

The National Committee on Chittagong Hill Tracts districts led by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah will represent the

government at the meeting while Shanti Bahini Supremo Jatindra Buddhipriya Larma alias Shantu Larma will lead his delegation.

The meeting in the capital city is a follow-up of two rounds of talks held at Khagrachhari Hill District town on December 21 and 24 last year between the two sides.

Leaders of the PCJSS will be flown to Dhaka from a boarder jungle hamlet Dadukchhari in Panchhari thana under Khagrachhari district by a military helicopter provided by the Government. The second-in command of the Shanti Bahini Rupayan Dewan, Gautum Kumar Chakma, Sudha Sindhu Khisa and Rakta Utpal Tripura are accompanying Shantu Larma, sources said.

They are expected to reach Dhaka around noon at the invitation of Prime Minister Sheikh Hasina who personally invited Shanti Bahini Leaders on January 7 to join the peace talks in the capital city. The Shanti Bahini accepted the invitation on January 18 and communicated the decision to the Government on January 19, via Hangsadhaj Chakma, a mediator between the Government and the PCJSS.

Earlier, all talks between the two sides were held at hill district town of Khagrachhari or in Panchhari thana under the district.

In the past 13 rounds of inconclusive peace talks were held. Of them, seven rounds were held during BNP government of Begum Khaleda Zia and six rounds during the period of Ershad Government. However, the ceasefire between the Government soldiers and the Shanti Bahini members was delcared in 1992 during the BNP government to pave the way for peace talks.

Meanwhile, the Government with drew security forces from eight camps and neutralised five others along the frontier region of Khagrachhari district near Panchhari to clean the way for crucial peace talks, official sources said.

The sources said that Shanti Bahini Supremo Shantu Larma had already arrived at Dadukchhari on Thursday with his entourage to prepare for Saturday's talk in Dhaka.

The groundwork for the crucial talks was made by Hangsadhaj Chakma, chief of the liaison committee that maintains liaison between the Government and the PCJSS.

A four-member delegation of the liaison committee comprising Biswajit Chakma, Kechang Marma, Shaktipada Tripura and Ashish Chakma are also likely to join the peace talks in Dhaka, the sources said adding that Hangsadhaj Chakma, the cheif of the liaison committe, might not be able to join the talks because of ill health.

The Bangladesh Observer
January 26, 1997
Govt-PCJSS talks progress
In cordial atmosphere
Staff Correspondent

The crucial peace talks between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) towards ending the two decade old tribal insurgency in three hill districs made some "satisfactory" progress in Dhaka on the first day on Saturday.

The marathon four-hour talks held at the state guest house Meghna were adjourned till 10 a.m. today (Sunday).

"We are making satisfactory progress in the talks held in an atmosphere of cordiality and understanding and we shall meet again at 10 a.m. today (Sunday) to resolve the issue in the interest of peace in the hill districts" said Chief Whip Abul Hasnat Abdullah who led the National Committee on CHT districts at a Press briefing after the talks.

Chairman of Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity and Chief of Shantibahini Joytiprio Bodhiprio Larma alias Shantu Larma who led the five-member team said "we are optimistic of an early solution. The sooner it will be done the better will be for all."

Scores of police guarded the state guest house Meghna when the talks between the Government and the Shanti Bahini leaders were held.

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah said they discussed all issues relating to peace in three hill districts. He did not specify the agenda of the talks. When asked whether the talks would be further extended after Sunday, he said it would depend on the outcome of Sunday's talks.

The Chief Whip led a 8-member government side while Shantu Larma led a five-member side in the talks.

The government side in the talks was represented by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, Engineer Mosharraf Hossain MP, Mayor of Chittagong City Corporation A.B.M. Mohiuddin Chowdhury, Dipankar Talukdar MP, Kalparanjan Chakma MP and Bir Bahadur MP. The five member PCJSS team included Jyotiprio Bodhiprio Larma, Rupayan Dewan, Goutam Chakma, Dr. Babul Chakma and Rakta Utpal Tripura. Dr. Babul replaced Sudha Sindhu Khisa who did not come to Dhaka with the team for reasons not known.

Abul Hasnat Abdullah said that two BNP members of Parliament Wahidul Alam and Amir Khasru Chowdhury who are on the National Committee on Chittagong Hill Districts regretted to join the talks while Jatiya Party MP Fazle Rabbi could not attend owing to illness.

The meeting sources said that the talks were being held on the basis of five-point demands put forward earlier by PCJSS, the political wing of Shanti Bahini. The demands are regional autonomy, pull out of the security forces from the hill districts, removal of settlers, proper rehabilitation of the Chakma refugees and reserved seats for tribals in Parliament.

Our Chittagong office reports, the PCJSS leaders were flown to Dhaka from Dadukchhari, a jungle hamlet in Panchhari thana of Khagrachhari district by an airforce helicopter. Mayor Mohiuddin Chowdhury and Divisional Commissioner of Chittagong Sakhawat Hossain Khan and Deputy Commissioner of Khagrachhari district Mohammad Ismail accompanied the PCJSS men in the helicopter. The helicopter first took off from Patenga, touched Khagrachhari district and then went to Dadukchhari to pick up the PCJSS key leaders including Shantu Larma.

UNB adds from Khagrachhari: Hundreds of tribal people, male and female, began thronging the frontier village of Dudukchhara since early in the morning to have a glimpse of their leaders, who operate from camps across the border in Tripura.

The tribal leaders, headed by Shantu Larma, reached the remote village at 10 am when Mayor of Chittagong Mohiuddin Chowdhury received them. Chittagong Divisional Commissioner Sakhawat Hossain Khan and DC of Khagrachhari

Mohammad Ismail were present.

On the occasion, more than 2,000 Shantibahini cadres in plain clothes reportedly came to Dudukchhari to see their leaders off to Dhaka. They will stay in the area till the return of the tribal leaders from talks in the capital.

The cadres of Shantibahini as well as the leaders, who have been staying outside the country for a long time, were seen exchanging greetings with their dear and near ones, comrades and sympathisers.

Thus the sleepy Dudukchhari village turned into a grand meeting place for the tribals who are eagerly awaiting a peaceful solution of the CHT problems from the Dhaka talks.

"We hope for a better solution when the talks have proceeded upto Dhaka from the Hill Tracts. We are very much optimistic about the current meeting between Bangladesh government and PCJSS leaders", a middle-aged tribal told UNB.

The Hill Tracts has been the scene of a prolonged insurgency which has claimed the lives of more than 20,000 people, including 500 troops, and driven 50,000 tribal refugees to camps in the eastern Indian state of Tripura since 1973.

A ceasefire announced by the guerillas in August 1992 is still holding with periodical renewal, while government leaders have continued dialogue with the Shantibahini's political wing for a peaceful settlement of the crisis.

The Shantibahini wants a constitutional guarantee for the CHT's autonomy and expulsion of all Bangalees settled there since 1979, demands which successive governments have found difficult to entertain.

The Bangladesh Observer
January 27, 1997
PM briefed on outcome of talks
Govt-PCJSS accord
On CHT likely today

The talks between the Government and the Parbattya Chhatagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) is heading to a positive conclusion and both sides are likely to reach an agreement today (Monday) towards ending the two-decade old insurgency in the three hill districts.

"The difference between the two sides to resolve the issues is gradually narrowing to reach an agreement" meeting source told the Bangladesh Observer on Sunday night.

The source requesting anonymity said that the Prime Minister Sheikh Hasina was briefed on the outcome of the talks between the Government and the PCJSS. The latest development of the talks was communicated to her by the leader of the National Committee on Chittagong Hill Tracts.

The Government and the PCJSS leaders will meet again at 10 a.m. today (Monday), the third day of the talks. It could not be known whether the talks would continue after Monday.

The government and the PCJSS leaders held a five-hour meeting split into two sessions on the second day of the talks on Sunday. The three day talks between the leaders of the National Committee on CHT and the PCJSS began in Dhaka on Saturday.

Mayor of Chittagong City Corporation A.B.M Mohiuddin Chowdhury who is also a member of the National Committee on Chittagong Hill Tracts told the journalists after the second day's talks on Sunday that both sides were earnestly trying to reach an agreement on the nagging problem of the trouble-torn hill districts. He said the meeting discussed both the five-point demand of PCJSS and the proposals of the government.

A meeting source said that the Sunday's talks figured three crucial demands of the tribals. The talks centred mainly on land distribution, issue of the settlers and the local government structure in the three hill districts.

The first round of talks on Sunday began at 10-15 a.m and continued till 12-30 p.m. The second round began at 2-30 p.m. and continued till 5-30 p.m.

UNB adds: About the possibility of PCJSS leaders meeting Prime Minister Sheikh Hasina, Mohiuddin Chowdhury said no decision had yet been taken in this regard.

Earlier, an official quoting the Chief Whip said there would be no press briefing on Sunday. But on repeated request from the waiting journalists, Mayor Mohiuddin and Engineer Mosharraf Hossain MP came up to the gate of State Guest House Meghna, the meeting venue, to talk to them.

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah is leading the government side while PCJSS Chairman Jyotirindra Bodipriya Larma alias Shantu Larma heading his four-member team at the talks, being held for the first time in Dhaka.

BSS adds from Rangamati: Rangamati Hill District Development Co Ordination Committee in a meeting on Sunday welcomed the on-going peace talks on Chittagong Hill Tracts.

Presided over by the Chairman of Rangamati Hill District Local Council Parishad Rabindra Lal Chakma the meeting thanked the government for holding the meeting with the PCJSS in Dhaka.

The meeting expressed the hope that the existing problems of the Chittagong Hill districts would be solved.

The Bangladesh Observer
January 28, 1997
Next meeting March 12
CHT peace talks fall
Short of final accord
Staff Correspondent

The peace talks between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), aimed at ending 20-year-old insurgency in the three hill districts of Chittagong, concluded inconclusively in Dhaka on Monday.

The three-day meeting could not reach the much-expected final agreement to resolve the Chittagong Hill Tracts (CHT) problem on Monday. But the two sides agreed to resume further talks on March 12.

The meeting led by Chief Whip of Parliament Abul Hasanat Abdullah, Convener of 11-member National Committee on CHT and Shantu Larma, leader of PCJSS (political wing of CHT insurgent group Shanti Bahani) made certain positive headway during the last three days. But the leaders of the two sides were tight-lipped about the outcome of their talks when they left the meeting place state guest house "Meghna" in the same car at the end of their three-day talks held within tight security cordon. They, however, waived cheerfully to the awaiting newsmen at the state guest house.

The PCJSS leaders flew back to their headquarters in the jungle of Dudukchhari in Panchhari thana under Khagrachhari hill district, near the Indian border, by an Air Force helicopter provided by the government.

Before leaving the state guest house Chief Whip Abul Hasanat Abdullah told newsmen that the two sides discussed all issues relating to CHT problems in a "friendly and cordial atmosphere" during the three-day "peace talks." PCJSS leader Jotindra Bodhiprio alias Shantu Larma who was standing beside the Chief Whip added "we have reached consensus on some points and we shall resume our talks in March." The two leaders did not say where they will meet on March 12.

Sources close to talks informed that on Monday the two sides discussed for two and a half hours from 11-30 a.m. to 1-55 p.m. The talks mainly centered on the points about land ownership,

withdrawal of Bengali (people from outside CHT) settlers and local government structure for the three tribal districts.

The sources added that the stumbling block on the way of clinching a final agreement was the issue of withdrawal of "Bengali" settlers from three hill districts Khagrachhari, Rangamati and Bandarban.

It was learnt that the PCJSS leaders took breathing time to go back to their sanctuaries to consult with their "comrades" about the outcome of the talks with the government.

The three-day "peace-talks" was held for the first time in the capital city between the government and PCJSS leaders at the invitation of Prime Minister Sheikh Hasina who gave priority to end the insurgency in CHT through dialogue. The earlier talks with the past governments were held at Khagrachhari district headquarters and at Panchhari thana headquarters.

In total 13 rounds of talks were held between the government and PCJSS leaders in the last 14 years of which seven rounds were held during the BNP government of Begum Khaleda Zia and six rounds under Jatiya Party regime of H.M. Ershad.

The three-day "peace talks" in Dhaka were the third round of meeting between the national committee on CHT and PCJSS leaders since the present Awami League government came to power on June 23 last year. The first and second rounds of talks were held in Khagrachhari district town on December 21 and December 24. The current talks between the two sides dwelt on the return of Chakma refugees from the Indian state of Tripura and their rehabilitation in their own homes, withdrawal of Army from CHT and overall development of the three hill districts for the welfare of the tribal people and others living there.

The summit meeting between Prime Minister Sheikh Hasina and her Indian counterpart H.D. Deve Gowda in Dhaka early this month agreed to root out cross-border insurgency including the activities of Shanti Bahini in CHT following the solution of the most irritating outstanding problem of the Ganges water sharing between the two countries through the historic 30-year water accord signed by them in New Delhi in December last year.

The Bangladesh Observer
January 28, 1997
Govt-PCJSS talks
Tribals wait
With bated Breath
Chittagong Office

CHITTAGONG, Jan. 27:-The life in the remote border hamlet Dauduckchhari of Panchhari thana under hill district Khagracchari now pulsates with the reunion of hundreds of tribal men, women and children from far and near.

The tribals, throbbed with joy, thronged there from all parts when Shanti Bahini insurgents are engaged in bush war. The venue turned out to be a place for sweet rendezvous of guerillas with their family members after a long isolation. And the village now wears a festive look.

Attired in their best outfits the tribals have now been roaming all over this tiny hamlet around which eight security camps were dismantled and five more made inoperative seven days ago. Many of them have taken accommodation in the houses of local tribals. They also thronged around the transistors to hear the outcome of talks between PCJSS and Bangladesh Govt.

The tribal villagers and hundreds of visitors are now eagerly waiting for the return of the five member PCJSS delegation from Dhaka. A warm welcome awaits the delegation members back at Duduckchhari.

However, optimism for peace now reigns high among the people in the battle-scarred Chittagong Hill Tracts. The people in CHT are found waiting with breath for the outcome of the peace talks in Dhaka. “We have every reason to be optimistic. We want an end to the bloodshed and hostility in CHT” said an influential tribal leader Charu Bikash Chakma at Rangamati.

The Bangladesh Observer
January 30, 1997
Call to resolve
CHT issue within
Constitutional Framework

Chittagong Hill Tracts National Coordination and Peace Council on Wednesday urged the government to resolve the CHT problems within the constitutional framework, reports UNB.

Presenting an 11-point proposal at a press conference at Jatiya Press Club, Council leaders emphasised the need for a fruitful dialogue between government and Jana Sanghati Samity for peaceful solution of the long-standing CHT crisis.

They proposed that the government delegate more power to the local government councils of the three hill districts and announce election schedule of the councils immediately.

The Council suggested establishment of civil and judge courts and introduction of land settlement and land survey in the CHT.

It demanded that its representative be included in the national committee on CHT.

Acting secretary general of the Council Talukder Shashikanti Chakma read out a written statement in the press conference. Its president Saiful Islam Dilder and other leaders were present.

The Bangladesh Observer
January 31, 1997
CHT issue
Tribal leaders for
Acceptance of
5-pt demand

Tribal leaders Thursday said nothign short of their five-point demand would be accepted in solution of the problems of the Chittagong Hill Tracts, reports UNB.

The demands, placed earlier by them, are: an autonomous Jum land comprising the three hill districts, withdrawal of security forces from the CHT, removal of non-tribal settlers from the region, proper rehabilitation of returnees and expansion of local government council power.

Pahari Gano Parishad, Pahari Chhatra Parishad and Hill Women's Federation held a joint rally in front of the Jatiya Press Club where they reiterated their demands.

It was addressed, among others, by Rabi Sankar, Kabita Chakma and Maung Shanu Marma.

They urged the government to resolve the problems within a couple of months failing which the tribals would be compelled to go for movement.

The tribal leaders also demanded end to what they said torture being perpetrated on members of their community.

The Bangladesh Observer
March 10, 1997
20-pt package of incentives announced

Repatriation of tribal refugees from Mar 28

Tribal refugees of Chittagong Hill Tracts (CHT) will start returning home from refugee camps in the Indian state of Tripura on March 28, reports UNB.

Some 5,000 refugees will be repatriated in the first batch, according to a joint declaration made by government committee and tribal leaders on Sunday.

The National Committee on Chittagong Hill Tracts led by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah and leaders of Parbatya Chattagram Jumma Sharanarthy Kalyan Samity (PCJSKS) reached a 20-point agreement to help arrange a safe return of tribal refugees to their homeland.

A copy of the agreement signed by Director General of Special Affairs Division ASM Mobaidul Islam and PCJSKS President Upendralal Chakma was faxed to UNB on Sunday night. According to the agreement, a joint task force will be constituted comprising the national committee members and tribal refugees to provide support in implementing the agreement and to monitor it.

A delegation of the refugee leaders will monitor the overall condition of the repatriated refugees and the situation in the CHT within one month of the repatriation. If the situation is found favourable the repatriation process will continue.

Earlier, a delegation of national committee visited in two phases the camps where tribal people were living and discussed issues and privileges to be provided by the Bangladesh government as confidence building measures.

Following are the 20 points of the agreement:

1. Security to life and property of every citizen of Bangladesh, including the tribals refugees would be ensure as per the constitution and law of the land.
2. Each of the repatriated refugee family will be provided with a total of Tk. 15,000 including Tk. 5,000 as per demand by the tribals in addition to earlier Tk. 10,000 as house building and agri grant. Besides, grants will be provided for funeral of the deceased members of the families enlisted by refugee leaders in the CHT.

3. Each of the repatriated refugee families will be given rice for nine months at the rate of five kg to every adult and 2.5 kg for every minor. Besides, four kg pulses, two kg soyabean oil and two kg salt will be given to every family for nine months.
4. Each repatriated refugees family will be given two bundles of CI sheets for construction of houses.
5. The refugee families who have cultivable lands will be given Tk 10,000 each to purchase a pair of bullocks after their return home. The refugees who are enjoying their ancestral lands, but failed to record in their own names will be given the facility after the collection of succession certificates from the headmen.
6. Each of the landless families will be given Tk 3,000 to purchase cow and steps will be taken to allocate land to those families as per government's policy.
7. The government decision to write off agri loans upto Tk 5,000 will be applicable for every refugee family.
8. Other dues like bank loans will be waived, subject to necessary scrutiny of the dues, after the return of all the tribal refugee families from India.
9. Loans given from the Chittagong Hill Tracts Development Board to the Bangladeshi tribal refugees now staying in India will also be written off.
10. The general amnesty announced by the government in the CHT region will remain in force. It will be applicable to every case of arrest warrant relating to emergency.
11. The lands owned by the repatriated refugees will be returned to them and religions places will be reinstated. The tribals will not be rehabilitated in the cluster villages.
12. The subject of reinstatement of the refugees who were in the government/semi-government jobs will be considered with sympathy after their return and steps will be taken for their reinstatement in their jobs on the basis of seniority and job facilities. Preference will be given to the tribals as underprivileged and backward population in the jobs.

[Incomplete]

The Bangladesh Observer
March 11, 1997
Agreement on
return of
tribal refugees

Following is the remaining part of the agreement signed between National Committee on Chittagong Hill Tracts and Parbatya Chattagram Jumma Sharanarthy Kalyan Samity (PCJSKS).

13. Steps will be taken to hold "special examination" under concerned boards for the students who have passed the SSC or HSC examinations in schools and colleges set up in refugee camps in Tripura.
14. Opportunities will be given to the students of the repatriated families for readmission to schools and colleges.
15. Each repatriated family will be provided with permit for necessary wood to construct a house in addition to two bundles of CI sheet as per previous decision.
16. Preference will be given to both male and female tribal youths on the basis of required qualifications in recruiting them to the posts of third and forth class jobs under Chittagong Hill Tracts Development Board and Local Government Councils for certain period.
17. Special consideration will be made to relax the age limit in the government jobs for the Bangladeshi refugees whose age expired during their stay in Tripura.
18. Steps will be taken to announce general amnesty to the tribal refugees who were convicted under criminal jurisdiction for sabotaging cases during the past governments.
19. The issue to withdraw camps in phases from the civil areas will be considered keeping consistency with the prevailing situation in CHT.
20. All the repatriated tribal headmen will be reinstated to their own posts.

The Bangladesh Observer
March 12, 1997
CHT peace talks
in city today
Staff Correspondent

CHITTAGONG, Mar. 11: Much awaited fourth round of peace talks between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), mentor of the Shanti Bahini will take place in the capital Dhaka tomorrow (Wednesday).

This is for the second time, the PCJSS top brass will be in the capital for talks with the high powered National Committee in quest of lasting peace in the battle-soared Chittagong Hill Tracts (CHT).

Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah and the PCJSS supreme leader Jatindra BuddhiPriya Larma alias Shantu Larma will lead the respective side at the talks.

The five-member PCJSS team comprising Shantu Larma, Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma alias Ashoke, Rakta Utpal Tripura and Shudha Sindhu Khisha has already arrived at border hamlet Daduckchhari of Panchhari thana to avail the helicopter sortie to Dhaka for tomorrow's talks.

The progress made in the last three rounds of talks and the aftermath breakthrough in the lingering issue of repatriation of 50,000 tribal refugees from the Indian state of Tripura has made all reasons to be optimistic about a comprehensive solution to the problems. In that backdrop, the fourth round of peace talks is sure going to be a crucial one for both sides.

Both the Government and the PCJSS now expect to get to business straight on this serious subject to hammer out a lasting peace in the 22-year-old insurgency in CHT. It seems that things are moving on quite satisfactorily except the blemish of two unpleasant incidents at Bandarban on February 15 in which three police men and a soldier were gunned down by unidentified radical tribesmen.

The peace talks are going to take place right on schedule date after lapse of 45 days since the third round of peace talks on January 24. The National Committee this time has enough home work to encounter the arguments of the PCJSS team members in support of their five-point charter encompassing 49-point demand

for a solution to the problems. The fourth round of talks will deal with the follow-up matters of third round of peace talks also held in Dhaka.

The Bangladesh Observer
March 13, 1997
Rehabilitation of tribal refugees ordered
Bengalee settlers won't be
Relocated from CHT: PM

CHITTAGONG, Mar. 12:-Prime Minister Sheikh Hasina Wednesday said the Bengalee settlers would not be relocated from the hill districts and ordered investigation into a reported move by an organisation to create confusion among them, reports UNB.

"Take action against any provocative attempt", she told officials at a meeting, adding "We are not going to touch the Bengalee people who have settled there."

The Prime Minister made it clear that "a citizen can stay and move to any parts of this country at his will.'"

"We will neither force anyone to stay there nor ask anyone to leave any place," Hasina said and also directed the concerned authorities to take proper care and steps for the repatriation and rehabiliation of Chakma refugees, beginning March 28.

"Soon after formation of the government, we started efforts to resolve the decades old problem of the Chittagong Hill Tracts," she told the meeting and directed the officials of civil, military and police administrations to give special attention to the repatriation and rehabilitation of the refugees.

She was taking stock of the law- and-order situation of different districts of Chittagong division, specially of the three districts of Chittagong Hill Tracts, at the division Headquarters of Chittagong Cantonment.

"Don't neglect your responsibility... image of all, including the army and civil administrations, are related with the task," she said.

Return of all others who left their homeland depends on the proper rehabilitation of the 5,000 refugees coming on March 28, she cautioned.

Hasina noted that vested quarters, including a section of newspapers, were creating confusion and trying to mislead the people and calld upon the authorities concerned to remain alert about it.

Her directives came at a time when the government is holding talks with the tribal leaders in the capital for a political solution of the CHT problem.

The law-and-order situation in Chittagong was not hopeful, Hasina noted and asked the civil and police administrations to take proper steps to improve the situation.

Referring to another serious crisis, power, Hasina directed the officials to motivate people. She appealed for austerity in this crisis period.

The prime Minister reiterated that political stability in the country is a must for development. Investment and production is dependent on political stability, she added.

"Economic condition of the people very poor," she said and called is upon all to put in united efforts to change the lot of common people.

"Bangladesh has every potential... what we only need is a collective and united effort to build a happy and prosperous country."

Sheikh Hasina said since takeover, the government had been trying to solve all the age-old outstanding problems. She cited the Ganges water treaty with India and steps to solve the Chittagong Hill Tracts problems.

Earlier, Commissioner of Chittagong Division, Commissioner of Chittagong Metropolitan Police and deputy Commissioners and police supers of Rangamati, Bandarban and Khagrachhari apprised the prime Minister of the law-and-order situation of their respective areas.

The Bangladesh Observer
March 13, 1997
4th round of
CHT peace
Talks begin

The fourth round of peace talks between the government and the 'Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS)' began in Dhaka on Wednesday reports BSS.

"The talks began at the state guest house Meghna in a warm and cordial atmosphere," Mashiur Rahman, Director of the Special Affairs Division, told the newsmen, waiting outside the state guest house in the evening.

When asked, Mr Rahman said the talks, which began Wednesday afternoon, would continue.

The convener of the National Committee on Chittagong Hill Tracts and Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdullah is leading the government side while PCJSS team is being led by Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Santu Larma.

The Bangladesh Observer
March 14, 1997
Next meeting Apr 30
CHT peace talks
End without accord
Staff Correspondent

The talks between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) to end the two-decade old hostility in Chittagong Hill Tracts region ended inconclusively on Thursday.

The negotiators from the both sides virtually failed to strike a much expected final peace deal at the third round of talks held at Meghna State Guest House in the capital on Thursday.

But both sides on Thursday agreed to hold further talks on April 30 and to extend the duration of ceasefire up to June 30.

This was the third round of talks between the present Government and PCJSS, the political wing of Shanti Bahini. The first round of talks was held at Khagrachhari in December last year and the second round was held in Dhaka in January this year.

After the eight-hour long talks, the head of National Committee on CHT and Chief Whip Abul Hasanat Abdullah told waiting journalists "talks are held in a very cordial atmosphere. We have reached consensus at the talks. We have agreed to hold next meeting on April 30. We have also agreed to extend the duration of ceasefire up to June 30".

The main leader of the PCJSS Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma who was standing beside the Chief Whip Abul Hasanat Abdullah said: "The statement of the Chief Whip Abdul Hasanat Abdullah is also the statement of ours".

Both the Government and PCJSS leaders did not elaborate on the progress of the talks despite repeated queries from the waiting journalists.

Besides Abul Hasanat Abdullah, the other members of the National Committee on CHT including Mayor of Chittagong City

Corporation ABM Mohiuddin Chowdhury, Engineer Mosharraf Hossain, MP, Kalparanjan Chakma, MP, Dipankar Talukder, MP, Bir Bahadur, MP and Awami League leader Ataur Rahman Kaiser were present at the talks. The PCJSS was represented at the two-day talks by Shantu Larma, Goutam Chakma, Shudha Sindhu Khisa and Roktautpal Tripura among others.

The five-point demand submitted at first round of talks with the present Government in December included constitutional guarantee for tribal people, formation of regional council for greater autonomy, strengthening of Local Government authorities, withdrawal of security forces from the Hill Tracts region and withdrawal of Bangalee settlers.

The Bangladesh Observer
March 28, 1997
Repatriation of Chakma refugees begins today
Chittagong Office

CHITTAGONG, Mar 27:–A total of 6,700 tribal refugees will return home in Chittagong Hill Tracts (CHT) from camps in India in the first batch of repatriation begin tomorrow (Friday).

The refugees are scheduled to return through two border points–Ramgarh and Tabalchhari under hill district Khagrachhari. All arrangements have been finalised for the repatriation of Bangladeshi Chakma refugees languishing in six different camps over past ten years.

The Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail held a joint meeting of the TNO's of eight thanas of the district at his office on March 22 in preparations for conducting the repatriation smoothly.

The home-coming people will be received by the Chief Whip of Parliament and the National Committee Convener Abul Hasnst Abdullah. The other members of the National Committee and concerned officials will also remain present.

A six-member Indian team last Tuesday visited Khagrachhari to see for themselves the arrangements for the repatriation of the refugees. The Indian officials visited transit points at Ramgarh and Tabalchhari and reception camps. They also had been to the village in Dighinala and Panchhari where refugees who returned in 1994 had been settled.

The final decisions for repatriation were taken at Deputy Commissioner level meetings of the two countries at Amarpur in the Indian state of Tripura on March 19 and 20. The decisions were taken in light of a package deal with the Refugee Welfare Association and the Dhaka talks with Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) leaders.

As per the decision, the 6,700 refugees out of total 49,812 are scheduled to return home in Chittagong through Ramgarh thana ghat transit point on March 28, 29 and 30 while through Tabalchhari transit point on April 1 and 7.

The remaining 43,112 will return in phases till April 7, according to an official announcement.

The National Committee members led by its Chief Abul Hasnat Abdullah on Monday visited the refugee reception camps at Ramgarh and Tabalchhari to see for himself the arrangements in connection with the repatriation.

In 1994, a test repatriation of 5,000 refugees from the Indian state of Tripura in two phases took place under a bilateral understanding between the two previous governments Begum Khaleda Zia of Bangladesh and PV Narasimha Rao of India

The Bangladesh Observer
April 26, 1997
Permanent solution to CHT problems urged
Call to ensure equal rights of all citizens

Speakers at a conference in Dhaka on Friday called upon the concerned authorities to resolve the problems in Chittagong Hill Tracts in the light of the constitution and to ensure the rights of all citizens living there, reports BSS.

The day-long conference styled as "National Conference on Chittagong Hill Tracts" was held at the Institution of Engineers. It was chaired by Ferdous Ahmed Qureshi, Convener of the conference and a central leader of BNP. Former Secretary General of the BNP Barrister Abdus Salam Talukder, Secretary General of Jamaat-e-Islami Bangladesh Moulana Motiur Rahman Nizami, President of Democratic League Oli Ahad, Secretary General of Bangladesh Khelafat Majlish MA Matin and President of Jatiya Ganotantrik Party (JAGPA) Safiul Alam Prodhan spoke at the opening session.

BNP Standing Committee member Barrister Abdus Salam Talukder said his party was in favour of the resolution of the long standing problem of the hill tracts, but that has to be done on the basis of neutral attitude towards tribals and non-tribals.

He said since Chittagong Hill Tracts is an integral part of Bangladesh, non-tribals cannot be pushed out of that area. He warned that any move to expel Bangalees from Chittagong Hill Tracts will be resisted.

He alleged that a neighbouring country has a sinister move involving Chittagong Hill Tracts and asked all to guard against the ill motive.

UNB adds: Barrister Salam Talukder said there was no scope to continue talks with terrorist Shantu Larma on their 5-point demand that had now been going on between the government and the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

He said, "There is a plot behind the talks to destroy our independence and sovereignty. If that is implemented an anarchic situation will engulf the country."

"A modern state believes in equal rights of every citizen and works to ensure those", the BNP leader observed. "It does not allow special rights to people living in a particular area as the Shantibahini is demanding", he said.

Jamant Secretary General Maulana Matiur Rahman Nizami said the CHT crisis was created due to the "aggressive policy" of neighbouring India. "Those unleashing a reign of terror in the name of Shantibahini want to cripple the country", he added.

Demanding withdrawal of ceasefire, Nizami said the talks were nothing but procrastination for destroying the country's independence and sovereignty. The Jamaat leader alleged that security forces were being pressurised not to arrest the terrorists in the CHT.

Democratic League leader Oli Ahad proposed to hold a meeting between Prime Minister Sheikh Hasina and Opposition Leader Begum Khaleda Zia to find out a solution to the problem that dates back to 1963.

"The country has a constitution, a Parliament. The issue should be addressed properly in Parliament for reaching a consensus to resolve it", he said emphasising on understanding and dialogue.

Oli Ahad, however, said neither the army nor the Bangalees could be evacuated from the land-one-tenth of the country's 55,598

square miles area-with potential for tourism and believed to be rich in mineral resources.

In a strongly-worded speech, In a JAGPA Chief Shafiul Alam Prodhan said, “We don't want to see terrorist Shantu Larma in the State Guest House, instead of on the gallows”.

He called upon the participants at the conference to launch a tough action programme against what he said the conspiracy to destroy country's interest in the name of dialogue between the government and the PCJSS.

Prodhan also proposed to call a hartal in the three hill districts and to paralyse the capital city when the PCJSS meets the National Committee on CHT in Dhaka on May 11.

An eight-point charter of demands, which was to be submitted to the President by “All-Party Coordination Council in CHT”, include keeping in tact the status of a unitary state, total scrapping of the Hill Tracts Manual of 1900, equal rights of all citizens to the hill lands, proportionate representation in local government councils and involving all parties in the peace process.

The Bangladesh Observer
May 10, 1997
Talks on May 11
PCJSS leaders
In Khagrachhari

KHAGRACHHARI, May 9: PCJSS leaders arrived here today Friday to attend the peace-talk on CHT issue to be held in Dhaka from May 11 (Sunday), reports UNB.

The tribal leaders have reached the bordering Dudukchhari area here with the withdrawal of security forces from 13 camps under an understanding between Parbatya Chattagram Janashanghati Samity (PCJSS) and National Committee on CHT issue.

A five-member delegation of PCJSS, led by its chairman Joytirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma, will be taken to Dhaka from here by a helicopter on Sunday morning.

Meanwhile, Parbatya Oikya Parishad has called a dawn-to-dusk hartal in the three hill districts on May 11 demanding inclusion of their representative in the dialogue.

The Bangladesh Observer
May 12, 1997
Govt-PCJSS talks begin
Solution can’t be achieved
overnight: Hasnat

Peace talks between the government and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) began in Dhaka on Sunday afternoon amidst tight security, reports UNB.

This is the fourth round of peace talks aimed at working out a formula to bring about durable peace in the trouble-torn hill districts after the present Government took over last June.

“There has been a lot of progress in the talks...dialogue is going on smoothly,” Chief Whip Abul Hasnat Abdullah told waiting newsmen at the main gate of state guest house Padma where the meeting was held.

He, however, said that solution of such a critical national issue could not be achieved overnight.

Abdullah, who led the government team as the Convener of the National Committee on Chittagong Hill Tracts, said the four-hour deliberation had covered all aspects of demands of the PCJSS.

The talks will resume at 10 a.m. today (Monday), he said.

Abdullah told a questioner that the present negotiation with the tribal leaders is the continuation of the peace process initiated by the previous regimes.

He regretted that BNP members of the national committee did not turn up at the current talks while Awami League representatives had attended such meeting in the past.

Replying to a question, he described the hartal enforced by the opposition in the hill districts on Sunday as an attempt to foil the peace process.

PCJSS President Jyotirindra Bodhipriya Larma known as Santhu Larma led the PCJSS delegation at the talks. The delegation included Goutam Kumar Chakma, Shudha Shindhu Khisa and Rakta Utpal Tripura.

They were flown into the city from Dudukchara, a frontier village of Khagrachhari, earlier in the day.

The government delegation included Chittagong city mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Awami League leader Ataur

Rahman Khan Kaiser, Kalpa Ranjan Chakma MP, Dipankar Talukder MP, Bir Bahadur MP, Engineer Mosharraf Hossain MP, Advocate Fazle Rabbi MP and Former Divisional Commissioner of Chittagong Ali Haider Khan and Secretary of Special Affairs Division Kazi Golam Rahman.

The Bangladesh Observer
May 13, 1997
CHT talks
Progress satisfactory, says Hasnat

Peace talks between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samiti PCJSS continued for the second consecutive day in Dhaka on Monday reports UNB.

"Today's talks is the continuity of Sunday's meeting. The progress satisfactory," government delegation Leader Chief Whip Abul Hasnat Abdullah told newsman Monday night after five hours of deliberations at the State Guest House Padma.

Abdullah, Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts, expressed optimism about a positive outcome of the peace talks and said the talks will continue today (Tuesday).

Talking to newsmen, Shantu Larma, Leader of the PCJSS said, also echoed the sentiment of the Government side.

This is the fourth round of peace talks initiated by the present government to bring about a durable peace in the trouble torn hill region.

The Government delegation at the talks included Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Awami League leader Ataur Rahman Khan Kaiser, Kalpa Ranjan Chakma MP, Dipankar Talukdar MP, Bir Bahadur MP, Engineer Mosharaf Hossain MP, Advocate Fazle Rabbi MP, former Divisional Commissioner of Chittagong Ali Haider Khan and Secretary of Special Affairs Division Kazi Golam Rahman.

The PCJSS delegation, led by its President Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma, Included Goutam Kumar Chakma, Sudhasindhu Khisa and Raktotpol Tripura.

Kalparanjan made Task Force chief

Kalparanjan Chakma, MP elected from Khagrachhari Hill District has been appointed Chairman of the Task Force on monitoring and implementing the government announced package incentive for the tribal refugees, reports UNB.

During his tenure as Chairman of the Task Force, Kalparanjan will enjoy the status and facilities of a State Minister, said an official handout on Monday.

The Bangladesh Observer
May 14, 1997
CHT talks continue

The peace talks in Dhaka between the government and leader of tribal insurgents continued for the third consecutive day Tuesday, reports UNB.

No official briefing was held on Tuesday's deliberation, but one source indicated that the talks would continue till Thursday.

The National Committee on Chittagong Hill Tracts began the talks with the Parbatya Chhattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political umbrella of Shanti Bahini, on Sunday to devise a peace formula.

The meeting during its eight-hour deliberation on Sunday-Monday had covered all aspects of the five-point demand of PCJSS.

Details of the proceedings or specific agenda of the meeting were not available, but the source said the government has offered a formula to bring about a lasting solution to the long-running problems in CHT within constitutional framework.

The PCJSS leaders were learnt to be examining the formula in the light of their demand for due status for the tribals and preservation of their district culture and tradition.

National Committee Chairman Chief Whip Abul Hasnat Abdullah is leading the government delegation. The PCJSS team is headed by Santu Larma.

The Bangladesh Observer
May 15, 1997
Govt-PCJSS talks end
Agreement soon

National committee on Chittagong Hill Tracts and Parbattya Chattagram Janashanghati Samity (PCJSS) will sign an agreement "very soon" as the two parties agreed on "all matters," reports BSS.

This was disclosed by the chairman of the National Committee and Chief Whip Abul Hasnat Abdullah at a Press briefing after the fourth day talks on Wednesday PCJSS leader Jotirindra Bodhipriya alias Shantu Larma was present during the Press briefing.

In a written statement Abul Hasnat Abdullah said, "we have agreed on all matters, and an agreement will be signed very soon."

However, he did not mention the "matters" they agreed on.

The fourth round of peace talks between the national committee and PCJSS began on Sunday at the State Guest House Padma. The talks concluded on Wednesday "fruitfully", the Chief Whip said.

The government side was led by Abul Hasnat Abdullah while the PCJSS was led by Shantu Larma.

The other leaders of PCJSS who joined the talks included Goutam Kumar Chakma, Sudha Sindhu Khisa, Rakta Utpal Tripura and Upendra Lal Chakma.

The national committee team included Chittagong city mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Awami League leader Ataur Rahman Khan Kaiser, Kalpa Ranjan Chakma MP, Dipankar Talukder MP, Advocate Fazle Rabbi MP, Engineer Mosharraf Hossain MP and Bir Bahadur MP.

The talks were held on five-point demand on different issues including land settlement Bengali settlers and Chittagong Hill Tracts local government councils.

The Bangladesh Observer
May 16, 1997
5-day talks end
Accord with PCJSS
Likely by June 30

Leaders of tribal insurgents left Dhaka on Thursday for Khagrachari, ending five-day talks with the Government during which the two sides agreed to strike a peace deal, reports UNB.

The fourth round of talks between the National Committee on Chittagong Hill Tracts and the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) that began May 11, made a major breakthrough as they agreed on Wednesday to sign a peace accord very soon to end the insurgency and establish peace in the hills.

The CHT has been the scene of a 23-year-long insurgency which has claimed the lives of some 20,000 people, including 500 troops, and driven 50,000 tribals into refugee camps in Tripura.

Neither the government nor the PCJSS disclosed when the peace deal would be signed.

But before leaving Dhaka PCJSS Chairman Jyotirindryo Bodhipriyo Larma alias Shantu Larma told news men that it will be set through discussion between the two sides.

An official source, however, said that the agreement was expected to be signed by June 30. The two sides met for a brief period for the fifth consecutive day on Thursday.

The tribal leaders, who stayed and held the talks at State Guest House Padma, left for Tejgaon helipad at 2 p.m. They were flown back to Dudukchari in Khagrachari by an Air Force Helicopter.

Larma told waiting newsmen at the gate of the Padma Guest House that they would come to Dhaka again to sign the peace deal after consultation between the two sides.

Replying to a question, he said, "We'll meet the Prime Minister when there is any necessity."

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah who was accompanying him in a car preferred to keep mum.

This was the fourth round of dialogue between the present government and the PCJSS, the third having been held here March 12-13. It was scheduled for March 30, but was later deferred to May 11.

During the talks, Shantu Larma was assisted by Goutam Chakma, Rupayan Dewan, Sudhasindhu Khisha and Raktotpal Tripura.

The Bangladesh Observer
July 14, 1997
Talks with PCJSS today
Chittagong Office

CHITTAGONG, July 13:-The much awaited sixth round of peace talks between the Awami League government and Parbattya Chhatagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), an apex body of the tribal insurgents, will take place at a state guest house in Dhaka tomorrow (July 14).

The PCJSS delegation for the fourth time will sit for the peace talks with the government's National Committee in the capital. The

first two rounds of talks were held at hill district headquarters at Khagrachhari on December 21 and 24 last year. The next three rounds of talks were held in Dhaka after the Awami League came to power. With the present one, there were in total … round of peace talks.

During the previous BNP rule, the PCJSS and the Security Forces in Chittagong Hill Tracts in order to create a situation conducive to the peace talks. The ceasefire will expire on September 30.

In the talks, the government side will be headed by the Chief Whip of Parliament Abul Hasnat Abdulla. Apart from the Chief Whip, the National Committee will comprise Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, three CHT Parliament Members-Kalpa Ranjan Chakma, Dipanker Talukder and Bir Bahadur, Awami League central leader Ataur Rahman Khan Kaiser, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, a BNP MP, Syed Wahidul Alam, MP of BNP and Advocate Fazle Rabbi, MP, of Jatiya Party. As in the past fifth round of peace talks, two BNP MPs are likely to abstain from the talks.

The PCJSS team will include its chief Jatindra Boddhipriya Larma alias Shantu Larma, Central Committee members Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma alias Ashok, Rakta Utpal Tripura and Shuda Sindhu Khisha. The liaison committee members will also remain present during the talks.

The Bangladesh Observer
July 15, 1997
CHT peace
talks begin

The fifth round of peace talks between the government and tribal leaders began in Dhaka on Monday aiming to hammer out a deal for ending insurgency in the Chittagong Hill Tracts, reports UNB.

Government side is being led by Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Chief Whip Abul Hasnat Abdullah while PCJSS leader Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma is heading a Parbatya Chattagram Jana Sangha ti Samity delegation.

Committee members Kalparanjan Chakma MP, Dipanker Talukder MP, engineer Mosharaf Hossain MP, advocate Fazle

Rabbi MP, Awami League leader Ataur Rahman Khan Kaiser, former Divisional Commissioner of Chittagong Ali Haider Khan and SS Chakma are attending the meeting at state guest house Padma.

The tribal side is represented by PCJSS leaders Rupayan Dewan, Goutom Kumar Chakma, Sudha Sindhu Khisa and Rakta Utpol Tripura.

Also present at the talks are Special Affairs Division Secretary Kazi Golam Rahman and Deputy Commissioner of Khagrachari Ismail Hossain.

The parley began at 3 p.m. amidst tight security in a "cordial and friendly atmosphere" and continued in the evening.

After Monday meeting, Director of the Special Affairs Division Matiur Rahman told waiting news men that the talks would resume this (Tuesday) morning.

He expressed his inability to speak anything on the proceedings of the five-hour deliberation in camera.

Earlier, Santu Larma, the chief of PCJSS, the political umbrella of the Shantibahini, and his colleagues were flown in the capital by helicopter from Dudukchhari, a frontier village of Khagrachhari hill district.

The Bangladesh Observer
July 16, 1997
Govt-PCJSS
talks heading
towards accord
Staff Correspondent

The fifth round of peace talks between the Government and Parbattya Chattragram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the apex body of the tribal insurgents, are now heading towards signing of an accord on the second day on Tuesday.

The parley began at 11 a.m. at State Guest House Padma amidst tight security and continued till 2-15 p.m. Later the talks started at 6 p.m. and continued till late night.

The Government's national committee on Chittagong Hill Tracts headed by its convenor and Parliament's Chief Whip Abul Hasanat Abdullah is represented by the committee members KalpaRanjan Chakma, MP, Dipanker Talukder, MP, Engr. Mosharraf Hossain, MP,

Mayor of Chittagong City Corporation Al-Haj A.B.M. Mohiuddin Chowdhury, Advocate Fazle Rabbi, MP, Awami League leader Ataur Rahman Khan Kaiser, former Divisional Commissioner Chittagong, Ali Haider Khan, Divisional Commissioner of Chittagong Division Shakhawat Hossain.

The PCJSS team led by its chief Jatindra Boddhi Priya Larma alias Shantu Larma is represented by the Central Committee Members Rupayan Dewan, Goutam Kumar Chakma, Sudha Sindhu Khisa and Rakta Utpal Tripura.

The convenor of National Committee on Chittagong Hill Tracts Abul Hasanat Abdullah told the waiting newsmen that the process of signing of a formal peace accord was progressing. However, he expressed his inability to say anything about the proceedings.

When enquired about the welfare of Mr. Shantu Larma by a journalist, Mr. Larma replied “I am bit sick”. The talks would resume today (Wednesday).

The Bangladesh Observer
July 17, 1997
PCJSS puts
some new
proposals
Staff Correspondent

The fifth round of peace talks between the National Committee on Chittagong Hill Tracts and the leaders of Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCISS) which began on Monday, continued for the third consecutive day at the State Guest House Padma on Wednesday.

The talks started at 10-30 a.m. and continued till 2 p.m. Later the talks began at 4 p.m. and continued till 7-30 p.m. but without any positive outcome of formulating a draft peace agreement to end the long-standing insurgency in the Chittagong Hill Tracts.

The convenor of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Abul Hasnat Abdullah led the Government side while Mr. Jatindra Bodhi Priya Larma popularly known as "Shantu Larma" led the PCJSS side.

UNB adds: The current negotiation, which began here Monday, is likely to end today (Thursday). The PCJSS leaders will fly back to their destinations.

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah who is leading the government side at the talks left the meeting venue, state guest house Padma, at 7-30 pm without giving any briefing to the waiting newsmen.

Wednesday's meeting, split into two sessions, had a threadbare discussion on some fresh proposals, submitted by PCJSS, the political umbrella of the Shantibahini, informed sources said.

The sources said the tribal insurgent leaders, participating in the talks, put up some new proposals on the constitution and function of the planned regional council, its jurisdiction, disposal of lands and security of Shantibahini activists.

The negotiation is slowly progressing as the meeting is examining all dimensions of the problem point by point, the sources added.

At the talks, Shantu Larma is being assisted by other PCJSS leaders-Rupayan Dewan, Goutam Kumar Chakma, Sudha Sindhu Khisa and Rakta Utpal Tripura.

This is the fifth round of talks of its kind under the present regime in a move to establish durable peace in the insurgency-hit hill districts.

The two sides are making sincere efforts towards working out a formula under the constitutional framework to resolve the two decade-old problem, the sources said.

The Bangladesh Observer
July 18, 1997
Talks with PCJSS
end without accord?
Staff Correspondent

The fifth round of peace talks between the government's National committee on Chittagong Hill Tracts and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) continued at the State Guest House at Padma for the fourth consecutive day on Thursday.

The talks started in the morning continued till late night on the day with two hours' recess. However, it was presumed that both sides could not reach any consensus in drafting a peace accord to end the insurgency in Chittagong Hill Tracts (CHT).

It was earlier informed in a Press briefing on Tuesday that a process for formulating a draft peace accord was underway. It was

not clear whether the talks will continue further or have concluded on Thursday.

However, a government source said that the PCJSS members will leave Dhaka on Friday by a government helicopter for Dudukchari, a bordering area of Khagrachari district. The members of PCJSS were earlier flown to Dhaka by a government helicopter for the fifth round of peace talks.

The convenor of the National Committee on Chittagong Hill Tracts and Chief Whip in Parliament Abul Hasanat Abdullah led the government side while Jatindra Bodhi Priya Larma alias Shantu Larma led the PCJSS side.

A large number of journalists waited at the main gates of Padma and Meghna state guest houses till 10 p.m. on Thursday for briefing.

The Bangladesh Observer
July 20, 1997
CHT talks end
no accord yet
Staff Correspondent

The fifth round of talks between the members of the Government's National Committee of Chittagong Hill Tracts (CHT) and leaders of Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political front of armed Shanti Bahini guerillas ended on Saturday without any positive outcome in formulating a draft peace accord to end the insurgency in the hill tracts.

The talks began at the state guest house Padma on last Monday between the two sides after last May's talks where they (both sides) reached a consensus and hoped to draft a final peace agreement to end the armed conflicts in CHT in the fifth round of talks.

However, the convenor of the National Committee on CHT and Chief Whip Abul Hasanat Abdullah told the waiting newsmen on Saturday morning that the process to prepare a draft peace accord was satisfactory.

Mr. Abdullah further informed the newsmen that the date for the next round of talks would be fixed through future discussion.

When asked his comment about the proceedings and outcome of the fifth round of peace talks, the PCJSS leader Jyotirindra

Bodhi Priya Larma popularly known as Shantu Larma told the journalists, “At the moment, I have nothing to say”.

While replying to the journalists with this single sentence Mr. Larma was looking a little bit pale and straight got into the car for Tejgaon Airport to fly back to Dudukchhari by Army helicopter a bordering village of Khagrachhari hill district.

On Friday night, Kalpa Ranjan Chakma, the MP from Khagrachhari district, who joined the talks from the government side, told UNB, “We are very close to an agreement.” But he did not elaborate.

During the talks, Chief Whip Abul Hasanat was assisted by Awami League leader Ataur Rahman Khan Kaiser and Kalpa Ranjan Chakma MP, while Santu Larma was reportedly aided by Goutam Chakma and Rupayan Dewan.

The Bangladesh Observer
July 20, 1997
Shantu urges
compatriots to
have patience

PANCHHARI, July 19:-After a six-day peace mission in the capital, Shantibahini supreme Shantu Larma flew back to the hill tracts and disappeared into deep forest much the same in legendary Robin Hood style, reports UNB.

Amidst tight security built by the tribal guerillas, Larma landed on the hilltop helipad at the frontier village Dudukchhari at about 11.15 a.m. waving to his comrades at arms and waiting hill people.

Tribesmen and women gathered at the helipad waved hands to greet their leader and he reciprocated.

At around 12 noon, before going back into his jungle hideout. Jyotindra Bodhipriya Larma known as Shantu Larma, chief of the Prabatya Chattagram Jana Sanghati Samity, the political front to Shantibahini, talked briefly with waiting tribals in the deep forest.

In his tribal dialect, the PCJSS leader was learnt to have told the tribals that the talks with the government continued and “there is nothing to worry about.”

He reportedly said the government is sincere in resolving the Chittagong Hill Tracts problems.

A tribal who was present there told UNB on condition of anonymity that Shantu asked his compatriots to "have patience and not to be misled."

He sought cooperation from all in reaching an acceptable solution to the problem. He stopped short of elaborating on the six-day peace talks in Dhaka with the government.

Members of the Parbatya Chattagram Liaison Committee-Mathura Lal Chakma and Mohammad Shafi -were also present at Dudukchhari helipad to welcome Shantu Larma and his aides who flew back from Dhaka by an army helicopter.

Members of the National Committee on CHT-Eng Mosharraf Hossain MP and Khagrachhari DC Mohammad Ismail accompanied the PCJSS in the copter which took off from Tejgaon Airport at 9.53 a.m.

Liaison Committee member Biswajit Chakma who returned from the Dhaka talks said the negotiation made a little progress. "The points of agreement about the five-point demand of the PCISS were noted down," he said.

At Khagrachhari, Convenor of the Liaison Committee Hangsadhaja Chakma in his reaction said the problem must be solved if the government be sincere.

"I want a quick, durable solution to the CHT problem," he said.

The Bangladesh Observer
September 14, 1997
6th round of CHT
Peace talks today
Chittagong Office

CHITTAGONG, Sept 13:- The sixth round of peace talks between the present Awami League Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), an apex body of the tribal insurgents will take place at a state guest house in Dhaka tomorrow (September 14).

The PCJSS delegation for the fifth time will sit for the peace talks with the Government's National Committee in Dhaka. The first round of peace talks between PCJSS and the National Committee held at hill district headquarter Khagrachhari in two phases on December 20 and December 22 last year. But the next three rounds of talks were held in Dhaka. With the present round, there will in all .. round of peace talks.

During the previous BNP Government, the PCJSS held talks seven times with the National Committee and six times with its subcommittee. Likewise, six rounds of peace talks were held between the Government and PCJSS during Ershad regime.

The 6-day fifth round of peace talks between the two sides were held from July 14 to 19. The present sixth round of talks are fixed in a recent letter sent to the National Committee on Chittagong Hill Tracts by the Director of the Publicity Wing of the PCJSS Ushatan Talukder through Liaison Committee Chairman Hangshadhaj Chakma. The Government too has given concurrence to the holding of talks on this date. The PCJSS originally proposed September 7 as the date for holding of sixth round of peace talks.

There is now a ceasefire between Shanti Bahini insurgents, armed cadre of the PCJSS and the Security Force in Chittagong Hill Tracts in order to create a conducive situation for the peace talks. The present phase of ceasefire between the two sides will expire on September 30.

The Bangladesh Observer
September 15, 1997
CHT Talks begin
Shantu Larma likely to meet PM

The sixth round of talks between the Government and the Parbatya Chattagram Janasanghati Samity (PCJSS), the political wing of the armed Shanti Bahini, began at the state guest house "Padma" on Sunday afternoon.

The outcome of Sunday's parleys could not be known as both sides remained tight-lipped and there was no press briefing for journalists who waited on the streets outside the guest house for about five hours.

However, one source who did not attend the talks but was involved in the process for long said that there was no possibility of reaching the final accord in the sixth round. He said that sixth round of meeting would try to settle some unresolved issues like land dispute and settlers' status.

Sunday's talks began at about 2:30 pm and lasted till 6:30 pm, one source said. He said that besides, a formal talks, there was another exclusive meeting of three from each side.

The talks will resume this (Monday) morning at the same venue, the source said. The talks are likely to continue till September 18.

Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Chief Whip Abul Hasnat Abdullah led the Government side while Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma led the PCJSS at the talks.

The Government side included Engineer Mosharraf Hossain, MP, in Kalparanjan Chakma, MP, Dipankar Talukdar, MP, Awami League leader Ataur Rahman Kaiser, Secretary of the Special Affairs Division Kazi Golam Rahman, Chittagong Divisional Commissioner Shakwat Hossain and Deputy Commissioner of Khagrachhari district Mohammad Ismail.

While the PCJSS delegation included Shudhasindhu Khisha, Rupayan Dewan, Goutam Kumar Chakma and Roktotpal Tripura.

In the "exclusive" talks, Abul Hasnat Abdullah, Kalparanjan Chakma and Ataur Rahman Kaiser from the Government side while Shantu Larma, Rupyan Dewan and Goutum Chakma from PCJSS team were present. The exclusive talks that began at 4:15 pm lasted till 6:30 pm, sources said.

Meanwhile, a meeting between Prime Minister Sheikh Hasina and another leader of the Shanti Bahini Upendralal Chakma was held on Friday on the eve of the sixth round of talks.

It is also expected that a meeting between the Prime Minister and the PCJSS delegation led by Shantu Larma will take place during the team's stay in Dhaka.

The PCJSS leaders flew to Dhaka by a helicopter provided by the Government from hilly-jungle area Dudukchhari.

The Bangladesh Observer
September 16, 1997
CHT peace talks continue
No accord yet
in sight
Staff Correspondent

The sixth round of talks between National Committee on Chittagong Hill Tracts and Parbatya Chattagram Janasanghati Samity (PCJSS), the political wing of the armed Shanti Bahini aimed at finding solution to over two decades old insurgency in

Chittagong Hill Tracts, resumed at the state guest house Padma for the second day on Monday.

The talks began at 10-30 a.m. and continued till 1 p.m. and after three hours recess the talks again started at 4 p.m. and lasted till 7-15 p.m. the same day.

An official source said that there would not be any peace agreement during the on-going sixth round of talks between the government and PCJSS although both sides during their earlier talks held in Dhaka categorically hinted for signing a peace agreement to end the decades old insurgency in Chittagong Hill Tracts.

Meanwhile, the Government had also reached a decision on the issue of repatriation of refugees from the camps in Tripura state during an informal discussion between Prime Minister Sheikh Hasina and the President of the Refugee Welfare Association Upendra Lal Chakma on last Friday.

Chief Whip Abul Hasnat Abdullah who is also the Convenor of the National Committee on Chittagong Hill Tracts led the Government side while Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma led PJCSS at the talks on Monday.

Engineer Mosharraf Hossain, MP, Kalpa Ranjan Chakma, MP, Dipankar Talukder, MP, Ataur Rahman Kaiser, and Awami League leader, Kazi Golam Rahman, Secretary, Ministry of Sepecial Affairs, Shawkat Hossain, Divisional Commissioner of Chittagong assisted the Chief Whip while Shantu Larma was assisted by Shudhasindhu Khisha, Rupayan Dewan, Goutam Kumar Chakma and Roktopal Tripura.

The talks is likely to resume tomorrow (Tuesday) morning at 10 a.m.

The Bangladesh Observer
September 17, 1997
CHT talks
Agreement on
some points
indicated

The peace talks between the government and the tribal leaders passed third day on Tuesday without any outcome officially disclosed, reports UNB.

But indications trickling down the negotiation table through some source said both sides had already agreed on all points, including functions and structure of the proposed regional council.

Agreement was also said to have been reached on security of the tribals in the Chittagong Hill Tracts as well as protection of their culture and heritage.

Now the debate is going across the table on the issue of settlement of returness to their respective land. Said one of the sources.

But another source said the tribal leaders still stuck to their original five-point demand, lingering the talks.

But an authoritative source asserted there is no scope of any solution outside the Constitution.

No official briefing was given on the proceedings of the dialogue on a critical national issue which began at the state guesthouse Padma on Sunday.

This is the sixth round of talks initiated by the present government to hammer out a formula to restore durable peace in the troubled Hill Tracts.

Chief Whip and Chairman of the National Committee on the CHT Abul Hasnat Abdullah has been leading the government side at the talks.

Insurgent leader Jyotirindra Bodhiprio Larma alias Shantu Larma is leading the Parbatya Chhattagram Jano Sanghati Samity (PCJSS) team.

The dialogue is expected to resume today (Wednesday).

The Bangladesh Observer

September 18, 1997

Govt, PCJSS to sign accord in next meeting

Draft agreement prepared

Staff Correspondent

A draft of a peace accord to end the two-decade-old insurgency in Chittagong Hill Tracts was prepared on the fourth day of the sixth round of talks between the National Committee on Chittagong Hill Tracts and Parbatya Chattagram Janasanghati Samity (PCJSS) at the state guest house Padma on Wednesday.

Disclosing this to the waiting news men, Jyotirindra Bodhipriya Larma popularly known as Shantu Larma, the leader of PCJSS, the political wing of the armed Shanti Bahini, said that the

peace accord would be signed during the next round of takls. However, the date for the next round of talks was not fixed.

The ceasefire in Chittagong Hill Tracts area has also been extended till December 31, a source said. On the fourth day the talks began at 3-30 p.m. and lasted till 7 p.m.

Chief Whip Abdul Hasnat Abdullah, who is also Convener of the National Committee on Chittagong Hill Tracts led the government side. He was assisted by engineer Mosharaf Hossain MP, Mr Kalparanjan Chakma MP, Awami League leader Ataur Rahman Kaiser, Secretary Ministry of Special Affairs Kazi Golam Rahman and Mr Shakhawat Hossain, Divisional Commissioner of Chittagong and the Deputy Commissioner of Khagrachhari. Mr. Shantu Larma assisted by Shudhasindhu Khisha, Rupayan Dewan, Gautam Kumar Chakma and Roktotpol Tri pura, led the PCJSS side.

However, it was not known whether the talks will continue today (Thursday).

UNB adds:-Larma, however, didn't announced date and venue of the next meeting.

He also would not speak anything about the terms and reference of the draft accord on a permanent solution of the two-decade-old problems in the ethnic strife-torn hill tracts.

The PCJSS supremo, who led the team of his organisation to the marathon talks that began on Sunday, also declared the extension of ceasefire in CHT till December 31.

Chief Whip and Chairman of the National Committee on CHT Abul Hasnat Abdullah, who was present at the short briefing, didn't speak to the Press.

The draft of the long-awaited agreement is reported to have been sent to the Ministry of Law and Justice for a perusal and endorsement, sources said.

This positive outcome came from the 6th round of talks initiated by the present government to hammer out a formula of restoring peace in the hilly region, troubled by insurgency waged by Shantibahini.

Shantu Larma and his comrades at arms are expected to return today (Thursday) morning to their destinations in the hills.

The two sides are reported to have agreed upon establishing a regional council headquartered Rangamati, vesting in it certain powers and functions to act as a coordinated development body.

It will be headed by a chairman enjoying the rank and status of state minister.

The planned council will consist of 21 members 12 tribals, six nontribals and three women.

Both sides are reported to have agreed upon a modified formula which has been worked out through amendment to the British Manual 1900 and the Chittagong Hill Tracts Act 1989.

With the signing of agreement a durable peace will descend on the three trouble-torn hill districts. ushering in a new era of peace and harmony between the tribal and nontribal communities in the rugged region.

The Shantibahini guerillas had been fighting for autonomy in the CHT area for over last two decades that reportedly claimed the lives of nearly 20,000 people, including troops, and drove 50,000 tribals into refugee camps in the Indian state of Tripura.

Limited autonomy was given to the region through Hill District Local Government Councils in Rangamati, Khagrachhari and Bandarban.

The councils, with 20 tribal and 10 nontribal members and one tribal chairman, were constituted through elections in 1989 for each of the three hill districts following constitutional amendment.

In the past, 19 rounds of peace talks had been held during the governments of President Ershad and Prime Minister Khaleda Zia.

A ceasefire announced by the guerillas in August 1992 is still holding after several renewals allowing peace talks.

And during Begum Zia's tenure, 5,100 refugees came back from camps in two batches in 1994 before the process was stalled.

During the rule of present government, another six thousand refugees had returned under a package deal on repatriation, before it stalled again.

The number of the tribals belonging to 13 tribes in the little over one million population of the CHT is estimated around 600,000 and the rest are Bangalees, including settlers.

The Bangladesh Observer
September 19, 1997
PCJSS team
leaves for
Dadukchhara
Staff Correspondent

The Chief of Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) the political wing of the armed Shanti Bahini Jatirindra Bodhipriya

Larma alias Shantu Larma who headed a six-member delegation including a physician of PCJSS at the sixth round of talks with the National Committee on Chittagong Hill Tracts, left Dhaka by a military helicopter for their temporary Headquarters at Dadukchhara, a small frontier hamlet in Khagrachhari near the bordering area of Tripura on Thursday.

The tribal delegation was earlier flown to the city on Sunday for talks with the leaders of National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) which ended on Wednesday.

During four-day long talks, the draft of an agreement to end the two-decade long insurgency in the Chittagong Hill Tracts was prepared. However, the peace accord will be signed between PCJSS and NCCHT during the next round of talks. The date and venue for the next meeting was not fixed as yet.

The leader of PCJSS before leaving the state guest house Padma on Thursday morning told the waiting newsmen that the next meeting and signing of the accord would be announced in due time.

When asked whether the agreed formula would ensure the land ownership of the tribal people, Shantu Larma said from a car that “this will also be communicated to you in time.”

It was also decided during the talks between NCCHT and PCJSS that the ceasefire in Chittagong Hill Tracts would be extended till December 31 next. The ceasefire was scheduled to expire on September 30.

The Bangladesh Observer
October 1, 1997
Uplift process
to be geared up
in CHT: Hasina

Prime Minister Sheikh Hasina Tuesday expressed the hope that the overall development process would be further geared up in the Chittagong Hill Tracts areas with the signing of the peace treaty, reports BSS.

“First of all, we have to establish peace to carry out development activities in the area,” she said while the interim chairmen of the three hill tracts district local government councils called on the Prime Minister at her office here. The members of the council were also present.

Sheikh Hasina said the peace process is on and the development activities would be accelerated further after the accord is signed. She referred to the potentials of the region with vast natural resources and scenic beauties and said these could be harnessed for the benefit of the people.

The Prime Minister cautioned the hill districts leaders to remain alert against any vested quarters who were out to disrupt the on-going peace process.

She said that her party had been working for a peaceful settlement in the area before forming the government and would continue to do so in the future.

The chairmen congratulated Sheikh Hasina for her dynamic role in initiating the peace process. They also lauded the leadership of Sheikh Hasina as she could find solution to a problem which could not be solved, so long.

They also narrated some local problems and the Prime Minister assured all possible help to remove those.

Awami League Presidium members Amir Hossain Amu, Abdul Jalil, Kalparanjan Chakma, MP and chairman of the task force, Dipankar Talukdar MP, Bir Bahadur MP were present.

The chairmen present were Samiran Dewan of Khagrachhari, Ching Ou Roaza of Rangamati and Thoaing Cha Prue Master of Bandarban Hill Tracts.

The Bangladesh Observer
October 15, 1997
Hasina tells Buddhist team
Conspiracy on to
Foil CHT peace

Prime Minister Sheikh Hasina on Tuesday said that some vested quarters are still hatching conspiracy to disrupt the peace process of Chittagong Hill Tracts to obtain political benefit, reports BSS.

"Those forces which grabbed power through coup and conspiracy and still want to handover our country to others are out to keep the conflicting situation in the hill districts to achieve their ulterior motives," she added.

The Prime Minister was talking to a delegation of Bangladesh Buddhist community who called on her Tuesday afternoon at her office to convey their greetings on the occasion of "Suva Probarana Purnima" one of the greatest religious festivals of the community.

Expressing her total optimism about the success of the peace efforts on the Hill Tracts issue, the Prime Minister said, "we have reached to settlement. We are sincere and by the grace of the Almighty peace would be restored there."

The Prime Minister said the tribals of the Hill Districts are our national assets and pride. They have their own cultural heritage and identity. She said all religions in the country have their own identical entities which are like ornaments of the nation. We have to contain these precious wealth, she said adding that her government would extend all patronisation to expand such cultural and religious heritage.

The Prime Minister said her government is eager to make best utilisation of the country's resources. She said Chittagong Hill Tracts is blessed with precious natural resources. Besides this area has attractive natural beauty which can impress foreign tourists and natural lovers. But to explore all these potentialities we need peace and tranquility in the region, she added.

The Prime Minister said, we cannot allow a situation in which our people will be compelled to stay outside the country. I don't know what benefit certain quarters want to achieve keeping our sons on foreign soil.

The Prime Minister called upon the Buddhist leaders to mobilise public opinion in favour of the peace process so that people belonging to all caste, creed and religion could lead a hermonious life there.

Noted community leaders present on the occasion included Chairman of Bangladesh Buddhist Association Rakhal Chandra Barua, Secretary General of the Association Kamal Kanti Barua, President of the Dhaka Chapter of the Association Dr Kanak Kanti Barua, President of the Comilla Chapter of the Association Srimath Dharmaraksmit Mahasthabir, President of Buddha Jubo Federation Sukumar Barua, President of the Bangladesh National Buddhist Youth Federation and Chairman of the Probarana Purnima Udjapan Committee Dr Sukomal Barua and General Secretary Kishore Kumar Barua.

The Bangladesh Observer
October 17, 1997
Chakma refugees
repatriation to resume Nov 21

Repatriation of the Chakma refugees from India will resume on November 21 after a holy Buddhist festival, 'Kathina Chivara Dana', reports UNB.

It will continue unhindered as long as all measures for safety, security and proper rehabilitation of the returnees are ensured and implemented.

Chittagong Hill tracts Jumma Refugees Welfare Association (JRWA) President Upendra Lal Chakma made the announcement carried in a press release on Thursday.

He said the decision was taken in view of assurances given by Prime Minister Sheikh Hasina and the progress in ongoing dialogue towards a peace pact.

The long-cherished accord is likely to be signed when the National Committee on CHT and Parbatya Chattagram Jano Sanghati Samity, the political umbrella of the Shantibahini, will sit in next meeting on November 16 in Dhaka.

He also said the central committee of the JRWA decided to resume the repatriation process despite the non-acceptance of its demand for involvement of UNHCR AND ICRC in it.

Upendra Lal, however, said they were confident that under the leadership of Prime Minister Hasina an agreement on the CHT problems would soon be reached creating a condition conducive to return of the Jumma refugees.

The Bangladesh Observer
October 19, 1997
Peace rally in
support of CHT
agreement held

KHAGRACHHARI, Oct. 18:- Tribals and non-tribals joined a peace rally in the town today to demonstrate their support to a planned agreement between the government and tribal insurgents to restore peace in the Chittagong Hill Tracts, says UNB.

Witnesses said thousands of men and women from eight thanas of the district participated in the rally, led by Agriculture

and Food Minister Begum Matia Chowdhury who echoed the Prime Minister's statement that army or Bangalees would not be withdrawn from the CHT.

Addressing the rally at Shapla Chattar here, the Agriculture Minister said the people of the country want a peaceful solution of the long-standing CHT problem, but peace cannot be restored without united efforts of all.

Matia Chowdhury alleged that a certain communal group is spreading a propaganda to keep the hill tracts problem alive.

She also charged BNP with acting against sovereignty of the country during its regime by holding a meeting in foreign soil. Awami League did not hold any such meeting in India, she added.

Pahari Peshajibi Oikyo Committee and Zilla Nagarik Committee organised the rally that began from Government College premises in the afternoon and ended at Shapla Chattar.

The Bangladesh Observer
October 28, 1997
Public meet at Rangamati
Call to resist peace
Treaty on CHT
Chittagong Office

CHITTAGONG, Oct. 27:- A huge public meeting was held at Old Court Building ground in hill district town Rangamati today in protest against the proposed peace agreement between the government and the Shanti Bahini's apex political body PCJSS.

The rally was organised by the Parbattya Sarbadaliya Oikya Parishad (PSOP) comprising the CHT units of opposition BNP, Jatiya Party (Z-M) and Jamaat-e-Islami. The protest rally was mostly attended by the non-tribals who came from three hill districts, according to our Rangamati correspondent.

The rally was presided over by senior Vice-President of PSOP and a local BNP leader Haji Fazlur Rahman. Maulana Matiur Rahman Nizami, General Secretary of Jamaat-e Islami Bangladesh attended the rally as chief guest. BNP central leader Salahuddin Quader Chowdhury MP was the special guest.

Among the speakers were Shamim Al Mamoon, Secretary General of Jatiya Party (Z-M) and Abdul Wadud Bhuiyan, a Jatiya Party leader from Khagrachhari.

The speakers lambasted the government for discrimination in the status of tribals and non-tribals in the proposed peace accord for a solution to the CHT problems. “The signing of an un-equal peace accord with the PCJSS leadership will be suicidal in terms of national interest and threaten the sovereignty in Chittagong Hill Tracts,” the speakers declared.

They also urged the tribals and non-tribals in CHT to make the dawn-to-dusk hartal in three hill districts next Wednesday for protesting the peace accord a success.

The Parbattya Sarbadaliy Oikya Parishad (hill all-party alliance) called for a grand rally at Chittagong Outer Stadium on November 11 protesting the proposed peace accord.

The Bangladesh Observer
October 30, 1997
AL blames
Khaleda for
bid to foil
peace treaty

Ruling Awami League on Wednesday squarely blamed BNP chairperson Begum Khaleda Zia for trying to foil a proposed peace treaty between the government and the PCJSS on Chittagong Hill Tracts, reports UNB.

“To foil the peace initiative in the CHT, Begum Zia is making confusing and untrue statements against country's independence and sovereignty”, a meeting of Awami League Presidium observed.

“In the name of creating “Ashanti Bahini”, BNP leadership is pushing the country into conflict and provoking racial and ethnic strife”, the meeting noted with deep anguish.

Acting Awami League President and Forest and Environment Minister Begum Sajeda Chowdhury presided over the meeting held at Awami Foundation.

Party Presidium members Syeda Zohra Tajuddin, Abdus Samad Azad, Abdul Mannan, Zillur Rahman, Principal Qumruzzaman, Amir Hossain Amu, Abdur Razzak, Suranjit Sengupta, Shamsur Rahman Khan Shahjahan, Abul Hasnat Abdullah, and ABM Mohiuddin Chowdhury were present.

For the first time, the meeting said, Bangladesh is going to host donors' consortium meeting in Dhaka in November as well as

meetings of International Invest Forum, Three-nation Economic and Commerce Summit.

"But a vested quarter became desperate to destroy political stability for foiling ongoing development process and investment chances in the country".

The meeting in a resolution pledged to protect investment climate, ongoing development process, democracy and democratic institutions.

It also pledged to maintain the effectiveness of democratic institutions, consolidate sovereignty and integrity, resolve the CHT problem politically on the basis of Constitution.

The government party Presidium also expressed its determination to give democracy an institutional shape making the Parliament a center for all activities and urged all concerned to solve all problems through discussion on the floor of the House.

The Bangladesh Observer
November 2, 1997
Tribals, settlers for
CHT peace plan
From Nizamuddin Ahmed

KHAGRACHARI. Nov 1:–There is a massive response among the tribals and the Bengali speaking people here in support of the forthcoming peace agreement between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), political wing of the Shanti Bahini.

This correspondent after talks with a cross section of people had the impression that there is hardly any opposition to the peace agreement which they hoped would bring an end to two decades of unrest and insurgency in the hill districts of Khagrachhari, Rangamati and Bandarban.

The tribals have hailed the peace process and are now eagerly waiting to see the agreement come into being. Similarly the majority of the Bengali settlers have expressed their support to the proposed peace agreement. A section of Bengali speaking people who had hesitation about the peace agreement earlier has now understood that the peace agreement will not go against their interest. They now feel the necessity of a peace agreement to live in harmony with their tribal neighbour.

Taking to this correspondent, Deputy Commissioner of Khagrachhari Mohammad Ismail said that he was very much hopeful about the signing of the peace agreement to be held on November 16.

He said that the tribal people specially the Pahari Chhatra Parishad had been working hard and going door to door to mobilise the public opinion in favour of the peace agreement.

Leaders of Bengali settlers were also moving to get the support of the Bengali speaking people.

The Deputy Commissioner said that the next phase of repatriation of tribal refugees would begin from November. He hoped that the repatriation of the refugees from Tripura of India would be continued. He said that the local administration in cooperation with the Jana Sanghati Samity as taken all preparations to receive the returnees and rehabilitate them properly. According to him, 99 per cent of the refugees were the residents of Khagrachhari district. The administration has preparation to receive 200 families a day (nearly 1000 refugees).

The Deputy Commissioner had meetings separately with the tribals represented by their headmen and Bengali settlers, who were represented by the leaders of ruling Awami League and the main opposition BNP. He said, 2800 families returned from the refugee camps at Tripura state of India since 1994. From March 28 to April 10, at least 4703 refugees returned to the country. All the returnees have been rehabilitated. Each family was given 15 thousand Taka cash on the spot and Taka 10 thousand in cash in addition buy bullocks.

Besides, the Government was giving them 25 kgs of rice, edible oil and pulse as support for nine months.

The Bangladesh Observer
November 3, 1997
43,000 more tribals
await repatriation
From Nizammuddin Ahmed

KHAGRACHARI, Nov 2:–About 43,000 more tribal refugees are waiting at the camps at Tripura to be repatriated to their home at Khagrachari and two other hill districts Rangamati and Bandarban. The repatriation of refugees will begin on November 21 followed by the signing of peace treaty on November 16.

Meanwhile, the tribal leaders have dispelled the fear prevailing among the Bengali settlers with the assurance that no settlers will be displaced from the hill tracts. The tribal leaders, the local administration and those involved with the peace process dismissed the propaganda now circulated by an interested quarter that Bengali settlers will be expelled from the hill districts.

"There is no power that can foil the peace agreement", asserts Samiran Dewan, Chairman of the Local Government Council of Khagrachari hill district. Samiran Dewan who has been Chairman of the Local Government Council since 1989 expressed his conviction about the signing of the peace agreement. He said, "it is a reality that the tribals and the settlers will co-exist and live together as they lived before the CHT turmoil." He does not feel that the expulsion of the settlers will bring solution to the hill districts. "Acceptance of the Bengali settlers by the tribals is a big achievement." He admitted that there are provocations from either side to foil the ongoing peace process. He said that the successful implementation of the peace agreement would be the real achievement of agreement. Mere signing of the treaty without its implementation will be meaningless," Samiran Dewan remarked.

This correspondent on Sunday visited the rehabilitation spots of the repatriated tribals at Dighinala thana where 15 clustered villages are located. These clustered villages were earlier set up by the previous Government to relocate the settlers who left their habitat in the interior in fear of Shanti Bahini massacre in late eighties. After the return of 4,700 refugees from Tripura from March 28 to April this year, they were rehabilitated around the clustered villages at Dighinala thana.

Akkhymoni Chakma was a primary school teacher before leaving his home at Dighinala returned to his own place after 11 years. Expressing his reaction he said he is happy to return to his birth place. "There is a difference between the life in exile and the life at my birth place", says Akkhymoni Chakma. Similar reactions were expressed by other returnees.

However, the Bengali settlers have some grievances. They say that some returnees are claiming their lands, which they do not really own. The local thana administration has been facing the problem of land dispute. But the administration is hopeful of resolving the dispute. But both the returnees and the Bengali settlers are getting the ration from the Government which amount to 85 kg of rice per month.

However, this correspondent talked to the local leaders of the ruling party Awami League and the Opposition BNP

The leaders of opposition BNP come from the Bengali settlers while the ruling party leaders belong to both tribals and settlers. The BNP leaders are skeptical about the peace agreement. They fear that some of the provisions of the agreement will go against the interest of settlers and many face expulsion. They demanded the Government to publish the provisions of the peace agreement before signing. On the contrary the leaders ruling party Awami League do not believe that it will hurt the interest of settlers. The agreement they believe has been drafted on the basis of the equality of rights of both the tribals and the settlers. BNP leaders say that they will hail the agreement provided it protects the interest of tribals and the settlers on the basis of equality of rights. They in principle do not oppose the peace agreement.

The Bangladesh Observer
November 4, 1997
Majority support
CHT peace plan
From Nizamuddin Ahmed

RANGAMATI, Nov. 3:–Though 90 percent of the people including the tribals and settlers earnestly support the CHT peace agreement, a handful of vested quarters are found to be more active in making adverse propaganda against it. The anti-peace activists are working among the poor and ordinary settlers to subvert the Government's efforts.

The anti-peace activists are the combine of BNP and Jamaat-e-Islami. They are spreading canards that the settlers will be expelled once the peace agreement is signed. This subtle propaganda against the peace accord has been sowing the seed of the ethnic tension, mistrust and distrust between the tribals and settlers of Rangamati district. The local Administration seems to be too week to counter this propaganda. They have formed Sarbadaliya Oikaya Parishad (All Party Unity Council) to misguide the people. But their propaganda has received little response from the people.

Former women MP of Awami League Mrs. Sudipta Dewan, Awami League General Secretary of the District Asutosh Barua,

former Local Government Council Chairman Goutam Dewan, current Chairman Ching Q. Roaza, Pourashava Chairman Moni Swapan Dewan have all expressed their full confidence to the proposed peace agreement. They told this correspondent that the present Government's peace initiative has received wide support both from the tribals and the settlers.

The present Chairman of Rangamati Pourashava Moni Swapan Dewan who was once an active member of Shanti Bahini surrendered with arms in 1989 said, “I fully support this peace agreement as no one will benefit from this bloodshed. The peace, he said is needed for the economic development of the country as well for exploiting vast natural resources of the hill districts. “The CHT is not an isolated part, but very much a part of Bangladesh,” he observed.

Raja Debashis Roy, the king of Chakma tribe the largest of the tribes of CHT who is now in Rangamati has full confidence in the Government's sincerity in resolving the CHT issue.

The Bangladesh Observer
November 6, 1997
Editorial
Chittagong Hill Tracts

A peace treaty is expected by the middle of the month between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), political wing of the Shanti Bahini. The treaty is expected to bring an end to the two-decade old unrest and insurgency in the hill districts of Khagrachhari, Rangamati and Bandarban. The issue is important both from the local and national perspectives. Naturally, there is excitement among the local people about the prospects of the agreement, despite controversy and debate about the provisions at the national level.

The tribal people have reportedly hailed the proposed agreement and the settlers too have reportedly expressed support. The tribal refugees are eagerly awaiting their return track from camps in the Indian state of Tripura. The settlers also appreciate the need for peace to live in harmony with the tribal neighbours. The peace process was started by the previous government and the number of the refugees who had returned to their homeland during their time almost equals the number repatriated after the process was restarted during the present regime.

The previous government had also set up 15 cluster villages in Dighinala thana to relocate the settlers who had left their habitats due toy massacres by Shanti Bahini. The settlers are still apprehensive of some of the returnee refugees claiming their land. The administration is, however, confident about resolving the problems.

The debate at the national level centers round the rights of settlers and the stationing of army units in the area. Both are fundamental. One is guaranteed by the constitution and the other relates to the traditional concept of sovereignty. There is no reason yet to presume the proposed agreement goes contrary to either. But there is a strong point in the demand to take the people into confidence about the terms of the treaty before it is signed.

There should however, be no confusion about rights, either of the returnee refugees or the settlers. Article 36 of the constitution is specific about both: "Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest, every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and re-enter Bangladesh".

This Article of the constitution should be given utmost importance. Bangladesh is not only one of the poorest countries of the world but also one of the most densely populated. The density of population here is 925 per square kilometer—thrice as much as in neighbouring India. In this country only the hill tracts region is comparatively thinly populated. The trend of migration is thus obvious. But the tribal people have an equal right to move to the plain areas and they should be given preference particularly in allotment of plots in satellite-townships. Instead of keeping the ethnic groups primitive, in the name of preserving their tradition and culture, and displaying them as curios to the visitors, effort, should be made to integrate them into mainstream Bangladeshi society.

The deployment of the armed forces must be dictated by strategic considerations. Compromise on this issue would certainly be compromise on the sovereignty of the country—the sovereignty that is referred to in the constitution. Any effort to create confusion on this issue would raise doubts about the terms of the treaty.

Since the terms of the treaty have not been made public, people might be imagining things. This is not an issue on which the decision may be made on the basis of majority opinion. It warrants consensus not only among the political leaders but also among the entire population inclusive of our ethnic minorities.

Without such consensus, agreement, however well-meaning, may run into difficulties in implementation.

The Bangladesh Observer
November 8, 1997
Task force meet today
Tribal repatriation
resumes Nov 21
Chittagong Office

CHITTAGONG. Nov. 7:– A meeting of the Task Force Committee will be held at Chittagong Circuit House tomorrow (Saturday) to discuss preparations for the reception of tribal returnees from the Indian state of Tripura.

The repatriation of tribal refugees from five transit camps in Tripura is expected to begin on November 21. "It will continue unhindered as long as all measures for safety, security and proper rehabilitation of the returnees are ensured and implemented", said Upendra Lal Chakma, President of Jumma Refugee Welfare Association.

The Task Force Committee meeting to be chaired by the Committee's Chairman Kalparanjan Chakma MP will also take into stock the overall situation prevailing in Chittagong Hill Tracts ahead of resuming the repatriation of tribal refugees.

Apart from the Committee Chairman, the meeting is expected to be attended by the Khagrachhari Local Government Council Chairman Samiran Dewan, refugee leader Akshoy Moni Chakma, Chittagong Divisional Commissioner Sakhawat Hossain Khan and Deputy Commissioners of three hill districts.

It seems that the cloudy atmosphere surrounding the repatriation process since the last phase of official repatriation in March-April this year has finally dissipated. Some 7,000 refugees belonging to 1,248 families returned hearths in CHT in that phase of repatriation from March 26 to April 17. Earlier in 1994, more than 5000 refugees returned home in CHT under official repatriation.

Arrangements have already been made to receive some 1,000 returnees everyday. The returnees will be given all sorts of supports for their rehabilitation.

The 34,000 refugees encamped in five camps in Tripura since 1986 will return back through Kathalchhari-Ramgarh and

Tabalchhari-Matiranga border routes, according to Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail.

The Bangladesh Observer
November 9, 1997
Task force reviews overall situation
Peace treaty with PCJSS to be signed soon: Hasanat
Chittagong Office

CHITTAGONG. Nov. 8:–The Task Force on refugee repatriation today reviewed in detail the "extensive preparations" made for the reception of tribal refugees to be repatriated from Indian state of Tripura beginning from November 21.

The Task Force Committee in a two-hour meeting at Chittagong Circuit House reviewed the overall situation in Chittagong Hill Tracts (CHT) and ironed out all snags for unhindered repatriation of refugees. The Committee's meeting was chaired by its Chairman Kalparanjan Chakma MP.

After the meeting, the Chittagong Divisional Commissioner and member of the Task Force Sakhawat Hossain Khan told this correspondent. "The stage is now set to get back 43,000 refugees now languishing in five camps in Tripura."

The Task Force committee meeting was also attended by Chief Whip and Convener of National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) Abul Hasanat Abdullah and NCCHT members Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Eng. Mosharraf Hossain MP, and Bir Bahadur MP.

Among the members present in the Task Force Committee meeting were Khagrachhari Local Government Council Chairman Shamiran Dewan, Chittagong Divisional Commissioner Sakhawat Hossain Khan, Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail, refugee leader Akshoy Moni Chakma and five Thana Nirbahi Officers of Ramgarh, Matiranga, Manikchhari, Dighinala and Panchhari. The meeting was also attended by Khagrachhari Brigade Commander Brigadier Ashfaque, Director General of Special Affairs Division Mobaidul Islam and Chittagong Deputy Commissioner Habibullah.

Briefing newsmen the Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail said that the repatriation of refugees would take

place through Kathalchhari-Ramgarh and Tabalchharis-Matiranga routes. He hope that the repatriation of refugees from five camps in Tripura would continue till the return of last person. The Deputy Commissioner also hoped that two hundred families would return.

A total of 50,000 tribal refugees have been staying in Natunbazar, Jatanbari, Karbuk, Thakumbari Silachari and Subrum camps in southern Tripura district of India since 1988. The past government's efforts yielded positive results only on two occasions. On February 15, 17 and 19, 1994 the first batch of 282 tribals came back to their homes in CHT. The second phase of repatriation of 648 families took place on July 21, 1994. After that, the process of refugee repatriation stopped.

Under the present Awami League government, the first batch of 1,248 families returned to their homes in CHT from March 26 to April 17 this year.

BSS adds: Chief Whip Abul Hasanat Abdullah who attended the meeting as chief guest expressed his firm determination that a peace treaty between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samiti (PCGSS) is expected to be signed at the quickest possible time.

He said the national committee and PCJSS have already reached an understanding on many unsettled issues in the light of six-point demands of the PCJSS.

He said under the government's 20-point package of incentives offered for the repatriated persons, so far 6703 refugees of some 1248 families had returned to their homes in Bangladesh from the Indian state of Tripura.

Winding up the meeting chairman of the task force Kalpa Ranjan Chakma, MP, urged all to extend their wholehearted cooperation to the repatriated persons so that they could live their own land peacefully.

The Bangladesh Observer
November 10, 1997
CHT peace treaty
People urged not to be misled by rumours

RANGAMATI, Nov. 9:–Speakers at a peace conference held here today urged all concerned not to be misguided by any rumour

being spread by the vested quarters against the peace treaty expected to be initiated on November 16 next between Bangladesh Government and Parbattya Chattagram Jono Shanghati Samity (PCJSS), says BSS.

Restoration of peace in the insurgency battered CHT region lies in the signing of peace treaty, they said in a meeting organised by Rangamati Nagorik Committee chaired by Gautam Dewan, the former chairman of Rangamati Hill District Local Government Council.

The meeting was attended by tens of thousands of people, both tribal and non-tribals.

Mohammad Nasim, Minister for Post, Telecommunication and Works said that peace is the pre-condition of development. Development of CHT, a region-full of natural and other resources can't be possible without restoration of peace," he said adding: "give us peace, we will give you development."

Reiterating the government desire to sign the peace treaty on the November 16 next, the Agriculture and Food Minister Begum Matia Chowdhury said as special guest that we are going to end the crisis prevailing in the CHT politically, process of which was started by the previous governments.

We are determined to sort it out within the frame work of the constitution, she said adding, "the previous government in the name of solving the crisis, went with negotiation in India and held talks with Narasimha Rao as they were not sincere to bring an end of the crisis, instead trying to give a touch to it as international problem."

She said we have realised the real problem, holding talks with the main party PCJSS and on the sixth round of talks in Dhaka we have succeeded to pursue them to prepare a draft agreement," Matia Chowdhury added.

In the peace conference organised in support of the peace treaty, Raja Debashish Roy, the chief of Chakma circle said that question of losing sovereignty does not arise at all with the signing of the peace treaty.

It's nonsense issue of the opposition since the process was started during their times he said and added a faction of non-tribal, the main stream population of the country has been living in CHT for above hundred years in peace and harmony. He said, if rights of anybody in CHT is violated after signing of peace treaty or if it is adverse to the constitution, there is a High Court in the country to seek its remedy.

Members of Parliament, Adv. Fazle Rabbi, Dipankar Talukdar, Bir Bahadur, Kalpa Ranjan Chakma, Chairman of the Three Hill District Local Government Councils Ching Kien Roaza, Samiran Dewan and Mong Thoai Chaw Prue were among those who spoke on the occasion.

The next peace conference will be held in Bandarban on November 1 next in support of the proposed peace treaty.

The Bangladesh Observer
November 11, 1997
Peace in CHT soon: Hasina
Agreement to be within constitutional framework

CHITTAGONG, Nov 10:–Prime Minister Sheikh Hasina today said peace would be established in the Chittagong Hill Tracts very soon, says BSS.

"Inshallah, a permanent peace will be established very soon in the hill tracts", she said while addressing the regimental commanding officers conference at the East Bengal Regiment Centre (EBRC) conference hall here.

She regretted that while peace was being established in the region after a long bloody clashes, a particular quarter was trying to disrupt it. "They are making propaganda and opposing the peace accord", she said.

Sheikh Hasina said that the previous government had held 13 meetings with the tribal leaders in India to reach an accord on the hill tracts. She said Awami League had its representation on the committee and it did not oppose the effort. She said there are two opposition members in the present committee and the opposition leaders could know about the treaty from their own party members.

"How can the national independence and sovereignty of the country be at stake if a peace accord is sign with the tribal leaders?" she asked, "Does it mean that national independence and sovereignty will remain intact if there is turmoil, confrontation and clashes?" she further asked.

The Prime Minister said the detail of a peace accord are not general made public before the accord signed. Opposing a peace treaty tantamounts to welcoming a war-like situation, she said.

She said the people want peace. They want an end to clashes an suicidal war in the Chittagong Hill Tracts. "We do not want that

the sold of Chittagong Hill Tracts is soaked with the blood of any brother. We want hilly, non-hilly, tribal, non tribal should live together", she added.

The Prime Minister urged the commanding officers not to pay heed to any propaganda regarding the peace accord. She said sacrifice, made by the soldiers to keep peace in the hill tracts, unparallel and the nation would never forget it. She firmly said that the accord would be signed within the framework of the constitution and by protecting country's independence, integrity and sovereignty.

Sheikh Hasina reiterated that the army would not be withdrawn from the area.

Referring to the huge natural resources in the area, the Prime Minister said that these resources should be utilized for the development of the area. She said foreign companies are working in the country and more such companies will be coming here and invest crores of Taka.

She said huge development activities such as construction of roads, educational institutions, hospitals and health complexes would be taken up following the treaty. Besides, the programmes, taken in the fields of agriculture and industry, would be implemented, she said.

Prime Minister Sheikh Hasina said her government wants to keep the armed forces above all controversies. We wants efficient, disciplined, properly equipped and powerful armed forces, she said. She said her government has been able to restore the chain of command in the army.

She called upon them not (not) to be influenced by any ambitious per sons as a large number of young officers had to die in the past to fulfill their ambitions. "Many officers were hanged and many were gunned down without knowing their crimes, she said, adding "we will not allow any one's political ambitions to be fulfilled at the cost of human lives. "She urged the officers to remain alert against such a recurrence in future.

Referring to her meet-the-people programme, the Prime Minister said once a widow had come to her to trace her husband's body, killed in an incident in 1977 she said a large number of brilliant officers were killed.

Sheikh Hasina said our armed forces had already suffered huge loss. "We do not want any more bloodshed" she said. To

bring an end to this, her party has advocated for ballot to change a government, she pointed out.

Chief of Army Staff Lt General Muhammad Mahbubur Rahman, Chittagong Area Commander, Major General Abdul Matin, Adjutant General Major General Matiur Rahman, and EBRC Commandant Brigadier Jahangir Kabir were present.

Earlier the Prime Minister presented national standards to the Adarsha Ekush (ideal 21) and the daring tigers, two battalions of the East Bengal Regiment at the Shaheed Mr. Chowdhury parade ground of the East Bengal Regiment Centre (EBRC) in the morning.

The national standards were presented to mark their meritorious services to the nation. The national standards were adorned with traditional military decorations and Arabic inscription to the holy Qalima-e Tayeeba.

The Prime Minister reviewed the smartly turned-out parade and took the salute of the impressive march past.

She also handed over gallantry awards Bir Bikram and Bir Pratiks to 14 army personnel including four officers. The recipients include Lt. Col Mozaffar Bir Bikram, Lt. Col Mia Muhammad Zainul Abedin Bir Bikkram, Major Muhammad Mahbubur Rahman Khan, Bir Pratik and Major Mizanur Rahman Shamim, Bir Pratik.

Addressing the officers and troops, the Prime Minister said that the nation would long remember the sacrifices of the brave soldiers of the East Bengal Regiment during the liberation war.

Sheikh Hasina said despite resource constraints the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman wanted to build up a strong armed forces in the country suiting to the needs. He had established different training academies for the army, she said.

She also referred to the various steps taken by the present government for the development and welfare of the armed forces. "We are committed to making the armed forces more modern, strong, disciplined and efficient despite constraints of resources," she pointed out.

On arrival at the parade ground, the Prime Minister was received by Chief of Army Staff Lt. General Muhammad Mahbubur Rahman, Area Commander of Chittagong Major General Muhammad Abdul Matin and EBRC Commandant Brigadier Jahangir Kabir.

Ministers, Mayor of Chittagong City Corporation, members of parliament, chief of air staff, principal staff officers and general officers commanding and other senior military officers and other high dignitaries and local elite were present.

The parade over, the Prime Minister visited the quarter guard of the EBRC and the Ajana shaheed smriti (unknown martyrs grave). She placed a wreath at the mausoleum and offered prayers. She also signed the visitor's book.

Later Sheikh Hasina joined the troops of the East Bengal regiment at a 'preeti bhoj' arranged in her honour at the Major K.A Khaleque ground.

The Bangladesh Observer
November 15, 1997
Accord to be signed between Nov 16-21
CHT peace talks Sunday
Chittagong Office

CHITTAGONG, Nov. 14:–The next crucial seventh round of peace talks between the National Committee for Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the apex political body of the Shanti Bahini will be held in Dhaka on Sunday (November 16).

The PCJSS delegation members including their chief Jyotirindra Bodhi Priya Larma arrived today at border halmet Daduckchhari of Panchhari thana under hill district Khagrachhari from where they will be flown to Dhaka by a military helicopter for the talks.

This round of talks is being seen as very important since the last sixth round of talks between the two sides from September 14 to 17 saw a major breakthrough. “We have prepared a draft agreement and we are going to initial the agreement in the next meeting after discussion with colleagues,” PCJSS Chairman Jyotirindra Bodhi Priya Larma alias Shantu Larma told newsmen after the end of 4-day talks.

The draft of the agreement to end the decades old insurgency in CHT is understood to have already finalised.

The next seventh round of talks is virtually going to be 28th round of talks in the continuation of negotiations since October, 1985.

During the previous BNP government of Begum Khaleda Zia, the PCJSS held talks seven times with the All-Party National Committee and eight times with its sub-committee (the sub-committee was headed by the Workers Party leader Rashed Khan Menon). Likewise, six round of peace talks were held between the government and the PCJSS during Ershad regime.

Meanwhile, a five-member delegation left hill district Khagrachhari for the Indian state of Tripura on Thursday to work out modalities for the repatriation of tribal refugees scheduled to begin on November 21.

The delegation led by the Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail will sort out all snags with the Indian officials and discuss ways to make the repatriation smooth and unhindered. The delegation will also procure lists of refugees from the District Magistrate of Indian South Tripura district.

UNB adds: Official sources could not confirm any date of signing of the agreement but there is speculation that it may be signed any day between November 16 and 21 if there is no fresh complications.

Other sources indicated that the agreement might be signed after the three-nation Business Summit, due to November 23.

Official sources said Bangladeshi tribal refugees, crammed in six camps in Tripura, are scheduled to resume returning home on November 21, now staying in Indian state of Tripura.

The planned peace agreement on CHT has already come under strong criticism by the main opposition party, BNP, and its allies, including Jamaat-e-Islami, who say the accord would jeopardies national sovereignty and territorial integrity of Bangladesh.

The BNP-led combined opposition on CHT has called dawn-to-dusk countrywide hartal on the day the agreement will be signed.

The ruling Awami League, however, blasted the opposition, saying that “those who don't want peace in the Chittagong Hill Tracts are opposing the signing of the agreement.”

The proposed peace accord is likely to be initialed by Chief Whip Abul Hasanat Abdullah, convener of the National Committee of CHT, on behalf of the government and by Jyotirindra Bodhi Priya Larma alias Shantu Larma, chairman of the PCJSS, the political wing of the tribal insurgents.

Nearly 43,000 Bangladeshi Chakmas, languishing in camps at Dakunbari, Lebachhara, Pancharampura, Karbook, Silachhari and

Kathalchhari in Sabrum and Amarpur districts of Tripura state, are awaiting repatriation.

Some 1,248 families, comprising 6,703 Chakma refugees returned home in CHT in last February and March. About 3,000 tribal refugees from Tripura also returned to the CHT in 1994.

The government has taken adequate measures to ensure security and proper re-settlement of the returnee Chakma refugees.

Talks in Agartala

PTI report from Agartala says: The modalities of repatriation of 6063 Chakma refugees to their homeland in Chittagong Hill Tracts (CHT) in the fourth phase was discussed by Bangladesh delegation and district Magistrate of South Tripura.

Official sources here said repatriation of the refugees, sheltered in South Tripura camps in Lebachhara, Pancharampara, Silachhari and Kathalchhari since April 1985, has been scheduled for November 21.

In the discussions held at Udaipur yesterday the five-member Bangladesh delegation was led by Deputy Commissioner of Khargrachhari Muhammad Ismail and the state government by South Tripura District Magistrate Lok Ranuan.

The Bangladesh delegation later visited the camps and discussed with Chakma leaders and appealed to them to return to their homeland, the sources said.

The Bangladesh Observer
November 15, 1997
CHT treaty to help establish
Indian supremacy : Khaleda
Our Correspondent

RAJSHAHI, Nov. 14:- BNP Chairperson and Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia called upon people to wage movement against the Awami Baksalite rulers.

Addressing a huge public meeting organised in protest against the killing of Union Parishad Chairman and Juba Dal leader Zahid Hossain Mukul at the ground of Natore Nawab Sirajuddowla Government College this afternoon the BNP Chairperson said soon after independence the Awami League government handed over Berubari to India and now they want to hand over the Chittagong Hill Tracts.

She alleged, in the name of peace treaty with the so-called Shanti Bahini the Government actually wants to allow supremacy of India over Chittagong Port and Kaptai Hydro-Electric Project. But people of the country have now put up resistance against the nasty ploy of India, she said.

"The people will not sacrifice even an inch of the land to others", Khaleda Zia commented. Begum Zia called upon all nationalist and Islamic forces to be united to foil all sorts of conspiracies for destroying country's independence and sovereignty.

She said BNP is not allowed to talk in Parliament. She also said if the government accepts the demand placed by BNP they would join the parliament.

Begum Zia alleged murder, rape and kidnapping have been increasing alarmingly in the country.

“The Government that can not ensure security of the countrymen has no right to clinch to power”, she said.

The BNP chief said, the frontier of the country has been opened for India, industries are facing closure and there is no control in the border areas. As a result, the people themselves are guarding the border, she further alleged.

“There is no fair price of agricultural products, farmers are starving and famine is imminent in the northern region,” she said.

Begum Zia blamed the ruling party workers for killing Jubo Dal leader Zahid Hossain Mukul in Natore.

Criticising the government for banning meetings on the streets in Dhaka, she said, “They have done it to prevent the opposition from demonstrating against the government misrule.”

About the cancellation of November 7 public holiday, she said the government was trying to distort history.

The BNP Chairperson said the present government has “betrayed the government officials and employees” regarding the implementation of the new national pay-scale violating its eection pledges.

Presided over by the Natore BNP convener Ruhul Quddus Talukder, MP, the meeting was addressed, among others, by Col (retd) Akbar Hossain, MP, Fazlur Rahman Patal, MP, Barrister Aminul Haque, MP, RCC Mayor Mizanur Rahman Minu, Alamgir Kabir, MP, Kazi Golam Morshed, MP, Dr Alauddin, MP, Harunar Rashid, MP, Monzur Hossain, MP, and Nadim Mostofa, MP.

Later, Begum Zia visited the residence of deceased Jubo Dal leader Zahid Hossain Mukul and consoled his family members and also prayed for the salvation of his departed soul.

The Bangladesh Observer
November 16, 1997
Shantu Larma sick
Govt-PCJSS meeting deferred till Nov 25
Chittagong Office

CHITTAGONG, Nov. 15:–The much-awaited seventh round of peace talks between the National Committee for the Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) have been deferred and re-fixed on November 25.

In this connection, a formal letter was sent to the NCCHT Convener and Chief Whip of the Parliament Abul Hasnat Abdullah by the Director of the Publicity Wing of the PCJSS Ushaton Talukder through the Liaison Committee chief Hangshadhaj Chakma on Friday night. But the letter did not give any reason for this unexpected change of date for talks at the last moment.

However, it said, "We (PCJSS) seek to shift the date for talks to November 25 for unavoidable reasons". The NCCHT is sending its replay tomorrow (Sunday) also through the Liaison Committee, official sources said.

The present Awami League Government initiated peace negotiations with the PCJSS, apex political body of guerilla outfit-Shanti Bahini from December 21, 1996.

But a reliable source said that the PCJSS Chairman Jatindra Buddhi Priya Larma alias Shantu Larma who is now stationed at tiny border hamlet Dadukchhari in Panchhari thana has taken seriously ill suddenly. A Liaison Committee representatives who had been to Dadukchhari on Friday also reportedly saw him indisposed and bed-ridden.

With the change of date for talks, the signing of peace treaty between the two sides to end the decades old insurgency also got deferred. "Yet the Government has completed all necessary formalities and taken preparations for signing the treaty", said a senior official of the Special Affairs Division.

Even then as agreed upon between the two sides earlier, eight military camps were dismantled and five more made inoperative in

and around Dadukchhari of Panchhari Thana under hill district Khagrachhari since November 11, five days ahead of scheduled talks on November 16 in the interest of public appearance of the PCJSS leadership. In the changed circumstances, these camps will continue to remain inoperative till the resumptions of talks on November 25.

A ceasefire is in force in the trouble-torn CHT since August 1992. It has now been extended till December 31.

The Bangladesh Observer
November 16, 1997
Non-stop agitation from next day of signing treaty
CHT being leased out to Shanti Bahini: Khaleda

JOYPURHAT, Nov 15:-Leader of the Opposition in Parliament Begum Khaleda Zia today accused the Awami League government of conspiring to cede the Chittagong Hill Tracts to insurgents without any discussion in the Jatiya Sangsad, says UNB.

"The CHT is being leased out to terrorist Shanti Bahini without taking consent of all the 12 tribes and lakhs of Bangalees", she told a huge public meeting at Housing Estate ground here in the afternoon.

The BNP Chairperson warned of non-stop agitation, including hartal, across the country from the next day of signing of any agreement on the CHT, if it goes against the Constitution.

"The government is working on a conspiracy to hand over the entire Chittagong Hill Tracts region to India in the name of so-called peace treaty, violating the country's holy Constitution", she said.

Begum Zia said the Prime Minister was carrying out a propaganda that army would not be called back from the CHT, but in the meantime many permanent and temporary army camps were withdrawn from the troubled region.

"Our army is the symbol of our independence and sovereignty. They should not be kept confined within the barracks. Top protect Bangladesh's territorial integrity, the army must remain in the CHT", she said.

The BNP Chairperson also accused the government of contemplating rigging in the ensuing Union Parishad election. She said that terrorists let loose by the ruling party started threatening the popular candidates.

She further sounded a note of caution to the government that if the UP election is not held in a free and fair manner, her party would wage tougher agitation programme after the eleciton to oust the government.

The Opposition leader lambasted the ruling Awami League, saying that coming to power after 21 years it is eating up everything through mass looting. "They have swallowed the waters of Padma (Ganges)".

"They have come to power only to sell out the country to India", Begum Zia said warning the AL government that it will not be able to remain in power even with the backing of expansionist forces as it has already been isolated from the mainstream population.

Listing development achievements of the BNP government, the former Prime Minister said AL did not want construction of the Jamuna Bridge. They had called hartal on the very day of laying foundation of the bridge.

The meeting addressed, among others, by Lt Col (Retd) Akbar Hossain, Mizanur Rahman Minu, Shahjahan Siraj, Harunur Rashid MP. Shamsuddin Ahmed MP, Alamgir Kabir MP, Abdul Alim MP, Habibur Rahman Habib and Mamudur Rahman Chowdhury. District BNP Convener Mojaher Ali Prodhan presided.

The Bangladesh Observer
November 17, 1997
Section 144 in Khagrachari
Govt for CHT
talks Nov 27
Staff Correspondent

The much awaited seventh round of peace talks between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCISS), the political wing of Shanti Bahini, is likely to be held on November 27.

The Government has proposed the new date for holding the talks as the PCJSS has requested the Government to shift the date from November 16 to November 25.

A Government source says that the Government side can not sit for talks on November 25 as the official negotiators will be busy on the day in connection with the visit of Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif. So, the National Committee on Chittagong Hill Tracts has proposed to hold talks on November 27, the source says.

The PCJSS sent a letter to the Government side through Liaison Committee chief, Hangsaraj Chakma on November 15 requesting the shift in the date without mentioning any reason.

Report from our Chittagong office says: The administration has imposed Section 144 in hill district Khagrachhari for thirteen days with effect from November 16 banning all meeting, rallies and processions there.

Meanwhile, a total of 6,063 tribal refugees is expected to return from south Tripura district of India in the next fourth phase of repatriation due to begin from November 21. The Khagrachhari Deputy Commissioner Muhammd Ismail told newsmen on Saturday night at the hill district headquarter on return from Indian south Tripura district after five days stay there since last Wednesday. The Deputy Commissioner who led a 5-member delegation returned to border town Ramgarh walking down a narrow 225 feet long wooden bridge on the river Feni bordering the two countries.

Apart from the Deputy Commissioner, the delegation members included Khagrachhari Superintendent of Police Aminul Islam, ADM Lehaj Uddin Chowdhury, Ramgarh Thana Nirbahi Officer Jamal A Naser and Matiranga Thana Nirbahi Officer Mir Ahmed.

The Deputy Commissioner said, "The olive branch that held out by the present Government to soothe the tribal refugees finally yielded positive results". On the first day (November 21), five hundred tribals belonging to one hundred families will trek back their homes in Chittagong Hill Tracts (CHT), the Deputy Commissioner disclosed.

The tribal refugees will come back through Khathalchhari-Ramgarh and Tabalchhari-Matiranga border routes. The returnees will get all benefits for their rehabilitation under 20-point package offers to be given by the Government. Each returnee family under the package offer will enjoy benefits to the tune of Taka 35,000.

All preparations have already been completed in this southern hill district Khagrachhari for receiving the repatriated refugees, according to official sources.

After completion of this phase of repatriation, the Jumm Refugees Welfare Association leaders sought a meeting with the members of Task Force on repatriation at Ramgarh on December 5 to review the repatriation process. "And only after that review of successful repatriation and subsequent rehabilitation, the future of further repatriation depends", said the refugee leader Moni Shankar Chakma.

There still remains 34,359 refugees in five camps in Amarpur subdivision and 10,000 in one camp Subrum Subdivision under south Tripura district of India. The Khagrachhari DC returned carrying the lists of all 44,359 refugees belonging to 8,151 families.

At the initial, 50,000 tribal refugees languished in Natunbazar Jatanbari, Karbuk, Thakumbari, Silchari and Subrum camps in India's south Tripura district since 1986. The past governments efforts, however, yielded positive results only on two occasions. On February 15, 17 and 19, 1994 the first batch of 282 tribals came back to their hearths and homes in CHT. The second phase of repatriation of 648 families took place on July 21, 1994. After that, the process of refugee repatriation got stuck up.

Under the present Awami League Government, the first batch of 6,703 tribal refugees belonging to 1,248 families returned to their homes in CHT from March 26 to April 17 this year.

The Bangladesh Observer
November 18, 1997
PCJSS proposes talks on Nov 26

KHAGRACHHARI, Nov 17:–The Parbattya Chattagram Jano Sanghati Samity has agreed to attend the seventh round of peace talks with the government on November 26 in Dhaka, reports BSS.

Convener of the Liaison Committee on hill tract dialogue Hangsadhaj Chakma told the newsmen today here that the Jana Sanghati Samity would send its letter of assent to Dhaka tomorrow in response to the government's proposal for talks.

The peace talks, which was scheduled to be held on November 16 in Dhaka, was deferred in view of the proposal of the Jano Sanghati Samity.

The Bangladesh Observer
November 19, 1997
'India has a design on Ctg region'
Any agreement beyond Constitution to be resisted: Khaleda

MUNSHIGANJ, Nov 18:-BNP Begum Khaleda Zia today lambasted the Awami League government for "conspiring" to rupture the national sovereignty by planning a CHT peace treaty without taking into confidence the Parliament and the people at large, says UNB.

"The government is going ahead with peace overtures on the Chittagong Hill Tracts without any discussion-we will resist any agreement beyond the Constitution," she told a huge public meeting at Muktarpur BSCIC groud here this (Tuesday) afternoon.

Deputy Leader of the Opposition in Parliament Prof. AQM Badruddoza Chowdhury, BNP MPs Shamsul Islam, Mizanur Rahman Sinha and Fazlur Rahman and local leaders also addressed the meeting. District BNP President Abdul Hye MP presided.

Begum Zia said in today's Bangladesh, there is a government which is playing with the fate of the country and its people, "It's regime subservient to India."

The opposition leader accused the government of secretly planning to hand over the country's sovereignty to India on the pretext of signing a peace treaty on CHT.

India for long has a design on the Chittagong region, Begum Zia alleged, and "that's why, she (India) had abetted to bring this puppet regime back into power through vote rigging."

"We and the people will see what agreement (on CHT) they sign," she said and warned of tougher agitation programmes in case of any accord against the country's interest.

In this regard, the BNP Chairperson reiterated her call for a united movement by the democratic nationalist, Islamic and other patriotic forces.

Begum Zia said the ruling party did not allow the opposition MPs to speak when they were in Parliament to suppress the voice of dissent against its misdeeds.

This government is busy making fortunes for themselves, rather than doing anything for the progress of the country, she said and alleged that they are smuggling out thousands of crores of Taka to foreign countries.

The former Prime Minister cautioned that once they are out of power, members of "this corrupt regime" will be tried on this soil.

The Awami League government is making "advanced announcement of victory in the ensuing Union Parishad elections," she said "This is funny."

Begum Zia blamed the government for the deteriorating law and order situation as manifested in rising incidents of stealing,

dacoity, snatching and terrorism across the country. It is not allowing the administration and the police to act impartially, she said.

"Today, the nationalist forces have the national flag in hand while the Awami League regime has in their hands the shackle of bondage-the people will have to choose either of the two."

Expressing her grave concern over the country's financial predicament under the AL government, the BNP leader said. "The people have no money. Mills and factories are facing closure."

To come out of this critical juncture, she said, farmers, labourers and various other segments of the people should be united and launch a movement against the government.

The Bangladesh Observer
November 20, 1997
Chakma refugees want to return in batches

NEW DELHI, Nov 19:–Despite Bangladesh request to Indian government to send back more than 44,000 Chakma tribal refugees from the Indian state of Tripura in "one go" to settle the problem permanently without any delay. The Chakma leaders want to send them in batches, in Indian news agency reported from Agartala today, says BSS.

The Bangladesh governments has taken up at the highest level with the Indian government the issue of repatriation of the Chakma refugees and expressed its willingness to settle them in Chittagong area immediately, United News of India (UNI) said today.

However, the Chakma leaders want to return in batches and have decided to send another group of 6,300 refugees to Bangladesh on November 21, the agency said quoting sources.

The UNI said, the Indian government is receiving good cooperation from the Bangladesh government and added, this can be guessed from the fact that not (not) a single refugee who returned to Bangladesh came back after repatriation.

So far nearly 12,000 Chakma refugees have gone back to Bangladesh, the news agency report said.

The report also admitted that of late there was no influx of Chakmas in Tripura. Hopefully the Chakma problem is expected to be over in future.

It said a five-member official team from Bangladesh during its recent stay in Tripura held talks with refugee leaders and the state government officials to finalise modalities for the repatriation of refugees.

The Bangladesh Observer
November 21, 1997
Repatriation of tribal refugees resumes today
Chittagong Office

CHITTAGONG, Nov. 20:–The fourth phase of repatriation of tribal refugees from South Tripura district of India will resume tomorrow (Friday).

A total of 6,063 tribal refugees are expected to return to their homes in Chittagong Hill Tracts (CHT) during this phase of repatriation, said Khagrachhari Deputy Commissioner Mohammad Ismail.

The district administration hopes 10 receive one thousand returnees belonging to 200 families a day.

All preparations have already been completed in this southern hill district Khagrachhari for receiving the repatriated refugees.

The tribal refugees will come back through Khathalchhari-Ramgarh and Tabalchhari-Matiranga border routes.

The first group of returnees are due to trek back to border town Ramgarh in the country's southern hill district Khagrachhari walking down a narrow 225 feet long wooden bridge on the river Feni bordering the two countries.

The returnees will get all benefits for their rehabilitation under 20-point package offers to be given by the government. Each returnee family under the package offer will enjoy benefits to the tune of Taka 35,000.

The 6,063 tribals who are due to return are the part of 35,359 refugees now encamped in six camps in South Tripura district of India. Of the total refugees, 34,359 are in five camps in Amarpur subdivision and 10,000 in one camp in Subrum subdivision under South Tripura district of India.

The Khagrachhari Deputy Commissioner is now in possession of the lists of 35,359 refugees belonging to 8,151 families.

At the initial, 50,000 tribal refugees languished in Natunbazar, Jatanbari, Karbuk, Thakumbari, Silehhari and Subrum camps in India's South Tripura district since 1986. The past governments efforts, however, yielded positive results only on two occasions. On February 15, 17 and 19, 1994, the first batch of 282 tribals came back to their homes in CHT. The second phase of repatriation of 648 families took place on July 21, 1994. After that, the process of refugee repatriation got stuck up.

Under the present Awami League government, the first batch of 6,703 tribal refugees belonging to 1,248 families returned to their homes in CHT from March 26 to April 17 this year.

The Bangladesh Observer
November 22, 1997
Citizens rally
for CHT treaty
Nov 26
Staff Correspondent

A grand "citizen's rally" will be organised in the afternoon on November 26 at the premises of the Central Shaheed Minar in the city in support of the peace treaty to be signed soon to establish permanent peace in Chittagong Hill Tracts.

This was decided at a meeting of leading professional leaders, educationists, intellectuals and eminent elite held on Friday at 6/A, Dhanmondi Bhaban with Justice KM Sobhan in the chair.

The meeting in a resolution said the present government has been trying relentlessly to resolve the two decade old crisis of Chittagong Hill region since the very day of its coming to power and it has already succeeded in creating bright possibilities to settle the issue through signing a peace treaty. But it noted with deep concern that BNP along with some identified anti-liberation elements have been opposing this “peace process move” of the government voicing that they would give countrywide hartal call on the day the peace treaty is signed.

It further said solution of any national crisis is the great expectation of all peace-loving people of the country but any negative stand against such bright prospect of the nation by BNP will naturally instigate anger among all.

The meeting said those who are opposing the peace treaty do not want peace in CHT and they are out to make propaganda

saying that our sovereignty and independence will be destroyed if this treaty is signed. The present peace talks are the continuation of those initiated by the governments of General Ershad and Begum Khaleda Zia, it pointed out.

It urged all those who are opposing it, to give up their anti-peace activities and play a vital role to help the government sign the treaty.

It also called upon all to attend the rally and make it a success.

The meeting was attended, among others, by Syed Hasan Imam, Dr Borhanuddin Khan Jahangir, Dr M Akahteruzzaman, Dr Rashid-e Mahbub, Dr Harun-Or-Rashid, Dr Mazharul Islam, Prof Mahfuja Khanam, Dr Mostafa Chowdhury, Barrister Amirul Islam, Prof Abdul Mannan Chowdhury, Dr Mizanur Rahman, Ramendu Majumder, Dr Nim Chandra Bhowmik, journalist Iqbal Sobhan Chowdhury, Aslam Sani, Abdul Ahad Chowdhury, Kazi Aref Ahmed and Golam Quddus.

The Bangladesh Observer
November 22, 1997
7-party threatens
movement if
unconstitutional
accord signed

The seven-party alliance led by main Opposition BNP on Friday warned of waging tough agitation, including hartal, if the government signs an “anti-constitution” agreement on the Chittagong Hill Tracts issue, reports UNB.

The warning came from a joint meeting of BNP, Jamaat, Jatiya Party (Z-M), Democratic League, National Democratic Alliance, Progressive Nationalist Party and JAGPA held at the Leader of the Opposition's Minto Road residence.

Presided over by BNP leader Barrister Abdus Salam Talukdar, the meeting was attended among others, by Shamsul Islam, Kazi Zafar Ahmed, Shamim Al Mamun, Abdul Quader Mollah, Advocate Mujibur Rahman, Oli Ahad, Shafiul Alm Prodhan, Shawkat Hossain Nilu and ASM Solaiman.

After holding a threadbare discussion on the CHT issue, the meeting observed that no resolution of the problem would be acceptable to the people without consent of all the groups of people residing in the hill tracts.

It decided that the seven-party alliance would enforce tough action programme from a day after the planned agreement, if it goes against the country's integrity.

The meeting in a resolution demanded withdrawal of cases filed against BNP leaders Salahuddin Quader Chowdhury and Giasuddin Quader Chowdhury, JP leader Kazi Zafar Ahmed and JAGPA leader Shafiul Alam Prodhan.

The Bangladesh Observer
November 22, 1997
Repatriation of tribal refugees resume
Chittagong Office

RAMGARH, Nov 21:–The first group comprising 574 members of one hundred tribal families of Chittagong Hill Tracts (CHT) arrived here, 85 km off Chittagong city today from the refugee camps of the Indian state of Tripura.

"I feel relieved coming back home", said Shukamal Chakma (40), a school teacher when he first set foot on home soil at 1.30 pm walking down a narrow 225 long wooden bridge over the Feni river bordering the two countries. Following his family of seven members, the tribal men, women and children steadily started streaming into home territory at border town Ramgarh of Khagrachhari district.

Some 6,063 tribal refugees will be repatriated nine days from the six refugee camps in the fourth phase under the joint declaration made by the National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

Abul Hasnat Abdullah, Chief Whip of Jatiya Sangsad and Chairman of NCCHT along with the ministers of Tripura state government, several members of Jatiya Sangsad and tribal leaders brought the refugee group from Kathalchhari of India to Ramgarh through the bridge erected over the river for the repatriation of the refugees. Hundreds of people gathered on both sides of the river to bid farewell and welcome the repatriated refugees.

The repatriation was preceded by two different functions, organised at Kathalchhari and Ramgarh by the Indian and Bangladesh authorities respectively.

The function was addressed, among others, by the Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, Tripura state Deputy Chief Minister Baiddya Nath Majumder, Tripura state Power Minister Keshob Majumder, Tripura state Sports Minister Jiten Chowdhury and South Tripura District Magistrate Lok Ranjan.

Abul Hasnat Abdullah in his speech said that the Bangladesh government would do everything possible for rehabilitating the repatriated refugees according to the 20-point agreement.

Mr Abdullah said, "We have hundred percent commitment and sincerity towards solving their problem and this has already been demonstrated in the steps taken". He called upon the rest of the refugees to come back to their motherland.

Speaking at the function Baiddaya Nath Majumder said, his country and Bangladesh had solved two major problems–the Ganges water sharing and refugee repatriation–through negotiations. "I hope the remaining problems will be solved in near future to further strengthen the solidarity of the two friendly countries", he added.

He hoped that he cordiality shown by the Bangladesh Government in initiating the repatriation process would continue and the refugees would live in peace in their homeland.

The function was also attended, among others, by Chittagong city Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury, Chairman of Task Force on refugee repatriation, Kalpa Ranjan Chakma MP, Engineer Mosharraf Hossain MP, Dipankar Talukder MP, member of the NCCHT Ataur Rahman Khan Kaiser, Khagrachhari Local Government Council Chairman Samiron Dewan, Bandarban Local Government Council Chairman Ching Qui Rowaja and Special Affairs Division Secretary Kazi Golam Rahman.

On arrival here every refugee got a ration card for collecting free food and other necessities. A makeshift hospital has been set up in cooperation with the Bangladesh Red Crescent Society for treating the sick refugees.

The provision of 20-point agreement included security to the returnees, allocation of cash, agriculture and food grants, providing them with house construction materials, giving back their own land, writing off arrear loans, restoration of religious places, taking initiatives for creating job opportunities and extending education facilities to the tribal children.

The tribal refugee problems, which began in 60s has been handled politically since 1982. Some 5,000 refugees were repatriated in two phases in 1994, 6,703 in March-April this year and a few of them came back to the country voluntarily.

The Bangladesh Observer
November 22, 1997
Political solution of CHT problem just around corner : PM

Prime Minister Sheikh Hasina on Friday said a political solution of the longstanding Chittagong Hill Tracts problem is just around the corner, reports UNB.

"We have reached the doorstep of a solution of the CHT problem through discussion with Santibahini realising the fact that political solution is the real solution", she said at a reception at Senakunja in the evening on the occasion of Armed Forces Day.

The CHT problem will be resolved under constitutional framework maintaining the integrity of the country. Hasina said, "Our government has taken sincere and effective steps to resolve the long running problem."

The Prime Minister said for last two decades a war-like situation is prevailing in the Hill Tracts region, where hundreds of people, including members of the Armed Forces, have lost their lives.

The problem has become a barrier to the country's stability and economic progress, she said and sought cooperation from all, including political parties and other organisations, for an early solution of the problem.

The initiative of the government for resolving the problem has been widely acclaimed at home and abroad, Hasina said and added that opposition members were also included in the concerned committee.

The Prime Minister said the Armed Forces are a national institution and the government has taken adequate measures for the development and welfare of the Armed Forces.

She said the government not only took steps for procuring military hardwares and developing the forces but also took steps for enhancing their professional skills.

Hasina announced in the meeting that work on setting up of National Defence College as well as Military Engineering and Medical Colleges will be completed by next year.

Leader of the Opposition Begum Khaleda Zia, BNP leaders Abdul Mannan Bhuiyan and Saifur Rahman, Jatiya Party leaders HM Ershad and Raushan Ershad as well as leaders of other political parties attended the reception at the decorated lawn of Senakunja

Ministers, senior ruling party leaders, MPs, Chiefs of three services, diplomats, high civil and military officials and elite of the city were present.

As the Prime Minister arrived at Senakunja and ascended on the podium national anthem was played.

Later Hasina exchanged pleasantries with opposition leader Khaleda Zia and other guests at the reception.

In her speech, the Prime Minister recalled the contribution of martyrs of the Liberation War, particularly members of the Armed Forces.

She said the Armed Forces built by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has now turned into a disciplined and organised force.

Members of the Armed Forces were praised for their welfare activities at home and abroad, She said.

The Bangladesh Observer
November 23, 1997
848 more tribal refugees return

KHAGRACHHARI, Nov. 22:– Some 848 tribal refugees returned to their homes in Chittagong Hill Tracts from camps of Indian State of Tripura today (Saturday), the second day of the fourth phase of repatriation, reports UNB.

A total of 850 tribals of 150 families were scheduled to come back but two of them did not turn up due to illness, officials said.

With this, the total number returnees stood at 1,425 in two days. Some 577 tribals of 100 families returned Friday on the first day of current repatriation. The process will continue till November 30.

Additional Deputy Commissioner (Revenue) Nurunnabi Chowdhury and TNO of Matiranga thana Mir Nasir received the returnees at Tabalchhari transit point.

On arrival at the reception camp, the tribals were provided with government facilities, including money and three-month ration, and sent to their homesteads.

Some 909 tribals of 150 families are expected to come back tomorrow (Sunday) through Tabalchhari transit point.

The Bangladesh Observer
November 24, 1997
CHT accord
Nirmul body
to hold peace
rally tomorrow
Staff Correspondent

The National Coordination Committee for Elimination of the Killers and Collaborators of '71 and Implementation of the Spirit of Liberation War (Nirmul Committee) will hold a peace rally at the Central Shaheed Minar at 4 pm tomorrow (Tuesday) to mobilise public support in favour of proposed peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

The Nirmul Committee will also arrange similar programme in the three hill districts on December 1, 2 and 3 and in Chittagong city on December 4 to strengthen unity among Bangalees and tribals to establish a permanent peace in the hill region of the country.

This decision was taken in an adjourned meeting of the Nirmul Committee on Sunday. Syed Hasan Imam, Convener of the Committee presided over the meeting, says a Press release.

The meeting in a resolution bitterly criticised the anti-liberation communal force for spreading propaganda against the proposed peace agreement and said that this "cvil force" was conspiring to push the country towards a "civil war" by creating division among the nation. The anti liberation force was trying to fish in the troubled water at a time when the country was struggling to achieve economic development being imbued with the spirit of liberation war, the meeting added.

The meeting called upon all patriotic people to build united resistance against the conspiracy of the anti liberation force.

The meeting was addressed, among others, by Prof Abdul Mannan Chowdhury, Kazi Aref Ahmed, Mirza Sultan Raza, Morshed Ali, Shamsunnahar Siddique, Nur Mohammad, Golam Kuddus, Shamim Akhter, Kazi Mukul, Kamal Pasha Chowdhury and Nazrul Islam Rumel.

The Bangladesh Observer
November 24, 1997
924 more tribal
refugees return

KHAGRAHHARI, Nov. 23:– A total of 924 tribal refugees returned home today on the third day of the current repatriation process to be warmly welcomed by fellow people and officials, reports BSS.

A total of 900 tribesmen belonging to 150 families were due to be repatriated today but the eagerness of the tribesmen, who were waiting for more than a decade for an amicable atmosphere for their return, in creased the figure, officials said.

With the repatriation of the third group of the refugees from their makeshift camps in Indian State of Tripura in three days, the number of the returnees stood at 2,346.

On arrival of the tribesmen at the Tabalchhari border point, each family was provided Taka 21,000 in cash, three months ration and other supports as part of a package of 20 incentives pledged by the government.

Officials said the government has so far distributed Taka 83.79 lakh in cash and other supports to 399 repatriated families.

A batch of more than 6,000 refugees are scheduled to come back home by the end of this month as the refugee leaders earlier said details of the repatriation of the next batch would be fixed later after discussion with Bangladesh officials.

But Tribal Association (WRTA) Chief Upendra Lal Chakma announced on the first day of the repatriation on Friday that another batch some 6,000 tribesmen would follow soon after repatriation of the current batch without any further discussion.

Officials and tribal leaders earlier said nearly 45,000 refugees await repatriation in batches from different camps in Tripura. The current fourth phase, expectedly the final one, of the repatriation process started ahead of talks with Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) aimed at signing a peace agreement to end the decades-old insurgency in the hills.

The talks are scheduled to start on November 26.

The Bangladesh Observer
November 24, 1997
Govt wants to handover
CHT resources
to India: Khaleda

KISHOREGANJ, Nov. 23:- BNP Chairperson and Leader of the Opposition Begum Khaleda Zia today alleged that Awami League government wants to make the country a vessel state of India, reports UNB.

"The government wants to handover the huge natural resources of CHT and Chittagong Port to India by signing a CHT accord," she said addressing a big public meeting at the local stadium this afternoon.

Begum Zia threatened a relentless movement to oust the government if it fails to hold the ensuing UP elections in a free and fair manner and sign any anti-constitutional treaty with the outlawed Shanti Bahini.

"We shed blood to achieve the country's independence and we shall shed blood again, if necessary, to protect every inch of our soil from any foreign aggression," she added.

Begum Zia said the ruling party before coming to power had talked tall on the welfare of the farmers, but after assuming power it raised the prices of all agri-inputs, including fertilizer and failed to ensure fair price of agricultural produce.

She criticised the government for harassing poor peasants under certificate cases for their outstanding small loans.

The former Prime Minister urged the law enforcing agencies to discharge their responsibilities neutrally and not to harass any people at the directive of the government.

She warned that if the ruling party, tries to turn the UP election results in its favour by rigging, a non-stop movement throughout the country will be waged to topple the government.

Begum Zia said a good number of BNP leaders and workers were killed and hundreds were arrested during the 17-month rule of the AL government.

Seventeen lawyers of the local Bar Council, including Jatiya Party leader Nasiruddin Ahmed Shahjahan, joined BNP today expressing their allegiance to the leadership of Begum Zia.

The rally was addressed by BNP leaders Prof Jahanara Begum, Habibul Islam Bhuyian, Mojibul Haque Chunnu and local leader Maj (Retd) Akteruzzaman MP presided.

The Bangladesh Observer
November 25, 1997
871 more return
List of 6388
tribals sent for
next repatriation

KHAGRACHHARI, Nov. 24:– Tribal Refugees Welfare Association (TRWA) has sent a list of 6,388 tribes belonging to 1,361 families for repatriation during the fifth batch to start immediately after the return home of the current batch by the end of this month, officials said today, reports BSS.

Deputy Commissioner of Khagrachhari Mohammad Ismail told BSS that the refugee leaders has sent the list after consulting the authorities of the Indian state of Tripura expressing their eagerness to continue the repatriation process in batches without any impasse after the return of current batch of more than 6,000 refugees.

Meanwhile, a total of 871 tribesmen in 148 families today returned come from Tripura on the fourth day of the refugee repatriation. With this 3,217 tribesmen in 547 families came back since November 21.

A batch of more than 6,000 tribesmen are due to return home by the end of this month.

Officials said despite being the weekly holiday, repatriation would continue on November 28, changing an early decision to stop the process on the day for a recess as both the tribal leaders and the officials are now trying to quicken the repatriation.

The official and tribal sources said they expect that the repatriation would continue until the rest of the total 44,359 refugees return home.

The Deputy Commissioner said most of the refugees returned home so far, have started constructing their houses with all out assistances from the government to restart their life in the homeland.

The government is providing a package of 20 incentives including cash money, ration and house building materials to the returnees. Meanwhile, chief of Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) are rived at the remote Duduckchhari frontier of the district from his hideout along with his aides to be flown to Dhaka on Wednesday.

The sixth round of talks between PCJSS and the National Committee on Chittagong Hill Tracts, aimed at signing a peace agreement to end the nearly two decade old trouble in the 13,000 kilometer hill tracts region, scheduled to start on Wednesday.

The repatriation of the tribal refugees, who left the country when the insurgency flared up in 1980's, began ahead of the peace talks as the National Committee and the PCJSS in September announced that they have reached a draft treaty to end the problem.

The Bangladesh Observer
November 25, 1997
JSD to help implement CHT accord
Staff Correspondent

President of Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) and Shipping Minister A.S.M. Abdur Rab on Monday called for greater unity among the pro-liberation forces to thwart the "conspiracy" of anti-liberation, fundamentalist and reactionary forces against the country and the people.

Addressing a discussion organised by the JSD at Paltan Maidan to mark the silver jubilee of the organisation, he said that JSD was friend of the pro-liberation forces and it would stay with the pro-liberation fronts.

He said that the JSD had been reunited and reconstituted with a view to upholding the values and spirit of the liberation war.

Shipping Minister Demanded Permanent mechanism for governing the country on the basis of national consensus, appointment of ombudsman and granting autonomy to state owned radio and television.

The discussion was also addressed by JSD General Secretary Hassanul Haque Inu, members of the reconstituted central committee Kazi Aref Ahmed, Sharif Nurul Ambia, Nure Alam Ziku, Moinuddin Khan Badal and Syed Jafar Sazzad.

The speakers emphasised the need for unity among pro-liberation forces to counter the rise and "conspiracy" of the anti-liberation, fundamentalist and reactionary forces. They said that JSD would never "compromise" with the anti-liberation forces. They vowed to keep up their fight against the anti-liberation forces and demanded implementation of the "verdict of the people's court (Gano Adalat) against Golam Azam".

They said that when the anti-liberation forces were united–the pro-liberation forces were disunited. They said that anti-liberation forces had forged unity to thwart the independence and sovereignty of the country.

Welcoming the Government's peace initiative they said that they would support and extend their cooperation to the implementation of the peace agreement on the Chittagong Hill Tracts region. They criticised those parties who were against the signing of peace treaty between the Government and Parbattaya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS). They called for placing the peace agreement in Parliament after the signing for discussion and Making it public to defuse confusion.

JSD leaders vowed to establish an exploitation-free, secular and democratic society in Bangladesh.

They regretted that after 25 years of independence the spirit of the liberation war had yet to be established.

The Bangladesh Observer
November 25, 1997
Ershad's call to place draft
CHT treaty before JS
Staff Correspondent

Former President and Jatiya Party Chairman Hossain Mohammad Ershad demanded of the government to place the draft of the peace treaty on Chittagong Hill Tracts before Jatiya Sangsad.

Addressing a Press conference at his Baridhara Office on Monday afternoon, Ershad said that the peace treaty on Chittagong Hill Tracts must be drawn up in the light of the constitution. This is what people want, he claimed.

Jatiya Party Chairman thought presence of Armed Forces in the Hill Tracts is necessary in the interest of the peace and tranquility in the area. He, however, said there was no need for temporary outpost of the Armed Forces in the Hill Tracts in view of restoration of peace. But permanent cantonments must be there, Ershad stated.

The former President suggested formal surrender of arms to the President or the Prime Minister by the members of the armed cadres of Shanti Bahini at a formal function. This he said was necessary to dispel all doubts, fear and apprehension from the

minds of people living in the Hill Tracts. He also demanded rehabilitation of the Shanti Bahini members.

Underlining the urgency of concluding a peace treaty on Chittagong Hill Tracts, he said, “its a must”. “Those who are opposing it are no friend of the country,” he added. “Chittagong Hill Tracts constitute 5000 square miles of our land. Mass violence bloodshed, killing and conflict are not in the interest of the country. We want peace, stability and economic development in the troubled hill tracts,” Ershad observed.

He said in the past Ziaur Rahman's Government tried to establish peace without any success in the Hill Tracts. The Jatiya Party government tried in vain to resolve the problem and establish peace in Hill Tracts. So did Begum Khaleda Zia's Government. The signing of peace treaty with Shanti Bahini and restoration of peace in the Hill Tracts will be a plus point for Awami League government. This has caused a heart burning to BNP which is running will to oppose the proposed peace treaty, JP Chief said.

He said his party stood for a peace treaty on the basis of equality. Making a dig at a political party who says the peace treaty on Chittagong Hill Tracts would be tantamount to sell out of Hill Tracts to India, he said they were not explaining how it was being sold out.

Criticising Zia administrations policy to settle Bangalees on land belonging to tribal people, Ershad said it was not a “correct policy”. In response to a question, he said as a Chief of Army Stuff he had to implement the policy without questioning it.

In reply to a question, Ershad stated in categorical terms that India was in no way involved directly or indirectly in Bangladesh government's efforts to conclude peace treaty with Shanti Bahani.

In reply to another question, Jatiya Party Chief said neither Ziaur Rahman's Government nor Khaleda's Government nor his own could fulfill Shanti Bahini's demand for autonomy. Having realised the futility of this demand, they have entered into a serious negotiation with Awami League government to league conclude a peace treaty, Ershad said.

The Bangladesh Observer

November 26, 1997

UN report

Accord to ensure CHT peace

Ashik Chowdhury

A recent report of the United Nations (UN) on Bangladesh observed that the Government's efforts for signing of an agreement with the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) would ensure peace in the Chittagong Hill Tracts (CHT).

The seventh round meeting between the National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and the PCJSS begins today (Wednesday). It is expected that the Government and the PCJSS will sign the peace agreement at the meeting to end the two decades of insurgency in the country's south-east-region.

The UN report viewed that the Government was moving towards settlement of the long-running dispute in the three hill districts– Bandarban, Rangamati and Khagrachari.

The report said that a social harmony would be established between the tribal and the non-tribe settlers after the agreement. Further more, it indicated that the agreement would pave the way for integrated development in the hills.

The report titled “Dancing Horizon” has also brought into focus the current affairs of Bangladesh including politics, economics, education, health and population, employment, environmental and governance.

Recommending the past general elections as “fair and democratic and the most positive evidence of progress on the political horizon,” the report said the elections had not only just elected new parliaments, but also upheld the public participation. As a result, many MPs now feel the need to travel around the villages soliciting support.

After the elections, people can now see parliamentary debates on television–what turned out to be the most popular programme, it cited.

Although the political situation was on progress after the general elections, the report observed that many aspects of the political and administrative system remained mired in the bureaucracy and corruption. It suggested exercise of parliamentary democracy for transforming Bangladesh into a modern state.

"One of the greatest challenge for the future will be to throw open the windows of public administration, and create modern institutions that work openly and transparently, based on the exercise of power and patronage and more on clear system of control and accountability," the UN report observed.

It emphasised the need for establishing local governments saying that the country of over 12 crore people can not be run "by decree from Dhaka."

On economic development, the report has painted a gloomy picture. According to it, the extreme poor people of the country are earning only Taka 215 per month and they have to wait at least 23 years to raise their income above the poverty line.

For alleviating poverty, the Government has earmarked 7 per cent growth. But, the UN report said "only growth of at least 8 per cent could drive Bangladesh forward with any sustained momentum."

The report also suggested to build a strong domestic economy which would facilitate people to generate income by exploring new sources.

The Bangladesh Observer
November 26, 1997
151 citizens hail govt for CHT treaty

A total of 151 political and cultural leaders and activists on Tuesday congratulated the government for trying to resolve the long-drawn crisis in the Chittagong Hill Tracts by signing the proposed peace agreement, reports BSS.

In a joint statement on Tuesday the signatories said all the past governments had tried to delay the solution of the crisis through conspiracies and had put the army of the country face to face with the people to achieve their selfish ends.

They also urged the people to strongly oppose the conspiracies of a particular quarter to undo the peace treaty. The signatories called upon the cultural activists, pro-liberation forces and lovers of Bangabandhu to raise their voice against such conspiracies.

The signatories among others, are Mufazzal Hussain Chowdhury (Maya), MP, Prof. Panna Kaiser, MP, Alhaj Maqbul Hussain, MP Sayed Hasan Imam, Samar Das, Prof. Abdul Manan Chowdhury, Dr. Inamul Huq, Jamaluddin Hussain, Ajit Roy, Moloy Kumar Ganguli, Raushan Ara Hussain, Kobori Sarwar, Habibur Rahman Milon, Golam Sarwar, Shafiqur Rahman, Abul Kalam Azad, Nirmalendu Goon, Mahadev Saha, Refiq Azad, Kazi Abu Zafar Siddiqi, Lucky Inam, Khaleda Edib Chowdhury, Lutfun Nahar Lata, Mita Huq, Tarana Halim, Badal Rahman, Liaqat Ali Lucky, Kamal Chowdhury, Dr. Arup Ratan Chowdhury, Rashida Mahiuddin, Saifullah Mahmud Dulal, Rupa Chakrabarti, Zafar Wazed, Timir Dutta, Tariq Sujat, Choyon Islam, Salam Chowdhury, Halim Azad, Salauddin Badal and Sheikh Abdul Quader.

The Bangladesh Observer
November 27, 1997
CHT peace talks resume
Structure of regional Councils discussed
Staff Correspondent

The seventh round of peace talks between the Government and Parbatiya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of the armed Shanti Bahini, began at the state guest house Padma in Dhaka on Wednesday.

On the first day of the talks on Wednesday, leaders of the National Committee on Chittagong Hill Tracts and PCJSS discussed some unresolved issues like the structure and functions of regional council, rehabilitation of the members of the armed Shanti Bahini into civil and police administration, meeting sources said. The leaders of both sides will meet again today (Thursday) morning.

If both sides can reach a consensus in the ongoing meeting, there is every possiblity of signing a Memorandum Of Understanding and later the final peace agreement will be signed at a ceremony sources involved in the peace process said. One insider says that the Memorandum Of Understanding may be tabled in a special session of parliament for discussion before signing the peace agreement.

Wednesday's meeting was divided into two sessions. At the inaugural session, held at 12:30 p.m. National Committee Chairman Chief Whip Abul Hasnat Abdullah and members Engineer Mosharraf Hossain MP, Advocate Fazle Rabbi MP, Kalpa Ranjan Chakma MP, Dipankar Talukder MP, Bir Bahadur MP, Alaur Rahman Kaiser, Divisional Commissioner of Chittagong Shakhawat Hossain and Khagrachhari Deputy Commissioner Ismail Hossain were present on behalf of the government while Jotindra Bodhi

Priya Larma alias Shantu Larma, Goutam Chakma, Rupayan Dewan, Babul Chakma and two other tribal leaders were present on behalf of the PCJSS.

At the inaugural meeting, Abul Hasnat Abdullah and Shantu Larma made introductory statements. The second session that began at 3 pm. was a closed door one in which Abul Hasnat Abdullah, Kalparanjan Chakma and Ataur Rahman Kaiser of the National Committee and Shantu Larma, Goutam Chakma and Rupayan Dewan of the PCJSS took part, meeting sources said.

Earlier, the PCJSS leaders were flown in to Dhaka by an Air Force helicopter provided by the government from Daduchhari under Panchhari of Khagrachhari district.

However, in the four-hour closed door meeting leaders of both sides discussed unsettled issues, sources said adding the consensus was likely to be reached in following meetings. The meeting will begin today (Thursday) at "Padma" at 10 in the morning.

This is the seventh round under the present government. The last sixth round four-day talks between two sides were held in Dhaka from September 14 to 17.

The Bangladesh Observer
November 27, 1997
Citizens rally supports CHT peace treaty
Staff Correspondent

Speakers at a citizens' rally on Wednesday expressed solidarity with the proposed peace treaty on Chittagong hill tracts and vowed to resist conspiracies against the government's initiatives to make a peaceful solution to the long-drawn problem of the country's hill region.

"No more bloodshed. Bengalees and tribals belong to this country and we want to live together in a brotherly atmosphere. We want peace, we need unity because we want to build this country with the spirit of the Liberation War to face the challenges of 21st century" the speakers said at the citizens' rally at the Central Shaheed Minar on Wednesday afternoon.

Organised in Support of the ongoing peace process on Chittagong Hill tracts, the citizens, rally was participated by a large number of intellectuals, educationists, poets, writers, doctors, journalists, Lawyers and professionals.

A large number of people from all walks of life joined the rally with banners and festoons.

Prof. Kabir Chowdhury Chaired the rally while Justics K.M. Sobhan, Nirmul Committee Convener Syed Hasan Imam, Chairman of the Central Command Council of Bangladesh Muktijoddha Sangsad Principal Ahad Chowdhury, Pro-VC of the National University Borhanuddin Khan Jahangir, Shamsunnaher Siddique, Barrister Amirul Islam, Prof. Momtaj Uddin Ahmed, Prakrichi Secretary General Abdur Razzaq, General Secretary of college University Teachers Association Principal Mohammad Shahjahan, Advocate Gaziul Haq, President of Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) Iqbal Sobhan Chowdhury, Nirmul Committee Convener Prof. Abdul Mannan Chowdhury, General secretary of Dhaka University Teachers Association (DUTA) Dr. Hossain Munsur, Dr. Shamsul Huda Haroon and Dr. Imamul Huq, among others, addressed the rally.

Justice K.M. Sobhan said that a vasted quarter was hatching conspiracy against the proposed peace treaty on Chittagong Hill Tracts because they were using this region for their ill purposes including illegal trafficking of arms and drugs.

He said that conspirators were active in and outside the country because they did not want development of the country. He said that after signing of the proposed treaty a peaceful atmosphere would be established in the country and that would help ensure the economic development. He called upon all democracy loving people to resist the conspiracy against the ongoing peace process on Chittagong Hill Tracts.

Syed Hasan Imam said that BNP in collaboration with anti-liberation communal forces was trying to create a chaotic situation capitalising the Chittagong Hill Tract issues. He said that as Jamaat Islami and its allies did not want the independence of Bangladesh they now does not sccept the proposed peace treaty in initiated by the pro-liberation Awami League government. He called upon all pro-liberation forces to remain alert against the conspiracy of "the so-called nationalist force".

Principal Abdul Ahad Chowdhury said that we liberated the country to live Muslims, Hindus and Tribals together in a brotherly atmosphere. Expressing his solidarity with the ongoing peace procession on Chittagong hill tracts, the chairman of the Central

Command Council of the Muktijoddha Sangsad Ahad Chowdhury said it is hard to understand that some people of the country could oppose the peace initiatives that would stop bloodshed.

Barrister Amirul Islam in his speech said that the then Pakistan government had created the Chittagong Hill Tracts Problems by Denying their social and economic rights. Now the collaborators of the occupied Pakistanis were hatching conspiracy to create a chaotic situation in the hill region, he added. Mr. Amirul Islam said it is very regrettable that a people's representative and former Prime Minister Khaleda Zia joined with those conspirators and was misguiding people.

Prof. Momtaj Uddin Ahmed narrated the experience of his recent visit to three hill districts and said tribals and Bengalees living in the hill region were in favour of the proposed peace treaty because they wont to live together there. He said that the anti-liberation Jamaat and its ally BNP were distributing arms and money to foil the ongoing peace process.

BFUJ President Iqbal Sobhan Chowdhury said the whole nation wants peace in Chittagong Hill Tracts and the vested quarters who had opposed the country's liberation war were hatching conspiracy to the government's peace initiatives. Hailing the on going peace process. Iqbal Sobhan Chowdhury said the present government under the leadership of Sheikh Hasina had signed the historic Ganges water treaty before the victory day last year and now this year the government is going to sign another historic peace agreement to restore a permanent peace in the country's hill region.

Member-secretary of Nirmul Committec Prof. Abdul Mannan Chowdhury expressed his Solidarity with the ongoing peace procession on Chittagong Hill Tracts and said that vested quarters were trying to foil this. Government's initiatives to keep alive wor-like situation in Chittagong Hill Tracts.

The Bangladesh Observer
November 27, 1997
Peace rally held in Ctg city
Chittagong Office

CHITTAGONG, Nov. 26:–A big peace procession was taken out in the port city today to garner mass support for the possible peace accord on the Chittagong Hill Tracts (CHT) problems.

The processionists in thousands paraded the main thoroughfares of the city. They carrying festoons, placards and banners walked all the way through Laldighipara, Shahid Suhrawardy Road, Station Road, Battali Road, Jublee Road, Enayet Bazar, Momin Road, Anderkilla and K.C Dey Road chanting full-throated slogans in support of peace accord. The Chittagong city Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury led the big peace procession. The procession started from Central Shaheed Minar Square.

Before the start of the procession, a rally was also held at Shaheed Minar Square with Advocate Ibrahim Hossain Bubul at the chair. Among the speakers were city Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury Chittagong University Pro-Vice Chancellor Professor Abu Yusuf Alam and Bandraban Local Government Council Chairman Thoaing Cha Pruc Muster.

The speakers strongly underscored the need for signing a peace treaty with the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity for a lasting peace in the battle scared Chittagong Hill Tracks.

The Bangladesh Observer
November 28, 1997
Draft peace treaty on CHT at final stage
Staff Correspondent

The seventh round of Peace talks between the National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on the second day in the capital made a headway to reach a consensus on the draft “peace agreement” which will end the two-decade long insurgency in the three hill districts in Chittagong.

The much talked about peace agreement on Chittagong Hill Tracts (CHT) is now almost set as Jottrindra Bodhipriya Larma popularly known as Shantu Larma, the chief of the PCJSS, the political wing of the armed guerrila force of the tribal insurgents expressed confidence on the signing of the peace treaty.

Emerging from the day-long talks at the state guest house Padma the PCJSS chief told newsmen "the draft agreement is now at the final stage and we are going to make the agreement soon."

He, however, did not specify the date when the peace agreement will be signed. The Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Chief whip of Jatiya Sangsad Abul Hasnat Abdullah was standing beside the PCJSS Chief when he talked to

newsmen at the end of Thursday's talks. The leaders of the two sides did not disclose what they discussed and whether there was any disagreement in the crucial talks.

The two sides will meet for the third consecutive day today (Friday) morning at the heavily guarded state guest house.

The second day's talks on Thursday mainly remained concentrated on the structure and functioning of the proposed regional council for the three hill districts in Chittagong. The two sides, it is learnt, are yet to resolve some of the differences on a number of important issues particularly on the authority of the proposed regional council.

Besides, Abul Hasnat Abdullah, National Committee members Engineer Mosharraf Hossain, M.P., Kalpa Ranjan Chakma, M. P., Dipankar Talukder, M.P., Bir Bahadur, M.P. and Ataur Rahman Kaiser of Awami League, Advocate, Fazle Rabbi, M.P. of Jatiya Party, Divisional Commissioner of Chittagong Shakhawat Hossain and Deputy Commissioner of Khagrachhari hill district Ismail Hossain were present in the talks.

However, National Committee members Amir Khasru Mahmood and Syed Wahidul Alam, MPs, of main opposition party BNP, have been boycotting the talks as their party is opposing "peace agreement" with the PCJSS.

The PCJSS leaders who were flown in to the capital by an army helicopter from their guerrila head quarters at Dudukchari for the talks that began at the state guest house on Wednesday include Shantu Larma, Goutam Chakma, Rupayan Dewan, Babul Chakma and two other tribal leaders.

The Bangladesh Observer
November 29, 1997
AL urges BNP to cancel hartal
Ctg clash death toll rises to 3
Chittagong Office

CHITTAGONG, Nov. 28:–The death toll in Thursday's incidents of violence centering the visit of Begum Khaleda Zia to the Chittagong Medical College Hospital rose to three today.

One Khairul Islam Hiru (21) succumbed to his bullet injuries at Chittagong Medical College Hospital on Thursday late night. Son of late Nazrul Islam, Hiru was shot at and severely injured by some people at Kapashgola of Chandgao thana on Thursday evening.

Khairul Islam Hiru, an activist of pro-AL Chhatra League fell prey to the bullets of the activists of JCD, student wing of opposition BNP.

The incident was the sequel to the clashes that took place earlier between the supporters of pro-AL Chhatra League and Jatiyatabadi Chhatra Dal, according to the police. Meanwhile The three Awami League district units today jointly urged the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) to withdraw tomorrow's (Saturday) hartal in Chittagong.

The district ruling party units requested the opposition BNP to consider the withdrawal of hartal in view of the scheduled public meeting at Polo ground on Saturday afternoon to be addressed by the Prime Minister Sheikh Hasina.

Addressing a Press conference at Chittagong Press Club this evening the city Awami League unit President and State Minister for Manpower and Labour M.A. Mannan hoped that the local BNP unit would put off their day long hartal call in the greater interest of "democratic practices and political tranquility."

MA Mannan said that the local Awami League units gave announcement for this public meeting much earlier and accordingly all preparations are completed.

The local BNP units, he said, suddenly gave the call for the hartal just one day ahead of that meeting "much to our chagrin." It seems that the opposition party called the hartal to torpedo the AL's public meeting in defiance of all democratic norms, he added.

The State Minister did not find any reason for hartal on Saturday when the BNP's central leadership called the half-day hartal next Sunday in all divisional headquarters of the country to protest the incidents at the Chittagong Medical College Hospital. We earnestly hope that the good sense would prevail among the BNP leaders", he said

Mr. Mannan disclosed that he phoned city BNP unit President Mir Mohammad Nasiruddin several times to request him for dropping the hartal programme. But the city BNP President did not respond on the phone, he regretted.

The City Awami League unit President warned that the opposition BNP would be liable for any consequences in such a simmering situation due to the hartal.

The press conference was also attended among others, by Awami League central Finance and Industry Secretary Akhtaruzzaman Babu,

Chittagong Awami League North District unit president Eng. Mosharraf Hossain MP, North AL district unit General Secretary MA Salam and South AL district unit General Secretary Moslem Uddin Ahmed.

Meanwhile the Chittagong BNP held a number of rallies and took out procession to make tomorrow's hartal a success.

In the backdrop of such confrontation between the two arch political parties, à tense situation is prevailing in the port. In the evening, there were gun fires at Kazir Dewri near city BNP office. But none was hurt.

The Bangladesh Observer
November 29, 1997
CHT peace
talks continue
Staff Correspondent

The seventh round of peace talks between the government and Parbattya Chhattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) aimed at ending two decade old armed insurgency in three hill districts in Chittagong division, continued for the third consecutive day on Friday, to finalise the draft of the peace agreement.

Members of the National Committee on Chittagong Hill Tracts (CHT), representing the government, and leaders of PCJSS, the political wing of the armed Shanti Bahini insurgents, had two-hour closed door meeting at the heavily guarded state guest house "Padma" on the day. The PCJSS leaders headed by Jyotirindra Bodhi Priya Larma alias Shantu Larma, were flown to the capital by an army helicopter from their guerilla headquarters at Dadukchari for the peace talks that started at the state guest house on Wednesday.

Though Shantu Larma told newsmen at the end of Thursday's meeting that "the draft agreement is now at the final stage and we are going to make the agreement soon", it was not known whether both sides reached consensus giving finishing touches to the draft of the much awaited peace agreement in their meeting on Friday.

There was no formal press briefing after the talks that started at 3:30 pm and continued till 5:30 pm it was larent that the chairman of the National Committee on CHT chief whip Abul Hasnat Abdullah went to the Prime Minister at the end of the meeting to brief her on progress of the talks.

A reliable source hinted that the much-talked about peace agreement to end tribal insurgency in the hill districts of Khagrachari, Rangamti and Bandarban was now "around the corner".

Among others Abul Hasnat Abdullah, Kalparanjan Chakma, MP, from Khagrachari and Ataur Rahman Kaiser of the National Committee and Shantu Larma, Goutam Chakma, Rupayan Dewan, Babul Chakma and two tribal leaders of PCJSS were present at the talks on Friday.

The two sides will resume their talks today (Saturday) at the state guest house "Padma".

The Bangladesh Observer
November 30, 1997
PCJSS leaders examine legal aspect of accord
Staff Correspondent

The leaders of National Committee on Chittagong Hill Tracts and Parbattya Chhattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of Shanti Bahini insurgents are now busy examining the legal aspect of he peace agreement before signing, sources said on Saturday.

One source said that a consensus would be reached in the ongoing seventh round of peace talks that began at State Guest House "Padma" on Wednesday.

Although there was no formal talks on Saturday, National Committee members Ataur Rahman Kaiser, Kalparanjan Chakma, MP, Dipankar Talukdar MP, and Bir Bahadur MP, met informally for some time with PCJSS leaders on Saturday afternoon, sources said.

The two sides will resume their formal talks today (Sunday) at the State Guest House "Padma".

However, sources involved in the peace process said that the regional council proposed in the draft peace agreement would be renamed as "Hill Council" (Parbattya Parishad) and its headquarters would be set up at Rangamati.

Sources said that special tribal ministry would be formed as the PCJSS leaders insisted on the government.

The Bangladesh Observer
December 1, 1997
Govt-PCJSS talks continue for 5th day

The seventh round of talks be tween the Government and Parbat tya Chattagram Jana Sanghati Sam ity (PCJSS) continued for the fifth day

on Sunday with two sides de liberating on smaller issues to reach an accord. The present government and the PCJSS have been searching for a permanent accord to end the two-decade old insurgency in the three hill districts of Rangamati, Khagrachhari and Bandarban.

The National Committee on Chit tagong Hill Tracts (NCCHT) led by Chief Whip of Jatiya Sangsad Abul Hasnat Abdullah held talks with the PCJSS leaders at the state guest house Padma on Sunday. The talks on Sunday continued till late night.

The seventh round of talks be tween the Government and PCJSS began in the capital city on Wednes day. Sunday's talks were participated by Chief Whip Abul Hasnat Abdul lah, Ataur Rahman Kaiser, State Minister for Planning and Civil Avia tion Dr. Mohiuddin Khan Alamgir and Kalparanjan Chakma, MP.

The Bangladesh Observer
December 2, 1997
Govt, PCJSS may sign MOU today
Staff Correspondent

A Memorandum Of Understanding (MOU) on peace agreement between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of armed Shanti Bahini, is expected to be signed today (Tuesday) or tomorrow.

Both the Government and tribal leaders are exchanging notes on the clauses of the draft agreement, sources said on Monday night.

Chairman of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Abul Hasnat Abdullah emerging from the talks told the waiting journalists, “the talks are continuing and you will be duly informed when the agreement will be signed. We will not keep you in the dark about the agreement.”

The seventh round of peace talks continued for the sixth day on Monday at the state guest house Padma. Monday's talks began at about 7 pm and continued till 10:45 pm.

The talks were participated by Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, Engineer Mosharraf Hossain, MP, Chittagong City Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury and State Minister for Planning and Civil Aviation Dr. Mohiuddin Khan Alamgir from the Government side. The PCJSS was represented by Jotiyrendra Bodhi Priya Larma alias Shantu Larma, Goutam Chakma, Rupayan Dewen and Raktatpal Tripura.

Earlier in the day, three parliament members from the hill districts Kalparanjan Chakma, Dipankar Talukdar and Bir Bahadur visited the talks venue several times and had discussion with the tribal leaders at the state guest house.

After the talks, Chief Whip Abul Hasnat Abdullah and Dr. Mohiuddin Khan Alamgir drove out in the same car at 10:45 pm. They were in a happy mood while talking to the journalists.

The scheduled cabinet meeting held on Monday night was apprised of the progress of the peace talks, sources said.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
23-yr old insurgency to end: SB to surrender arms within 45 days
Landmark CHT treaty signed
Staff Correspondent

The much-awaited peace agreement between the Government and the tribal leaders of Parbattya Chattatam Jana Sanghati Samity (PCJSS) aimed at ending over two decade-long insurgency in the Chittagong Hill Tracks, was signed at the Prime Minister's office on Tuesday morning.

It was the second landmark treaty concluded by the present Government of Prime Minister Sheikh Hasina within its 17-month rule after the signing of the thirty-year Ganges water sharing treaty with India on December 12 last year.

The peace treaty, positive out come of the excruciating seven round of talks this year, was signed by the Jatiya Sangsed Chief Whip Abul Hasanat Abdullah. Convener of the National Committee on CHT Affairs and Joytirindra Bodhipriya Larma known as Shantu Larma, the Chairman of PCJSS the political wing of the Shanti Bahini insurgents. After putting their signature Abul Hasanat Abdullah and his counter part in the peace process Shantu Larma exchanged the copies of the agreement.

Prime Minister Sheikh Hasina, who guided the peace talks since coming to power through the general elections in June last year, witnessed the signing of the historic peace treaty, now being opposed by the main opposition BNP and its allies.

The signing of the treaty at 10:25 am was also witnessed by cabinet members, MPs, political leaders, members of the National Committee on CHT Affairs, three chiefs of the Armed Forces, senior

secretaries of the Government, Director General of para-military force BDR, high civil and military officials, PCJSS leaders Goutam Chakma, Rupayan Dewan and Roktotpal Tripura were also present when their Chairman Shantu Larma signed the treaty which will materialise their long cherished dream of peace in CHT.

Belying the doubts of the opposition against the peace treaty, the National Committee on CHT Affairs and PCJSS made the agreement under the ambit of the Constitution, showing allegiance to the national independence and sovereignty, up holding the political social, cultural and educational and economic rights of all citizens including the tribals in CHT region. In the preamble of the treaty it is said that the agreement is made to accelerate socio-economic development process and protect rights of all citizens of the country.

Under the agreement, armed insurgents of the Shanti Bahini will have to surrender their arms within 45 days. The PCJSS will provide the full list of its armed members to the government who will be given general amnesty for rehabilitation. Those who will not surrender arms will face legal action.

The temporary camps of the Army, BDR, Ansar and Village Defence Party, now in the remote areas of the three hill districts of Khagrachari, Rangamati and Bandarban, will be dismantled in phases following the return of tribal insurgents to normal life. However, the cantonment and permanent camps of BDR in CHT will remain and the Army can be deployed in aid of the civil administration in case of ensuring law and order, combating natural calamities and national needs, the agreement asserts.

A three-member committee consisting of a convener, nominated by the Prime Minister, and Task-Force Chairman and PCJSS Chairman will be formed to monitor the implementation of the peace treaty.

Under the agreement, a land commission beaded by a retired justice will be set up to settle land disputes in CHT region. The decision of this Commotion will be considered final and there will be no provision of appeal.

As per agreement, the Government will return the quota system for the tribals in Government jobs and higher educational institutions till the tribals attain the same level that exists in other areas of the country.

The Bangladesh Observer

December 3, 1997

Text of CHT treaty

Following is the English rendering of the Peace Agreement signed between the National Committee on Chittagong Hill Tracts Affairs, formed by the Government of Bangladesh and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity, reports BSS.

Keeping full and unswerved allegiance to Bangladesh's state Sovereignty and territorial integrity in Bangladesh's Chittagong Hill Tracts region under the jurisdiction of the constitution of the People's Republic of Bangladesh, the National Committee on Chittagong Hill Tracts on behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity on behalf of the inhabitants of Chittagong Hill Tracts reached the following agreement in four parts (Namely: Ka, Kha, Ga, Gha) to uphold the political, social, cultural, educational and economic rights of all the people of Chittagong Hill Tracts region, expedite socio-economic development process and to preserve respective the rights of all the citizens of Bangladesh and their development.

Ka) General

1. Both the sides recognised the need for protecting the characteristics and attaining overall development of the region considering Chittagong Hill Tracts as a tribal inhabitated region.
2. Both the parties have decided to formulate, change, amend and incorporate concerned acts. regulations and practices as soon as possible in keeping with the consensus and responsibility expressed in different sections of the agreement.
3. An Implementation Committee will be formed to monitor the implementation process of the agreement with the following members:
   - Ka) A member nominated by the Prime Minister: Convenor
   - Kha) Chairman of the taskforce formed under the purview of the agreement: member
   - Ga) President of Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity: member
4. The agreement will come into effect from the date of its signing and execution by both the sides. This agreement will be valid from the date of its effect until all the steps are executed as per the agreement.

Kha) Chittagong Hill Tracts Local Government Council/Hill District Council.

Both the sides have reached agreement with regard to changing, amending, incorporating and writing off the existing Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad Ain 1989 (Rangamati Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad Ain 1989, Bandarban Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad 1989, Khagrachhari Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad Ain 1989) and its different clauses before this agreement comes into force.

1. The word 'tribal' used in different clauses of the Parishad Ain will stay.
2. The name "Parbatya Zila Sthanio Sarkar Parishad" will be amended and the name of Parishad will be "Parbatya Zila Parishad."
3. "Non-tribal permanent residents" will mean those who are not a tribals but have legal lands and generally live in hill districts at specific addresse.
4. Ka) There will be three seats for women in each of the Parbatya Zila Parishad. One-third of these seats will be for non-tribals.

   Kha) 1.2.3 and 4 sub-clauses of clause four will remain in force as per the original act.

   Ga) The words "Deputy Commissioner" and "Deputy Commissioner's" in the second line of sub-clause (5) of Clause 4 will be replaced by "circle chief" and "circle chief's".

   Gha) The following sub-clause will be incorporated in the Clause-4 "the concerned circle officer will ascertain whether a person is non-tribal or not on the basis of submission of certificate given by concerned mouza headman/union parishad chairman/pourashabha chairman and no nontribal person can become the nontribal candidate without the certificate received from the circle officer regarding this."
5. In the Clause 7 it has been stated that the chairman or any other elected member will have to take oath or give declaration before Chittagong Divisional Commissioner before the taking over office, Amending this in place of "Chittagong divisional Commissioner" the members will take oath or give declaration before "any High Court Division Judge."
6. The words "to Chittagong Divisional Commissioner" will be replaced by "as per election rules" in the fourth line of clause 8.

7. The words "three years" will be replaced by "five years" in the second line of clause 10.
8. In clause number 14 there will be provision that a tribal member elected by other members of the parishad will chair and discharge other responsibilities if the post of chairman fall vacant or in his absence.
9. The existing clause number 17 will be replaced by the following sentences: A person will be considered eligible to be enlisted in the voters list if he/she(1) Is a Bangladeshi citizen (2) He/she is not below the 18 years (3) Appropriate court has not declared him mentally sick (4) He/she is a permanent resident of hill districts.
10. Sub-clause 2 of clause number 20 to words "delimitations of constituencies" will be incorporated independently.
11. In sub-clause 2 of clause 25 there will be a provision that the chairman of all the meetings of the Parishad or a Tribal member elected by other members of the Parishad will chair meetings and discharge other responsibilities if the post of chairman falls vacant or in his absence.
12. At the entire region of Khagrachhari district is not included in the Mong circle, the words "Kagrachhari Mong Chief" in clause number 26 of Kagrachhari Parbattya Zila Sthanio Sarkar Parishad Ain will be replaced by the words "Mong Circle Chief and Chakma Circle Chief." Similarly there will be scope for the presence of Bomang Chief in the meetings of Rangamati Parbattya Zila Parishad. In the same way there will be provision that the Bomang Circle Chief can attend the meetings of Bandarban Parbatiya Zila Parishad meetings if he wishes or invited to join.
13. In sub-clause (1) and sub-clause (2) of clause 31 there will be a provision that a chief executive officer of the status of a Deputy Secretary will be there as Secretary in a Parishad and the Tribal officials will get priority in this post.
14. (Ka) In sub-clause (1) of clause 32 there will be a provision that the Parishad will be able to create new posts for different classes of officers and employees for properly conducting the activities of the parishad.

    (Kha) the sub-clause 2 of clause 32 will be amended as follows: the Parishad can according to rules recruite class three and four employees and can transfer, suspend, terminate

or give any other punishment. But condition would be that in case of such appointments the tribal residents of the district will be given priority.

(Ga) as per sub-clause (3) of clause 32, the government, in consultation with the Parishad, may appoint officers for the other posts and there will be legal provision to removed, suspend or terminate or penalise officers as per the government rules.

15. As per rules' will be mentioned in sub-clause (3) of rule 33.
16. In the third line of sub-clause (1) of rule 36, the words" or in any way devised by the government" will be deleted.
17. (Ka) The principal clause of the 'fourth' of sub-clause (one) of clause 37 will be valid.

    (Kha) as per rules will be included in sub-clause (2), Gha, of rule 37.
18. Sub-clause (3) of clause 38, will be cancelled and sub-clause (4) will be amended in conformity with the following text, "a new budget can be prepared and approved, if needed, at any time, before the completion of the previous financial year."
19. Rule 42 will incorporate the following sub-clause, the Parishad, with the allocated money from the government, will receive, initiate or implement any development project in the transferred subjects and all national level development programmes will be implemented through the parishad by the concerned ministries/divisions/organisations."
20. The word "Parishad" will replace the word "Government" in the second line of sub-clause (2) of rule 45.
21. Rules 50, 51, and 52 will be repealed and following clauses will be introduced.

    If needed, the government will b give advice or regulatory directives for streamlining the Parishad activities with the objectives of the aforesaid rules,"

    The government, if the government receives any hard evidence that any activity or proposed activity of the Parishad is violating the aforesaid rules or is inconsistent with it, will have the authority to ask for written information along with explanation. The Government will also have the authority to give advice or directives in this regard."
22. 'Within 90 days of abolition of the Parishad' shall be read in place of 'after the expiry of defunct period' before the words "the act" under clause 53 sub-clause (3).

23. The word 'government' will be replaced by the word 'minister' in the third and fourth lines in clause 61.
24. a) Sub-clause (1) in clause 62 will be replaced by the following:

    Whatever be the provisions in the currently prevailing laws, Hill Districts Police Sub-Inspector and below shall be appointed by the Parishad as per the prescribed rules and the Parishad will transfer, and take action against them as per the prescribed rules.

    However, the condition will be that tribals of the district will get preference in case of this appointment.
25. The words 'supports will be provided' will remain in third line in clause 63.
26. Clause 64 will be amended as follows:
    a) Whatever exists in the currently prevailing laws, without prior permission, of the Parishad no lands, including leasable khas lands in the district, can be leased out, sold, purchased or transferred.

       However it will not be applicable in case of the reserved forest, Kaptai Hydroelectricity project area, Betbunia Sattelite Station area, state-owned industrial enterprises and lands recorded in the name of the government.
    b) Whatever exists in the currently prevailing other laws, the government cannot acquire or transfer any lands, hills and forests under the jurisdictions of the Hill District Parishad without prior discussion and approval of the Parishad.
    c) The Parishad may supervise or control the work of headmen, Chairman, Amin, Surveyors, Kanungo and Assistant Commissioners (land).
    d) the fringe land of Kaptai Lake will be leased out on priority basis to their original owners.
27. Clause 65 will be amended to formulate the following: for the time being, whatever law is in force/the land development tax of the district will be in the hand of the Parishad and the tax to be collected on that account will be in the fund of the Parishad.
28. Clause 67 will be amended to formulate the following: Parishad and the Government will raise specific proposals if it is necessary for the coordination of the Parishad and he government, and coordination of work will be done through mutual consultations.

29. Sub-clause (1) of clause 68 will be amended to formulate the following sub-clause:
With a view to fulfilling the objectives of this law, the government will be able to prepare rules after discussion with the Parishad through gazette notification. Even after the formulation of any rule, the Parishad will have the right to appeal to the government for re-consideration of such rules.

30. KA) In the first and second paragraphs of sub-clause (1) of clause 69, the words "prior approval of the government" will be dropped and following part will be added after the words "should be done" in the third para:

It is conditional that if the government disagrees with any part of the provision formulated then the government will be able to provide suggestions or directives regarding the provision.

Kha) In the (Ja) of sub-clause (2) of clause 69 the words "the power of the Chairman will be given to any officers of the Parishad" will be dropped.

31. Clause 70 will be deleted.

32. Clause 79 will be amended to formulate the following section:
The Parishad will be able to make written appeal to the government in case it feels that a law passed by the Jatiya Sangsad or any other authority is difficult for the district or objectionable for the tribals after stating the reasons of the difficulty or objection and the government may take appropriate steps for redressal as per the appeal.

33. Ka) the word supervision will be added after 'discipline' in the schedule number one on the activities of the Parishad. Kha) the activities of the Parishad mentioned in number three will be added with the following:
(1) Vocational education, (2) primary education in mother tongue (3) secondary education.
Ga) The words "reserved or" will be dropped from the first schedule of the activities of Parishad and sub-clause 6 (Kha).

34. The following subjects will be included in the functions and responsibilities of the Hill District Parishad:
(Ka) Land and land management (Kha) Police (local). (Ga) Tribal Law and Social Justice (Gha) Youth Welfare, (Uma) Environmental Protection and Development. (Cha) Local Tourism. (Chha) Barring Pourashava and Union Parishads.

Improvement Trust and other local government institutions, (Ja) issue of licence to local industries and business, barring Kaptai water resources, proper use and irrigation of other rivers and canals and beels. (Ya) preservation of statistics of birth and deaths, (Ta) business transactions and (Tha) jum cultivation.

35. The following subjects and sources will be included for imposition of taxes, rate, toll and fees by the Parishad stated in the second schedule:
(Ka) registration fee of manual vehicles (Kha) tax on buying and selling of commodities. (Ga) holding tax on land and buildings. (Gha) tax on domestic animals. (Uma) fees of social judgement. (Cha) holding tax on government and non-government industries. (Chha) A portion of royalty on forest resources. (Ja) Uplementary tax on cinema, jatra and circus. (Jha) Partial royalty of contracts by government for search and exploration of mineral resources. (Neo) Tax on business. (Ta) Tax on lottery, (Tha) Tax on catching fish.

Ga) Hill Tracts Regional Parishad.

1. A regional council will be formed combining the three hill districts local Government Parishad through amending and some clause of three Hill Districts Local Government Parishad Act 1989 with a view to strengthening and making them effective.
2. Chairman of the Parishad will be indirectly elected by the elected members of the Parishad. The Chairman will enjoy the status of a State Minister and he must be a tribal
3. The parishad will consist of 22 members including its Chairman. two-thirds of the members will be elected from the tirbals.

Following is the structure of the Parishad:

Chairman	One
Member (Tribal) male	12
Member (Tribal) female	2
Member (non-Tribal)	6
Member (non-Tribal) female	One

Among the total male tribal members five will be elected from the Chakma tribe, three from Marma, two from Tripura and one from Morang and Tanchownga.

Two persons will be elected from every district from the non-Tribal male members. In the case of non-Tribal female members, one from the Chakma tribe and one from the other tribes will be elected.

4) Three seats will be reserved from women in the council of which one-third will be non-Tribal.
5) The members of the council will be elected indirectly by the elected members of the three Hill District councils. Chairmen of the three Hill Districts will be the ex-officio members of the council and they will have the voting right. The eligibility and non-eligibility of the candidates for the membership of the council will be similar to that of the members of the Hill District Council.
6) The tenure of the council will be five years. Budget preparation and its approval, dissolution of council, formulation of council's regulation, appointment of and control over officers and employees and matters related to concerned subject and procedure will be similar to the subjects and procedures given in favour of and applicable for the Hill District Council.
7) A principal executive officer equivalent to the Joint Secretary of the government will be appointed in the council and Tribal candidates will be given preference in the appointment of the post.
8) a) If the chairman's post of the council remains vacant, a Chairman will be elected indirectly from the other Tribal members of the council by the members of the three Hill District Councils for an interim period.
   b) If any post of the member of the council remains vacant for any reason, it will be filled by by-election.
9. a) All the development activities under the direction of three Hill District councils will be coordinated by the council, including overall supervision and coordination of the matters under the jurisdiction of the three Hill District councils. The decision of the regional council will be b considered final in case of any conflict or lack of coordination in discharging the duties vested upon the three Hill District councils."
   b) The council will coordinate and supervise the local councils, include-ing the municipalities.
   c) The regional council may coordinate and supervise the general administration, law and order and matters related to the development of the three hill districts.

   d) The council may provide direction in the disaster management and relief programme, including coordination of the NGOs' activities.
   e) Tribal rules and social justice will be under the jurisdiction of the regional council.
   f) The council may provide licence for heavy industries.
10. Chittagong Hill Tracts Development Board will discharge the given duties under the general and overall supervision of the council. The government will give preference to the eligible tribal candidates in appointing the Chairman of the Development Board.
11. If any contradiction in observed between the Chittagong Hill Tracts administrative rules of 1900 and other related laws, acts and ordinances and the Local Government Council Law of 1989, it will be settled as per the advise and the proposals of the regional council.
12. The government may form an interim regional council and give it the responsibilities of the council until and unless the regional council is formed on the basis of direct and indirect election.
13. The government may formulate any law regarding Chittagong Hill Tracts subject to discussion with the regional council and that will be done as per the advise of the council.
14. Fund of the council will be formed from the following sources:
   a) Finance received from the District Council Fund.
   b) Finance and profits from all the property which have been provided and directed by the council.
   c) Loan and grants from the government and other authorities.
   d) Grants provided by any institution or person.
   e) Profit from the financial investment of the council.
   f) Any of the finance received by the council.
   g) Finance received from other sources of income provided to the council as per the direction of the government.

Gha) Rehabilitation, general amnesty and other issues

Both sides have reached the following position and agreed to take programmes for restoring normal situation in Chittagong Hill Tracts area and to this end on the matters of rehabilitation, general amnesty and others related issues and activities.

1. An agreement was signed between the Government and the Tribal refugee leaders on March 9, 1997 at Agartala of Tripura state on bringing back the tribal refugees staying in the state of Tripura. Under this agreement repatriation of tribal refugees began on March 28, 1997. This process will continue and the leaders of the PCJSS will extend all possible cooperation in this regard. The internal refugees of the three hill districts will be rehabilitated through their proper identification by a task force.
2. The land record and right of possession of the Tribal people will be ascertained after finalisation of the ownership of land of the Tribal people. And to achieve this end the government will start land survey in Chittagong Hill Tracts and resolve all disputes relating to land through proper scrutiny and verification in consultation with the regional council to be formed under this agreement. These steps will be taken soon after signing and implementation of this agreement between the Government and the PCJSS and rehabilitation of the Tribal refugees and internal Tribal refugees.
3. The government will ensure leasing two acres of land in the respective locality subject to availability of land to the landless Tribals or the Tribals having less than two acres of land per family. However, groveland can be allotted in case of non-availability of necessary lands.
4. A Commission (land commission) will be constituted under a retired judge for the disposal of all disputes relating to lands. Besides settlement of the land disputes of the rehabilitated tribals, this Commission will have full power to annul all rights of ownership on land and hills which have so far been given illegal settlements or encroached illegally. No appeal can be made against the verdict of this Commission and the decision of this Commission will be treated as final. This will be implied in cash of fringe land.
5. This Commission will be constituted with the following members:
   Ka) Retired judge:
   Kha) Circle chief (concerned):
   Ga) Chairman representative of the regional council.
   Gha) Divisional Commissioner/Additional Commissioner.
   Uma) Chairman of the District Council (concerned).

6. Ka) The tenure of the Commission will be of three years. But the tenure can be extended in consultations with the regional council.
   Kha) The Commission will resolve disputes on the basis of existing laws, customs and systems of Chittagong Hill Tracts.
7. The loans, which were obtained by repatriated Tribals from government agencies but could not properly utilised owing to conflicting situation, will be exempted with full interest.
8. Rubber plantation and allotment of other lands: The allotments of lands to non-tribals and nonresidents for rubber cultivation and other purposes but not yet utilised the lands for the projects during the last ten years, will be cancelled.
9. The Government will allocate additional finance on priority basis for taking up maximum number of projects to develop Chittagong Hill Tracts. Projects will be implemented on priority basis for construction of infrastructure for the development of the region. And the government will allocate necessary funds for this purpose. The government will encourage development of tourism for local and foreign tourists, taking into consideration the environmental aspect of the region.
10. Reservation of quota and allocation of scholarship: The Government will continue the quota system for the tribals in case of government jobs and higher education till they reach at par with the people of other regions of the country With this aim in view the government will provide more scholarshops for tribal boys/girls in educational institutions. The Government will provide necessary scholarships for taking education abroad and research pursuit
11. The Government and the elected representatives will be active to preserve the distinctiveness of the Tribal culture and heritage. The Government will provide due patronisation and assistance for expansion of tribal cultural activities at par with that of the mainstream of the national life.
12. The PCJSS will submit to the government within 45 days of signing of this agreement the full list of its armed members and description and accounts of all arms and weapons under its control and possession.

13. The government and the PCJSS will jointly decide the day, date and place of depositing arms by the PCJSS within 45 days of signing of this agreement. The government will ensure all security for the members of the listed members of the PCJSS and their families for coming back to normal life after declaring the day, date and place of depositing arms by the listed members of the PCJSS.
14. The Government will declare amnesty for those members who will deposit arms and ammunition on the scheduled date. The Government will withdraw cases lodged earlier against those persons.
15. The Government will take legal action against those who will not deposit arms and ammunition within the stipulated time..
16. General amnesty will be given to all PCJSS members after they return to normal life and this amnesty will also be given to all the permanent residents who were connected with the PJCSS activities.

    Ka). Each family of the repatriated members of the PCJSS will be given Taka 50,000 in cash at a time for their rehabilitation.

    Kha). All cases, warrants of arest, hulia against any armed member or general member of the PCJSS will be withdrawn and punishment given after trial in absentia will be exempted after surrender of arms and coming back to normal life as soon as possible. The members of the PCJSS, if they are in jail, will be released.

    Ga). Similarly, no cases will be filed or no punishment be given to any person for mere being the members of the PCJSS after surrendering arms and coming back to normal life.

    Gha). The loans obtained by the members of the PCJSS from any government banks or other agencies but could not utilised owing to conflicting situation would be exempted with interest.

    Uma). Those members of the PCJSS who were employed in various government jobs would be absorbed in their respective posts and the eligible members of their family will be given jobs as per their qualifications. In such cases the government principles regarding relaxation of age will be followed.

    Cha). Bank loans of soft term will be given to the members of the PCJSS for cottage industry and horticulture and other such self- employment generating activities.

    Chha). Educational fecilities will be provided to the children of the PCJSS and the certificates obatained from foreign board and educational institutions will be considered as valid.

17) Ka). Immediately with signing and executing the agreement between the government and the PCJSS and the members of the PCJSS coming to normal life all temporary camps of Army, Ansar and Village Defence Force in Chittagong Hill Tracts excepting Bangladesh Rifles (BDR) and permanent cantonments (three in three district headquarters and Alikadam, Ramu and Dighinala) will be gradually brought back to the permanent places and a deadline for this will be fixed. The members of the armed forces can be deployed under due rules and procedures in case of deterioration of law and order situation and in times of natural calamities or like other parts of the country under the control of the civil administration, the regional council may request the appropriate authorities for such help and assistances in case of such a necessity and in due time.

    Kha). The lands to be abandoned by military or para military camps and cantonments will be either returned to the original owners or to the Hill District Councils.

18) The permanent residents of Chittagong Hill Tracts with priority for the Tribals will be given appointment to all categories of officers and employees of all government, semi-government, parishad and autonomous bodies of Chittagong Hill Tracts. In case of absence of eligible persons among the permanent residents of Chittagong Hill Tracts for particular posts, the government may give appointment on lien or for a definite period to such posts.
19) A ministry on Chittagong Hill Tracts Affairs will be set up appointing one Minister from the tribals The following advisory Committee will be constituted to assist this ministry:
    1) The Minister in charge of Chittagong Hill Tracts Affairs,
    2) Chairman/representative, regional council,
    3) Chairman/representative, Rangamati Hill District Council,
    4) Chairman/representative, Khagrachhari Hill District Council,
    5) Chairman/representative, Bandarban Hill District Council,
    6) MP, Rangamati 7) MP, Khagrachhari, 8) MP, Bandarban,
    9) Chakma Raja (King), 10) Bomang Raja, 11) Mong Raja and

12) Three non-tribal members to be nominated by the government taking one permanent non-tribal resident from each three Hill Districts.

This agreement is prepared in Bangla and completed and signed in Dhaka on Agrahayan 18, 1404, December 2, 1997.

On behalf of the Government of the People's Republic of Bangladesh Sd/illegible (Abul Hasanat Abdullah), Convenor. National Committee on Chittagong Hill Tracts, Government of Bangladesh.	On behalf of the residents of Chittagong Hill Tracts Sd/illegible (Jyotirindra Bodhipriya Larma) President, Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Treaty to ensure peace in CHT region: Hasina
Staff Correspondent

Prime Minister Sheikh Hasina on Tuesday said that peace treaty on Chittagong Hill Tracts would end the "long-standing hostility, bring back normalcy and pave the way for development" in the hill region.

Briefing the newsmen after emerging from the signing ceremony of the historic Peace Agreement, she said that the accord between the Government and Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) had been done within the framework of the constitution and showing due respect to sovereignty and independence of the country.

She sought cooperation from all political parties including the main opposition BNP in implementing the peace accord for economic emancipation of common people and national peace. She arged BNP to shun the path of chaos, confusion and violence to disrupt the peace treaty.

The Prime Minister called upon the people not to be misled by any provocation from any quarter and warned that a "certain quarter" was conspiring to thwart the peace process in the Chittagong Hill Tracts region.

She said that her government had carried forward the peace process initiated by previous governments including BNP that held thirteen

meetings with tribal insurgents. She added with a spirit of satisfaction that her government had succeeded in signing the final peace agreement ending over two decade long tribal insurgency in CHT.

"In present-day context, nobody wants war-like situation in the country and peace initiative is going on in every conflict-torn areas around the world," the Prime Minister asserted. She pointed out "We never liked the hostility in Chittagong Hill Tracts region and even when we were in opposition we cooperated with BNP government as we wanted solution to the crisis in the hill tracts region."

Prime Minister Sheikh Hasina hoped that after the signing of the peace agreement both tribals and Bengali settlers would now work together for development of that area. She said that peace was a must not only for CHT but also for the development of the country.

Responding to a question the Prime Minister with jubilation "I am very happy about the signing of the peace treaty and it is a historic moment for me".

She said in response to another question that the agreement would be sent to President Justice Shahabuddin Ahmed for his assent and he would consider whether it was necessary to send the treaty to parliament for discussion. She, however, assured that the treaty would be discussed in parliament if the opposition wants. She clarified that it was not necessary that the peace treaty must be ratified by parliament as it was not an international agreement.

Prime Minister Sheikh Hasina expressed her gratitude to all sections of the people including administrative officials of the Chittagong Hill Tracts region, members of the Armed Forces, BDR, Police, Ansar, PCJSS leaders, tribals and Bengali people living in hill tracts region, country's intellectuals and professional groups who helped the peace process and welcomed the peace agreement.

Convener of the National Committee on Chittagong Hill Tracts Affairs Jatiya Sangshad Chief Whip Abul Hasanat Abdullah who signed the peace agreement on behalf of the government in his reaction to journalists said, "I am happy with the signing of the treaty as it will bring both peace and development in the region." He thanked the PCJSS leaders for their sincere cooperation in resolving the long-standing issue.

PCJSS Chief Jotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma, the tribal leader who took the tenacious move to end the two decade long insurgency in CHT by signing the peace agreement with the government told newsmen. "I am feeling very happy after signing

the agreement. Now we shall return to normal life and begin a new life after so many years. Now we can dedicate our talent and labour for the development of the Chittagong Hill Tracts region." Expressing his confidence in the present government, he said, "we all hope that the agreement will be implemented." Shantu Larma sought cooperation from all people irrespective of religion, caste and ideology to implement the agreement and ensure peace in CHT.

Army Chief Lt Gen Mahbubur Rahman who returned from Kuwait to witness the signing of the peace treaty told newsmen. "I am very happy after the signing of the peace agreement on Chittagong Hill Tracts region." The army chief exuded confidence that the treaty between the government and the PCJSS would restore peace and ensure development in the CHT region.

The Bangladesh Observer

December 3, 1997

Chronology

Chronology of historical events in Chittagong Hill Tracts (CHT) since 1715.

Area: 5093 square miles which in one tenth of the total area of Bangladesh. The forest area of Chittagong Hill Tracts in 47 percent of the total forest area of the country.

Population: One million including tribals and settlers from outside CHT. There are 10 tribes in the three hill districts of CHT. They are Chakma, Marma, Tripura, Dhak, Thiang Khumi, Murang, Lusai, Bhom Pankho and Tanchangya.

Mughal rule

1715: Raja Jallal Khan signed treaty with the Mughal rulers.

1715-1760: Chittagong Hill Tracts had independent status. But it had to pay revenues to the Mughals by cotton and yarn. Since then the region used to be named as cotton area.

1760-1780: CHT maintained the status of independent state under British empire after the fall of Mughal dynasty. But it continued to pay revenue to the British. From 1777 to 1780, Chakma soldiers fought wars with the British.

British rule

1787: Chakma Raja (king) Jan Baksh expressed loyalty to the British East India Company. Chittagong Hill Tracts came under

the British rule following the surrender of Chakma raja to the British and the British established full control in CHT. The British rulers promised not to interfere in the administration of Chittagong Hill Tracts.

June 20, 1860: The British government separated the hilly areas from the main Chittagong district. The hilly area came to be known as Chittagong Hill Tracts as a separate district.

Pakistani rule

August 17, 1947: Radclif award incorporated Chittagong Hill Tracts with Pakistan during the partition of British India that formed to independent sovereign states, India and Pakistan.

August 15 to Aug 20, 1947: Parbattaya Chhattagram Jana Sanghaty expressed doubt whether their rights would be preserved in the new state of Pakistan. The samity hoisted Indian flag in Rangamati Deputy Commissioner's office. But Bomang king protested and fled to Bandarban where he hoisted Burmese flag.

Aug. 21, 1947: Baluch regiment took control of the CHT and brought down the Indian flag. A big group of Chakmas left CHT and took refuge in India.

1948: Several thousands of tribals left for India and Burma.

1950: Pakistan government violating the Chittagong Hill Tracts manual of 1900, made forcible settlement of several hundred Muslims families at Langdu, Nanyarchar, and Bandarban.

1956: The hill tracts manual law–1900 was incorporated in Pakistan Constitution.

1962: Pakistan government continued to bring the Chittagong Hill Tracts under the control of the non tribals.

1957-62: Kaptai hydroelectric dam was constructed and as a result 40 percent of CHT cultivable land went under water. This dam deprived thousands of tribal people of their source of living and income.

1964: The affected people due to Kaptai Dam were rehabilitated in other areas of CHT. Being dissatisfied with the rehabilitation programme, about 50 thousand tribals left for India. Of the total refugees, 20 thousand Chakma refugees were allowed to settle in the Indian state of Arunachal and the rest were settled in the Indian state of Tripura and other Indian states.

1971: When the Liberation War of Bangladesh started. Chakma Raja Tridib Roy collaborated with the Pakistani occupation forces.

Dec. 5, 1971: When the Pakistani force was withdrawn from Panchari area, the non-tribal freedom fighters killed 14 tribals.

Awami League rule

CHT under Awami League government of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman from 1971 to 1975.

Jan 20, 1972: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman assured that the Chakmas would get their due share in the government jobs.

Feb. 15, 1972: Representatives of Chakma Raja submitted their 4-point proposal to Bangabandh Sheikh Mujibur Rahman demanding autonomy for CHT.

April 24, 1972: Manabendra Narayan Larma, then Member of the council of Chakma Raja submitted the 4-point proposal to the constitution drafting committee.

June 24, 1972: Larma in his bid to realise the demand for autonomy formed a regional political party under the name of "Parbattya Chhattagram Sanghati Dal".

Jan. 7, 1973: Armed wing of Jana Sanghati under the name of Shantibahini was formed Santu Larma became the chief of Shanti Bahini.

February 13, 1973: Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman during his visit to CHT declared that no separate tribe would be in Bangladesh and all would be considered as Bangalee. In the general election of 1973, Manabendra Narayan Larma was elected from two seats.

August 1975: After the killing of Bangabandhu, the political scenario was totally changed. Larma went into hiding.

Ziaur Rahman govt

CHT under martial law and BNP government of President Ziaur Rahman.

1976: Chittagong Hill Tracts Development Board was formed by the government of Ziaur Rahman and The Area Commander of Chittagong Cantonment was made its chairman. The board took plan to settle the non-tribals in CHT. Under the plan non-tribal Bangalis were settled in the hill areas and they were given government loan for meeting their necessities including food.

May 29, 1977: Shanti Bahini launched major attack on the Army. Following the attack, the army and navy were reinforced.

Dec. 26, 1977: Area commander of Chittagong Major General Manjoor warned Shanti Bahini and the Chakmas and said, "we do not want you. You are free to go anywhere. We only want your land."

March 25, 1980: Kalampati massacre took place. The local Army commander called a meeting of the Chakmas at a Buddhist temple. It was alleged that at least 300 tribals were killed when the Army opened fire. The non-tribals also launched attack on Chakma settlement and Buddhist temples. Local MP Upendra Lal Chakma called a Press conference. Then the opposition leaders Shahjahan Siraj and Rashed Khan Menon were present at the Press conference.

April 25, 1980: The demand for autonomy of CHT was made and tribals pressed for its incorporation in the constitution.

July 29, 1980: President Ziaur Rahmam had a closed door meeting with the tribal leaders.

February 5, 1982: Subinial Dewan Tribal Affairs Secretary to the President led a delegation of tribals and non-tribals to President Sattar, who was elected President of BNP government after the killing of Ziaur Rahman in Chittagong.

Ershad govt

CHT development under Martial Law regime and Jatiya Party government of President HM Ershad.

July 27, 1982: General Ershad held a meeting with Chakma leaders after he took over power from President Sattar. He sent General Mannaf the Area Commander of Chittagong Cantonment to Rungamati to talk to the tribal leaders.

Oct. 24, 1982: Janasanghati Samity clearly split into two factions in the annual conference of Janasanghati Samity, Manabendra Larma and Priu Kumar Chakma led the two factions.

June 14, 1983: Two factions of the Jana Sanghati Samity got locked in armed conflicts.

Oct. 3, 1983: General Ersahd made some proposals to resolve the CHT crisis.

Nov. 10, 1983: Manabendra Larma along with the & associates were killed by Pritikumar Chakma in an attack at the Kallayanpur camp in village Ijara in Tripura state in India.

June 29, 1985: 233 armed members at Priti group surrendered and returned to normal life after an agreement with the government. But Priti Kumar Chakma and Bhavalesh Dewan remained in hiding.

Oct 21, 1985: The first dialogue between the Army officials and Jana sanghati Samity leaders was held under Ersahd regime.

June to July 27, 1986: Shanti Bahini launched several attacks on the non-tribals. Bangali settlers in rehabilitation looted Chakma settlements. Over 50 thousand tribals crossed over to Indian state of Tripura.

1986: The first international conference on Chittagong Hill Tracts was held in Amsterdam. On September 1987, tribal leaders met with General Ershad and made efforts for a political solution to the CHT problem. National Committee on CHT was formed with Planning Minister Air Vice Marshal AK Khondakar.
Dec. 7, 1987: After two years interval the second meeting between army officials and Janasanghati was held at Panchari.
January 24-25: The third meeting between the Army officials and Jana Sanghati Samity was held again at Panchari.
Feb. 17-18, 1988: The fourth meeting between the Army officials and Janasanghati Samity was held.
June 19, 1988: The Fifth meeting between Army officials and Janasanghati Samity was held at Khagrachhari Circuit House.
Aug. 8, 1988: International working group formed Chittagong Committee in Netherlands.
Dec. 14-15, 1988: The sixth and the last meeting under Ershad government was held between the Army officials and Janasanghati leaders without any result.
Feb. 28, 1989: A local government bill on three hill districts was placed in the Jatiya Sangsad (Parliament).

Khaleda Zia govt

Talks with Shanti Bahini leaders under BNP government Prime Minister Begum Khaleda Zia.
April 10, 1992: A riot took place between the tribals and non-tribals youths. Following the riot, arms and the settlers attacked Chakma village at Lodang. At least 300 Chakmas were killed there in the attack. BNP government under Prime Minister Khaleda Zia formed committee to investigate into the Lodang massacre.
May 19, 1992: Violence spread to the area.
May 20, 1992: Chairman of Rangamati Regional Council Gautam Dewan resigned in disappointment following the failure of the government in stopping violence.
MAY 1992: The summit meeting between Prime Minister Khaleda Zia and Indian Premier Narshima Rao in Delhi talked to repatriation of Chakma refuges.
TULY 8, 1992: BNP government passed a bill in parliament for extending term of the local government in the three hill districts.
JULY 10, 1992: BNP Government formed a committee with Oli Ahmed as leader to resolve the CHT problems. The three local

government councils called the committee illegal as three local MP's were not included in the committee.
AUGUST 1, 1992: Jana Sanghati Samity unilaterally declared truce in CHT. The term of ceasefire was extended 35 times. The latest the ceasefire will remain in force till December 1997. During the last five years of ceasefire the government and the Jana Sanghati Samity blamed each others for violating ceasefire.
NOVEMBER 5, 1992: First meeting between BNP's committee on CHT and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of armed Shanti Bahini insurgent, at Khagrachhari Circuit House. Minister Oli Ahmed and PCJSS leader Shantu Larma led their respective side.
DECEMBER 26, 1992: Second meeting between the government and PCJSS at Khagrachhari Circuit House.
MAY 2-9, 1993: The political committee on CHT of BNP government headed by minister Oli Ahmed visited Indian state of Tripura to discuss with the refugee leaders.
MAY 22, 1993: Third meeting between the government and PCJSS at Khagrachhari Circuit House.
JULY 14: Fourth meeting at Khagrachhari Circuit House.
SEPTEMBER 18, 1993: Fifth meeting at Khagrachhari Circuit House.
NOVEMBER 24, 1993: Sixth meeting at Khagrachhari Circuit House.
FEBRUARY 15-22, 1994: 1841 Tribal refugees returned home from the refugee camps in the Indian state of Tripura.
MAY 5, 1994: Seventh meeting between the BNP government and PCJSS at Khagrachhari Circuit House.
JUNE 4, 1994: Government formed a sub-committee headed by Rashed Khan Menon MP of Workers Party which held meeting with the PCJSS at Dudukchhari in Khagrachhari district.
JULY 10, Aug. 28 and Dec. 26, 1994: Second, third and fourth meeting between the sub-committee and PCJSS at Dudukchhari.
JULY 12, 1995: Fifth meeting between the government sub-committee and PCJSS held at Dudukchhari.
OCTOBER 25, 1995: The sixth and the last meeting of the sub-committee which was the 13th meeting of the political committee on CHT under BNP government was held with the PCJSS at Dudukchhari yielding no positive outcome.

Sheikh Hasina govt

Peace talks leading to the historic CHT peace agreement under the present Awami League Government of Prime Minister Sheikh Hasina following the general elections in June 1996.

SEPTEMBER 30: Government formed a National Committee on CHT headed by Jatiya Sangsad Chief Whip Abul Hasanat Abdullah coming of MPs from ruling party Awami League main opposition party BNP and Jetiya Party, the third largest group in parliament.

DECEMBER 21-24, 1996: The first meeting between the National Committee and the PCJSS held at Khagrachhari Circuit House Chief Whip Abul Hasanat Abdullah and PCJSS leader Jyotirindra Bodhipriya Larma alias Shantu Larma led their respective side.

JANUARY 25-27, 1997: The PCJSS leaders were flown to Dhaka by army helicopter to have their meeting with the national committee at the state guest house Padma, first time in the capital.

MARCH 12-13, 1997: The third meeting between the National Committee on CHT and PCJSS an the state guest house Padma.

MARCH 28 to APRIL 7, 1997: A total of 6708 refugees returned home from the Indian state of Tripura.

MAY 11-14, 1997: Both sides agreed to sign and agreement at the fourth meeting held at state guest house Padma.

JULY 14-18, 1997: The National Committee and PCJSS held their fifth round of talks at the state guest house.

SEPTEMBER 14-17, 1997: Progress made on the formulation of the draft of the peace agreement at the sixth round talks of the state guest house Padma.

NOVEMBER 21-30, 1997: Another group of 1620 tribal refugees returned home from the Indian sate of Tripura. The National Committee members earlier visited Indian state of Tripura to discuss the repartition of tribal refugees.

NOVEMBER 26, 1997: The seventh round of talks between the National Committee and PCJSS started amidst rising expectation about the signing of a peace agreement.

NOVEMBER 27, 1997: PCJSS leader Shanto Larma said the draft agreement in at the final stage and we are going to sign the agreement soon.

DECEMBER 1, 1997: The draft of the agreement was finalised after six day talks. The cabinet meeting in the evening was apprised of the final draft of the peace agreement.

DECEMBER 2, 1997: The historic peace agreement between the government and the tribal leaders was signed at 10-25 am. at the Prime Minister's office ending the to-decade long tribal insurgency to CHT.

The BNP MPs in the National Committee on CHT boycotted all the seven rounds of peace talks between the National Committee and PCJSS as their party opposed the peace agreement with the tribals. Jatiya Party MP Advocate Fazle Rabbi, however, attended the peace talks.

During the peace talks the main opposition party BNP and its allies including Jamaat-e-Islami held vio lent demonstration, rallies and threatened to call hartal against the peace agreement. However, Left Democratic Front in which Rashed Khan Menon, former MP and the leader of the political sub-committee on CHT formed by the last BNP government, is a central leader and Gono Forum led by Dr. Kamal Hossain, and JSD headed by A.S.M. Rob and Hasanul Huq Inu welcomed the peace talks with the PCJSS.

The Bangladesh Observer

December 3, 1997

CHT treaty

BCL, JCD hold rallies on DU campus

Varsity Correspondent

Pro-Awami League Chhatra League and opposition BNP's student front Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) brought out separate processions and held rallies on Dhaka University campus on Tuesday in support and against the signing of treaty on Chittagong Hill Tracts respectively.

Addressing the rally, the BCL leaders hailed the treaty and said that the signing of the treaty was a milestone in the history of the country's politics.

The rally held in front of Modhu's Canteen was addressed among others, by BCL President Enamul Haq Shamim, Anwar Hossain, Shajahan Alam Saju. Ajoy Kor Khokon, Bahadur Bepary and Abdul Woadud Khokon.

The Chhatra Dal leaders at their rally strongly criticised the Government for signing such a treaty and said that it would be a threat to the country's sovereignty.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Editorial
Hill Tracts Peace Accord

The long awaited peace accord on Chittagong Hill Tracts has finally been signed. The document was firmed up by negotiators representing the government and the ethnic groups inhabiting the region in prolonged discussions in several rounds of talks. The accord was signed in Dhaka Tuesday morning by Abul Hasanat Abdullah, Convener of the National Committee on Chittagong Hill Tracts (NCCHT) on behalf of the government of Bangladesh and Jytorindriyo Bodhipriyo Larma alias Shantu Larma, Chairman/ President of the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) on behalf of the inhabitants of the region.

The preamble claims the treaty is based on the constitution of the nation and expresses full regard to the sovereignty and integrity of the country and pledges to protect the country and political, social, economic and cultural rights of all citizens.

The 14-page agreement is divided into four parts: (a) General, (b) Parbatya Zila Parishad, (c) Parbatya Chattagram Regional Council and (d) Rehabilitation. General Amnesty and miscellaneous affairs.

Considering the Chittagong Hill Tracts as a tribal people-inhabited region both the parties have accepted the necessity of working for the overall development of the area protecting the special characteristics of the region. A three-member committee headed by a nominee of the Prime Minister will monitor implementation of the accord.

There will be a Parbatya Zila Parishad for each of the Hill Tract districts. Besides, there will be a regional council named Parbatya Chattagram Anchalik Parishad comprising the three Hill Tract Districts. The Council will comprise 22 members including a Chairman with the status of State Minister. The Chairman will be indirectly elected by the elected members of the Parbatya Zila Parishads. The ratio of tribals and non-tribals will be two to one.

The PCJSS will submit the complete list of its armed cadre together with other members and details of arms and ammunition within 45 days of signing the accord. The government and PCJSS will fix a date for surrender of the arms and ammunition. The member of the PCJSS will enjoy general amnesty after surrender.

A commission headed by a retired judge will head all disputes related to land claims by the returnees. Each member of PCJSS will get a lump grant of Taka 50,000 to help rehabilitation of their respective families.

The members of PCJSS who had previously been in the employ of the government or any semi-government institution will be reinstated in their respective jobs. Those who had taken loans from nationalised banks or other financial institutions but could not properly utilise those loans under the prevailing circumstances will be exempted together with interest. This is part of the favourable terms for the tribal citizens to feel satisfied with the peace agreement just signed.

It is to be seen how local and non-local proportion in the local self-governing institutions of the region are taken by the concerned people or how the other provisions stand scrutiny. How it goes down with the opposition would also be interesting; it has for quite some time been one of the bones of contention between the government and the opposition. The real test however lies in implementation. Which we hope could be made easier by letting the agreement signed be thoroughly discussed in national parliament as pledged by the government.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Peace treaty hailed in Ctg
Chittagong Office

CHITTAGONG, Dec. 2:– The ruling Awami League in Chittagong today held a rally and took out a procession to hail the peace agreement signed between the Government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS) to bring an end the two-decades old insurgency in Chittagong Hill Tracts (CHT).

The three district Awami League units held the rally at Darul Fazal market square. Among the speakers were city Mayor ABM Mohiuddin Chowdhury. The speakers termed the peace agreement a landmark for the country.

After the rally, a big procession was taken out in support of the CHT peace agreement. The processionists chanting slogans hailing the agreement paraded the main thorough fares of the port city.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
President apprised of CHT treaty

On behalf of Prime Minister Sheikh Hasina, Chairman of the National Committee on Hill Tracts Affairs and Chief Whip Abul Hasnat Abdullah, along with State Minister for Civil Aviation, Tourism and Planning Dr. Mohiuddin Khan Alamgir, called on President Justice Shahabuddin Ahmed at Bangabhaban. Tuesday submitted a copy of the peace agreement signed between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), says BSS.

They apprised the President of the various aspects of the peace agreement.

Secretary-in-charge of Special Affairs Division Kazi Golam Rahman was present on the occasion.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
JSD hail treaty

Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) on Tuesday hailed the peace agreement between the Government and Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), says BSS.

"The peace agreement is a primary step towards ensuring peace and stopping war situation in the hill tracts and national consensus should be built in favour of the agreement," the JSD said in a reaction to the landmark peace agreement, a party release said.

A meeting of the JSD in this connection was held this afternoon at its central office with central committee leaders Hasanul Huq Inu, Noor Alam Jiku, Kazi Aref Ahmed, Sharif Nurul Ambia, Syed Zafar Sajjad and Moinuddin Khan Badal.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
3 CHT bodies reject peace treaty

Three factions of the Shanti Bahini's open fronts have rejected the peace accord on the CHT calling it "a document of compromise," reports UNB.

Pahari Chhatra Parishad, Pahari Gano Parishad and the Hill Women's Federation, in a joint statement in Dhaka on Tuesday said they will not accept the agreement.

"It will also not bring peace in Chittagong Hill Tracts" said Gano Parishad General Secretary Prasit Bikash Khisa on behalf of the three organisations.

He said there was no difference between the accord and the so-called hill districts local government council introduced in 1989 during the regime of autocrat Ershad.

He said the accord did not ensure the basic demands of the hill people–constitutional recognition of their ethnic entity, withdrawal of army and outsiders, and the right on land.

The three organisations, considered the open platforms of the Shanti Bahini insurgents, played very important roles in the movement of the hill people.

But all the three organisations were split over the peace talks and the process of peace agreement between the Awami League government and the Parbatya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS).

Meanwhile, Jatiya Ganotantrik Front President Dr. MA Karim and General Secretary Protapuddin Ahmed, in a statement, also rejected the accord.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Ctg BNP rejects CHT peace accord

CHITTAGONG. Dec. 2:– Opposition political parties here to day demonstrated against the signing of the CHT peace agreement, reports UNB.

Holding protest processions and rallies, leaders of the main opposition BNP and its allies said they reject the treaty as it would "endanger" territorial integrity as well as political independence of the country.

Under constant police surveillance, some 200 BNP leaders and workers paraded the main city streets in a procession, chanting slogans urging the people "not to obey the Accord". Later, the BNP held a rally at its city unit office.

Presided over by Haji Nurul Islam Sawdagar, the rally was addressed, among others, by BNP leaders Abdus Sattar and Qamrul Islam Sajjad, Jubo Dal's Abul Hashem Bakkar and JCD City President Nazimur Rahman.

Protesting the treaty, Jamaat-e-Islami brought out a procession from its Dewanbazar office that ended with a rally at Andarkilla.

Our Correspondent from Rajshahi adds: Various opposition political parties including Bangladesh Nationalist Party (BNP), Jamaat-e-Islami and Muslim League brought out separate processions held wayside meetings and issued statements protesting the signing of the CHT Peace Treaty with the Shanti Bahini leaders, while the leaders and workers of local units of Bangladesh Awami League and its front organisations brought out processions hailing the peace treaty.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Separate Ministry on CHT Affairs to be set up
Staff Correspondent

A separate Ministry on Chittagong Hill Tracts Affairs headed by a minister from the tribals will be set up.

According to the Clause 19 of the draft of the agreement on CHT, a 12-member Advisory Committee will be formed to assist the Hill Tracts Affairs Ministry.

The 12-member Advisory Committee will be composed of the Minister of Chittagong Hill Tracts Affairs, Chairman or representatives of the Regional Council, Chairman or representative of Rangamati Hill District Council Chairman or representative of Khagrachhari Hill District Council, Chairman or representative of Bandarban Hill District Council, Parliament Members of Rangamati, Khagrachhari, and Bandarban. Bomang Raja, Chakma Raja, Mong Raja three non-tribal members from the three hill districts to be nominated by the government.

A regional council comprising the three hill district councils will be set up to further strengthen and make the Hill District Councils more effective.

The Chairman of the Regional Council will be elected indirectly by the elected members of the three Hill District Council. The Chairman who have the status of a State Minister must be tribal. The regional council will have 22 members. Two third of the members of the regional council will be elected from among the tribals the council will determine the functions.

The composition of the members of the regional council will be as follows: Chairman-1, members tribals (male) 12, members tribals (female) 2, members non-tribals (male) 6, member non-tribal (female) 1. Five of the male members will be elected from the Chakma tribe, three from Marma, two from Tripura, one from Morang and Tanchangya, one from Lusai Bhome, Pankho, Chak and Khiang tribes. The non-tribals (male) members will be two from each three district, in the case of tribals (famale) one be from Chakma and one from other tribes. Three seats will be reserved for the Females. One third of its members will be from non-tribals.

The members of the regional council will be indirectly elected by the elected members of three hill district councils. Chairmen of three hill district council will become ex-officio members of the council and they will have the right to vote. The qualification and disqualification of the council members will be the same as those of the district council.

The tenure of the regional council will be for five years. The formulation of the budget, approval, dissolution of the council, formulation of rules, appointment of officials and employees etc. will be as those of the district councils.

A principal executive officer of the council will be in the status of Joint Secretary of the government. A tribal will be given priority for appointment to this post.

The Bangladesh Observer
December 3, 1997
Treaty hailed
Staff Correspondent

Different political parties, trade bodies, professional groups, socio cultural and voluntary organisations issued statements on Tuesday hailing the signing of peace treaty between the government and the Parbattya Chattagram Jana Sanghati Samity (PCJSS), the political wing of the Shanti Bahini to end the decades long insurgency in three hill districts of Chittagong.

Syed Ataur Rahman and Mohammad Shahabuddin, President and Secretary General of Bangladesh Sarkari Karmachari Sanghati in a joint statement on Tuesday, hailed the signing of the peace treaty between the government and the PCJSS.

They also greeted the Prime Minister Sheikh Hasina for her political statesmanship and acumen in taking the right step to resolve the crisis. Mr. Alauddin Ahmed and Mr. Nazrul Islam, President and General Secretary respectively of Sangbadik Oikya

Andolon (SOA) in a joint statement on Tuesday, hailed the signing of peace treaty on Chittagong Hill Tracts on Tuesday.

They said that with the signing of this treaty the two decades long insurgency in three hill districts in Chittagong would be resolved.

The Narayanganj district unit of Bangladesh Awami League brought out a procession in Narayanganj town hailing the signing of the peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

The Narayanganj district Awame League leaders including district President Prof. Nazma Rahman, General Secretary Shamim Osman, MP, Shahabuddin Ahmed, Advocate Anisur Rahman Dipu, Advocate Saduzzaman, district Juba League General Secretary Abul Hasnat, Shahid Mohammad Badal addressed a gathering.

Central Command Council of Bangladesh Muktijoddha Sangsad expressed its satisfaction with the signing of the peace treaty on Chittagong Hill Tracts. The Sangsad in its statement said that the long outstanding problems of Chittagong Hill Districts would be resolved after signing of this peace accord.

One hundred fifty one intellectuals including litterateurs, journalists, artistes, physicians, cultural activists, poets, writers and Salahuddin Badal and Sheikh Abdul Kader, President and General Secretary respectively of Joybangla Sangskrituk Jote, in a joint statement on Tuesday, hailed the government for signing the peace accord for restoring peace in Chittagong Hill Tracts after much efforts.

They called upon the government to remain alert against all conspiracies.

Prominent among the signatories are Mofazzal Hossain Chowdhury (Maya), M.P., Al-haj Moqbul Hossain, M.P., Prof. Panna Kaiser, MP, Syed Hasan Imam, Samar Das, Prof. Abdul Mannan Chowdhury, Dr. Inamul Huq, Jamaluddin Hossain, Ajit Roy, Kabori Sarwar, Rawshan Ara Hossain, Habibur Rahman Milon, Golam Sarwar, Shafiqur Rahman, Abul Kalam Azad, Nirmalendu Gun, Mohadev Saha, Rafiq Azad, Lucky Inam, Lutfun Nahar Lata, Mita Huq, Khaleda Edib Chowdhury, Dr. Arup Ratan Chowdhury.

Advocate Shahara Khatoon and Advocate Abdullah Abu, Convener and Member-Secretary respectively of Bangladesh Awami Ainjibi Parishad in a joint statement on Tuesday, expressed their satisfaction with the signing of the historic peace accord on Chittagong Hill Tracts.

The Commonwealth Students and Youth organisation in a statement on Tuesday, hailed the signing of peace accord on Chittagong Hill Tracts.

Dr. Rashid-E-Mahboob and Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, President and Secretary General respectively of Bangladesh Medical Association (BMA) in a joint statement on Tuesday, said the signing of peace accord to end over two decades long insurgency in three Chittagong hill districts of Chittagong is a milestone in the history of Bangladesh.

They also congratulated the Prime Minister Sheikh Hasina on her political sagacity and acumen in signing the peace agreement.

M.A. Kashem, Secretary General of the council for the Officers of the Republic in a statement on Tuesday hailed the peace treaty on Chittagong Hill Tracts.

Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ) and Dhaka Union of Journalists (DUJ) on Tuesday hailed the agreement which they said would bring an end to the two decade old hostility in the Chittagong Hill Tracts.

In a joint statement, BFUJ President Iqbal Sobhan Chowdhury and Secretary General Abul Kalam Azad and DUJ Acting President Suva Rahman and General Secretary Azizul Islam Bhuiyan termed the signing of the accord as a milestone in the national history. “This agreement will bring peace and stability in the country's resourceful and picturesque hilly region which for a long time was shattered by the cry of agony,” they said.

The union leaders said after signing the historic Ganges Water sharing treaty, this is yet another big victory of the government of Sheikh Hasina in resolving national issues through peaceful negotiations. “Prime Minister Sheikh Hasina deserves a covetous award” for her initiative for peace, they added.

The union leaders also thanked the members of the National Committee on Chittagong Hill Tracts and the PCJSS for demonstrating their utmost good sense.

■■■